ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম

মূলঃ শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহঃ)

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম

মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

অনুবাদঃ

আবদুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম,এম, ফার্স্ট ক্লাশ

মুহাঃ আবদুল্লাহ আল-কাফী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকমন্ডলী :

আব্দুল্লাহিল হাদী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দাঈ জোবায়েল ইসলামিক সেন্টার

মুহাঃ জাহিদুল ইসলাম

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দাঈ জোবায়েল ইসলামিক সেন্টার

আব্দুন্ নূর বিন আব্দুল জব্বার

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দাঈ রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দাঈ পশ্চিমদ্বীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ

প্রথম প্রকাশঃ ১৪৩০ হিজরী

দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪৩১ হিজরী

তৃতীয় প্রকাশ: ১৪৩২ হিজরী

فتاوى أركان الإسلام

لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله

ترجم :

عبد الله بن شاهد

الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

محمد عبد الله الكافي

الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المراجعة:

عبد الله الهادي

الداعية و المترجم بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالجبيل

محمد جاهد الإسلام

الداعية و المترجم بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالجبيل

عبد النور بن عبد الجبار

الداعية و المترجم بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة – الرياض

محمد عبد الرب عفان

الداعية و المترجم بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة – الرياض

الطبعة الأولى 1430هـ الطبعة الثاني 431 هـ 1430هـ الطبعة الثالث 432 هـ

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনিত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" (সূরা আল-ঈমরান-১৯) তিনি আরো বলেন,"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করবে, ওটা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (সূরা আল ঈমরান-৮৫)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের উপর। ১) এ কথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল ২) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা ৩) যাকাত প্রদান করা ৪) মাহে রামাযানে ছিয়াম পালন করা এবং ৫) সাধ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই, জিজ্ঞাসার শেষ নেই। তাই নির্ভরযোগ্য প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, যুগের অন্যতম সেরা গবেষক আল্লামা শায়খ **মুহাম্মাদ বিন ছালেহ্ আল-উছাইমীন** (রহঃ) ঐ সকল জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য জবাব প্রদান করেছেন। প্রতিটি জবাব পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বিশুদ্ধ হাদীছ ও পূর্বসূরী নির্ভরযোগ্য উলামাদের মতামত থেকে দেয়া হয়েছে। সেই জবাবগুলোকে একত্রিত করে বই আকারে বিন্যস্ত করেছেন জনাব 'ফাহাদ বিন নাসের বিন ইবরাহীম আল-সুলাইমান'। নাম দিয়েছেন **'ফতোয়া আরকানুল ইসলাম'**। ইসলামী জ্ঞানের জগতে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়াই বাংলা ভাষায় আমরা তা অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করি। তাছাড়া বাংলা ভাষী মুসলমানদের জন্য এধরণের দলীল নির্ভর পুস্তকের খুবই অভাব। তাই বইটিকে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জুবাইল দা'ওয়া সেন্টারের দা'ওয়া বিভাগের পরিচালক শায়খ খালেদ নাসের আল উমাইরির। তিনি বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন। যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যায়। হে আল্লাহ্ এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, তত্ত্বধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান কর। সকলকে মার্জনা কর এবং এ কাজটিকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবূল কর।

* আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
* মুহা আবদুল্লাহ্ আল কাফী

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন (রঃ)এর সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

নাম ও জন্ম তারিখঃ

তাঁর নাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আত্-তামীমী। তিনি হিজরী ১৩৪৭ সালের ২৭ রামাযানের রাত্রিতে সঊদী আরবের আল ক্বাসীম প্রদেশের উনাইযা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি তাঁর নানার কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করেন। অতঃপর আরবী ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই কুরআন মজীদ মুখস্থ করেন এবং হাদীছ ও ফিক্‌হসহ কতিপয় পুস্তিকাও মুখস্থ করেন।

অতঃপর তিনি তাওহীদ, ফিক্‌হ এবং নাহু শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার পর শায়খ আব্দু র রাহমান বিন নাসির আল-সা'দী (রঃ)এর পাঠশালায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফারায়েয, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ এবং আরবী ব্যকরণ অধ্যয়ন করেন। যে সমস্ত শায়খদের ইলম, আকীদাহ এবং পাঠদান পদ্ধতির দ্বারা তিনি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ আব্দুর রাহমান বিন নাসের আল-সা'দী (রঃ) সর্বপ্রথম।

উনাইযাতে থাকাবস্থায় তিনি শায়খ আব্দুর রাহমান বিন আলী বিন আওদান (রঃ)এর নিকট ইলমে ফারায়েয এবং শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফীফী (রঃ) এর নিকট ইলমে নাহু এবং ইলমে বালাগাত শিক্ষা করেন।

রিয়াদ শহরে ইসলামিক শিক্ষা ইন্সটিটিউট খোলা হলে তিনি বন্ধুদের পরামর্শক্রমে এবং তাঁর উস্তাদ শায়খ আব্দুর রাহমান সা'দীর অনুমতিক্রমে তথায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি দু'বছর অধ্যয়ন কালে শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকীতী, আব্দুল আজীজ নিব নাসের বিন রাশীদ এবং শায়খ আব্দুর রাহমান আল-আফ্রিকীসহ অন্যান্য উস্তাদদের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পান। এ সময়ই আল্লামা ইবনে বায (রঃ)এর কাছে উপস্থিত হয়ে ছহীহ বুখারী এবং ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ)এর লিখিত বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে হাদীছ এবং ফিকহী মাজহাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে যাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন ইবনে বায (রঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়।

অতঃপর তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে একাডেমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে উনাইযায় ফেরত এসে উনাইযা জামে মসজিদে পাঠ দান শুরু করেন। তাঁর উস্তাদ আব্দুর রাহমান সা'দী ইন্তেকাল করার পর উনায়যা জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালনসহ

উস্তাদের প্রতিষ্ঠিত উনায়যা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে লাইব্রেরীতে স্থান দেয়া অসম্ভব হওয়ায় মসজিদেই ক্লাশ নেওয়া শুরু করেন। এ পর্যায়ে সঊদী আরবের বাইরে থেকেও বিপুল সংখক ছাত্রের আগমণ ঘটতে থাকে। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তিনি অত্র মসজিদে শিক্ষা দানে ব্যস্ত ছিলেন। সাঊদী সরকারের উলামা পরিষদেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

ব্যক্তিগত আমল-আখলাকঃ

শায়খ একজন উঁচু মানের আলেম হওয়ার সাথে সাথে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, বিনয়ী, নম্র এবং আল্লাহ ভীরু। জীবনের প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। ফতোওয়া দানের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করতেন। তিনি মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সচেষ্ট থাকতেন। বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক সংগঠনকে তিনি বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করতেন।

দাওয়াতী কর্মতৎপরতাঃ

তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত একজন আলেম এবং দাঈ। পৃথিবীতে এমন কোন তালেবে ইলম পাওয়া যাবেনা, যে শায়খ ইবনে উছাইমীন সম্পর্কে অবগত নয়। প্রচন্ড রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি মক্কা শরীফে দারস্ এবং তালীমের কাজ আন্জাম দিতেন। মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে তিনি চিকিৎসার জন্য আমেরিকা সফরে গিয়ে বিভিন্ন ইসলামী সেন্টারে উপস্থিত হয়ে লেকচার প্রদান করেন। তথায় তিনি জুমআর খুৎবা দেন এবং ইমামতি করেন। সাঊদী আরব আল কুরআন রেডিওতেও তিনি নিয়মিত শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন।

ইলমী খিদমতঃ

ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম ছাড়াও তাঁর রচিত কিতাব ও পুস্তিকার সংখ্যা অনেক। তাঁর লেখনীর মধ্যে রয়েছেঃ-

১) শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতীয়াহ। ২) কাশফুশ্ শুবহাত। ৩) আল কাওয়ায়েদুল মুছলা ৪) শারহুল আরবাঈন আন নাবুবীয়াহ। ৫) কিতাবুল ইলম। ৬) আশ্ শারহুল মুমতিউ (সাত ভলিওম) ৭) শারহু ছালাছাতুল উসূল ৮) আল উছূল মিন ঈলমিল উছূল। এছাড়া রয়েছে তাঁর আরো অসংখ্য ক্যাসেট ও ছোট ছোট পুস্তিকা, যা তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ইবনে উছাইমীন কল্যাণ সংস্থা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে থাকে। বর্তমানে তাঁর ইসলামের খিদমত সমূহ ওয়েব সাইটেও পাওয়া যায়।

ঠিকানাঃ www.binothaimeen.com

পরলোক গমণঃ

এই স্বনামধন্য ও বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন দীর্ঘ দিন ইসলামের খেদমত আন্‌জাম দেয়ার পর ১৪২১ হিঃ শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ মাগরিবের নামাযের সামান্য পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে সঊদী আরবের বাদশাসহ রাজ পরিবারের সকল সদস্য, সে দেশের সকল আলেম এবং সর্বস্তরের জনগণ শোকাহত হন। বিশ্ব এক অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করে।

আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন শায়খের সমস্ত দ্বীনি খেদমত কবূল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান প্রদান করেন। আমীন॥

সূচীপত্র
অধ্যায়ঃ আকীদাহ-বিশ্বাস

পৃষ্ঠা নং

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

অধ্যায়ঃ নামায

অধ্যায় ঃ যাকাত

অধ্যায়ঃ রোযা

অধ্যায়ঃ হজ্জ

فتاوى العقيدة

অধ্যায়ঃ আকীদাহ-বিশ্বাস

প্রশ্নঃ (১) তাওহীদ কাকে বলে ? উহা কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তরঃ- তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসকে একক হিসাবে নির্ধারণ করা। 'না' বাচক ও 'হ্যাঁ' বাচক উক্তি ব্যতীত এটির বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ একককৃত বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু হতে কোন বিধানকে অস্বীকার করে একককৃত বস্তুর জন্য তা সাব্যস্ত করা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলব, "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই" একথার সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাওহীদ পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য প্রদান করবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তু হতে উলুহিয়্যাতকে (ইবাদত) অস্বীকার করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করবে। কারণ শুধুমাত্র নাফী বা 'না' বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোন বস্তুকে গুণাগুণ থেকে মুক্ত করা হয়। আর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোন বস্তুর জন্য কোন বিধান সাব্যস্ত করলে সেই বিধানে অন্যের অংশ গ্রহণকে বাধা প্রদান করে না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ যদি আপনি বলেন, 'অমুক ব্যক্তি দাঁড়ানো'। এই বাক্যে আপনি তার জন্য দন্ডায়মান হওয়াকে সাব্যস্ত করলেন। তবে আপনি তাকে দন্ডায়মান গুণের মাধ্যমে একক হিসাবে সাব্যস্ত করলেন না। হতে পারে এই গুণের মাঝে অন্যরাও শরীক আছে। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির সাথে অন্যান্য ব্যক্তিগণও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আর যদি বলেন, "যায়েদ ব্যতীত আর কেউ দাঁড়ানো নেই" তবে আপনি দন্ডায়মান হওয়াকে শুধুমাত্র যায়েদের সাথে সীমিত করে দিলেন। এই বাক্যে আপনি দন্ডায়মানের মাধ্যমে যায়েদকে একক করে দিলেন এবং দাঁড়ানো গুণটিকে যায়েদ ব্যতীত অন্যের জন্য হওয়াকে অস্বীকার করলেন। এভাবেই তাওহীদের প্রকৃত রূপ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ নাফী (না বোধক) ও ইছবাত (হ্যাঁ বোধক) বাক্যের সমন্বয় ব্যতীত তাওহীদ কখনো প্রকৃত তাওহীদ হিসাবে গণ্য হবে না। মুসলিম বিদ্বানগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

১) তাওহীদুর্ রুবূবীয়্যাহ
২) তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ
৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে গবেষণা করে আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাওহীদ উপরোক্ত তিন প্রকারের মাঝে সীমিত।

প্রথমতঃ তাওহীদে রুবূবীয়্যার বিস্তারিত পরিচয়ঃ

সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ্।

১- সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্বঃ আল্লাহ একাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾

"আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা আছে কি? যে তোমাদেরকে আকাশ ও যমিন হতে জীবিকা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই।" (সূরা ফাতির-৩) কাফিরদের অন্তসার শুন্য মা'বূদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ﴾

"সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত, যে সৃষ্টি করে না ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?" (সূরা নাহলঃ ১৭) সুতরাং আল্লাহ তাআ'লাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআ'লার কর্ম এবং মাখলুকাতের কর্ম সবই আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত। তাই আল্লাহ তাআ'লা মানুষের কর্মসমূহও সৃষ্টি করেছেন- একথার উপর ঈমান আনলেই তাকদীরের উপর ঈমান আনা পূর্ণতা লাভ করবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকেও সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ৯৬) মানুষের কাজসমূহ মানুষের গুণের অন্তর্ভূক্ত। আর মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কোন জিনিষের স্রষ্টা উক্ত জিনিষের গুণাবলীরও স্রষ্টা।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও তো সৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ﴾

"আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকর্তা।" (সূরা মুমিনূনঃ ১৪) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে রূহের সঞ্চার কর।[1] উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহর মত করে কোন মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম। মানুষের পক্ষে কোন অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দেয়া সম্ভব নয়। কোন মৃত প্রাণীকেও জীবন দান করা সম্ভব নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের তৈরী করার অর্থ হল নিছক পরিবর্তন করা এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা মাত্র। মূলতঃ তা আল্লাহরই সৃষ্টি। ফটোগ্রাফার যখন কোন বস্তুর ছবি তুলে, তখন সে উহাকে সৃষ্টি করে না। বরং বস্তুটিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে মাত্র। যেমন মানুষ মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করে এবং অন্যান্য জীব-জন্তু বানায়। সাদা কাগজকে রঙ্গীন কাগজে পরিণত করে। এখানে মূল বস্তু

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বুয়ূ।

তথা কালি, রং ও সাদা কাগজ সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি। এখানেই আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

২- রাজত্বে আল্লাহর একত্বঃ

মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লা। তিনি বলেনঃ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"সেই মহান সত্বা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা মুলকঃ ১) আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾

"হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে ? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর কোন আশ্রয় দাতা নেই।" (সূরা মুমিনূনঃ ৮৮) সুতরাং সর্ব সাধারণের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বাদশাহ বলা হলে তা সীমিত অর্থে বুঝতে হবে। আল্লাহ তাআ'লা অন্যের জন্যেও রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করেছেন। তবে তা সীমিত অর্থে। যেমন তিনি বলেন,

﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾

"অথবা তোমরা যার চাবি-কাঠির (নিয়ন্ত্রনের) মালিক হয়েছো।" (সূরা নূরঃ ৬১)
আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

"তবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা তোমাদের আয়ত্বধীন দাসীগণ ব্যতীত।" (সূরা মুমিনূনঃ ৬) আরো অনেক দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরও রাজত্ব রয়েছে। তবে এই রাজত্ব আল্লাহর রাজত্বের মত নয়। সেটা অসম্পূর্ণ রাজত্ব। তা ব্যাপক রাজত্ব নয়। বরং তা একটা নির্দিষ্ট সীমা রেখার ভিতরে। তাই উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যায়েদের বাড়ীতে রয়েছে একমাত্র যায়েদেরই কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তাতে আমরের হস্ত ক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নেই এবং বিপরীত পক্ষে আমরের বাড়ীতে যায়েদও কোন হস্ত ক্ষেপ করতে পারে না। তারপরও মানুষ আপন মালিকানাধীন বস্তুর উপর আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত সীমা-রেখার ভিতরে থেকে তাঁর আইন-কানুন মেনেই রাজত্ব করে থাকে। এজন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অকারণে সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾

"যে সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ স্বরূপ দান করেছেন, তা তোমরা নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিওনা।" (সূরা নিসাঃ ৫) মানুষের রাজত্ব ও মুলূকিয়ত খুবই সীমিত। আর আল্লাহর মালিকান ও রাজত্ব সর্বব্যাপী এবং সকল বস্তুকে

বেষ্টনকারী। তিনি তাঁর রাজত্বে যা ইচ্ছা, তাই করেন। তাঁর কর্মের কৈফিয়ত তলব করার মত কেউ নেই। অথচ সকল মানুষ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩- পরিচালনায় আল্লাহর একত্বঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলূকাত এবং আসমা-যমিনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা অতীব বরকতময়।" (সূরা আ'রাফঃ ৫৪) আল্লাহর এই পরিচালনা সর্বব্যাপী। কোন শক্তিই আল্লাহর পরিচালনাকে রুখে দাঁড়াতে পারে না। কোন কোন মাখলূকের জন্যও কিছু কিছু পরিচালনার অধিকার থাকে। যেমন মানুষ তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। কিন্তু এ কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট একটি সীমার ভিতরে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হল যে, তাওহীদে রুবূবীয়্যাতের অর্থ সৃষ্টি, রাজত্ব এবং পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসাবে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ্ঃ

এককভাবে আল্লাহর এবাদত করার নাম তাওহীদে উলুহীয়্যাহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর এবাদত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে এবাদতের জন্য গ্রহণ না করা। তাওহীদে উলুহীয়্যাতের ভিতরেই ছিল আরবের মুশরিকদের গোমরাহী। এ তাওহীদে উলূহিয়াকে ক্রেন্দ্র করেই তাদের সাথে জিহাদ করে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জান-মাল, ঘরবাড়ী ও জমি-জায়গা **বলপূর্বক কেড়ে নেয়া** হালাল মনে করেছিলেন। তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। এই প্রকার তাওহীদ দিয়েই আল্লাহ তাআ'লা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। যদিও তাওহীদে রুবূবীয়্যাত এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতও নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নবীগণ তাদের স্বজাতীয় লোকদেরকে তাওহীদে উলুহীয়্যার প্রতি আহবান জানাতেন। মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য এবাদতের কোন অংশই পেশ না করে, সদাসর্বদা রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এই আদেশই দিতেন। চাই সে হোক **সান্নিধ্যপ্রাপ্ত** ফেরেশতা, আল্লাহর প্রেরিত নবী, আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ অলী বা অন্য কোন মাখলুক। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও এবাদত করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার তাওহীদে ত্রুটি করবে, সে কাফির ও মুশরিক। যদিও সে তাওহীদে রুবূবীয়াহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতের স্বীকৃতী প্রদান করে থাকে। সুতরাং কোন মানুষ যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক, কিন্তু আল্লাহর এবাদতে যদি অন্য কাউকে শরীক করে, তবে তার এই স্বীকৃতী

ও বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না। যদি ধরে নেয়া হয় যে, একজন মানুষ তাওহীদে রুবূবীয়াতে এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতে পূর্ণ বিশ্বাস করে, কিন্তু সে কবরের কাছে যায় এবং কবরবাসীর এবাদত করে কিংবা তার জন্য কুরবানী পেশ করে বা পশু জবেহ করে তাহলে সে কাফির এবং মুশরিক। মৃত্যুর পর সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাঃ ৭২) কুরআনের প্রতিটি পাঠকই একথা অবগত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদের জান-মাল হালাল মনে করেছেন এবং তাদের নারী-শিশুকে বন্দী করেছেন ও তাদের দেশকে গণীমত হিসাবে দখল করেছেন, তারা সবাই একথা স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তারা এতে কোন সন্দেহ পোষণ করত না। কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অন্যেরও উপাসনা করত, তাই তারা মুশরিক হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং তাদের জান-মাল হরণ হালাল বিবেচিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ তাওহীদুল্ আসমা ওয়াস্ সিফাতঃ

তাওহীদুল্ আসমা ওয়াস্ সিফাতের অর্থ হল, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসাবে মেনে নেওয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোন রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আসল অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে তার উপর ঈমান আনতে হবে-কোন প্রকার ধরণ বর্ণনা করা বা দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবেনা। এই প্রকারের তাওহীদে আহলে কিবলা তথা মুসলমানদের বিরাট একটি অংশ গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। এক শ্রেণীর লোক আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এর কারণে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর এক শ্রেণীর লোক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। আর এক শ্রেণীর লোক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কাছাকাছি।

কিন্তু সালাফে সালেহীনের [1] এ তাওহীদের ক্ষেত্রে মানহাজ [2] হল, আল্লাহ নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছেন এবং নিজেকে যে সবগুণে গুণান্বিত করেছেন, সে সব নাম ও গুণাবলীর কোন পরিবর্তন, কোন গুণ শূন্য করা, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোন উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা প্রকৃত ভাবেই সাব্যস্ত করা।

আল্লাহর কতিপয় নামের দৃষ্টান্তঃ

১) (الحي القيوم) আল্লাহ তাআ'লার অন্যতম নাম হচ্ছে, "আল হাইয়্যুল্ কাইয়্যুম" এই নামের উপর ঈমান রাখা আমাদের উপর ওয়াজিব। এই নামটি আল্লাহর একটি বিশেষ গুণেরও প্রমাণ বহন করে। তা হচ্ছে, আল্লাহর পরিপূর্ণ হায়াত। যা কোন সময় অবর্তমান ছিলনা এবং কোন দিন শেষও হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় আছেন এবং সমস্ত মাখলুকাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোন ধ্বংস বা ক্ষয় নেই।

২) আল্লাহ নিজেকে السميع। (আস্ সামীউ) শ্রবণকারী নামে অভিহিত করেছেন। তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। শ্রবণ করা আল্লাহর একটি গুণ। তিনি মাখলুকাতের সকল আওয়াজ শ্রবণ করেন। তা যতই গোপন ও অস্পষ্ট হোক না কেন।

আল্লাহর কতিপয় সিফাতের দৃষ্টান্তঃ

আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উন্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।" (সূরা মায়িদাঃ ৬৪) এখানে আল্লাহ তাআ'লা নিজের জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। সুতরাং আল্লাহর দু'টি হাত আছে। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। কিন্তু আমাদের উচিৎ আমরা যেন অন্তরের মধ্যে আল্লাহর হাত কেমন হবে সে সম্পর্কে কোন কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন তার ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। " (সূরা শুরাঃ ১১) আল্লাহ বলেন,

[1] - এই কিতাবের যেখানেই "সালাফে সালেহীন" বা শুধু "সালাফ" কথাটি উল্লেখিত হবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণ।

[2] - মানহাজ বলতে আকীদাহ ও আমলের ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের গৃহীত নির্ভেজাল নীতিকে বুঝানো হয়েছে।

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয় সমূহ) হারাম করেছেন।" (সূরা আরাফঃ ৩৩) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৩৬) সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর হাত দু'টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে আল্লাহর বাণী "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়" একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং আল্লাহর বাণী,

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না।" (সূরা নাহলঃ ৭৪) এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর নির্দিষ্ট কোন কাইফিয়ত[1] বর্ণনা করল, সে আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলল এবং এমন বিষয়ের অনুসরণ করল, যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই।

আল্লাহর সিফাতের[2] আরেকটি উদাহরণ পেশ করব। তা হল আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া। কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ তাআ'লা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আরশের উপরে বিরাজমান। প্রত্যেক স্থানেই (استوى على العرش) "ইসতাওয়া আলাল আরশি"বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি আরবী ভাষায় ইসতিওয়া শব্দটি অনুসন্ধান করতে যাই তবে দেখতে পাই যে, (استوى) শব্দটি সব সময় (على) অব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবহার হয়ে থাকে। আর (استوى) শব্দটি এভাবে ব্যবহার হলে 'সমুন্নত হওয়া' এবং 'উপরে হওয়া' ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হয় না। সুতরাং الرَّحْمَنُ عَلَىْ العَرْشِ

[1] - আল্লাহর গুনাবলীর বিশেষ কোন ধরণ, গঠণ বা পদ্ধতি বর্ণনা করাকে"তাকয়ীফ" বা "কাইফিয়াত" বলা হয়। যেমন কেউ বলল আল্লাহর হাত এরকম এরকম। এভাবে আল্লাহর সিফাত সমূহের কাইফিয়াত (ধরণ-গঠন) বর্ণনা করা হারাম।

[2] - আল্লাহর গুণাবলী এবং আল্লাহর কর্মসমূহকে আল্লাহর সিফাত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

اسْـتَوَى এবং এর মত অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সৃষ্টি জগতের উপরে সমুন্নত হওয়া ছাড়াও আরশের উপরে বিশেষ একভাবে সমুন্নত। প্রকৃতভাবেই আল্লাহ আরশের উপরে। আল্লাহর জন্য যেমনভাবে সমুন্নত হওয়া প্রযোজ্য,তিনি সেভাবেই আরশের উপরে সমুন্নত। আল্লাহর আরশের উপরে হওয়া এবং মানুষের খাট-পালং ও নৌকায় আরোহনের সাথে কোন সামঞ্জস্যতা নেই। এমনিভাবে মানুষের যানবাহনের উপরে চড়া এবং আল্লাহর আরশের উপরে হওয়ার মাঝে কোন সামঞ্জস্যতা নেই। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَـذْكُرُوا نِعْمَـةَ رَبِّكُـمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾

"তিনি তোমাদের আরোহনের জন্য সৃষ্টি করেন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা তার উপর আরোহণ করতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বলঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।" (সূরা যুখরুফঃ ১২-১৪) সুতরাং মানুষের কোন জিনিষের উপরে উঠা কোন ক্রমেই আল্লাহর আরশের উপরে হওয়ার সদৃশ হতে পারে না। কেননা আল্লাহর মত কোন কিছু নেই।

যে ব্যক্তি বলে যে, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার অর্থ আরশের অধিকারী হয়ে যাওয়া, সে প্রকাশ্য ভুলের মাঝে রয়েছে। কেননা এটা আল্লাহর কালামকে আপন স্থান থেকে পরির্বতন করার শামিল এবং ছাহাবী এবং তাবেয়ীদের ইজমার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরণের কথা এমন কিছু বাতিল বিষয়কে আবশ্যক করে, যা কোন মুমিনের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া সংগত নয়। কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"আমি এই কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা যুখরুফঃ ৩) আরবী ভাষায় ইসতাওয়া শব্দের অর্থ 'সমুন্নত হওয়া' এবং 'স্থির হওয়া'। আর এটাই হল ইসতিওয়া শব্দের আসল অর্থ। সুতরাং আল্লাহর বড়ত্বের শানে আরশের উপর যেভাবে বিরাজমান হওয়া প্রযোজ্য, সেভাবেই তিনি বিরাজমান। যদি ইসতিওয়ার (সমুন্নত হওয়ার) অর্থ ইসতিওলা (অধিকারী) হওয়ার মাধ্যমে করা হয়, তবে তা হবে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার শামিল। আর যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে কুরআনের ভাষা যে অর্থের উপর প্রমাণ বহণ করে, তা অস্বীকার করল এবং অন্য একটি বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করল।

তাছাড়া "ইসতিওয়া" এর যে অর্থ আমরা বর্ণনা করলাম, তার উপর সালাফে সালেহীন ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন। কারণ উক্ত অর্থের বিপরীত অর্থ তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। কুরআন এবং সুন্নাতে যদি এমন কোন শব্দ আসে সালাফে সালেহীন থেকে যার প্রকাশ্য অর্থ বিরোধী কোন ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হল উক্ত শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থের উপর অবশিষ্ট রাখতে হবে এবং তার মর্মার্থের উপর ঈমান রাখতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সালাফে সালেহীন থেকে কি এমন কোন কথা বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, "ইসতাওয়া" অর্থ "আলা" (আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন)? উত্তরে আমরা বলব হ্যাঁ, অবশ্যই তা বর্ণিত হয়েছে। যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, তাঁদের থেকে এর প্রকাশ্য তাফসীর বর্ণিত হয়নি, তবেও এ সমস্ত ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের মানহাজ (নীতি) হল, কুরআন এবং সুন্নাহর শব্দ যে অর্থ নির্দেশ করবে, আরবী ভাষার দাবী অনুযায়ী শব্দের সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

ইসতিওয়ার অর্থ ইসতিওলা দ্বারা করা হলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয়ঃ

১) ইসতিওলা অর্থ কোন বস্তুর মালিকানা হাসিল করা বা কোন যমিনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাই ইসতিওয়ার অর্থ ইসতিওলার মাধ্যমে করা হলে অর্থ দাঁড়ায়, আকাশ-যমিন সৃষ্টির আগে আল্লাহ আরশের মালিক ছিলেন না, পরে মালিক হয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন সেই আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশ এবং যমিন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপরে সমুন্নত হলেন।" (সূরা আরাফঃ ৫৪)

২) "আর্-রাহমানু আ'লাল আরশিস্ তাওয়া" অর্থ যদি ইস্তাওলার মাধ্যমে করা শুদ্ধ হয় তাহলে এ কথাও বলা শুদ্ধ হবে যে, আসমান-যমিন সৃষ্টি করার পূর্বে বা সৃষ্টি করা পর্যন্ত আরশ আল্লাহর কর্তৃত্বের মধ্যে ছিলনা। এমনিভাবে অন্যান্য মাখলুকাতের ক্ষেত্রেও একই ধরণের কথা প্রযোজ্য। এ ধরণের অর্থ আল্লাহর শানে শোভনীয় নয়।[1]

৩) এটি আল্লাহর কালামকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয়ার শামিল।

৪) এ ধরণের অর্থ করা সালাফে সালেহীনের ইজমার পরিপন্থী।

---

[১] - আল্লাহ তাআ'লা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর তিনি একমাত্র মালিক। সূচনা থেকেই সকল বস্তুর উপর তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর মালিকানা বহাল থাকবে। আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ পূর্বে অমুক বস্তুর মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হয়ে গেলেন। এধরণের অর্থ গ্রহণ করা হলে, আল্লাহ যে মহান ক্ষমতাবান তাতে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতের ক্ষেত্রে সার কথা এই যে, আল্লাহ নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কোন পরিবর্তন, বাতিল বা ধরণ-গঠন কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই তার প্রকৃত অর্থের উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

মক্কার কাফেরদের শির্কের ধরণ ?

প্রশ্নঃ- (২) যাদের কাছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের শির্ক কি ধরণের ছিল ?

উত্তরঃ- যাদের নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা তাওহীদে রুবূবীয়্যাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করত না। কুরআনে কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, তারা কেবলমাত্র তাওহীদে উলুহীয়াতে আল্লাহর সাথে শির্ক করত। রুবূবীয়াতের ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহই একমাত্র রব বা পালনকর্তা। তিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া প্রদানকারী এবং বিপদাপদ দূরকারী।

কিন্তু তারা এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করত। এ ধরণের শির্ক মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কেননা তাওহীদের অর্থ হল আল্লাহকে এবাদতের ক্ষেত্রে একক করা। আল্লাহর জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট হক রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব। এই হকগুলো তিন প্রকারঃ

১) মালিকানার অধিকার
২) এবাদত পাওয়ার অধিকার
৩) নাম ও গুণাবলীর অধিকার।

এই জন্যই উলামাগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তাওহীদুর রুবূবীয়্যা, তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত এবং তাওহীদুল উলুহীয়া। মুশরিকরা শেষ প্রকারের তাওহীদে আল্লাহর সাথে শরীক করত, আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করত। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।" (সূরা নিসাঃ ৩৬) আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা মায়িদাঃ ৭২) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। তবে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন।” (সূরা নিসাঃ ৪৮) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

“এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয়ই যারা আমার এবাদত করতে অহংকার করবে, তারা অচিরেই অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সূরা গাফেরঃ ৬০) আল্লাহ তাআ'লা সূরা কাফিরূনে বলেন,

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾

“বল হে কাফিররা! আমি তার এবাদত করি না, যার এবাদত তোমরা কর, এবং তোমরাও তার এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি এবং আমি এবাদতকারী নই তার, যার এবাদত তোমরা করে আসছ।” (সূরা কাফেরূনঃ ১-৫)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি কি?

প্রশ্নঃ-(৩) আকীদাহ ও অন্যান্য দীনি বিষয়ের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের মূলনীতিগুলো কি কি?

উত্তরঃ আকীদাহ ও দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতএবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়িয়ে ধরা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ﴾

“হে নবী! আপনি বলুন যে, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।” (সূরা আল-ইমরানঃ ৩১) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

“যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করল সে স্বয়ং আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে, আমি তাদের জন্য আপনাকে সংরক্ষণকারী হিসাবে প্রেরণ করিনি।” (সূরা নিসাঃ ৮০) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

“এবং আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।” (সূরা হাশরঃ ৭)

যদিও আয়াতটি গণীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তবে শরীয়তের অন্যান্য মাসায়েলের ক্ষেত্রেও উত্তমভাবে প্রযোজ্য হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআর নামাজের খুৎবায় বলতেন,

((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺوَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضلالة فى النار.))

"অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নির্দেশনা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে দ্বীনের ভিতরে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা। প্রতিটি বিদ্‌আতই গোমরাহী। আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।"[1] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.))

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং উহাকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়িয়ে ধরবে। আর তোমরা দ্বীনের বিষয়ে নতুন আবিস্কৃত বিষয় হতে সাবধান থাকবে। কারণ প্রতিটি নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদ্‌আত আর প্রতিটি বিদ্‌আতই গোমরাহী।"[2] এ সম্পর্কে আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের পথ হল আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পথকে আঁকড়িয়ে ধরা। তারা সদাসর্বদা দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করেন, এর ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করেন না। আল্লাহ বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দ্বীনকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (আঃ) কে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) কে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।" (সূরা শুরাঃ ১৩) তাদের মাঝে কখনো মতবিরোধ হয়ে থাকলে তা হয়েছে কেবল এমন ক্ষেত্রে, যাতে ইজতেহাদ[3] করা বৈধ আছে। এই ধরণের

---

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাতুল জুমআহ।

[2] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ।

[3] - কুরআন ও সুন্নায় দ্বীনের কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ না পাওয়া গেলে মুসলিম উম্মার বিজ্ঞ আলেমগণ কুরআন সুন্নাহকে সামনে রেখে গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তাকে ইজতেহাদ বলে। এসমস্ত ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করা বৈধ আছে। আর যে আলেম ইজতেহাদ করার যোগ্য, তাঁকে মুজতাহেদ বলা হয়।

মতবিরোধ অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করে না। ইজতেহাদী বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ হওয়া সত্বেও আপনি তাদের মাঝে একতা এবং একে অপরের প্রতি ভালবাসা দেখতে পাবেন।

প্রশ্নঃ (৪) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কারা ?

উত্তরঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তারাই, যারা আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ কারণেই তাদেরকে আহলে সুন্নাত রূপে নামকরণ করা হয়েছে। কে ননা তাঁরা সুন্নাহর ধারক ও বাহক। তাদেরকে আহলে জামাতও বলা হয়। কারণ তাঁরা সুন্নাহর উপর জামাতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ। আপনি যদি বিদ্‌আতীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, তারা আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাদের এ অবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা যে পরিমাণ বিদ্‌আত তৈরী করেছে সে পরিমাণ সুন্নাত থেকে দূরে সরে গেছে।

জান্নাতী দলের পরিচয়ঃ

প্রশ্নঃ- (৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর উম্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। সম্মানিত শায়খের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তরঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছহীহ হাদীছের[1] মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইয়াহুদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে, নাসারারা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে। আর এই উম্মাতে মুহাম্মাদী বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। একটি দল ব্যতীত সমস্ত দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি হল সেই দল, যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই দলটি দুনিয়াতে বিদ্‌আতে লিপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। এটিই হল সাহায্যপ্রাপ্ত দল, যাকিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর বিজয়ী থাকবে।

কোন কোন আলেম এই জাহান্নামী ৭২ ফির্কার পরিচয় নির্ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথমতঃ বিদ্‌আতীদেরকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক ভাগ থেকে শাখা-প্রশাখা বের করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ঘোষিত ৭২ টি ফির্কা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিছু কিছু আলেম ফির্কাগুলো নির্ধারণ না করাই উত্তম মনে করেছেন। কারণ এই ফির্কা ৭২ এ নির্ধারিত থাকার পরও আরো অসংখ্য মানুষ গোমরা হয়েছে। তারা আরো বলেন এই সংখ্যা শেষ হবে না। শেষ যামানায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এর সর্বশেষ সংখ্যা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং উত্তম হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু

---

[1] - আবু দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা সংক্ষেপ (অস্পষ্ট) রেখেছেন, তা সংক্ষেপ (অস্পষ্ট) রাখা। আমরা এভাবে বলব যে, এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২ দল জাহান্নামে যাবে এবং মাত্র একদল জান্নাতে যাবে। অতঃপর বলব, যে দলটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহর বিরোধীতা করবে, সে এই ৭২ দলের অন্ত র্ভূক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (৬) নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য কি ? কোন ব্যক্তির মাঝে উক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহের কোন একটি অবর্তমান থাকলে সে ব্যক্তি কি নাজাত প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে যাবে?

উত্তরঃ ফির্কা নাজীয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আকীদাহ, এবাদত, চরিত্র ও আচার ব্যবহারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহকে আঁক ড়িয়ে ধরা।

আপনি দেখতে পাবেন যে, আকীদার ক্ষেত্রে তাঁরা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর অনুসারী। উলুহীয়াত, রুবূবীয়াত এবং আসমা ওয়াস্ সিফাতের[1] ক্ষেত্রে তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।

এবাদতের ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নকারী। এবাদতের প্রকার, পদ্ধতি, পরিমাণ, সময়, স্থান এবং এবাদতের কারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর অনুসরণ করাই তাদের বৈশিষ্ট্য। আপনি তাদের নিকট দ্বীনের ব্যাপারে কোন বিদ্আত খোঁজে পাবেন না। তাঁরা আল্লাহ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করে চলেন। আল্লাহ অনুমতি দেননি, এবাদতের ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তারা আল্লাহ এবং রাসূলের অগ্রণী হয়না।

আখলাক-চরিত্রের ক্ষেত্রেও আপনি তাদেরকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখতে পাবেন। মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা, অপরের জন্য উদার মনের পরিচয় দেয়া, মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা, উত্তম কথা বলা, বদান্যতা, বীরত্ব এবং অন্যান্য মহান গুণাবলী তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট।

পার্থিব বিষয়াদিতে আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা সততার সাথে সকল প্রকার লেন-দেন সম্পন্ন করে থাকেন। কাউকে ধোকা দেন না। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তারা

---

[1] - সকল প্রকার ইবাদত এককভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করাকে তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ বলা হয়। আল্লাহর সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদুর্ রুবূবীয়াহ। আর কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর যেসমস্ত নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস করাকে তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত বলা হয়।

দ্রব্যের আসল অবস্থা বর্ণনা করে দেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))

"পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার রয়েছে। যদি তারা উভয়েই সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, আল্লাহ তাদের বেচা-কেনায় বরকত দান করেন। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ভিতর থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়[1]।"

উপরে যে সমস্ত গুণাবলীর আলোচনা করা হল, কোন ব্যক্তির মাঝে উক্ত গুণাবলীর কোন বৈশিষ্ট অবর্তমান থাকলে এ কথা বলা যাবে না যে, সে নাজাত প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই আপন আপন আমল অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করবে। তবে তাওহীদের ক্ষেত্রে ত্রুটি করলে নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্‌আতের বিষয়টিও অনুরূপ। কিছু কিছু বিদ্‌আত এমন আছে, যা মানুষকে নাজী ফির্কা থেকে বের করে দেয়। তবে চরিত্র ও লেন-দেনের ভিতরে কেউ ত্রুটি করলে সে নাজাত প্রাপ্ত দল থেকে বের হবে না। বরং মর্যাদা কমিয়ে দিবে।

আখলাকের বিষয়টি একটু দীর্ঘ করে বর্ণনা করা দরকার। চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরস্পরে একতাবদ্ধ থাকা এবং আল্লাহ তাআ'লা যে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছেন, তার উপর অটুট থাকা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

"তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দ্বীনকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (আঃ) কে। আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)কে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না।" (সূরা শুরাঃ ১৩) আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

"নিশ্চয় যারা দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে আপনি কোন ব্যাপারেই তাদের অন্তর্ভূক্ত নন।" (সূরা আনআ'ম ঃ ১৫৯) সুতরাং ঐক্যবদ্ধ থাকা নাজী ফির্কার (আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতে র) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের মাঝে কোন

[1] - বুখারী ও মুসলিম। অধ্যায়ঃ কিতাবুল বুয়ূউ (ক্রয়-বিক্রয়)।

ইজতেহাদী বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তাদের এই মতবিরোধ পরস্পরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার সৃষ্টি করে না; বরং তারা বিশ্বাস করে যে, তারা পরস্পরে ভাই। যদিও তাদের মাঝে এই মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি তাদের একজন এমন ইমামের পিছনেও নামায আদায় করে থাকে, তার দৃষ্টিতে সেই ইমাম ওযু বিহীন। আর ইমাম বিশ্বাস করে যে, সে ওযু অবস্থায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোকেরা উটের গোশত খেয়ে ওযু করে নি এমন ইমামের পিছনেও নামায আদায় করে থাকে। ইমাম মনে করে যে, উটের গোশত খেলে ওযু ভঙ্গ হয় না। আর মুক্তাদী মনে করে যে, ওযু ভঙ্গ হয়ে যায়। তা সত্বেও সে মনে করে উক্ত ইমামের পিছনে নামায আদায় করা জায়েয আছে। এমনটি তারা এ জন্যই করে যে, ইজতেহাদের কারণে যে সমস্ত মতভেদ সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃত পক্ষে মতভেদ নয়। কেননা প্রত্যেকেই আপন আপন দলীলের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করেন তাদের কোন দ্বীনি ভাই দলীলের অনুসরণ করতে গিয়ে যদি কোন আমলে তাদের বিরোধীতা করেন প্রকৃত পক্ষে তারা বিরোধীতা করেননি; বরং তাদের অনুরূপই করেছেন। কারণ তারাও দলীলের অনুসরণ করার প্রতি আহবান জানান। যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন।

অধিকাংশ আলেমের কাছে এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ছাহাবীগণের মধ্যে এরকম অনেক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তিনি কাউকে ধমক দেননি বা কারও উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খন্দকের যুদ্ধ হতে ফেরত আসলেন, তখন জিবরীল (আঃ) এসে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বানু কুরায়যায় অভিযান পরিচালনার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের কেউ যেন বানু কুরায়যায় না গিয়ে আসরের নামায না পড়ে[1]। সাহাবীগণ এ কথা শুনে মদীনা হতে বের হয়ে বানু কুরায়যার দিকে রওনা দিলেন। পথি মধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল। তাদের কেউ নামায না পড়েই বানু কুরায়যায় পৌঁছে গেলেন। এদিকে নামাযের সময় শেষ হয়ে গেল। তারা বললেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আসরের নামায অবশ্যই বানী কুরায়যায় গিয়ে পড়তে হবে। তাদের কেউ নামায ঠিক সময়েই পড়ে নিল। তাদের কথা হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বের হতে বলেছেন। তাঁর কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা সময় মত নামায না পড়ে পিছিয়ে নিব। এরাই সঠিক ছিল। তদুপুরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'দলের কাউকে ধমক দেননি। সাহাবীগণও একজন অন্যজনের সাথে শত্রুতা পোষণ

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল খাওফ।

করেন নি বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বক্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে ভিন্নমত হওয়া সত্বেও তাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি।

এই হাদীছটি বুঝতে গিয়ে যে মতভেদের সূচনা হয়েছিল, তার কারণে তাদের মধ্যে শত্রুতা বা দলাদলির সৃষ্টি হয়নি। এজন্য আমি মনে করি সুন্নী মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ। তাদের মাঝে যেন কোন প্রকার দলাদলি সৃষ্টি না হয়। যাতে তারা পরস্পরে কাঁদা ছুড়াছুড়ি করবে, একে অপরকে শত্রু মনে করবে এবং ইজতেহাদী মাসআলায় মতভেদ হওয়ার কারণে একজন অপর জনকে ঘৃণা করবে। আমি মনে করি দলীলের ভিত্তিতে ইজতেহাদী কোন মাসআলায় মতভেদ হওয়া সত্বেও, আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের অনুসারীদের ঐকবদ্ধ হওয়া উচিৎ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কারণ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শত্রুরা চায় যে, মুসলমানেরা পরস্পরে বিভক্ত হোক। সুতরাং আমাদের উচিৎ নাজী ফির্কার বৈশিষ্টে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা।

প্রশ্নঃ-(৭) দ্বীনের ভিতরে মধ্যম পন্থা বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ- দ্বীনের ভিতরে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের অর্থ এই যে, মানুষ দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়াবে না। যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এমনিভাবে দ্বীনের কোন অংশ কমাবে না। যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত দ্বীনের কিছু অংশ বিলুপ্ত করে দেয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর জীবনীর অনুসরণ করাও দ্বীনের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর জীবনাদর্শ অতিক্রম করা দ্বীনের ভিতরে অতিরঞ্জনের শামিল। তাঁর জীবন চরিতের অনুসরণ না করা তাঁকে অবহেলা করার অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন লোক বলল আমি আজীবন রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়ব। রাত্রিতে কখনই নিদ্রা যাব না। কারণ নামায সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদাত। তাই আমি নামাযের মাধ্যমে বাকী জীবনের রাত্রিগুলো জাগরণ করতে চাই। আমরা তার উত্তরে বলব যে, এই ব্যক্তি দ্বীনের মাঝে অতিরঞ্জিতকারী। সে হকের উপর নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এরকম হয়েছিল। তিন জন লোক একত্রিত হয়ে একজন বলল, আমি সারা রাত্রি নামায আদায় করব। আর একজন বলল আমি সারা বছর রোযা রাখব এবং কখনো তা ছাড়ব না। তৃতীয় জন বলল আমি স্ত্রী সহবাস করব না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন একদল লোকের কি হল তারা এ রকম কথা বলে থাকে? অথচ আমি রোযা রাখি এবং কখনো রোযা থেকে বিরত থাকি। রাত্রে ঘুমাই এবং আল্লাহর এবাদত করি। স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। এটি আমার সুন্নাত সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। এই লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা করলেন।

কেননা তারা রোযা রাখা না রাখা, রাত্রি জাগরণ করা, ঘুমানো এবং স্ত্রী সহবাস করার ক্ষেত্রে তাঁরসুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল।

দ্বীনী বিষয়ে যে ব্যক্তি অবহেলা করে বলবে যে, আমার নফল এবাদতের দরকার নেই। শুধ ফরজ ইবাদতগুলো পালন করব। আসলে সে ব্যক্তি ফরজ আমলেও অবহেলা করে থাকে।

সঠিক পথের অনুসারী হল সেই ব্যক্তি যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহর উপর চলবে।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত হল, মনে করুন তিন জন ভাল লোকের পাশে রয়েছে একজন ফাসেক ব্যক্তি। তিনজনের একজন বলল, আমি এই ফাসেককে সালাম দিব না। তার থেকে দূরে থাকব এবং তার সাথে কথা বলব না। অপর জন বলল, আমি এর সাথে চলব, তাকে সালাম দিব, হাসি মুখে তার সাথে কথা বলব, তাকে দাওয়াত দিব এবং তার দাওয়াতে আমিও শরীক হব। আমার নিকট সে অন্যান্য সৎ লোকের মতই। তৃতীয়জন বলল, আমি এই ফাসেক ব্যক্তিকে তার পাপাচারিতার কারণে ঘৃণা করি। তার ভিতরে ঈমান থাকার কারণে আমি তাকে ভালবাসি। তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করব না। তবে তাকে সংশোধনের কারণে বর্জন করা হলে তা ভিন্ন কথা। তাকে বর্জন করলে যদি তার পাপাচারিতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে আমি তাকে বর্জন করব না। এই তিনজনের প্রথম ব্যক্তি বেশী বাড়াবাড়ি করল। দ্বিতীয়জন ত্রুটি করল এবং তৃতীয়জন মধ্যম পন্থা ও সঠিক পথের অনুসরণ করল।

অন্যান্য সকল এবাদত ও মানুষের মুআমালাতের[1] ক্ষেত্রেও অনুরূপ। মানুষ এতে ত্রুটি, বাড়াবাড়ি, এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

আরো একটি উদাহরণ ভাল করে শ্রবণ করুন। মনে করুন একজন লোক তার স্ত্রীর কথায় চলে। তার স্ত্রী তাকে যেখানে পাঠায় সেখানে যায়। সে তার স্ত্রীকে অন্যায় কাজ হতে বাধা প্রদান করে না এবং ভাল কাজে উৎসাহ দেয় না। সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী তার উপর কর্তৃত্ব করছে এবং তার মালিক হয়ে বসেছে।

আরেক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই গুরুত্ব দেয়না। তার স্ত্রীর সাথে অহংকার করে চলে। যেন তার স্ত্রী তার কাছে চাকরানীর চেয়ে অবহেলিত। অন্য ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এবং আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ব সীমা অনুযায়ী স্ত্রীর সাথে আচরণ করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

---

[1] - মানুষ পরস্পরে যে লেন-দেন, বেচা-কেনা, চুক্তি, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করে থাকে, তাকে ইসলামের পরিভাষায় মুআমালাত বলা হয়। এসবের সাথে ইবাদতের কোন সম্পর্ক নেই। তবে এগুলো যদি ইসলামী নীতিমালার ভিতরে হয় এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, তবে তাও এবাদতে পরিণত হয়।

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের উপর হক রয়েছে, যেমন তাদের উপর তোমাদের হক রয়েছে।" (সূরা বাকারাঃ ২২৮) কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। স্ত্রীর কোন একটি চরিত্রকে অপছন্দ করলে হয়ত অন্য একটি গুণ দেখে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে[1]। শেষ ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী, প্রথম ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় শিথিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ত্রুটিকারী (অবহেলাকারী ও অবজ্ঞাকারী)। প্রিয় পাঠক! আপনি সকল এবাদত ও আচর-আচরণকে উক্ত উদাহরণগুলোর উপরে অনুমান করুন।

প্রশ্নঃ-(৮) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ঈমানের অর্থ কি ? ঈমান কি বাড়ে ও কমে ?

উত্তরঃ- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ঈমানের অর্থ হল অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল- এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম ঈমান।

যেহেতু উক্ত বিষয় সমূহের সমষ্টির নাম ঈমান সে হিসাবে, তা বাড়বে এবং কমবে এটিই স্বাভাবিক। কারণ অন্তরের বিশ্বাসেরও তারতম্য হয়ে থাকে। অতএব সংবাদ শুনে কোন কিছু বিশ্বাস করা আর আপন চোখে দেখে বিশ্বাস করা এক কথা নয়। অনুরূপভাবে একজনের দেয়া সংবাদ বিশ্বাস করা আর দু'জনের সংবাদ বিশ্বাস করা এক কথা নয়। এ জন্যই ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখান আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, বিশ্বাস তো অবশ্যই করি, কিন্তু আমার অন্তর যাতে পরিতৃপ্ত হয় এজন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই।" (সূরা বাকারাঃ ২৬০) কাজেই অন্তরের বিশ্বাস এবং তার স্থীরতা ও প্রশান্তির দিক থেকেও ঈমান বৃদ্ধি পায়। মানুষ তার অন্তরে ইহা সহজেই অনুভব করে থাকে। সে যখন ইসলামী অনুষ্ঠান বা ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনে, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এমন কি সে যেন জান্নাত- জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। সে যখন মজলিস থেকে উঠে যায়, তখন গাফলতি চলে আসে এবং এই বিশ্বাস কমতে থাকে।

এমনিভাবে মুখের আমলের (যিকর্) কারণেও ঈমান বৃদ্ধি পায়। কেননা যে ব্যক্তি দশবার আল্লাহর যিক্র করল, সে একশতবার যিক্র্কারীর সমান নয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রাদা।

আমল প্রথম ব্যক্তির আমলের চেয়ে অনেক বেশী। তাই তার ঈমান বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে এবাদত সম্পন্ন করবে আর যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করবে- উভয়ে সমান নয়।

এমনিভাবে আমলের মাধ্যমেও ঈমান বাড়ে। যে ব্যক্তি বেশী আমল করে তার ঈমান কম আমলকারীর চেয়ে বেশী। ঈমানের বেশী-কম হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾

"আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফেরেশতাকেই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি, যাতে কিতাবধারীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (সূরা মুদ্দাস্‌ছিরঃ ৩১) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

"আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করল ? তবে যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের অন্তরে কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করল"। (সূরা তাওবাঃ ১২৪-২৫) ছহীহ হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে,

((مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ))

"দ্বীন ও জ্ঞানে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানী পুরুষদের জ্ঞানকে তোমাদের চেয়ে অধিক হরণকারী আর কাউকে দেখিনি।"[1] সুতরাং ঈমান বাড়ে এবং কমে। প্রশ্ন হল ঈমান বাড়ার কারণ কি?

*** ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার উপায় সমূহ ঃ**

প্রথম উপায়ঃ আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণাবলীসহ আল্লাহ তাআ'লার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাবে, নিঃসন্দেহে তার ঈমানও তত বৃদ্ধি পাবে। এ জন্যই যে সমস্ত আলেম

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হাঈজ।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা এ সম্পর্কে জ্ঞানহীন আলেমদের চেয়ে ঈমানের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী।

দ্বিতীয় উপায়ঃ সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে গবেষণা করা এবং আল্লাহ মানব জাতিকে যে জীবন বিধান দিয়েছেন, তার ভিতরে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিরাজি নিয়ে যতই চিন্তা করবে, ততই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

"বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" (সূরা যারিয়াতঃ ২০) আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করলে যে ঈমান বৃদ্ধি পায়, এ মর্মে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

তৃতীয় উপায়ঃ বেশী বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করা। সৎ আমল যতই বৃদ্ধি পাবে, ঈমান ততই বৃদ্ধি পাবে। এই সৎ আমল মুখের কথার মাধ্যমে হোক, কিংবা কাজের মাধ্যমে হোক যেমন যিক্‌র-আয্‌কার, নামায, রোযা এবং হজ্জ। এসব কিছুই ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম।

*** ঈমান কমে যাওয়ার কারণ সমূহ ঃ**

প্রথম কারণঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা ঈমান কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই কমবে, ঈমানও তত কমতে থাকবে।

দ্বিতীয় কারণঃ সৃষ্টিতে ও শরীয়তে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহর সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা না করা ঈমানের ঘাটতি হওয়ার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় কারণঃ গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া। কেননা গুনাহের কাজ করলে অন্তরে এবং ঈমানের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে। এই জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) "ব্যভিচারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।"[1]

চতুর্থ কারণঃ সৎ আমল না করা ঈমান হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। কিন্তু যদি বিনা কারণে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে ঈমান কমার সাথে সাথে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। অবশ্য গ্রহণযোগ্য কারণে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে অথবা ওয়াজিব নয় এমন কাজ ছেড়ে দিলে ঈমানের ঘাটতি হবে, কিন্তু [আখেরাতে] শাস্তির সম্মুখীন হবে না। এই জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে জ্ঞান ও দ্বীনের ক্ষেত্রে

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদূদ, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

অপূর্ণ বলেছেন। এর কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের যখন মাসিকের রক্ত বের হয়, তখন তারা নামায-রোযা থেকে বিরত থাকে। অথচ মাসিক অবস্থায় নামায-রোযা থেকে বিরত থাকার কারণে তাদেরকে দোষারূপ করা হয় না। বরং তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পুরুষদের তুলনায় তাদের আমল কম হয়ে গেল, সে হিসাবে তারা পুরুষেরে চেয়ে কম ঈমানের অধিকারী।

হাদীছে জিবরীল এবং আবদুল কায়েসের হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ঃ

প্রশ্নঃ (৯) হাদীছে জিবরীলে ঈমানের ব্যাখ্যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈমান হল 'আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখা, পরকালের উপর বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখার নাম।'[1] অথচ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঈমান হল 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই তিনি এক ও অদ্বিতীয়, একথার সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা।' উপরের উভয় হাদীছের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় করব?

উত্তরঃ এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর ভিতরে কোন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নেই। কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের বিরোধী নয়। এমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর ক্ষেত্রেও একই কথা। কুরআন ও সুন্নাতে পরস্পর বিরোধী কোন জিনিষ নেই। এ মূলনীতিটি মনে রাখলে কুরআন ও হাদীছ বুঝার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

"তারা কি কুরআন গবেষণা করেনা? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে হত, তাহলে তারা উহাতে অনেক মতভেদ দেখতে পেত।" (সূরা নিসাঃ ৮২) কুরআনের ভিতরে যেহেতু মতবিরোধ নাই, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছের ক্ষেত্রেও তাই। এক হাদীছ অন্য হাদীছের বিরোধী নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি এক স্থানে ঈমানকে একভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং অন্য স্থানে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন, যা আপনার দৃষ্টিতে প্রথম ব্যাখ্যার বিরোধী মনে হয়, কিন্তু আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি কোন দ্বন্দ্ব পাবেন না।

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

হাদীছে জিবরীলে (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনকে ইসলাম, ঈমান, ইহসান এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। আর আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীছে শুধুমাত্র দ্বীনের একটি মাত্র প্রকার তথা ইসলামের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে শুধুমাত্র ইসলামের কথা উল্লেখ হবে, সেখানে ঈমানকেও অন্তর্ভূক্ত করা হবে। কারণ মুমিন হওয়া ব্যতীত ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। আবার যেখানে শুধুমাত্র ঈমানের আলোচনা হবে, সেখানে ইসলামও অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ প্রত্যেক মুমিনকে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। আর যেখানে ঈমান ও ইসলাম একই সাথে উল্লেখ হবে, সেখানে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হবে অন্তরের বিষয়সমূহ। আর ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বাহ্যিক আমল সমূহ। ইলম অর্জনকারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। শুধুমাত্র ইসলামের আলোচনা আসলে ঈমানও তার ভিতরে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ﴾

"ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন।" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৯) আর এটা জানা বিষয় যে, ইসলাম আকীদাহ, ঈমান ও বাহ্যিক আমলের সমষ্টি। এককভাবে ঈমানের উল্লেখ হলে ইসলামকে তার ভিতরে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। দু'টি একসাথে উল্লেখ হলে ঈমানের অর্থ হবে অন্তরে বিশ্বাস করার বিষয়সমূহ আর ইসলামের অর্থ হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আমলসমূহ। এই জন্যই পূর্ববর্তী যুগের কোন কোন আলেম বলেছেন, ইসলাম প্রকাশ্য বিষয় এবং ঈমান গোপনীয় বিষয়। কারণ তা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আপনি কখনো দেখতে পাবেন যে, মুনাফেক ব্যক্তি নামায পড়ছে, রোযা রাখছে এবং সাদকা করছে। এই ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে মুসলমান কিন্তু মু'মিন নয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾

"মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনয়ন করেছি; অথচ তারা মুমিন নয়"। (সূরা বাকারাঃ ৮)

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে

প্রশ্নঃ (১০) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছে জিবরাঈলে বলেছেন, ঈমান হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস, রাসূলদের উপর বিশ্বাস, পরকালের উপর বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস

স্থাপন। অন্য হাদীছে রয়েছে, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। উভয় হাদীছের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় করব?

উত্তরঃ যে ঈমানের মাধ্যমে আকীদাহ্[1] উদ্দেশ্য, তার রুকন মোট ছয়টি। সেগুলো হাদীছে জিবরাঈলে উল্লেখিত হয়েছে। জিবরীল (আঃ) যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঈমান হল তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি। অপর পক্ষে যেখানে ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা থাকার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ঈমানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সৎ আমল উদ্দেশ্য। এই জন্য নামাযকে ঈমানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু"। (সূরা বাকারাঃ ১৪৩) তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এখানে ঈমান দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে আদায় করা নামায উদ্দেশ্য। কেননা ছাহাবীগণ কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের পূর্বে বাইতুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন।

প্রশ্নঃ (১১) মসজিদে আসার অভ্যাস আছে এমন ব্যক্তিকে কি আমরা মুমিন হিসাবে সাক্ষ্য দিতে পারি?

উত্তরঃ কোন সন্দেহ নাই যে, কোন ব্যক্তি যদি নামাযের জন্য মসজিদে আসে, তার মসজিদে আসাটাই তার ঈমানের পরিচয় বহন করে। কারণ তা না হলে কিসে তাকে ঘর থেকে বের করে মসজিদে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য করল ?

প্রশ্নকারী যে হাদীছটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা হল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ))

"তোমরা যদি কোন ব্যক্তিকে মসজিদে আসতে অভ্যস্ত দেখ, তবে তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য প্রদান কর"।[2] কিন্তু এই হাদীছটি দূর্বল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই হাদীছটি ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

[1] - ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আকীদা বলা হয়। যেমন আল্লাহর সত্বা ও গুণাবলীতে বিশ্বাস নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস ও অন্যান্য বিষয়সমূহ।

[2] - তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, নামাযের মর্যাদা অনুচ্ছেদ

আল্লাহ সম্পর্কে শয়তানের ওয়াস্ ওয়াসা (কুমন্ত্রণা)

প্রশ্নঃ (১২) আল্লাহ তাআ'লা সম্পর্কে শয়তান একজন মানুষকে এমন ওয়াস্ ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) প্রদান করে যে, সে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে। এ সম্পর্কে আপনার উপদেশ কি?

উত্তরঃ প্রশ্নকারী যে সমস্যার কথা ব্যক্ত করলেন এবং যার পরিণতিকে ভয় করছেন, আমি তাকে বলব যে, হে ভক্ত! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। উক্ত সমস্যার ভাল ফলাফল ব্যতীত মন্দ কোন ফল হবে না। কেননা এই ওয়াস্ওয়াসাগুলো শয়তান মুমিনদের মাঝে প্রবেশ করায়, যাতে সে মানুষের ঈমানকে দূর্বল করে দিতে পারে এবং তাদেরকে মানষিক অস্থিরতায় ফেলে দিয়ে ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। শুধু তাই নয় অনেক সময় মুমিনদের সাধারণ জীবনকে বিপন্ন করে তুলে।

প্রশ্নকারী ব্যক্তির সমস্যাই মুমিনদের প্রথম সমস্যা নয় এবং শেষ সমস্যাও নয়; বরং দুনিয়াতে একজন মুমিন অবশিষ্ট থাকলেও এই সমস্যা বর্তমান থাকবে। সাহাবীগণও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَـــدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

"সাহাবীদের একদল লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আগমণ করে জিজ্ঞাসা করল, আমরা আমাদের অন্তরে কখনো কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন যে, সত্যিই কি তোমরা এরকম পেয়ে থাক? তাঁরা বললেন হ্যাঁ, আমরা এরকম অনুভব করে থাকি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণ"।[1]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

((يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ))

"তোমাদের কারো কাছে শয়তান আগমণ করে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলে কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারও অবস্থা এরকম হলে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এরকম চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত থাকে।"[2] ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত,

---

[1] - মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ অন্তরের ওয়াস্ ওয়াসা

[2] -বুখারী, কিতাবু বাদইল খালক্, অনুচ্ছেদঃ ইবলিস ও তার সৈন্যদের আলোচনা

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُحَدِّثُ نَفْسِى بِالشَّيْءِ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে একজন লোক আগমণ করে বলল, আমার মনে কখনো এমন কথার উদয় হয়, যা উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশী ভাল মনে হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এ ই বিষয়টিকে নিছক একটি মনের ওয়াস্‌ওয়াসা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।"[1]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) তাঁর কিতাবুল ঈমানে বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় কখনো কুফরীর ওয়াস্‌ওয়াসায় পতিত হয়। এতে তাদের অন্ত র সংকুচিত হয়ে যায়। সাহাবীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ব্যক্ত করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কেউ কেউ তার অন্তরে এমন বিষয় অনুভব করে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আকাশ থেকে জমিনে পড়ে যাওয়াকে অধিক শ্রেয় মনে করে। এটা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইহা ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত। অন্য বর্ণনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি শয়তানের কুমন্ত্রণাকে নিছক একটি মনের ওয়াস্‌ওয়াসা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। মুমিন ব্যক্তি এই ধরণের ওয়াস্‌ওয়াসাকে অপছন্দ করা সত্বেও তার মনে এর উদয় হওয়া এবং তা প্রতিহত করতে প্রাণপন চেষ্টা করা তার ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন কোন মুজাহিদের সামনে শত্রু এসে উপস্থিত হল। মুজাহিদ শত্রুকে প্রতিহত করল এবং পরাজিত করল। এটি একটি বিরাট জিহাদ।[2] এই জন্যই ইলম অর্জনকারী ও এবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিগণ বেশী বেশী ওয়াস্‌ওয়াসা এবং সন্দেহে পতিত হয়ে থাকে। অথচ অন্যদের এ রকম হয়না। কেননা এরা তো আল্লাহর পথ অনুসরণ করে না। এরা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত রয়েছে। শয়তানের উদ্দেশ্যও তাই। অপর পক্ষে যারা ইলম অর্জন এবং এবাদতের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের পথে চলে, শয়তান তাদের শত্রু। সে তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে চায়।

প্রশ্নকারীকে আমি বলব যে, যখন আপনি বুঝতে পারবেন, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হোন। আর জেনে রাখুন যে, আপনি যদি তার সাথে সদা-সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, তার পিছনে না ছুটেন, তাহলে সে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

[1] - আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদঃ ওয়াস্ ওয়াসা প্রতিরোধ

[2] - অনুরূপভাবে শয়তানের ওয়াস্ ওয়াসাকে প্রতিহত করাও একটি বড় জিহাদ।

((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ))

"আমলে পরিণত করা অথবা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা আমার উম্মতের মনের ওয়াস্‌ওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[1]

আপনাকে যদি বলা হয় শয়তান মনের ভিতরে ওয়াস্‌ওয়াসা দেয় তা কি আপনি বিশ্বাস করেন ? সেটাকে আপনি কি সত্য মনে করেন ? আপনার মনে আল্লাহ সম্পর্কে যে ধরণের ওয়াস্‌ওয়াসার উদয় হয়, তার ব্যাপারে আপনার ধারণা কি তাই ? উত্তরে আপনি অবশ্যই বলবেন, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা সম্পূর্ণ অনুচিত। হে আল্লাহ! আপনি পূত-পবিত্র। এটি একটি বিরাট অপবাদ। আপনি অন্তর দিয়ে মনের এ সব ওয়াস্‌ওয়াসাকে ঘৃণা করবেন এবং জবানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করবেন। আর আপনি এ থেকে দূরে থাকবেন। সুতরাং এগুলো শুধুমাত্র মনের কল্পনা এবং ওয়াস্‌ওয়াসা, যা আপনার অন্তরে প্রবেশ করে থাকে। এটি একটি শয়তানের ফাঁদ। মানুষকে শির্কে লিপ্ত করার জন্যই সে এ ধরণের ফাঁদ পেতে রেখেছে। মানুষকে গোমরাহ করার জন্য শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে থাকে।

সামান্য কোন জিনিষের ক্ষেত্রে শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় না। আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জনবসতিপূর্ণ বড় বড় শহরের কথা শ্রবণ করে থাকেন। এসমস্ত শহরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয়না। অথবা এ ধরণের সন্দেহ হয়না যে, শহরটি বসবাসের উপযোগী নয় অথবা শহরে কোন জন-মানুষ নেই। এ ক্ষেত্রে সন্দেহ না হওয়ার কারণ হল শয়তানের এতে কোন লাভ নাই। কিন্তু মানুষের ঈমানকে বরবাদ করে দেয়ার ভিতরে শয়তানের বিরাট স্বার্থ রয়েছে। জ্ঞানের আলো এবং হেদায়েতের নূরকে মানুষের অন্তর থেকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য ও তাকে সন্দেহ এবং পেরেশানীর অন্ধকার গলিতে নিক্ষেপ করার জন্য শয়তান তার অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে বাঁচার উপযুক্ত ঔষধও আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। এসব ধারণা থেকে বিরত থাকা এবং শয়তানের ধোকা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। মুমিন ব্যক্তি যদি ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এবাদতে লিপ্ত হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় অন্তর থেকে উহা চলে যাবে। সুতরাং আপনার অন্তরে এ জাতীয় যা কিছু উদয় হয়, তা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকুন। আপনি তো আল্লাহর এবাদত করেন, তাঁর কাছে দু'আ করেন এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করেন। আপনার অন্তরে যে সমস্ত কুধারণার উদয় হয়, তার বর্ণনা যদি

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ গোলাম আযাদ করা, অনুচ্ছেদঃ তালাক এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি প্রসঙ্গে। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ মনের কুমন্ত্রনা...।

অন্যের কাছ থেকে শুনেন, তাহলে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলতে ইচ্ছা করবেন। তাই যে সমস্ত ওয়াস্‌ওয়াসা মনের মধ্যে জাগে, তার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই; বরং তা ভিত্তিহীন মনের কল্পনা মাত্র। এমনিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কাপড় পরিধানকারী কোন ব্যক্তির মনে যদি এমন ওয়াস্‌ওয়ার জাগ্রত হয় যে, হয়তোবা কাপড়টি নাপাক হয়ে গেছে, হয়তোবা এ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে নামায বিশুদ্ধ হবে না, এমতাবস্থায় সে উক্ত ওয়াস্‌ওয়াসার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। উপরোক্ত আলোচনার পর আমার সংক্ষিপ্ত নসীহত এই যেঃ

১) ওয়াস্‌ওয়াসার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ মোতাবেক ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।
২) বেশী করেআল্লাহ র যিকির করবে।
৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে এবাদতে লিপ্ত থাকবে। যখনই বান্দা পরিপূর্ণরূপে এবাদতে মশগুল থাকবে, ইনশাআল্লাহ এ ধরণের কুচিন্তা দূর হয়ে যাবে।
৪) এই রোগ থেকে আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দু'আ করবে।

প্রশ্নঃ- (১৩) কাফেরের উপর কি ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব?

উত্তরঃ- প্রত্যেক কাফেরের উপরই ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব। চাই সে কাফের ইয়াহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে এরশাদ করেন,

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُــوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে মানবমন্ডলী! আমি আকাশ-যমিনের রাজত্বের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সবার নিকট প্রেরিত রাসূল। তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নাই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁর প্রেরিত নিরক্ষর নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।" (সূরা আরাফঃ ১৫৮) সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনয়ন করা সমস্ত মানুষের উপর ওয়াজিব। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশেষ অনুগ্রহ করে অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের আইন-কানুন মেনে মুসলিম দেশে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন।

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِيــنَ

الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ এবং রোজ হাশরের উপর ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) প্রদান করে।" (সূরা তাওবাঃ ২৯) সহীহ মুসলিম শরীফে বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন যুদ্ধে কাউকে আমীর নির্বাচন করতেন, তখন তাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। আরো উপদেশ দিতেন সাথীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার। আর বলতেন, তাদের সামনে তিনটি বিষয় পেশ করবে, তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।[1] এই সমস্ত বিষয় সমূহের মধ্যে জিযিয়া গ্রহণ অন্যতম। অনেক আলেম ইয়াহুদী-খৃষ্টান ছাড়াও অন্যান্য কাফের-মুশরেকদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ বৈধ বলেছেন।

মোটকথা অমুসলিমদের উপর আবশ্যক হল, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইসলামী শরীয়তের কাছে নতি স্বীকার করে কর দিয়ে ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাস করবে।

প্রশ্নঃ- (১৯) যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব জানে বলে দাবী করবে, তার হুকুম কি?

উত্তরঃ- যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব জানার দাবী করবে সে কাফের। কেননা সে আল্লাহ তাআ'লাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"হে নবী আপনি বলে দিন! আকাশ এবং যমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের সংবাদ জানে না এবং তারা জানে না যে, কখন পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা নামলঃ ৬৫) যেহেতু আল্লাহ তাঁর নবীকে এই মর্মে ঘোষণা করার আদেশ দিয়েছেন, আকাশ-যমিনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না, এরপরও যে ব্যক্তি গায়েবের খবর জানার দাবী করবে, সে আল্লাহকে এই ব্যাপারে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল। যারা ইলমে গায়েবে জানার দাবী করে, তাদেরকে আমরা বলব, তোমরা কিভাবে এটা দাবী কর অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জানতেন না। তোমরা বেশী মর্যাদাবান না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)? যদি তারা বলে আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বেশী মর্যাদাবান, তাহলে তারা এ কথার কারণে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশী মর্যাদাবান, তাহলে আমরা বলব কেন তিনি গায়েবের সংবাদ জানেন না ? অথচ তোমরা তা জান বলে দাবী করছ? আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

[1] - মুলিম শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদঃ আমীর নির্বাচন

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

“তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না- তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।” (সূরা জিনঃ ২৬-২৭) ইলমে গায়েবের দাবীদারদের কাফের হওয়ার এটি দ্বিতীয় দলীল। আল্লাহ তাআ’লা তাঁর নবীকে মানুষের জন্য ঘোষণা করতে বলেন যে,

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

“আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য জগতের বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার নিকট প্রেরণ করা হয়।” (সূরা আনআ’মঃ ৫০)

মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহই ভাল জানেনঃ

প্রশ্নঃ- (১৫) বর্তমান কালের ডাক্তারগণমাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান আছে না কন্যা সন্তান বলে দিতে পারে। আর কুরআনে আছে, وَ يَعْلَمُ مَا فِيْ الْأَرْحَامِ অর্থঃ “মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহই জানেন।” ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী কি সন্তান প্রসব করবে? তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কাতাদা থেকেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। আল্লাহর বাণী, مَا فِيْ الْأَرْحَامِ “গর্ভে যা আছে” এ কথাটি ব্যাপক। এ ব্যাপকতা ভঙ্গকারী বিশেষ কোন দলীল আছে কি? অর্থাৎ কোন অবস্থাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও কি মাতৃগর্ভের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখতে পারে?

উত্তরঃ- উপরের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমি বলতে চাই যে, কুরআনের কোন আয়াত কখনই বাস্তব সত্য কোন ঘটনার বিরোধী হতে পারে না। যদিও কখনো কোন ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে এরকম কিছু দেখা যায়, তবে হয়তো এটা হবে নিছক অবাস্তব দাবী অথবা কুরআনের আয়াতটি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। কেননা কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত এবং প্রকৃত বাস্তব ঘটনা উভয়টিই অকাট্য। দু’টি অকাট্য বিষয়ের মধ্যে কখনো বিরোধ হতে পারে না।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি সত্য হয়ে থাকলে বলব যে, অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে তারা এখন জানতে পেরেছে যে, মাতৃগর্ভে কি আছে। বর্তমানে ডাক্তারগণ ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান হওয়া সম্পর্কে যে আগাম খবর প্রদান করে, তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলেও আয়াতের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই। আয়াতটি গায়েবী বিষয় সংক্রান্ত। এখানে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা আল্লাহর

জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। তম্মধ্যে মাতৃগর্ভে কি আছে তা একটি। শিশু মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় গায়েবী বিষয়গুলো হল সে কত দিন মায়ের পেটে থাকবে, কত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, কি রকম আমল করবে, সে কতটুকু রিযিক গ্রহণ করবে, সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ছেলে না মেয়ে হবে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর গঠন পূর্ণ হওয়ার পরে মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া ইলমে গায়েবের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা গঠন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞানের মতই হয়ে গেল। তবে শিশুটি তিনটি অন্ধকারের ভিতরে লুকায়িত অবস্থায় রয়েছে। যদি অন্ধকারের আবরণগুলো অপসারণ করা হয়, তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইহা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমন শক্তিশালী যন্ত্র রয়েছে, যা এই তিনটি অন্ধকার ভেদ করতে সক্ষম। যাতে করে শিশুটি ছেলে না মেয়ে, তা জানা যায়। আর আয়াতে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে- একথা বলা হয়নি। হাদীছেও এই মর্মে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

আয়াতের শানে নুযুলের ক্ষেত্রে মুজাহিদ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা মুনকাতে'।[1] কারণ তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভূক্ত।

কাতাদার তাফসীরের অর্থ এই যে, গঠন হওয়ার পূর্বে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ ব্যতীত অন্যরাও জানতে পারে। ইবনে কাছীর সূরা লুকমানের আয়াতের তাফসীরে বলেন, মাতৃগর্ভে যা আছে তা দিয়ে আল্লাহ তাআ'লা কি সৃষ্টি করতে চান, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কিন্তু যখন ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কিংবা সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার আদেশ দিয়ে দেন, তখন ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবেরাও জানে। আল্লাহর বাণী,

﴿ويعلم مَا فِيْ الأَرْحَامِ﴾

"মাতৃগর্ভে যা আছে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।" এ থেকে মানুষ কোন কিছু জানতে পারে কিনা। জানলে তা কিসের মাধ্যমে ? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব যে, আয়াতের মাধ্যমে যদি গঠন প্রণালী পূর্ণ হওয়ার পর ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব। আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝি যে, মাতৃগর্ভের ছোট-বড় যাবতীয় অবস্থা আল্লাহ তাআ'লা বিস্তারিতভাবে অবগত আছেন। মানুষ শুধুমাত্র গঠন পূর্ণ হওয়ার পর ছেলে না মেয়ে এই একটি মাত্র অবস্থা জানতে পারে। আরো অসংখ্য অবস্থা এখনও রহস্যময় রয়ে গেছে। উসূলবিদগণ[2] উল্লেখ

---

[1] - মুনকাতে সেই হাদীছকে বলা হয়, যার সনদ হতে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়। হাদীছের সনদ হতে বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কারণে হাদীছ দূর্বল হয়ে যায়।

[2] - কুরআন-সন্নাহর থেকে গবেষণা করে যারা দ্বীনের মাসায়েল বের করার মূলনীতি নির্ধারণ করেন তাদেরকে উসূলবিদ (উসূলী) বলা হয়।

করেছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপকার্থক বিষয়গুলো থেকে কোন জিনিষকে আলাদা করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর কোন দলীল কিংবা ইজমা'[1] বা কিয়াস[2] বা বাস্তব উপলোব্ধি অথবা বিশুদ্ধ বিবেকের[3] দরকার। এ ব্যাপারে আলেমদের আলোচনা অত্যন্ত পরিস্কার।

আর আয়াতের মাধমে যদি সন্তান সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ডাক্তারদের কথা এবং কুরআনের আয়াতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। ডাক্তাররা সন্তান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বলতে পারে না যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে।

আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, পৃথিবীতে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল বিরোধী কোন বাস্তব ঘটনা পাওয়া যায়নি। ইসলামের শত্রুরা কিছু কিছু বাস্তব বিষয়ে বাহ্যিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ভেবে তাতে আঘাত করেছে। আল্লাহর কিতাব বুঝতে অক্ষম হওয়ার কারণে অথবা তাদের উদ্দেশ্য অসৎ হওয়ার কারণেই তারা এমনটি করে থাকে। কিন্তু মুসলিম উম্মার আলেমগণ তাদের এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন।

এব্যাপারে মানুষেরা তিনভাগে বিভক্তঃ

প্রথম শ্রেণীর লোকেরা কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য অর্থটিকে গ্রহণ করেছে এবং এর বিপরীতে প্রতিটি বাস্তব সত্য বিষয়কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। অথচ আয়াতটি উক্ত অর্থে সুস্পষ্ট নয়। এতে করে সে নিজের অক্ষমতার কারণে নিজের উপর কিংবা কুরআনের উপর দোষ টেনে এনেছে।

অন্য একটি দল কুরআনের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে পার্থিব বিষয়কেই গ্রহণ করার কারণে নাস্তিকে পরিণত হয়েছে।

অন্য দিকে মধ্যমপন্থী দলের লোকেরা কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে এবং বাস্তব সত্য বিষয়াবলীকেই সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তারা জানে যে, উভয়টিই সত্য। কারণ কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো চাক্ষুষ বস্তুগুলোর বিরোধী হতে পারে না। তারা দলীল এবং বিবেক সম্মত বিষয়, উভয়টির উপরই আমল করে। এর মাধ্যমে তাদের দ্বীন এবং বিবেক উভয়টিই নিরাপদ থাকল। ঈমানদারগণ যখন সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের দ্বীনী ভাইদেরকে তাওফীক দান করুন এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং সঠিক পথের দিকে আহবানকারী ও উম্মতের জন্য সংশোধনকারী নেতা

[1] - কুরআন-সুন্নার কোন বিধানের উপর মুসলিম উম্মার সকল আলেমদের একমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়।

[2] - দ্বীনের কোন মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল না থাকলে সেখানে বিশুদ্ধ কিয়াসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

[3] - বিশুদ্ধ বিবেক ও বাস্তব সত্য কখনও কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হতে পারে না।

হিসাবে নির্ধারণ করুন। আমি আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই, তারই উপর ভরসা করি এবং তারই দিকে ফিরে যাব।

সূর্য ঘুরে না পৃথিবী ?

প্রশ্নঃ- (১৬) সূর্য কি পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে ?

উত্তরঃ- সম্মানিত শায়খ উত্তরে বলেন যে, শরীয়তের প্রকাশ্য দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। এই ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির আগমণ ঘটে। আমাদের হাতে এই দলীলগুলোর চেয়ে বেশী শক্তিশালী এমন কোন দলীল নাই, যার মাধ্যমে আমরা সূর্য ঘূরার দলীলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হলঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ﴾

"আল্লাহ তাআ'লা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৮) সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করে।

২) আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾

"অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেনঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত।" (সূরা আনআ'মঃ ৭৮) এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয়নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

৩) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَتَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾

"তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।" (সূরা কাহাফঃ ১৭) পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদি নড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।

৪) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

"এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে।" (সূরা আমবীয়াঃ ৩৩) ইবনে আব্বাস বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।

৫) আল্লাহ বলেনঃ

﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾

"তিনি রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের মাধ্যমে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে।" (সূরা আ'রাফঃ ৫৪) আয়াতে রাতকে দিনের অনুসন্ধানকারী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানকারী পিছনে পিছনে দ্রুত অনুসন্ধান করে থাকে। এটা জানা কথা যে, দিবা-রাত্রি সূর্যের অনুসারী।

৬) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾

অর্থঃ "তিনি (আল্লাহ) আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী,ক্ষমাশীল।" (সূরা যুমারঃ ৫) আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর উপরে দিবা-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরতো তাহলে তিনি বলতেন, দিবা-রাত্রির উপর পৃথিবীকে ঘূরান। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান"। এই সমস্ত দলীলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চলমান বস্তুকে বশীভুত করা এবং কাজে লাগানো একস্থানে অবস্থানকারী বস্তুকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৭) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾

"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।" (সূরা আশ্-শামসঃ ১-২) এখানে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র সূর্যের পরে আসে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য এবং চন্দ্র চলাচল করে এবং পৃথিবীর উপর ঘুরে। পৃথিবী যদি চন্দ্র বা সূর্যের চার দিকে ঘুরত, তাহলে চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করতনা। বরং চন্দ্র একবার সূর্যকে, আর একবার সূর্য চন্দ্রকে অনুসরণ করত। কেননা সূর্য চন্দ্রের অনেক উপরে। এই আয়াত দিয়ে পৃথিবী স্থীর থাকার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করার ভিতরে চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে।

৮) মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮-৪০) সূর্যের চলা এবং এই চলাকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এই চলাচলের কারণেই দিবা-রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মনযিল নির্ধারণ করার অর্থ এই যে, সে তার মনযিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মনযিল নির্ধারণ করা হত। চন্দ্রের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

৯) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যরকে বলেছেনঃ

((أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا))

"হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নীচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।"[1] এটি হবে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে। আল্লাহ সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এই ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

১০) অসংখ্য হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এই কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়।

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ বাদউল খাল্ক, মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান

হয়তো এ ব্যাপারে আরো দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আমার এই মুহূর্তে মনে আসছেনা। তবে আমি যা উল্লেখ করলাম, এই বিষয়টির দ্বার উম্মুক্ত করবে এবং আমি যা উদ্দেশ্য করেছি, তা পূরণে যথেষ্ট হবে। আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি!

প্রশ্নঃ (১৭) আল্লাহকে এক বলে সাক্ষ্য দেয়া এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহর রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ কি?

উত্তরঃ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ কথার ঘোষণা দেয়া ইসলামে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ। এই সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়া'য (রাঃ) কে ইয়ামান দেশে পাঠানোর সময় আদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি সর্বপ্রথম এই কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নাই। এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।[1]

প্রথম বাক্যটি অর্থাৎ **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। সেই সাথে মুখে এই কালেমাটির উচ্চারণ করবে।

যার দাসত্ব ও উপাসনা করা হয় তার নাম ইলাহ। (لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এই বাক্যটির দু'টি অংশ। একটি 'না' বাচক অংশ অপরটি 'হ্যাঁ' বাচক অংশ। "লা-ইলাহা" কথাটি 'না' বাচক। এবং "ইল্লাল্লাহ" কথাটি 'হ্যাঁ' বাচক। প্রথমে সমস্ত বাতিল মা'বূদের জন্য কৃত সকল প্রকার এবাদতকে অস্বীকার করে দ্বিতীয় বাক্যে তা একমাত্র হক্ব মা'বূদ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

"লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।' যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি কিভাবে বললেন আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই ? অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাস্তবে আল্লাহ ব্যতীত অসংখ্য মা'বূদের উপাসনা করা হচ্ছে। আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত করা হচ্ছে আল্লাহও তাদেরকে মা'বূদ হিসাবে নাম রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتِى يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা'বূদকে ডাকত, আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়বে, তখন কেউ কোন কাজে আসবেনা।" (সূরা হুদঃ ১০১) আল্লাহ আরো বলেন,

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

﴿وَ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾

“আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা’বূদ স্থির করবে না”। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৩৯) আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾

“আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা’বূদ ডেকো না।” (সূরা কাসাসঃ ৮৮) আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

﴿لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾

“আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা’বূদকে আমরা কখনই আহবান করব না।” (সূরা কাহ্ফঃ ১৪)

এখন আমরা কিভাবে বলতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাত উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমরাই বা কিভাবে গাইরুল্লাহর জন্য এবাদত সাব্যস্ত করতে পারি ? অথচ রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছেন,

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

“তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা’বূদ নাই।” (সূরা আরাফঃ ৫৯)

উপরোক্ত সমস্যার উত্তর এই যে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বাক্যটির মধ্যে ইলাহা কথাটির পরে হাক্কুন শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে বাক্যটি এ রকম হবে, (لا الــه حــق الا الله) (লা-ইলাহা হাক্কুন ইল্লাল্লাহ) হাক্কুন শব্দটি উহ্য মানলেই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তাই আমরা বলব আল্লাহ ছাড়া যাদের এবাদত করা হয়, তারাও মা’বূদ কিন্তু এগুলো বাতিল মা’বূদ। এবাদত বা দাসত্ব পাওয়ার তাদের কোন অধিকার নাই। এ কথার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

“এটাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের উপাসনা করে তারা সবাই মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ সুমহান।” (সূরা লুকমানঃ ৩০) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى، إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾

অর্থঃ “তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে ? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। এগুলো কতগুলো নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তোমরা নিজেরা রেখেছ এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ

কোন দলীল নাযিল করেন নি।" (সূরা নাজ্মঃ ১৯-২৩) আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে ইউসুফ (আঃ) এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾

"তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা নাম করণ করে নিয়েছো। আল্লাহ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি।" (সূরা ইউসুফঃ ৪০) সুতরাং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তিনি ব্যতীত অন্যান্য মা'বূদগুলো সত্য মা'বূদ নয়। বরং তা বাতিল উপাস্য।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ এই যে, অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সমস্ত জিন ও ইনসানের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন যে, হে মানব মন্ডলী তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও যমিনের রাজত্ব তাঁর। তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর উপর, তার প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর উপর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পার।" (সূরা আরাফঃ ১৫৮) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

"পরম কল্যাণময় তিনি (আল্লাহ) যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়সালার গ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন।" (সূরা ফুরকানঃ ১) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলঃ

(১) তিনি যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা,
(২) তাঁর আদেশ মান্য করা,
(৩) তিনি যে বিষয় নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা
(৪) তাঁর নির্দেশিত শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর এবাদত করা।
(৫) তাঁর শরীয়তে নতুন কোন বিদ্আত সৃষ্টি না করা।

এই বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়ার অন্যতম দাবী হল সৃষ্টি বা পরিচালনায় এবং প্রভুত্বে কিংবা এবাদতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন অধিকার নাই। বরং তিনি

আবদ্ বা আল্লাহর দাস-বান্দা। মা'বূদ নন। তিনি সত্য রাসূল। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। তিনি নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোন ক্ষমতা রাখেন না। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের একমাত্র মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

"আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে।" (সূরা আনআ'মঃ ৫০) সুতরাং তিনি একজন আদেশ প্রাপ্ত বান্দা মাত্র। তাঁর প্রতি যা আদেশ করা হয় তিনি কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করে থাকেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

"বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুনঃ আল্লাহ তাআ'লার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এবং তিনি ব্যতীত আমি আশ্রয় স্থল পাবনা।" (সূরা জিনঃ ২১-২২) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কিন্তু আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েবের খবর জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কখনো কোন অমঙ্গল হতনা। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।" (সূরা আরা'ফঃ ১৮৮) এটাই হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর প্রকৃত অর্থ।

হে পাঠক! এই অর্থের মাধ্যমেই আপনি জানতে পারলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা অন্য কোন মাখলুক এবাদতের অধিকারী নয়। এবাদতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লা। তিনি বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

"আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল মুসলিম।"(সূরা আন্‌আমঃ ১৬২-১৬৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহ তাআ'লা যে সম্মান দান করেছেন, তাতে অধিষ্ঠিত করাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য যথেষ্ট। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

মর্যাদাবান হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সীমাহীন শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

প্রশ্নঃ (১৮) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিভাবে তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে?

উত্তরঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এই পবিত্র বাক্যটি তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করে। কখনো প্রকাশ্যভাবে আবার কখনো অপ্রকাশ্যভাবে। 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলার সাথে সাথে বাহ্যিকভাবে তাওহীদে উলুহিয়্যাতকেই বুঝায়। তবে তা তাওহীদে রুবুবিয়্যাতকেও শামীল করে। কেননা যারা আল্লাহর এবাদত করে তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতকে স্বীকার করে বলেই তা করে থাকে। এমনিভাবে তাওহীদে আসমা ওয়াস্‌সিফাতকেও অন্তর্ভূক্ত করে। কারণ যার কোন ভাল নাম ও গুণাবলী নাই মানুষ কখনই তার এবাদত করতে রাজি হবে না। এই জন্যই ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছেনঃ

﴿يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾

"হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসেনা, তার এবাদত কেন কর?" (সূরা মারইয়ামঃ ৪২) সুতরাং তাওহীদে উলুহিয়াতের স্বীকৃতি তাওহীদে রুবুবিয়াত ও তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতকেও অন্তর্ভূক্ত করে।

প্রশ্নঃ (১৯) মানুষ এবংজিন সৃষ্টির উদেশ্য কি?

উত্তরঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আল্লাহর সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম এবং আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মটি বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর নিম্মোক্ত বাণীসমূহে ,

﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাহরীমঃ ২) আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসাঃ ২৪) এছাড়া আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন এবং যার আদেশ প্রদান করেন তাতে তিনি মহা কৌশলী। তিনি যাই সৃষ্টি করেন না কেন, তার পিছনে রয়েছে এক বিরাট উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের জন্য যে শরীয়ত দিয়েছেন, তার ভিতরেও রয়েছে এক বিরাট হিকমত। চাই কোন বস্তু ওয়াজিব করার ভিতরে হোক কিংবা হারাম করার ভিতরে হোক। অথবা বৈধ করার মাঝেই হোক না কেন। এই হিকমত আমরা কখনো জানতে পারি আবার কখনো জানতে পারিনা। আল্লাহ প্রদত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে কখনো কিছু লোকে জানে আবার অনেকে জানেই না। তাই আমরা বলব যে, আল্লাহ তাআ'লা জিন

এবং মানুষকে এক বিরাট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তা হল একমাত্র আল্লাহর এবাদত করা। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

"(হে মানুষ!) তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে এমনিই সৃষ্টি করেছি? আর তোমরা আমার দিকে (হিসাবের জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে না?" (সূরা মুমিনূনঃ ১১৫) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾

"মানুষ কি ধারণা করে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?" (সূরা কিয়ামাহঃ ৩৬) এছাড়া আরো অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে, জিন-ইনসানের সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআ'লার এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হল আল্লাহর এবাদত করা। ভালবাসা ও সম্মানের সাথে আল্লাহর আদেশ সমূহ বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধ সমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়ার নাম এবাদত। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে আল্লাহর এবাদত করবে।" (সূরা বাইয়িনাহঃ ৫) এই হল মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করতে অহংকার করবে, সে ব্যক্তি এই হিকমত প্রত্যাখ্যানকারী হিসাবে গণ্য হবে। যার জন্য আল্লাহ তাআ'লা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা না করলে কি হবে তাদেরকর্মসমূহ প্রমা ণ বহন করে যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর কাছে দু'আ কবূল হওয়ার শর্তঃ

প্রশ্নঃ- (২০) কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকে। কিন্তু দু'আ কবূল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অথচ আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব"। তাহলে মানুষ কিভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তা কবূল হবে?

উত্তরঃ- বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। দরূদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর। মুসলমান ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে আকীদাহ ও আমলের ক্ষেত্রে সঠিক পথের তাওফীক প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

“তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি"তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার এবাদ করা হতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।” (সূরা গাফেরঃ ৬০)

এক প্রশ্নকারী বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকেন। অথচ আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন না। ফলে তার কাছে এই অবস্থা কঠিন বলে মনে হয়। বিশেষ করে আল্লাহ তো ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে, আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন। আল্লাহ কখনই ওয়াদা খেলাফ করেন না। উক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব যে, দু'আ কবূলের জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা সর্ববস্থায় দু'আর ক্ষেত্রে বর্তমান থাকতে হবে।

প্রথম শর্তঃ একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে, এই বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করা যে, আল্লাহ কবূল করতে সক্ষম। দু'আ করার সময় এই আশা রাখবে যে, আল্লাহ তা কবূল করবেন।

দ্বিতীয় শর্তঃ দু'আ করার সময় এই কথা অনুভব করবে যে, দু'আ কবূলের জন্য সে খুবই মুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয় বরং এ কথাও অনুভব করবে যে, একমাত্র আল্লাহই বিপদগ্রস্থ ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ শ্রবণ করেন এবং তিনিই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যদি এ কথা অনুভব করে যে, সে আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী নয় এবং আল্লাহর কাছে তার কোন প্রয়োজনও নেই; বরং দু'আ করাটা যেন একটা অভ্যাসমাত্র তাহলে এ ধরণের দু'আ কবূল না হওয়ারই উপযোগী।

তৃতীয় শর্তঃ হারাম খাদ্য খাওয়া থেকে দূরে থাকবে। কারণ বান্দা এবং তার দু'আ কবূল হওয়ার মধ্যে হারাম রুযী প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ))

(হে মানব মন্ডলী! নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাআ'লা রাসূলদের (আঃ) প্রতি যা নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনদের প্রতিও তাই নির্দেশ দিয়েছেন।” তিনি বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ واعْمَلُوْا صَالِحا﴾

“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার্য গ্রহণ কর এবং সৎ কর্ম কর।” (সুরা মুমিনুনঃ ৫১) আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী থেকে আহার গ্রহণ কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।" (সূরা বাকারাঃ ১৭২) অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলায়িত কেশ ও ধুলামিশ্রিত পোশাক নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে থাকে, হে প্রতিপালক! হে রব!! অথচ সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় কি করে তার দু'আ কবূল হতে পারে ?"[1]

দু'আ কবূলের সকল মাধ্যম অবলম্বন করা সত্বেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ লোকের দু'আ কবূল হওয়াকে অসম্ভব মনে করলেন। দু'আ কবূলের কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১) আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করা। কেননা আল্লাহ তাআ'লা আকাশে আরশের উপরে। আল্লাহর দিকে হাত উঠানো দু'আ কবূলের অন্যতম কারণ। হাদীছে এসেছে,

﴿إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও সম্মানী। বান্দা যখন তাঁর দিকে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করে, তখন তিনি হাত দু'টিকে খালি অবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জা বোধ করেন।"[2]

২) এই লোকটি আল্লাহর একটি নাম (রব্ব্) 'পালনকর্তা' উচ্চারণ করে করে দু'আ করেছে। এই নামের উসীলা গ্রহণ করা দু'আ কবূলের অন্যতম কারণ। কেননা রব্ব অর্থ পালনকর্তা, সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টিকারী ও পরিচালনাকারী। তাঁর হাতেই আকাশ-যমিনের চাবি-কাঠি। এ জন্যই আপনি কুরআন মজীদের অধিকাংশ দু'আতেই দেখতে পাবেন, 'রব্ব' বা পালনকর্তা শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্ যাকাত

[2] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত

সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমাদিগকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দু'আ এই বলে কবূল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী লোক হোক। তোমরা সকল নারী-পুরুষই সমান।" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৯৩-১৯৫) সুতরাং আল্লাহর এই নামের (রব্ব) মাধ্যমে উসীলা দেয়া দু'আ কবূলের অন্যতম কারণ।

৩) এই লোকটি মুসাফির ছিল। সফর করাকে অধিকাংশ সময় দু'আ কবূলের কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। কেননা সফর অবস্থায় মানুষ আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। স্বদেশে অবস্থানকারীর চেয়ে মুসাফির আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মুসাফির এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট ও ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধানকারী হয়। মনে হয় সে নিজের নফসের প্রতি কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। আল্লাহর কাছে দু'আ করা ব্যতীত তার অন্য কোন উপায় নেই। সফরে থেকে এলোমেলো বিশিষ্ট হয়ে ও ময়লাযুক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় দু'আ করা দু'আ কবূলের পক্ষে খুবই সহায়ক। হাদীছে আছে, আল্লাহ তাআ'লা আরাফার দিন বিকাল বেলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং আরাফাতে অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, "তারা পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল হতে তারা আমার কাছে এসেছে, ধুলা-মলিন পোষাক নিয়ে এবং এলোকেশ বিশিষ্ট অবস্থায়।[1]

যাই হোক দু'আ কবূলের উপরোক্ত কারণগুলো থাকা সত্বেও কোন কাজ হলো না। কারণ একটাই তার খাদ্য-পানীয় ছিল হারাম, পোষাক ছিল হারাম এবং হারাম খেয়ে তার দেহ গঠিত হয়েছে। এ জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কি ভাবে তার দু'আ কবূল করা হবে? দু'আ কবূলের এই শর্তগুলো পাওয়া না গেলে দু'আ কবূলের কোনই সম্ভাবনা নেই। শর্তগুলো বর্তমান থাকার পরও যদি দু'আ কবূল না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কি কারণে দু'আ কবূল হয়নি, তা আল্লাহই ভাল জানেন। দু'আকারী এ বিষয়ে জানার কোন সুযোগ নাই। দু'আ কবূলের সকল শর্ত বর্তমান থাকার পরও দু'আ কবূল না হলে হতে পারে আল্লাহ তার উপর থেকে দু'আ কবূলের চেয়ে বড় কোনমুসিবত দূর করবেন। অথবা এও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিনের জন্য তার দু'আকে সঞ্চয় করে রাখবেন এবং সেদিন তাকে অধিক পরিমাণে বিনিময় দান করবেন। কেননা ব্যক্তি দু'আ কবূলের সকল শর্ত বাস্তবায়ন করে আল্লাহর কাছে দু'আ করার পরও দু'আ কবূল করা হয়নি এবং তার উপর থেকে বড় কোন মুসিবতও দূর করা হয়নি। হয়ত বান্দা দু'আ

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ।

কবূলের সকল শর্ত পূরণ করে দু'আ করেছে। কিন্তু দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়ার জন্য তার দু'আ কবূল করা হয়নি। একটি পুরস্কার দু'আ করার কারণে এবং অন্য একটি পুরস্কার মুসীবত দূর না করার কারণে। সুতরাং তার জন্য দু'আ কবূলের চেয়ে মহান জিনিষ তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সঞ্চয় করে রাখা হবে।

মানুষের উচিৎ হল দু'আর ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়া না করা। কেননা তাড়াহুড়া করা দু'আ কবূল না হওয়ার অন্যতম কারণ। হাদীছে এসেছে,

((يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوْا كَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ ودَعَــوْتُ وَ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ))

"তোমাদের কেউ দু'আয় তাড়াহুড়া না করলে তার দু'আ কবূল হয়ে থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তাড়াহুড়া করা হয়ে থাকে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বান্দা বলে থাকে কত দু'আ করলাম, কত দু'আ করলাম, কত দু'আ করলাম, কিন্তু কবূল তো হচ্ছে না।"[1] তাই কারও জন্য দু'আতে তাড়াহুড়া এবং দু'আ করতে করতে ক্লান্তি বোধ করে দু'আ করা ছেড়ে দেয়া ঠিক নয় বরং বেশী বেশী দু'আ করা উচিৎ। কারণ দু'আ একটি এবাদত। যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে এবং প্রতিদান বৃদ্ধি করবে। কাজেই হে দ্বীনী ভাই! ছোট-বড় এবং কঠিন-সহজ সকল বিষয়ে আপনাকে বেশী বেশী দু'আ করার উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন।

ইবাদতে ইখলাছ এবং জান্নাত লাভের কামনা

প্রশ্নঃ- (২১) ইখলাছ অর্থ কি? কোন মানুষ যদি এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করে, তবে তার বিধান কি?

উত্তরঃ- বান্দা তার আমলের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য কামনা করবে এবং বেহেশতে পৌঁছার চেষ্টা করবে।

আর যদি বান্দা তার আমলে অন্য কিছুর নিয়ত করে, তবে তাতে নিম্ন লিখিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

১) যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের নৈকট্য লাভের নিয়ত করে এবং এবাদতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত থাকে, তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এটা শির্কের অন্তর্ভূক্ত। হাদীছে কুদছীতে বর্ণিত আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ বলেন,

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত

((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))

"আমি সমস্ত শরীকদের চেয়ে শির্ক থেকে অধিক মুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যাতে সে আমার সাথে অন্য কোন কাউকে শরীক করল, আমি তাকে এবং সে যা শরীক করল, তাকে প্রত্যাখ্যান করব।"[1]

২) যদি আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের নিয়ত করে যেমন, নেতৃত্ব লাভ, সম্মান লাভ ইত্যাদি তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ ধরণের আমল তাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হল সেসব লোক যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট।" (সূরা হুদঃ ১৫-১৬)

প্রথম প্রকার শির্ক এবং এই প্রকার শির্কের মাঝে পার্থক্য এই যে, প্রথম লোকটি আল্লাহর এবাদতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করেছে। আর দ্বিতীয় লোকটি আল্লাহর ইবাদতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করেনি। মানুষের প্রশংসার প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপও নেই।

৩) আমল শুরু করার সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করেছে। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ এমনিতেই চলে আসার সম্ভাবনা থাকে। যেমন পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে এবাদতের নিয়তের সাথে সাথে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের নিয়ত করা, নামাযের মাধ্যমে শরীর চর্চার নিয়ত করা, রোযার মাধ্যমে শরীরের ওযন কমানো ও চর্বি দূর করা এবং হজ্জের মাধ্যমে পবিত্র স্থান এবং হাজীদেরকে দেখার নিয়ত করা। এ রকম করাতে এবাদতে ইখলাছের ছাওয়াব কমে যাবে। আর যদি এবাদতের নিয়তটাই প্রবল হয়, তা হলে পরিপূর্ণ প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। আর ঐ পরিমাণ মিশ্রিত নিয়ত তার কোন ক্ষতি করবে না-মিথ্যা ও গুনাহ করার দ্বারা যেমন হয়। হজ্জের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয জুহ্‌দ ওয়ার রাকায়েক।

"তোমাদের উপর তোমাদের পালন কর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৮) আর যদি এবাদতের নিয়ত ছাড়া অন্য কোন নিয়ত প্রবল থাকে তাহলে দুনিয়াতে যা অর্জন করল ছওয়াব হিসেবে কেবল তাই পাবে, পরকালে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এ রকম করার কারণে সে ব্যক্তি পাপী হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা সে আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থের নিয়ত করেছে। এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লা বলেন

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُون﴾

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সাদ্‌কা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। সাদ্‌কা থেকে কিছু পেলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।" (সূরা তাওবাঃ ৫৮) আবু দাউদ শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক যদি দুনিয়ার কোন সম্পদ লাভের আশায় জিহাদে যায় তবে তার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। লোকটি কয়েকবার প্রশ্ন করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিবারই বললেন, সে ব্যক্তি ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

((فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ))

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত তার নিয়ত অনুযায়ীই হবে।"[1]

আর যদি তার কাছে উভয়টি সমান হয় অর্থাৎ এবাদতের নিয়ত কিংবা অন্য কোন নিয়তের কোনটিই প্রবল না হয়, তাহলেও বিশুদ্ধ কথা হলো সে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এবং অন্যের জন্য এবাদত করলে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

মোট কথা অন্তরের নিয়তের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বান্দা কখনো সিদ্দীকীনের স্তরে পৌঁছে যায় আবার কখনো নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই জন্যই কোন কোন সালাফে সালেহীন বলেছেন, এখলাছের ব্যাপারে আমি যতটুকু নাফসের সাথে জিহাদ করেছি, অন্য কোন ব্যাপারে আমার নাফসের সাথে ততটুকু জেহাদ করিনি।

আমরা আল্লাহর কাছে নিয়ত ও আমলে এখলাস কামনা করি।

প্রশ্নঃ (২২) আশা এবং ভয়ের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতামত কি?

[1] -বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু বাদ্‌য়িল ওহী। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত।

উত্তরঃ মানুষ আশাকে ভয়ের উপর প্রাধান্য দিবে? না ভয়কে আশার উপর ? এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) বলেছেন, মানুষের নিকট আশা এবং ভয় সমান সমান হওয়া উচিৎ। একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া উচিৎ নয়। তিনি আরো বলেন, একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য দিলে বিপথগামী হবে। কেননা আশাকে প্রাধান্য দিলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। আর ভয়কে প্রাধান্য দিলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে।

কোন কোন আলেম বলেন, সৎ আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশাকে প্রাধান্য দিবে এবং পাপ কাজের প্রতি ধাবিত হওয়ার সময় আল্লাহর ভয়কে সামনে রাখবে। কেননা বান্দা আনুগত্যের কাজের দ্বারা আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা আবশ্যক হওয়ার কাজ করে থাকে। তাই আশার দিককে অর্থাৎ আমলটি কবূল হওয়ার আশাকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। আর মনের ভিতরে যদি পাপ কাজের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন আল্লাহর ভয়কে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। যাতে পাপ কাজে লিপ্ত না হয়।

কোন কোন আলেম বলেছেন, সুস্থ ব্যক্তির ভয়কে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। আর অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আশার আলো থাকা দরকার। কেননা সুস্থ ব্যক্তির নিকটে ভয় বেশী থাকলে পাপের কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর রোগী ব্যক্তি আশাকে প্রাধান্য দিবে। কারণ সে যদি আশাকে প্রাধান্য দেয়, তা হলে আল্লাহর সাথে ভাল ধারণা রাখা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।

এই মাসআলাতে আমার কাছে গ্রহণ যোগ্য কথা হল মানুষের অবস্থাভেদে হুকুম বিভিন্ন হবে। ভয়ের দিককে প্রাধান্য দিতে গেলে যদি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলে মন থেকে এ ধরণের ভয় দূর করে দিয়ে আশার দিককে স্থান দিবে। আর যদি আশঙ্কা থাকে যে, আশার দিককে প্রাধান্য দিতে গেলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবার ভয় রয়েছে, তা হলে ভয়কেই প্রাধান্য দিবে। মানুষ তার অন্তরের ডাক্তার। যদি তার অন্তর জীবিত থাকে। আর যদি অন্তর মৃত হয়ে থাকে, তা হলে তার কোন চিকিৎসা নেই।

উপায় গ্রহণ করা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়

প্রশ্নঃ (২৩) উপায় গ্রহণ করা কি আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী? উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কেউ কেউ উপায় অবলম্বন করেছে। আবার কতক লোক এই বলে উপায় অবলম্বন করা বাদ দিয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ- মুমিনের উপর কর্তব্য হল অন্তরকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রাখা এবং কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূর করণে আল্লাহর উপর ভরসা করা। কেননা আকাশ-যমিনের চাবি কাঠি আল্লাহর হাতে। তাঁর হাতেই মানুষের সকল বিষয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহর নিকটেই আছে আকাশ ও যমিনের গোপন তথ্য, আর প্রত্যেকটি বিষয় প্রত্যাবর্তন করবে তাঁরই দিকে; অতএব তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা বে-খবর নন।" (সূরা হূদঃ ১২৩) মূসা (আঃ) স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

﴿وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

অর্থঃ আর মূসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই যালেম সম্প্রদায়ের ফিতনার বিষয়ে পরিণত করোনা। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে এই কাফেরদের কবল হতে উদ্ধার করুন। (সূরা ইউনুসঃ ৮৪-৮৬) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ﴾

"মুমিনদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভরসা করা।" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৬০) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" (সূরা তালাকঃ ৩) সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হল তার মালিক এবং আকাশ-যমিনের মালিকের উপর ভরসা করবে এবং তাঁর প্রতি ভাল ধারণা রাখবে। সাথে সাথে বাহ্যিক উপায়-উপকরণও গ্রহণ করবে এবং আত্মরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা কল্যাণ সংগ্রহের উপকরণ গ্রহণ করা এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার উপায় অবলম্ভন করা আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। দেখুন সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসাকারী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে তিনি সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস পাঠ করার মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য শরীরে ফুঁক দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের আঘাত থেকে শরীর হেফাজত করার জন্য লোহার পোষাক পরিধান করতেন। যখন মুশরেক সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণ করার জন্য তার চারপাশে একত্রিত

হল, তখন মদীনাকে সংরক্ষণ করার জন্য তার চতুর্পার্শ্বে খন্দক খনন করেছেন। যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ যে সমস্ত হাতিয়ার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী দাউদ (আঃ) এর সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾

"আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (সূরা আম্বিয়াঃ ৮০) আল্লাহ তাআ'লা দাউদ (আঃ) কে ভালভাবে যুদ্ধের বর্ম তৈরী করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা লম্বা করে তৈরী করতে বলেছেন। কারণ আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যুদ্ধের স্থানের কাছাকাছি অঞ্চলের লোকদের জন্য ক্ষতিকারক গ্যাস শরীরে প্রবেশের ভয় থাকলে তারা যদি উপযুক্ত পোষাক পরিধান করে, তা হলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এই সমস্ত উপকরণ শরীরকে হেফাজত করবে। এমনিভাবে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে রাখাতেও কোন অসুবিধা নেই। বিশেষ করে যদি প্রয়োজনের সময় এগুলো না পাওয়ার ভয় থাকে। সর্বোপুরি ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর। আল্লাহ তাআ'লা এ সমস্ত আসবাব[1] গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন তাই এই সমস্ত আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করা বৈধ। এই জন্য নয় যে, এগুলোর ভিতরে কল্যাণ-অকল্যাণ বয়ে আনার ক্ষমতা আছে।

পৃথিবীতে মানুষের চলার জন্য আল্লাহ তাআ'লা যে সমস্ত নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন এবং আমাদের ও আমাদের মুমিন ভাইদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান এবং তাঁর উপর ভরসার বলে বলিয়ান করেন এবং এমন সব উপায় উপকরণ গ্রহণ সহজ করেন যা তাঁর পক্ষ থেকে অনুমদিত ও মনোনিত।

প্রশ্নঃ (২৪) ইসলামে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার হুকুমকি?

উত্তরঃ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা কয়েক প্রকার হতে পারেঃ-

১) যা মূলতই তাওহীদের পরিপন্থী। তা এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন জিনিষের উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করল, বাস্তবে যার কোন প্রভাবই নাই। মুসিবতে পড়ে কবর পূজারীরা এমনটি করে থাকে। এটি বড় শির্ক। যারা এ ধরণের শির্কে লিপ্ত হবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

[1] - জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র এবং বিপদাপদ হতে উদ্ধারের জন্য যেসমস্ত উপায় উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার, তাকে সবাব বা আসবাব বলা হয়ে থাকে।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা মায়িদাঃ ৭২)

২) শরীয়ত সম্মত উপায়-উপকরণের উপর ভরসা করা এবং আল্লাহ তাআ'লাই যে এগুলোর সৃষ্টিকারী, তা একেবারে ভুলে যাওয়া। এটাও এক প্রকার শির্ক। তাবে এটা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না।

(৩) মানুষ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, এই উপকরণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তিনি ইচ্ছা করলে এটি ছিন্ন করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট রাখতে পারেন। এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোনভাবেই তাওহীদেরপরিপন্থী নয়।

মোট কথা এই যে, শরীয়ত সম্মত উপায়-উপকরণ বর্তমান থাকা সত্বেও এগুলোর উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করা ঠিক নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করতে হবে। সুতরাং কোন চাকরীজীবি যদি তার বেতনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী আল্লাহর উপর ভরসা করতে ভুলে যায়, তাহলে সে এক প্রকার শির্কে লিপ্ত হবে। আর যে কর্মচারী এই বিশ্বাস রাখে যে, বেতন কেবল একটি মাধ্যম মাত্র তাহলে এটা আল্লাহর উপর ভরসার বিরোধী হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আল্লাহর উপর ভরসা করার সাথে সাথে আসবাব গ্রহণ করতেন

প্রশ্নঃ (২৫) ঝাড়-ফুঁকের হুকুম কি ? কুরআনের আয়াত লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার হুকুম কি?

উত্তরঃ যাদু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ঝাড় -ফুঁক করাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি তা কুরআনের আয়াত বা অন্য কোন বৈধ দু'আর মাধ্যমে হয়ে থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাহাবীদেরকে ঝাড়-ফুঁক করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ঝাড়-ফুঁকের বিভিন্ন দু'আও প্রমাণিত আছে। তম্মধ্যে কয়েকটি দু'আ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

((رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ))

"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার নাম অতি পবিত্র। আকাশ এবং যমিনে আপনার আদেশ বাস্তবায়িত হয়। আকাশে যেমন আপনার রহমত বিস্তৃত রয়েছে, জমিনেও অনুরূপভাবে আপনার রহমত বিস্তার করুন। আপনি আমাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্রদের প্রভু, এই রোগীর উপর আপনার রহমত ও শিফা অবতীর্ণ

করুন। এই ভাবে ঝাড়-ফুঁক করলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠত।"[1]

((بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ))

"আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি। প্রতিটি এমন রোগ আরোগ্যের জন্যে, যা তোমাকে কষ্ট দেয়। প্রতিটি মানুষের অকল্যাণ থেকে এবং হিংসুকের বদ নজর থেকে আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করুন। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।"[2]

(أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)

আমি আল্লাহ এবং তাঁর কুদরতের উসীলায় আমার কাছে উপস্থিত ও আশংকিতকারী অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[3] রোগী ব্যক্তি শরীরের যেখানে ব্যথা অনুভব করবে, সেখানে হাত রেখে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। উপরের দু'আগুলো ছাড়াও হাদীছে আরো অনেক দু'আ বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনের আয়াত অথবা হাদীছে বর্ণিত দু'আ বা যিক্‌র লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারে আলোমেগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন বৈধ। আবার কেউ বলেছেন অবৈধ। তবে অবৈধ হওয়াটাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী। কারণ এসব ঝুলিয়ে রাখার পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। এটাই সর্বাধিক সঠিক কথা; বরং একাজটি একটি শিরকী কাজ বলে গণ্য হবে। কারণ এখানে এমন জিনিষকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে আল্লাহ যাকে শরীয়ত সম্মত মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন দলীল পাওয়া যায়না। কুরআন বা অন্য দু'আ পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁক দেয়ার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রোগীর গলায় বা হাতে কুরআনের আয়াত লিখে ঝুলিয়ে রাখা কিংবা কুরআনের আয়াত লিখে বালিশের নীচে রেখে দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

প্রশ্নঃ (২৬) ঝাড়-ফুঁক করা কি আল্লাহর উপর (তাওয়াক্কুল) ভরসা করার পরিপন্থী?

উত্তরঃ তাওয়াক্কুল অর্থ হল কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা। চেষ্টা করা বাদ দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষের মাঝে সব চেয়ে বেশী আল্লাহর উপর ভরসাকারী কে? তবে উত্তর হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি কি ক্ষতি ও অকল্যাণ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন না? উত্তর হল হ্যাঁ অবশ্যই করতেন। তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন, তখন তীর-তরবারীর আঘাত হতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের

---

[1] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তিব্ব।

[2] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।

[3] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।

পোষাক পরিধান করতেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি দু'টি লোহার বর্ম পরে বের হয়েছেন। সম্ভাব্য বিপদাপদ হতে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। অসুস্থ মানুষ নিজের উপর ঝাড়-ফুঁক করা বা অন্যান্য অসুস্থ ভাইদের ঝাড়-ফুঁক করা তাওয়াক্কুলের[1] পরিপন্থী নয়। হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ফালাক ও নাস পড়ে নিজের উপর এবং সাহাবীদের উপর ফুঁক দিতেন।

প্রশ্নঃ (২৭) তাবীজ ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তরঃ তাবীজ ব্যবহার দু'ধরণের হতে পারে।

প্রথমতঃ কুরআনের আয়াত লিখে তাবীজের ভিতরে রেখে ব্যবহার করা। কুরআনের আয়াত লিখে তাবীজ ব্যবহার করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। কুরআন পড়ে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন ছাড়া এমন কিছু লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখা, যার অর্থ বোধগম্য নয়। এধরণের কিছু ব্যবহার করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। কেননা সে লিখিত বস্তুর অর্থ অবগত নয়। কিছু কবিরাজ রয়েছেন, যারা অস্পষ্ট এবং দূর্বোধ্য ভাষায় লিখে থাকে। যা আপনার পক্ষে বুঝা বা পাঠ করা সম্ভব নয়। এধরণের তাবীজ লিখা ও ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম ও শির্ক।

প্রশ্নঃ (২৮) পানাহারের পাত্রে চিকিৎসা স্বরূপ আয়াতুল কুরসী বা কুরআনের অন্য কোন আয়াত লিখে রাখা জায়েয আছে কি ?

উত্তরঃ জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর কিতাবকে এত নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা কোন ক্রমেই জায়েয নয় একজন মুমিন ব্যক্তি কুরআনের সব চেয়ে মহান আয়াতটি কিভাবে পানাহারের পাত্রে লিখে রাখতে পারে? যা ঘরের ভিতরে ফেলে রাখা হয়, শিশুরা তা নিয়ে খেলা-ধুলা করে থাকে। সুতরাং এই কাজটি বৈধ নয়। যার ঘরে পানাহারের পাত্রে এরকম কিছু লেখা আছে, তার উচিৎ এই আয়াতগুলো মুছে ফেলা। কারণ এইভাবে কুরআনের আয়াত লিখে চিকিৎসা করার কথা সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়।

কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা

প্রশ্নঃ (২৯) কোন কোন ইসলামী দেশে মাদরাসার ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে যে, আহলে সুন্নাতুওয়াল জামাতের মাযহাব হল কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আহলে

---

[1] - আল্লাহর উপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।

সুন্নাতওয়াল জামাতের লোকেরা জ্ঞানার্জনের মাদরাসাকে ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্রদের মাদরাসা এবং আশআরীদের মাদরাসা, এই দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকে। এই ভাবে বিভক্ত করা কি সঠিক? যে সমস্ত আলেমরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করে থাকে, তাদের ব্যাপারে একজন মুসলিমের অবস্থান কি রকম হওয়া দরকার?

উত্তরঃ যে ছাত্ররা এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের মাযহাব হল কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রকৃত পক্ষে এটিই আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের মূলনীতি। এই মাযহাব তাদের কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতঅনুযায়ী এই মাযহাবই সত্য। সালাফে সালেহীনের বক্তব্যও তাই। সুস্থ বিবেক এই মাযহাবকেই সমর্থন করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোকেরা জ্ঞানার্জনের মাদরাসাকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। একটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্রদের মাদরাসা এবং অন্যটি আশআরী ও মাতুরিদীয়াদের মাদরাসা। ইবনে তাইমিয়ার মাদরাসার ছাত্রগণ কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করার বিরোধীতা করেন। আর আশআরী ও মাতুরিদীয়া ফির্কার লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অপব্যাখ্যা করে থাকে।

সুতরাং আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে উভয় মাদরাসার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যত আয়াত ও হাদীছ এসেছে, কোন প্রকার পরিবর্তন করা ছাড়াই সেগুলোর ক্ষেত্রে ঈমান আনয়ন করে থাকেন। আর দ্বিতীয় মাদরাসার লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন আয়াতগুলোকে তার আসল অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করে থাকে। নিম্নের উদাহরণটির মাধ্যমে উভয় মাযহাবের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"বরং তাঁর (আল্লাহর) হাত দু'টি সদা প্রসারিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন।" (সূরা মায়িদাঃ ৬৪) ইবলীস যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করল তখন আল্লাহ তাকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'টি হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে কিসে তোকে বারণ করল?" (সূরা সুয়াদঃ ৭৫) উপরে বর্ণিত দুই মাদরাসার শিক্ষকরা আল্লাহর দুই হাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। প্রথম মাদরাসার লোকেরা বলেনঃ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর

ক্ষেত্রে যেরকম হাত প্রযোজ্য, আল্লাহর জন্য সেরকম হাতই সাব্যস্ত করতে হবে। আর দ্বিতীয় মাদরাসার ছাত্ররা বলে থাকে, হাতকে তার আসল অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। তাদের মতে আল্লাহর জন্য প্রকৃত হাত সাব্যস্ত করা হারাম। তাদের মতে হাতের উদ্দেশ্য হল কুদরাত (শক্তি) অথবা নেয়ামত।

সুতরাং উভয় মাযহাবের ভিতরে এতো পার্থক্য থাকা সত্বেও মাযহাব দু'টিকে একই কাতারে শামিল করা যায়না। উক্ত দু'মতের কোন একটিকে বলতে হবে যে, তারা আহলে সুন্নাত বা সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যটিকে তা বলা যাবেনা। এতদুভয়ের মধ্যে অবশ্যই ইনসাফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। অতএব, তাদের মতামতগুলোকে ন্যায়ের মানদন্ডে মেপে দেখা কর্তব্য। আর সে ন্যায়ের মানদন্ডটি হল আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পূণ্যবান অনুসারী এবং মুসলমানদের ইমামগণের বক্তব্য। আতএব, উক্ত মানদন্ডের পরিমাপ অনুযায়ী এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর ছাত্রদের মাযহাবটি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফে সালেহীনদের মাযহাবের অনুরূপ। পক্ষান্তরে আশআরী সম্প্রদায়ের মাযহাব কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনদের মাযহাবের পরিপন্থী। তারা বলে থাকেন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন আয়াতগুলোকে যদি এমন অর্থের মাধ্যমে তা'বীল (অপব্যাখ্যা) করা হয়, যাতে অন্য কোন দলীলের বিরোধীতা হবে না, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

আমরা তাদের উত্তরে বলব যে, কুরআনের কোন শব্দকে বিনা দলীলে প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করাই কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীতা করার নামান্তর এবং আল্লাহ সম্পর্কে বিনা দলীলে কথা বলা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলা হারাম। আল্লাহ তায়া,লা বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়, অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলাও হারাম, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই"। (সূরা আরাফঃ ৩৩) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৩৬) যারা আল্লাহর নাম ও

গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করে, তাদের কাছে শরীয়তের কোন জ্ঞান নেই। এমন কি তারা সুস্থ বিবেক সম্পন্নও নয়।

বলা হয় যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) নিম্ন লিখিত তিনটি স্থানে তা'বীল করেছেনঃ (১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ "বনী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে", (২) হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত এবং (৩) আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। (সূরা হাদীদঃ ৪)

উত্তরে আমরা বলব যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে এধরণের কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, আবু হামেদ ইমাম গাজ্জালী আহমাদ বিন হাম্বালের নামে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাত্র তিনটি স্থানে তা'বীল করেছেন। স্থান তিনটি হল, "হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত", "বনী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে" এবং "আমি যেন ইয়ামানের দিক থেকে আল্লাহর নিঃশ্বাস পাচ্ছি"। এধরণের কথা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

আর আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। (সূরা হাদীদঃ ৪) আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) এই আয়াতটির তা'বীল করেন নি। বরং তিনি আয়াত থেকে সাব্যস্ত কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি জাহ্‌মীয়া ফির্কার প্রতিবাদে আল্লাহ র ইলমকে সাব্যস্ত করেছেন। জাহ্‌মীয়া ফির্কার লোকেরা বলে আল্লাহ যদি সর্বত্র থাকেন, তাহলে আল্লাহ স্বশরীরে থাকা আবশ্যক হয়। এই জন্যই তারা উক্ত আয়াতের উল্টা ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা বলি যে, আল্লাহ সাথে আছেন এই কথার অর্থ হল জ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত মাখলুকাতকে বেষ্টন করে আছেন। এটা নয় যে, সৃষ্টিকুলের সাথে মিশে আছেন। সাথে থাকার অর্থ স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। এই জন্যই বলা হয়ে থাকে, সে আমাকে দুধের সাথে পানি পান করিয়েছে, আমি জামাতের সাথেই নামায আদায় করেছি, তার স্ত্রী তার সাথে আছে।

উপরের উদাহরণ গুলোর প্রথম উদাহরণে দুধের সাথে পানির সংমিশ্রন বুঝায়। দ্বিতীয় উদাহরণে একে অপরের সাথে মিশে যাওয়া ব্যতীত একই স্থানে এক সাথে কাজ করা বুঝায় এবং তৃতীয় উদাহরণে সাথে থাকার অর্থ একই স্থানে বা একই কাজে থাকাকে আবশ্যক করে না। সুতরাং আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন-একথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ বান্দার সাথে মিশে আছেন অথবা একই স্থানে আছেন। এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ আল্লাহ রয়েছেন সমস্ত মাখলুকাতের উপরে। আল্লাহ আমাদের সাথে থাকার অর্থ এই যে, তিনি সাত আকাশের উপরে আরশে আযীমে থেকেও শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, রাজত্ব, শ্রবণ, দেখা এবং পরিচালনার মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টিজীবকে বেষ্টন করে আছেন। সুতরাং সাথে থাকাকে কোন ব্যাখ্যাকারী যদি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে,

তাহলে আয়াতের দাবী থেকে বের হয়ে আসবে না এবং সে অপব্যাখ্যাকারীও হবে না। তবে যে ব্যক্তি সাথে থাকাকে একসাথে সর্বস্থানে, সবসময় বিরাজমান থাকা বুঝবে সে অপব্যাখ্যাকারী হিসাবে গণ্য হবে।

সমস্ত বানী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে, যেভাবে ইচ্ছা তিনি তা ঘুরান- হাদীছটি মুসলিম শরীফে রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোকেরা এই হাদীছের অপব্যাখ্যা করেন নি। তারা আল্লাহর শানে যে ধরণের আঙ্গুল প্রযোজ্য তা সাব্যস্ত করেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের অন্তরগুলো আল্লাহর আঙ্গুলের সাথে লেগে আছে। মেঘমালা আকাশ এবং যমিনের মাঝখানে থাকে কিন্তু তা আকাশের সাথে মিশে থাকেনা, যমিনের সাথেও নয়। তাই বানী আদমের অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলের সাথে মিশে থাকা জরুরী নয়।

হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত, যে তাতে স্পর্শ করল অথবা চুম্বন করল, সে যেন আল্লাহর হাতে স্পর্শ করল বা চুম্বন করল, এই হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) মাজমূ ইবনে কাসেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ এ হাদীছটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়; বরং এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কথা হল এটি ইবনে আব্বাসের নিজস্ব উক্তি। উপরোক্ত গ্রন্থে (৪৪/৩) সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজরে আসওয়াদ আল্লাহর কোন গুণ নয় বা তাঁর ডান হাতও নয়। যেহেতু বলা হয়েছে "পৃথিবীতে তাঁর ডান হাত" শুধু ডান হাত বলা হয়নি। সুতরাং পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে তার অর্থ সাধারণ অর্থ থেকে আলাদা হবে। তাই হাজরে আসওয়াদকে আল্লাহর ডান হাত বলা যাবেনা। সুতরাং তাকে তা'বীল বা ব্যাখ্যা করার প্রশ্নই আসে না।

সহীহ আকীদাহ ও ইলম শিক্ষার মাদরাসাকে ইবনে তাইমিয়ার মাদ্‌রাসা হিসাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। কারণ তিনি নতুন কোন মাদরাসা তৈরী করেন নি। তিনি সালাফে সালেহীনের পথই অনুসরণ করেছেন।

যারা আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত আয়াতসমূকে ব্যাখ্যা করে, তাদের ব্যাপারে আমরা বলব যে, তাদের নিয়ত যদি ভাল হয় এবং দ্বীনের প্রতি আনুগত্যশীল বলে জানা যায়, তবে তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু তার কথা যে সালাফে সালেহীনের মাযহাব বিরোধী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তাঁরা সর্বক্ষেত্রে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর ঈমান এনেছেন। নিয়ত ভাল থাকা সত্বেও কোন মানুষ যদি ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তবে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। বরং এতে সে ইজতিহাদের ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))

"বিচারক যদি ইজতিহাদ করে সঠিক ফায়সালা দেয়, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে, আর যদি ইজতিহাদ করে ফায়সালা দিতে গিয়ে ভুল করে, তাহলে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে।"

কাজেই আকীদার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে যারা ভুল করেছেন, তাদেরকে গোমরাহ বলা যাবে না। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, তার নিয়ত ভাল ছিল, সে দ্বীনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিল এবং সে সুন্নাহর অনুসরণকারী ছিল। অবশ্য তার মতামতকে গোমরাহী মতামত বলতে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাহ

প্রশ্নঃ- (৩৮) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত্তওয়াল জামাতের আকীদাহ কি? নাম ও গুণের মধ্যে পার্থক্য কি ? আল্লাহর প্রতিটি নাম কি একটি করে গুণকে আবশ্যক করে ? অনুরূপভাবে ছিফাতও কি নামকে আবশ্যক করে ?

উত্তরঃ- আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত্তওয়াল জামাতের আকীদাহ হল আল্লাহ তাআ'লা নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার, ধরণ বর্ণনা এবং উপমা পেশ করা ছাড়াই তার উপর বিশ্বাস করা। নাম ও গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, নাম হল আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেছেন, এবং গুণ হল আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আল্লাহর প্রতিটি নাম একটি করে গুণকে আবশ্যক করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়"। এখানে (গাফুর) আল্লাহর একটি নাম। অর্থঃ ক্ষমাশীল। এই নামটির মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা করার গুণ প্রমাণিত হয়। অনুরূপ ভাবে (রাহীম) নামটি রাহমত গুণটিকে আবশ্যক করে।

কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, তা থেকে নাম নির্বাচন করা আবশ্যক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কথা বলা আল্লাহর একটি গুণ। এ থেকে মুতাকাল্লিম (বক্তা) নাম বের করা বৈধ নয়। সুতরাং নামের তুলনায় গুণ অধিক প্রশস্ত। কারণ প্রতিটি নামই একটি করে সিফাতকে সাব্যস্ত করে। কিন্তু প্রতিটি ছিফাতের ক্ষেত্রে এমনটি নয়।

প্রশ্নঃ (৩১) আল্লাহর নাম কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত?

উত্তরঃ আল্লাহর নামগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়। সহীহ হাদীছে এর দলীল হল,

((اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.))

'হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার কপাল আপনার হাতে। আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আপনার ফায়সালাই ন্যায় সম্মত। আপনার প্রতিটি নামের উসীলা দিয়ে আপনার কাছে দু'আ করছি। যে নামের মাধ্যমে আপনি নিজের নাম কারণ করেছেন বা আপনার কোন সৃষ্টিকে (বান্দাকে) শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন অথবা যে নামগুলোকে আপনি নিজের জ্ঞান ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছেন।' [1]

আর এ কথা শতসিদ্ধ যে, আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারে যে সমস্ত নাম সংরক্ষিত রেখেছেন, তা একমাত্র আল্লহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যা অজ্ঞাত তা সীমিত হতে পারে না।

((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[2] হাদীছে এটা বুঝা যাচ্ছেনা যে, আল্লাহর নাম মাত্র নিরানব্বইটি। বরং হাদীছের অর্থ এই যে, আল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যা মুখস্ত করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এতে বুঝা যায় যে, এই নিরানব্বইটি ব্যতীত আল্লাহর আরো নাম রয়েছে। এখানে (مــن أحصــاها) বাক্যটি পূর্বের বাক্যের পরিপূরক। নতুন বাক্য নয়। যেমন আরবরা বলে থাকে আমার এমন একশটি ঘোড়া রয়েছে, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, তার কাছে ঘোড়ার সংখ্যা মাত্র একশটি। বরং তার কাছে এমন একশটি ঘোড়া আছে, যা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অন্য কাজের জন্য আরো ঘোড়া থাকতে পারে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এই মর্মে হাদীছ বিশারদগণের ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আল্লাহর নামসমূহের নির্দিষ্ট সংখ্যার বর্ণনা সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি। তিনি সত্যই বলেছেন। এর প্রমাণ উলামাদের এতে বিরাট ধরণের এখতেলাফ বিদ্যমান রয়েছে। কারণ যারা তিরমিযীতে

---

[1] - মুনাদে আহমাদ

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুশ শুরুত

৯৯টি নাম সম্বলিত হাদীছটিকে সহীহ্ বলার চেষ্টা করেছেন, তারা বলেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ তা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে বলা হয়েছে। সাহাবীগণ এ বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্ধারণ করতে বলবেন না-এটা হতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেই নির্ধারিত।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এটি আবশ্যক নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যদি নির্ধারিত হত, তাহলে পরিষ্কার ভাবে নামগুলো জানা থাকত এবং বুখারী-মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছের কিতাবে উল্লেখ থাকত। কারণ এটি এমন বিষয়, যা বর্ণনা এবং হেফাজত করার প্রয়োজন। সুতরাং কিভাবে তা সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত না হয়ে দূর্বল এবং পরস্পর বিরোধী সূত্রে বর্ণিত হতে পারে ? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামগুলো বিশেষ এক উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন নি। তাহলো মানুষ যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত্হতে খোঁজে বের করে। এতে করেই স ৎকাজের প্রতি কে প্রকৃত আগ্রহী এবং কে আগ্রহী নয়, তা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

আল্লাহর নামগুলো শুধু কাগজে লিখে মুখস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলঃ

১) ভালভাবে নামগুলো মুখস্থ করা।

২) নামগুলোর অর্থ অনুধাবন করা।

৩) নামগুলোর দাবী অনুযায়ী আল্লাহর এবাদত করা। আর তা দু'ভাবে হতে পারেঃ

(ক) আল্লাহর নাম সমূহের উসীলা দিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করা। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

"আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সেই নামগুলোর উসীলায় তাঁর কাছে দু'আ কর।" (সূরা আরাফঃ ১৮০) আপনি যা কামনা করেন তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি নাম নির্বাচন করে সেই নামটি উল্লেখ করে দু'আ করবেন। যেমন ক্ষমা চাওয়ার সময় আপনি বলবেনঃ (يا غفور اغفـــر لى) ইয়া গাফুর! ইগফিরলী। অর্থঃ হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষমা চাওয়ার সময় এটা বলা কখনই উপযোগী নয় যে, يا شديد العقاب اغفرلى হে কঠোর শাস্তি দাতা! আমাকে ক্ষমা করুন। এটা এক ধরণের ঠাট্টা করার শামিল। বরং বলতে হবে, হে কঠোর শাস্তি দাতা! আমাকে আপনার শাস্তি হতে রেহাই দিন।

২) আপনার এবাদতের মধ্যে এমন কিছু বিষয় থাকা চাই, যা আল্লাহর নামগুলোর দাবীকে আবশ্যক করে। রাহীম নামের দাবী হল রহমত করা। সুতরাং আপনি এমন আমল করবেন, যা আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার কারণ হয়। এটাই আল্লাহর নাম সমূহ মুখস্থ করার অর্থ। আল্লাহর নামসমূহের দাবীকে আবশ্যক করার মত আমলই জান্নাতে প্রবেশের মূল্য হতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপরে আছেন। এমর্মে একজন নারীর সাক্ষ্যঃ

প্রশ্নঃ (৩২) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে উপরে আছেন, সে ব্যাপারে সালাফদের মাযহাব কি ? যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছয়টি দিক থেকে মুক্ত এবং যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে আছেন, তার হুকুম কি ?

উত্তরঃ সালফদের মাযহাব এই যে, আল্লাহ স্বীয় সত্বায় মাখলুকাতের উপরে আছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাক, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (সূরা নিসাঃ ৫৯)

আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

"তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর নিকটে।" (সূরা শুরাঃ ১০)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। মূলতঃ তারাই সফলকাম। এবং যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কৃতকার্য।" (সূরা নূরঃ ৫১-৫২) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবে।" (সূরা আহযাবঃ ৩৬) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"অতএব তোমার পালকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেয়। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল করে নেবে।" (সূরা নিসাঃ ৬৫) সুতরাং জানা গেল যে, মতভেদের সময় ঈমানদারের পথ হল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফেরত যাওয়া এবং তাদের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা। সাথে সাথে আল্লাহ এবং রাসূলের কথার বাইরে অন্য কারও কথা গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের কাছে কোনরূপ স্বাধীনতা না রাখা। এ ছাড়া কেউ ঈমানদার হতে পারবে না। পরিপূর্ণরূপে নিজেকে কুরআন ও সুন্নাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে এবং অন্তর থেকে সংকীর্ণতা অবশ্যই দূর হতে হবে। এর বিপরীত করলে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"হেদায়েতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে কেউ রাসূলের বিরোধীতা করবে এবং ঈমানদারদের অনুসৃত পথেরবিরুদ্ধে চলবে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।" (সূরা নিসাঃ ১১৫)

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় সত্বায় মাখলুকের উপরে থাকার মাসআলাটি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফেরানোর পর তা নিয়ে গবেষণাকারী অবশ্যই জানতে পারবে যে, আল্লাহ তাআ'লা স্বসত্বায় সমস্ত মাখলুকাতের উপরে আছেন। বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নায় এই বিষয়টি অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১) সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশের উপরে আছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

"তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।" (সূরা মুলকঃ ১৭)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোগীকে ঝাড়ফুঁক করার হাদীছে বলেনঃ

((رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ))

"আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। যিনি আকাশে আছেন।"[1] তিনি আরো বলেন

[1] - আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا))

"ঐ সত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য ডাক দিলে স্ত্রী যদি বিছানায় যেতে অস্বীকার করে তাহলে যিনি আকাশে আছেন, স্বামী সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন।"[1]

২) আল্লাহ উপরে আছেন, এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

"তিনিই মহা প্রতাপশালী স্বীয় বান্দাদের উপরে আছেন।" (সূরা আনআ'মঃ ১৮) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾

"তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে। যিনি তাদের উপরে আছেন।" (সূরা নাহলঃ ৫০) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী,

((لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي))

"আল্লাহ তাআ'লা যখন সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে। কিতাবটি তাঁর নিকটে আরশের উপরে রয়েছে।"[2]

৩) আল্লাহর দিকে বিভিন্ন বিষয় উঠা এবং তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিষ অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। উপরের দিকে উঠা সব সময় নীচের দিক থেকেই হয়ে থাকে। এমনিভাবে অবতরণ করা সাধারণত উপরের দিক থেকে নীচের দিকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ উঠে থাকে এবং সৎ আমল তাকে উপরের দিকে তুলে নেয়।" (সূরা ফাতিরঃ ১০) আল্লাহ বলেনঃ

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

"ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তাআ'লার দিকে উর্ধ্বগামী হয়।" (সূরা মা'আরিজঃ ৪) আল্লাহ বলেনঃ

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু বাদইল খাল্ক (সৃষ্টির সূচনা)।

“তিনি আকাশে থেকেই যমিনে সকল কর্ম পরিচালনা করেন।” (সূরা সেজদাঃ ৫) আল্লাহর বাণী,

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

“এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।” (সূরা ফুচ্ছিলাতঃ ৪২) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾

“আর মুশরেকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।” (সূরা তাওবাঃ ৬) কুরআন) যেহেতু আল্লাহর কালাম এবং তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে তাই এর দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় সত্বায় উপরে রয়েছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

((يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ))

“আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লা প্রতিদিন রাত্রের একতৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন কে আছে আমার কাছে দু'আ করবে? আমি তার দু'আ কবূল করব। কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে প্রদান করবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত আছি।”[1] বারা বিন আযিব (রাঃ) এর হাদীছে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিছানায় শয়নকালে পাঠ করার দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। সেই দু'আর মধ্যে এটাও আছে,

(آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ)

“আমি আপনার অবতারিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এই দু'আ পাঠ করার পর যদি তুমি মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যু বরণ করবে।”[2]

৪) আল্লাহ তাআ'লা উপরে হওয়ার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করা। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত।

"আপনি আপনার সর্বোচ্চ ও সর্বমহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।" (সূরা আল-আলাঃ ১) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"সেগুলোকে (ভূমন্ডল ও নভমন্ডলকে) সংরক্ষণ করা তাঁকে পরিশ্রান্ত করেনা। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, (سبحان ربي الأعلى)

"আমি পবিত্রতা বর্ণনাকরছি আমার সুমহান প্রভুর ।"[1]

৪) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার মাঠে ভাষণ দেয়ার সময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, (ألا هــل بلغــت؟) আমি কি তোমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছি? উপস্থিত জনতা এক বাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (أللهم اشــهد) হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এ কথা বলতে বলতে তিনি উপরের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলেন এবং মানুষের দিকে তা নামাতে লাগলেন। এ হাদীছটি মুসলিম শরীফে যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছটিতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আকাশে। তা নাহলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরের দিকে হাত উঠিয়ে ইশারা করা অনর্থক বলে সাব্যস্ত হবে।

৬) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক দাসীকে প্রশ্ন করেছেন, আল্লাহ কোথায়? দাসী বলল, আকাশে। এ কথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَــا مُؤْمِنَــةٌ) অর্থঃ "তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ঈমানদার।"[2] হাদীছটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত মুআবীয়া বিন হাকাম আস্ সুলামী (রাঃ) এর দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় সত্বায় উপরে হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। কেননা (أيــن) শব্দটি দিয়ে কোন বস্তুর অবস্থান সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মহিলাটিকে আল্লাহ কোথায়-এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মহিলাটি বললঃ তিনি আকাশে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ কথাকে মেনে নিলেন এবং বললেনঃ এটাই ঈমানের পরিচয়। তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে ঈমানদার। সুতরাং যতক্ষণ কোন মানুষ আল্লাহ উপরে হওয়ার বিশ্বাস না করবে এবং এ কথার ঘোষণা না দিবে ততক্ষণ সে ঈমানদার হতে পারবে না।

---

[1] - আবু দাউদ, কিতাবুছ্ ছালাত।

[2] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ।

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় সত্বায় মাখলুকের উপরে হওয়ার ব্যাপারে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে উপরোক্ত দলীলগুলো উল্লেখ করা হল। এ ব্যাপারে আরো দলীল রয়েছে। যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত দলীলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সালাফে সালেহীন এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ স্বীয় সত্বায় মাখলুকের উপরে রয়েছেন। এমনিভাবে তারা আল্লাহর গুণাবলী সুউচ্চ হওয়ার উপরও একমত হয়েছেন।

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আকাশ ও যমিনে সর্বোচ্চ মর্যদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা রুমঃ ২৭)

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

"আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামসমূহ। কাজেই সেই নামসমূহ ধরেই (অসীলায়) তাঁকে ডাক।" (সূরা আ'রাফঃ ১৮০)

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবগত আছেন আর তোমরা অবগত নও।" (সূরা নাহলঃ ৭৪)

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করোনা।" (সূরা বাকারাঃ ২২) এমনিভাবে আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সত্বা, গুণাগুণ এবং কর্মসমূহ পরিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়।

অনুরূপভাবে কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীনের সর্ব সম্মত ঐকমত্য, সুস্থ বিবেক এবং ফিতরাতও[1] আল্লাহ উপরে হওয়ার কথা স্বীকার করে নেয়।

বিবেক এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, উচ্চে হওয়া একটি পরিপূর্ণ ও উত্তম গুণ। অপর পক্ষে উপরে হওয়ার বিপরীতে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ গুণ। আল্লাহর জন্য সকল পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট সাব্যস্ত। তাই আল্লাহর জন্য সুউচ্চে হওয়া বিবেক সম্মত। তাই উপরে হওয়াতে ত্রুটিপূর্ণ কোন গুণ সাব্যস্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আমরা বলব যে, উপরে হওয়া সৃষ্টিজীব দ্বারা বেষ্টিত হওয়াকে আবশ্যক করে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করবে, সে নিছক ধারণা করল এবং বিবেকভ্রষ্ট হিসাবে পরিগণিত হল।

মানুষের স্বভাব জাত ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহ মাখলুকের উপরে প্রমাণিত হয়। মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তখন অন্তরকে আকাশের দিকে ধাবিত করে। এই জন্যই মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে তখন ফিতরাতের দাবী অনুযায়ী আকাশের

[1] - আল্লাহ তাআ'লা সকল মানুষকে যে সৃষ্টিগত স্বভাব এবং দ্বীন ইসলাম কবুল করার যে যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাকে ফিতরাত বলা হয়।

দিকে হাত উত্তোলন করে। একদা হামদানী নামক জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীকে বলল, আপনি তো আল্লাহ উপরে হওয়াকে অস্বীকার করেন। আপনি আমাকে বলুন, আল্লাহ যদি উপরে না থাকেন, তা হলে আল্লাহ ভক্ত কোন মানুষ যখনই আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তখন তার অন্তরকে উপরের দিকে ফেরানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন? এ কথা শুনে জুওয়াইনী মাথায় হাত মারতে মারতে বলতে থাকল হামদানী আমাকে দিশেহারা করে দিয়েছে! আমাকে হামদানী দিশেহারা করে দিয়েছে!

ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার সূত্র সঠিক হোক কিংবা ভুল হোক, তাতে কিছু আসে যায়না। প্রতিটি ব্যক্তির অনুভূতিও হামদানীর মতই। দু'আ করার সময় সবাই উপরের দিকে অন্তর ও হাত উঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলোমেলো কেশ ও ধুলামলিন পোষাকনিয়ে অন্ত্যত্য ব্যকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে থাকে হে আমার প্রতিপালক! হে রব!! অথচ সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোষাক পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় কি করে তার দু'আ কবূল হতে পারে ?[1] এমনিভাবে নামাযে বান্দা তার অন্তরকে আকাশের দিকে ফেরায়। বিশেষ করে সে যখন সেজদায় যায় তখন বলে, (سبحان ربي الأعلى) অর্থঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার সুউচ্চ প্রভুর। যেহেতু সে জানে যে তার মা'বূদ আকাশে তাই সে এভাবে বলে থাকে।

যারা আল্লাহ আরশের উপরে হওয়াকে অস্বীকার করে তারা বলে থাকে যে, আল্লাহ তাআ'লা ছয়টি দিক থেকে মুক্ত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করেন না; বরং তিনি সর্বদিকে সর্বত্র সদা বিরাজিত। আমরা বলব এ কথাটি একটি বাতিল কথা। কেননা এটা এমন কথা যা আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্তকৃত বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর। আর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জন্য যে সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, তাও বাতিল করার আহবান জানায়। তা এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা উপরের দিকে রয়েছেন। আল্লাহ উপরে আছেন এ কথা অস্বীকার করা হলে আল্লাহকে অস্তিত্বহীন বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়ে যায়। কেননা দিক হল ছয়টি। উপর, নীচ, ডান, বাম, পশ্চাৎ এবং সম্মুখ। অস্তিত্ব সম্পন্ন যে কোন বস্তুকে এই ছয়টি জিনিষের সাথে সম্পর্কিত রাখতে হবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিবেক সম্মত ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তাআ'লার ক্ষেত্রে যদি ছয়টি দিককে

[1] - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্ দাওয়াত।

সমানভাবে অস্বীকার করা হয়, তা হলে আল্লাহ নাই এ কথাই আবশ্যক হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) কোন মানুষের সুস্থ মস্তিস্ক এই ছয়টি দিকের বাইরে কোন জিনিষের অস্তিত্বকে সম্ভব মনে করতে পারে কি ? কেননা বাস্তবে আমরা এ ধরণের কোন জিনিষের অস্তিত্ব খোঁজে পাইনি। আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ উপরে। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত্ সালাফে সালেহীনের ইজমা', সুস্থ বিবেক এবং ফিতরাতও তা সমর্থন করে। যেমন আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআ'লা সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন, কিন্তু আল্লাহকে কোন বস্তুই পরিবেষ্টন করতে পারে না। কোন মু'মিনের জন্যই এটা বৈধ নয় যে, সে মানুষের কথাকে গ্রহণ করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করবে। সে মানুষটি যত বড়ই হোক না কেন। আমরা ইতি পূর্বে দলীলগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

যারা বলে যে, আল্লাহ মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে আছেন, তাদের কথার পক্ষে আমাদের জানামতে কুরআন, সুন্নাহ কিংবা সালাফে সালেহীনের কোন উক্তি পাওয়া যায় না। কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহ বান্দার অন্তরে অবতীর্ণ হয়ে আছেন, তাহলে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোওয়াট । আল্লাহ তাআ'লা এ থেকে অনেক পবিত্র। বড় আশ্চর্যের কথা এই যে, কিভাবে একজন মানুষ কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য মতে আল্লাহ তাআ'লা আকাশে হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ তাআ'লা মু'মিনের অন্তরে থাকেন একথা মেনে নিতে পারে ?! অথচ এর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর একটি দলীলও মিলে না।

আল্লাহ মু'মিন বান্দার অন্তরে আছেন- এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, মু'মিন ব্যক্তি সদা-সর্বদা অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে এ কথা সত্য। তবে বাক্যটি পরিবর্তন করা দরকার, যাতে বাতিল অর্থের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। এভাবে বলা উচিৎ যে, মু'মিন বান্দার অন্তরে সবসময় আল্লাহর যিক্র বিদ্যমান রয়েছে। তবে যারা এ কথা বলে তাদের কথা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ আকাশে আছেন একথাকে অস্বীকার করা এবং মু'মিনের অন্তরে আল্লাহর অবস্থানকে সাব্যস্ত করা। অথচ এটা বাতিল।

সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফে সালেহীনের ইজমা' বাদ দিয়ে এমন বাক্য ব্যবহার থেকে সাবধান থাকা উচিৎ, যা সত্য-মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। মুমিনদের উচিৎ প্রথম যুগের আনসার-মুহাজির সাহাবীদের পথ অনুসরণ করা। তবেই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান সফলতা।” (সূরা তাওবাঃ ১০০)

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর রহমত দান করুন। তিনিই মহান দাতা।

আল্লাহ তাআ'লা সুউচ্চ আরশের উপরে আছেন

প্রশ্নঃ- (৩৩) আল্লাহ তাআ'লার শানে যেভাবে প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই আরশের উপরে আছেন- এটাই কি সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যা?

উত্তরঃ- আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী যেভাবে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া শোভাপায়, তিনি সেভাবেই আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মুফাস্‌সিরগণের ইমাম আল্লামা ইবনে জারীর বলেন, ইসতিওয়া অর্থ হল সমুন্নত হওয়া, উপরে হওয়া। আল্লাহর বাণী,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, “আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত।” এই অর্থ ব্যতীত সালাফে সালেহীন হতে অন্য কোন অর্থ বর্ণিত হয়নি। তদুপরি ইসতিওয়া শব্দটি ভাষাগত দিক থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

১) অন্য কোন শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে এককভাবে ব্যবহার হলে অর্থ হবে, পরিপূর্ণ হওয়া। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾

“যখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন এবং পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন।” (সূরা ক্বাছাছঃ ১৪)

২) ইসতিওয়া শব্দটি আরবী অক্ষর (واو) এর সাথে ব্যবহার হলে অর্থ হবে সমান সমান হওয়া, একটি জিনিষ অন্যটির বরাবর হওয়া। যেমন বলা হয় (استوى الماء والعتبة) পানি কাষ্ঠের সমান হয়ে গেছে।

৩) আরবী অব্যয় (إلى) এর সাথে মিলিত হয়ে আসলে অর্থ হবে, ইচ্ছা করা, মনোনিবেশ করা। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾

“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন।” (সূরা বাকারাঃ ২৯)

৪) আরবী অব্যয় (على) এর সাথে মিলিত হয়ে আসলে অর্থ হবে, সমুন্নত হওয়া, উপরে হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"আল্লাহ্ আরশের উপরে সমুন্নত।"

আবার কোন কোন সালাফ বলেন ইসতিওয়া শব্দটি إلى এবং على এর মধ্যে থেকে যে কোন একটির সাথেই মিলিত হয়ে আসুক না কেন, অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। একটি অন্যটির অর্থে ব্যবহার হয়। তাই উভয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত।

'আল্লাহ্ আরশের উপরে সমুন্নত' এ কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ- (৩৪) সম্মানিত শায়খ! আল্লাহ্ আপনাকে হেফাযত করুন! আপনি বলেছেন, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া বিশেষ এক ধরণের সমুন্নত হওয়া, যা কেবলমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে প্রযোজ্য। আমরা কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তরঃ- আমরা বলি যে, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি বিশেষ ধরণের সমুন্নত হওয়া। যা আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের উপরে হওয়ার সাথে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এই জন্যই এ রকম বলা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ মাখলুকাতের উপর সমুন্নত হলেন অথবা আকাশের উপরে কিংবা জমিনের উপরে। অথচ তিনি সকল বস্তুর উপরে। অন্যান্য মাখলুকাতের ক্ষেত্রে আমরা বলি আল্লাহ তাআ'লা আকাশ-যমিনসহ সকল মাখলুকের উপরে আছেন। আর আরশের ক্ষেত্রে বলব যে, আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত (مستوي)। সুতরাং ইসতিওয়া (সমুন্নত হওয়া) গুণটি সাধারণভাবে উপরে হওয়া থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এই জন্যই আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া গুণটি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত এবং তা আল্লাহর কর্মগত গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। আর মাখলুকের উপরে হওয়া আল্লাহর সত্বার সাথে সম্পর্কিত গুণ, যা আল্লাহর সত্বা হতে কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া দুনিয়ার আকাশে আল্লাহর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীছে এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছয়দিনে আকাশ-যমিন সৃষ্টি করার পর আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। তার পূর্বে তিনি আরশের উপরে ছিলেন না। ইসতিওয়া অর্থ বিশেষ এক ধরণের উপরে হওয়া। তাই কোন বস্তু অন্য বস্তুর উপরে সমুন্নত হওয়ার অর্থ বস্তুটি তার উপরে আছে। কিন্তু উপরে থাকলেই সমুন্নত হওয়া জরুরী নয়। এই জন্যই প্রতিটি উপরের বস্তুকে সমুন্নত বলা যায়না। তার বিপরীতে প্রতিটি সমুন্নত বস্তুই অপর বস্তুর উপরে বিরাজমান।

আমাদের কথা, আল্লাহর শানে যে ধরণের সমুন্নত হওয়া প্রযোজ্য তিনি সে রকম ভাবেই আরশে আযীমে সমুন্নত- এর অর্থ এই যে, আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া আল্লাহর অন্যান্য সিফাতের মতই। আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহর ক্ষমতা ও বড়ত্ব

অনুযায়ী তাঁর সাথে প্রতিষ্ঠিত। আরশের উপরে তাঁর সমুন্নত অন্য কোন মাখলুকাতের সমুন্নত হওয়ার মত নয়। আল্লাহর সত্বা যেহেতু অন্য কোন সত্বার মত নয়, তাই তাঁর সিফাতও অন্য কোন সিফাতের মত নয়। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই। তিনি সব কিছু দেখেন এবং শুনেন।" (সূরা শুরাঃ ১১) আল্লাহর সত্বার মত কোন সত্বা নেই এবং আল্লাহর গুণাবলীর মত কোন গুণাবলীও নেই। একজন বিদ্আতী লোক ইমাম মালেক (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ্ আরশের উপরে কি অবস্থায় সমুন্নত আছেন? উত্তরে মহামান্য ইমাম বললেন, 'আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপরে ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদ্আত।' পরবর্তী বিদ্যানগণ সকল সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (রঃ) এর এ উক্তিটিকে একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কখন ইন্শাআল্লাহ বলতে হবে?

প্রশ্ন (৩৫) কোন ক্ষেত্রে ইন্শাআল্লাহ বলতে হবে? এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বলতে হবে না?

উত্তরঃ- ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্শাআল্লাহ বলা উত্তম। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

"কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলোনা, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এভাবে বলবে যে, যদি আল্লাহ চান।" (সূরা কাহাফঃ ২৩-২৪) অতীত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলার দরকার নেই। যেমন কোন লোক যদি বলে গত রবিবারে রামাযান মাস এসেছে ইনশাআল্লাহ। এখানে ইনশাআল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তা অতীত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ইনশাআল্লাহ আমি কাপড় পরিধান করেছি। এখানেও ইনশাআল্লাহ বলার দরকার নেই। কারণ কাপড় পরিধান করা শেষ হয়ে গেছে। নামায আদায় করার পর ইনশাআল্লাহ নামায পড়েছি বলার দরকার নেই। কিন্তু যদি বলে ইনশাআল্লাহ মাকবূল নামায পড়েছি তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কারণ নামায কবূল হল কি না তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।

প্রশ্নঃ- (৩৬) ইরাদাহ্ বা আল্লাহর ইচ্ছা কত প্রকার ?

উত্তরঃ- ইরাদাহ (ইচ্ছা) দু'প্রকার

১) ইরাদাহ কাওনীয়া (সৃষ্টি গত ইচ্ছা)
২) ইরাদা শারঈয়া (শরীয়ত গত ইচ্ছা)

আল্লাহর যে ইচ্ছা সৃষ্টি করার সাথে সম্পৃক্ত তাই ইরাদাহ কাওনীয়া। আর যে ইচ্ছা ভালবাসার সাথে সম্পৃক্ত তাকে ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা কোন

জিনিষকে ভালবেসে যে ইচ্ছা পোষাণ করেন তাকে ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। ইরাদাহ শরঈয়ার উদাহরণ হল, আল্লাহর বাণী

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন।" (সূরা নিসাঃ ২৭) এখানে ইচ্ছা করেন অর্থ ভালবাসেন। এখানে সৃষ্টিগত ইচ্ছা অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং ব্যবহৃত হয়েছে শরীয়তগত ইচ্ছায়। যদি সৃষ্টিগত অর্থে হত তাহলে সকল মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু তা তো করেন নি। কেননা অধিকাংশ বনী আদমই কাফির। সুতরাং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন অর্থ আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করা পছন্দ করেন। আল্লাহ কোন জিনিষকে ভালবাসার অর্থ এই নয় যে, তা অবশ্যই কার্যকরী হবে। তা কার্যকরী না হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য রয়েছে।

ইরাদাহ কাওনীয়া তথা সৃষ্টির সাথে সংলিষ্ট ইচ্ছার দৃষ্টান্ত হল,

﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾

"যদি আল্লাহই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন।" (সূরা হুদঃ ৩৪) এখানে যে ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে, তাতে আল্লাহর ভালবাসা থাকা জরুরী নয়।

যদি বলা হয় কার্যকরী হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে ইরাদাহ কাওনীয়া এবং ইরাদাহ শরঈয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ? উত্তরে আমরা বলব যে, ইরাদাহ কাওনীয়াতে উদ্দিষ্ট বস্তু অবশ্যই কার্যকরী হবে। আল্লাহ কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চাইলে তা অবশ্যই করবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾

"আল্লাহর আদেশ তো এমনই যে, তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি বলেন, হয়ে যাও। আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়।" (সূরা ইউনুছঃ ৮২) আর ইরাদা শরঈয়া বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা কার্যকরী হয় আবার কখনো কার্যকরী হয়না। অথচ আল্লাহ তাআ'লা শরীয়তগতভাবে জিনিষটি বাস্তবায়িত হওয়াকে পছন্দ করেন।

যদি কোন লোক জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ কি পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন ? উত্তর হল সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে পাপ কাজও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেন না এবং ভালবাসেন না। তবে আকাশ-যমিনে যা কিছু হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।

প্রশ্নঃ-(৩৭) আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে ইলহাদ (إلحاد) কাকে বলে ? উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ-ইলহাদের আভিধানিক অর্থ বাঁকা হয়ে যাওয়া বা এক দিকে ঝুকে পড়া। আল্লাহর বাণী,

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾

"যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়।" (সূরা নাহলঃ ১০৩) লাহাদ কবর যেহেতু এক পাশ দিয়ে বাঁকা করে ভিতরের দিকে প্রবেশ করানো থাকে, তাই তাকে লাহাদ বলা হয়। সঠিক বিষয় জানা না থাকলে ইলহাদ জানা সম্ভব নয়। আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক কথা হল এগুলোকে আমরা আহলে সুন্নাতদের মূলনীতি অনুযায়ী কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিকৃতি, বাতিল এবং উপমা-দৃষ্টান্ত বর্ণনা ছাড়াই আল্লাহর শানে প্রযোজ্য অর্থে ব্যবহার করব। সুতরাং আমরা যখন সঠিক পথ জানতে পারলাম, তখন তার বিপরীত পথে যাওয়ার নামই ইলহাদ বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন। আলেমগণ ইলহাদকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

১) আল্লাহর কোন নাম বা কোন গুণকে সরাসরি অস্বীকার করা ঃ যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা আল্লাহর 'রাহমান' নামটি অস্বীকার করত। কিংবা নামটির প্রতি ঈমান আনয়ন করল কিন্তু নামটি যে গুণের প্রতি প্রমাণ বহণ করে, তা অস্বীকার করল। যেমন কোন কোন বিদ্‌আতী বলে থাকে, আল্লাহ দয়াবিহীন দয়ালু, শ্রবণশক্তিহীন শ্রবণকারী।

২) আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেন নি, সে নামে তাঁকে নামকরণ করাঃ এভাবে নাম রাখা ইলহাদ হওয়ার কারণ হল আল্লাহর নাম সমূহ কুরআন এবং হাদীসে যেভাবে এসেছে সেভাবেই মানতে হবে। কারও পক্ষে জায়েয নেই যে, নিজ থেকে আল্লাহর নাম রাখবে। কারণ এটি আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা বশতঃ কথা বলার শামিল। যেমন খৃষ্টানেরা আল্লাহকে পিতা বলে এবং দার্শনিকরা ক্রিয়াশীল কারণ বলে থাকে।[1]

৩) আল্লাহর নামসমূহকে সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর প্রতি নির্দেশ দানকারী মনে করে উপমা স্বরূপ বিশ্বাস করাও ইলহাদের অন্তর্ভূক্ত। ইলহাদ হওয়ার কারণ হল, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী মানুষের নামের মতই, সে তাকে তার আপন অর্থ হতে সরিয়ে ফেলল এবং সঠিক অর্থ বর্জন করে অন্য অর্থ গ্রহণ করল। এ রকম করা কুফরী। আল্লাহ বলেনঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর অনুরূপ আর কেউ নেই। তিনি সব কিছু জানেন এবং শুনেন।" (সূরা শুরাঃ ১১) আল্লাহ আরো বলেন,

[1]. অনেকে যেমন আল্লাহকে 'খোদা' বলে থাকে, এটাও মারাত্মক একটি ভুল। কেননা এটাও ইলহাদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

"তাঁর সমকক্ষ কেউ আছে কি?" (সূরা মারইয়ামঃ ৬৫) ইমাম বুখারীর (রঃ) উস্তাদ নাঈম ইবনে হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করল, সে কুফরী করল। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন গুণকে অস্বীকার করল, সেও কুফরী করল। আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাতে মাখলুকের সাথে কোন তুলনা নেই।

৪) আল্লাহর নাম থেকে মূর্তির নাম বের করাঃ যেমন ইলাহ্ থেকে লাত নাম বের করা, আজীজ থেকে উজ্জা এবং মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি। এখানে ইলহাদ হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহর নামগুলো শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোন মাখলুককে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবাদতের অংশ প্রদান করার উদ্দেশ্যে এগুলোর অর্থ স্থানান্তর করা জায়েয নেই।

আল্লাহর 'চেহারা', আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি সম্পর্কে

প্রশ্নঃ (৩৮) আল্লাহর 'চেহারা', আল্লাহর 'হাত' এজাতীয় যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন তা কত প্রকার ?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধ করেছেন তা তিন প্রকার। যথাঃ (১) স্বয়ং সম্পূর্ণ কোন বস্তুকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা। এটি হল সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার দিকে সম্পৃক্ত করার শ্রেণীভুক্ত। এটি কখনো সাধারণ ভঙ্গিতে হয় যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾

"আমার যমিন অতি প্রশস্ত।" (সূরা আনকাবূতঃ ৫৬) কখনো কোন জিনিষের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন বলা হয়, (بيت الله) আল্লাহর ঘর, (ناقة الله) আল্লাহর উটনী ইত্যাদি। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

"এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজদা করে।" (সূরা হাজ্জ- ২৬) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾

"আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও।" (সূরা শামস- ১৩)

(২) অন্যের উপর নির্ভরশীল কোন বস্তুকে আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা। সাধারণত সম্মানের জন্যই তাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। আল্লাহ ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারে বলেনঃ

﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾

"তিনি আল্লাহর রূহ।" (সূরা নিসাঃ ১৭১) এখানে ঈসা (আঃ) এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁকে আল্লাহ র দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর রূহ এর অর্থ হল, আল্লাহ যে সমস্ত রূহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রূহও সে সমস্ত রূহের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু এ রূহ অন্যান্য রূহের

তুলনায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। এ নয় যে, আল্লাহর রূহ ঈসা (আঃ) এর রূহের ভিতরে প্রবেশ করে আছে।

৩) আল্লাহর সিফাতকে আল্লাহ র দিকে সম্পৃক্ত করাঃ কুরআনে ব্যাপকভাবে এ ভঙ্গিতে আল্লাহর সিফাতের বিবরণ এসেছে। আল্লাহর কোন সিফাতই তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমনঃ وجه الله আল্লাহর চেহারা, يد الله আল্লাহর হাত, قدرة الله আল্লাহর শক্তি বা ক্ষমতা, عزة الله আল্লাহর ইয্যত বা সম্মান।

প্রশ্নঃ (৩৯) আল্লাহর কোন নাম বা গুণ অস্বীকার করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ আল্লাহর নাম ও গুণ অস্বীকার করা দু'ধরণের হতে পারেঃ

(১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে অস্বীকার করা। এটা নিসন্দেহে কুফরী। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর কোন নামকে অস্বীকার করে অথবা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত আল্লাহর কোন গুণকে অস্বীকার করে, যেমন বলল, আল্লাহর কোন হাত নাই, এধরণের কথা মুসলমানের ঐকমত্যে সম্পূর্ণ কুফরী। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কুফরী এবং তা ইসলাম থেকে মানুষকে বের করে দেয়।

(২) ব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্বীকার করা। তা হল সরাসরি অস্বীকার না করে ব্যাখ্যা করে অস্বীকার করা। এটি আবার দু'প্রকার।

(ক) ব্যাখ্যাটি আরবী ভাষা অনুপাতে হওয়া। এটি কুফরী নয়।

(খ) আরবী ভাষাতে ব্যাখ্যাটির পক্ষে কোন প্রকার না থাকা। এটি কুফরীকে আবশ্যক করে। ব্যাখ্যার কোন সুযোগ না থাকলে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ বলল, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোন 'হাত' নেই। এমনকি 'নিয়ামত' কিংবা 'শক্তি' অর্থেও নেই। এ রকম বিশ্বাস পোষণকারী কাফের। কেননা সে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করল। আর যদি আল্লাহর বাণী, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ "বরং তাঁর দু'হাত প্রসারিত।" (সূরা মায়িদাঃ ৬৪) এর ব্যাখ্যায় কেউ বলে এখানে আল্লাহর দু'হাত দ্বারা আকাশ-যমিন উদ্দেশ্য, সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। কারণ আরবী ভাষাতে এ ধরণের ব্যাখ্যা ঠিক নয় এবং শরঈ বাস্তবতারও পরিপন্থী। কিন্তু হাতকে যদি নেয়ামতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে কিংবা শক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, তাহলে কাফের হবে না। কারণ 'হাত' কখনো কখনো 'নেয়ামত' অর্থে ব্যবহার হয়। কিন্তু হাতের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করলে অবশ্যই বিদআতীদের দলভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ- (৪০) আল্লাহর গুণাবলী কি মানুষের গুণাবলীর মতই?

উত্তরঃ– যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর মতই সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কেননা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾

"তাঁর অনুরূপ আর কেউ নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরাঃ ১১) দু'টি জিনিষের নাম ও গুণ এক হলেই জিনিষ দু'টি সকল দিক থেকে এক হওয়া জরুরী নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। মানুষের মুখমন্ডল আছে। উটেরও মুখমন্ডল আছে। মুখ দু'টি কি একই রকম? কখনই নয়। অনুরূপভাবে উটের হাত আছে পিপিলিকারও হাত আছে। হাত দু'টি কি সমান? তাহলে কেন আমরা বলব না যে, আল্লাহর চেহারা আছে। তা মাখলুকাতের চেহারার অনুরূপ নয়। আল্লাহর হাত আছে। কিন্তু তা মানুষের হাতের মত নয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾

"তারা যথার্থভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ও সম্মান বুঝতে পারেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে।" (সূরা যমারঃ ৬৭) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।" (সূরা আম্বিয়াঃ ১০৪) কোন মাখলুকের কি এধরণের হাত রয়েছে? কখনই নয়। সুতরাং আমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সৃষ্টিজীবের মত নন। না সত্বায় না গুণাবলীতে। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ অর্থঃ "তাঁর মত আর কেউ নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরাঃ-১১) এই জন্যই আল্লাহর কোন সিফাতের ধরণ গঠন বা প্রকৃতি অনুসন্ধান করা ঠিক নয়। কিংবা এরকম ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহর গুণসমূহ মানুষের গুণাবলীর মতই।

'শেষ রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন' এ কথার ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ (৪) আমরা জানি যে, রাত ভূপৃষ্ঠের উপরে ঘুর্ণায়মান। আর আল্লাহ রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। এ হিসাবে আল্লাহ তাআ'লা রাতভর দুনিয়ার আকাশেই থাকেন। এর উত্তর কি?

উত্তরঃ আল্লাহ কুরআন মজীদে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং যে সমস্ত নামে নিজেকে নামকরণ করেছেন তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের উপর ওয়াজিব। এমনি ভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন অস্বীকৃতি, পরিচয়ের জন্য ধরণ নির্ধারণ করা বা উপমা পেশ করা ব্যতীত তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। পরিবর্তন সাধারণতঃ হয়ে থাকে আয়াত ও হাদীছ সমূহে। আর অস্বীকার হয়ে থাকে আকীদার ভিতরে। ধরণ, পদ্ধতি ও উপমা বর্ণনা করা হয় সিফাত তথা গুণের ভিতরে।

সুতরাং উপরোক্ত চারটি দোষ হতে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিষ্কার করতে হবে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কেন, কেমন? এ ধরণের প্রশ্ন করা যাবে না। এমনিভাবে আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ধরণ বর্ণনার চিন্তা করা থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনেক বিষয় সহজ হয়ে যাবে। এটাই ছিল সালাফে সালেহীনের আদর্শ। ইমাম মালেকের (রঃ) কাছে এক লোক এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ তো আরশের উপরে আছেন, তবে কিভাবে? উত্তরে ইমাম মালেক (রঃ) বললেন, আরশের উপরে থাকার বিষয়টি জ্ঞাত আছে। কিভাবে আছেন তা আমাদের জানার বাইরে। এ বিষয়ে ঈমান রাখা ওয়াজিব। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ্‌আত। আমার মনে হচ্ছে তুমি একজন বিদ্‌আতী লোক।

যে ব্যক্তি বলে যেহেতু রাত সারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে আর আল্লাহ তাআ'লা রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, তাই আল্লাহ সারা রাতই এ আকাশে থাকেন। কারণ শেষ তৃতীয়াংশ তো এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রতিনিয়ত স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

উত্তরে আমরা বলব যে, এই প্রশ্নটি কোন ছাহাবী করেন নি। যদি প্রশ্নটি কোন মুসলিমের অন্তরে হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। আমরা বলব পৃথিবীর কোন অংশে যতক্ষণ রাতের এক তৃতীয়াংশ থাকবে, ততক্ষণ সেখানে আল্লাহর অবতরণের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়িত হবে। রাত শেষ হয়ে গেলে তা শেষ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর অবতরণের ধরণ আমরা জানিনা। তার সঠিক জ্ঞানও আমাদের কাছে নেই। আর আমরা জানি আল্লাহর মত আর কেউ নেই। আমাদের উচিৎ হবে আল্লাহর কিতাবের সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং এ কথা বলা যে, আমরা শুনলাম এবং ঈমান আনয়ন করলাম ও অনুসরণ করলাম। এটাই আমাদের করণীয়।*

আল্লাহকে দেখার মাসআলায় সালাফে সালেহীনের অভিমত।

প্রশ্নঃ (৪২) আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের অভিমত কি? যারা বলে যে, চক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় বরং আল্লাহকে দেখার অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানের নামান্তর, তাদের হুকুম কি?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে কিয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

*. এরপরও বলব, আল্লাহ তো সেই পাক যাতের নাম যার নিকট সকল প্রকারের অসম্ভব সম্ভব। মানুষের সীমিত ও ক্রুটিপূর্ণ জ্ঞান ও বিবেকে যা ধরে না অতি সহজেই তিনি তা করতে পারেন। সময়ের তারতম্য থাকা সত্বেও একই সাথে তিনি সকল ভূপৃষ্ঠের বরাবর আসমানে থাকতে পারেন। সমস্ত সৃষ্টিই তার সামনে বিরাজমান।

"সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে দর্শনকারী।" (সূরা কিয়ামাহঃ ২২-২৩) আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় যে, কিয়ামত দিবসে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহকে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যাবে। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর সমগ্র সত্বাকে দর্শন করা সম্ভব হবে।

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

"তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে না।" (সূরা ত্বোহাঃ ১১০) জ্ঞানের মাধ্যমে কোন জিনিষকে আয়ত্ব করার বিষয়টি চোখের মাধ্যমে দেখে আয়ত্ব করার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। যখন জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয় তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে যে চর্মচক্ষু দ্বারা পরিপূর্ণভাবে দর্শন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন।" (সূরা আনআ'মঃ ১০৩) প্রকৃত পক্ষেই মানুষ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবে। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাআ'লা এর অনেক উর্দ্ধে। এটাই সালাফে সালেহীনের মাযহাব। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকা বেহেশ্‌তবাসীর জন্য হবে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এই জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আয় বলতেনঃ (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِـــكَ) উচ্চারণঃ- আস্‌-আলুকা লায্‌যাতান্‌ নাযরি ইলা ওয়াজ্‌হিকা।[1] অর্থঃ "হে আল্লাহ আমি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার পরিতৃপ্তি প্রার্থনা করছি।" আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর স্বাদ খুবই বিরাট। যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করেছে, সেই কেবলমাত্র তা অনুভব করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর দিদার লাভে ধন্য করেন।

যারা ধারণা করে যে, আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়; বরং আল্লাহকে দেখার অর্থ পরিপূর্ণভাবে অন্তর দিয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করার নামান্তর, তাদের কথা বাতিল এবং দলীল বিরোধী। প্রকৃত অবস্থা এই ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কারণ অন্তরের পরিপূর্ণ বিশ্বাস দুনিয়াতেই বর্তমান রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহসানের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

(أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)

[1] - নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সাহু।

"ইহসান হল তুমি এমন ভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"[1] তুমি এমন ঈমান নিয়ে আল্লাহর এবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। এটিই পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়। যে সমস্ত আয়াত ও হাদীছে আল্লাহকে দেখার কথা আছে, সেগুলোকে অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল এবং কুরআনের আয়াতকে তার আসল অর্থ হতে পরিবর্তন করার শামিল। যে ব্যক্তি এ ধরণের ব্যাখ্যা করবে তার প্রতিবাদ করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ (৪৩) জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তরঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জিনেরা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কষ্ট দিতে পারে। কখনো জিনেরা মানুষকে মেরে ফেলে। কখনো বা পাথর নিক্ষেপ করে এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়। জিনদের এ সকল কর্ম হাদীছ এবং বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন জনৈক ছাহাবীকে তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কারণ তিনি নতুন বিবাহিত যুবক ছিলেন। ঘরে ফিরে যুবক দেখলেন, স্ত্রী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ দেখে তিনি তার প্রতি মনক্ষুন্ন হলেন। স্ত্রী বললেন, ঘরে প্রবেশ করুন। ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন বিছানার উপরে একটি সাপ ব্যাড় দিয়ে বসে রয়েছে। হাতেই ছিল বর্শা। বর্শা দিয়ে সাপকে আঘাত করার সাথে সাথে সাপটি মারা গেল এবং উক্ত ছাহাবীও মৃত্যু বরণ করলেন। সাপ এবং ছাহাবীর মধ্যে কে আগে মারা গেল, তা জানা যায়নি। এই সংবাদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছার পর তিনি ঘরের মধ্যে বসবাসকারী সাপগুলো মারতে নিষেধ করলেন। তবে পিঠের উপরে রেখা বিশিষ্ট এবং লেজহীন ছোট ছোট সাপগুলো ব্যতীত।[2] এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, জিনেরা মানুষের উপরে আক্রমণ করে এবং কষ্ট দেয়। মুতাওয়াতের এবং মাশহুর সনদে বর্ণিত হাদীছে আছে যে, মানুষ কখনো কখনো পুরাতন এবং ধ্বংস প্রাপ্ত বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করলে পাথর নিক্ষিপ্ত হয়। অথচ সেখানে কোন মানুষ দেখতে পায়না। কখনো কখনো আওয়াজ এবং গাছের পাতার নাড়াচাড়া শুনতে পায়। এতে মানুষ ভয় পায়। এমনিভাবে আসক্ত হয়ে কিংবা কষ্ট দেয়ার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে জিন মানুষের শরীরেও প্রবেশ করে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ﴾

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ বাদউল খাল্ক

“যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান (জিন) আছর করে ভারসাম্যহীন পাগলের মত করে দেয়।” (সূরা বাকারাঃ ২৭৫) কখনো জিনেরা মানুষের শরীরে মিশে গিয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বলে। জিনে ধরা রোগীর কাছে কবিরাজ যখন কুরআনের আয়াত পাঠ করে, তখন জিন তার সাথে কথা বলে। কবিরাজ জিনের কাছ থেকে পুনরায় না আসার অঙ্গীকার গ্রহণ করে। এ ধরণের আরো কথা হাদীছে বর্ণিত আছে এবং জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য হাদীসে বর্ণিত দু’আগুলো পাঠ করতে হবে। তার মধ্যে আয়াতুল কুরসী অন্যতম। কোন লোক রাত্রিতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে একজন হেফাজতকারী থাকে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটেও আসতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৪৪) জিনেরা কি গায়েব জানে?

উত্তরঃ জিনেরা গায়েব জানে না। আল্লাহ ব্যতীত আকাশ-যমিনের কোন মাখলুকই গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾

“যখন আমি তাঁর (সোলায়মানের) মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাইজি নদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্চনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।” (সূরা সাবাঃ ১৪) সুতরাং যে ব্যক্তি ইলমে গায়েবে জানার দাবী করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কাউকে ইলমে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করবে, সেও কাফের। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

“বলুন আসমান-যমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।” (সূরা নামলঃ ৬৫) যারা ভবিষ্যতের সংবাদ জানে বলে দাবী করে, তাদেরকে গণক বলা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)

“যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না।”[1] গণকের কথা বিশ্বাস করলে কাফেরে পরিণত হবে। কারণ

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সালাম।

গণকের কথা বিশ্বাসের মাধ্যমে সে আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"আসমান-যমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।" (সূরা নামলঃ ৬৫)

প্রশ্নঃ- (৪৫) যারা আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর হাবীব) বলে তাদের হুকুম কি ?

উত্তরঃ– নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বন্ধু। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহকে তিনি খুব ভাল বাসতেন আল্লাহও তাকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম শব্দ দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা যায়। তা হল খালীলুল্লাহ বা আল্লাহর নিকটতম বন্ধু। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বন্ধু। তিনি বলেন,

(انَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا)

"আল্লাহ তাআ'লা আমাকে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমনভাবে আল্লাহ তাআ'লা ইবরাহীম (আঃ) কে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন।"[1] যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাবীবুল্লাহ গুণে গুণান্বিত করল, সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদা কমিয়ে দিল। হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর মর্যাদা বেশী। প্রতিটি মুমিনই আল্লাহর হাবীব। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদা এর চেয়ে বেশী। আল্লাহ তাআ'লা ইবরাহীম (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে খলীল বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই জন্যই আমরা বলি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খলীলুল্লাহ। কারণ হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর ভিতরে বন্ধুত্বের অর্থ বেশী পরিমাণে বর্তমান রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৪৬) দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসা করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসা করা হারাম। এখানে জানা দরকার যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসাকারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত।

১) বাড়াবাড়ি ব্যতীত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রশংসা করাতে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে যে সমস্ত সৎ গুণাবলী রয়েছে, তা বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই।

---

[1] - ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ মুকাদ্দামাহ।

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা। তিনি এটা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

"নাসারা সম্প্রদায় যেমনভাবে ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা সেভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমি একজন আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বল।"[1] অতএব যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসা এভাবে করবে যে, তিনি আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় দাতা, বিপদ গ্রস্থের আহবানে সাড়া দানকারী, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক, তিনি গায়েবের খবর জানেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসা করা হারাম। বরং কখনো ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুতরাং বেশী বাড়াবাড়ি করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসা করা ঠিক নয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে দুনিয়ার স্বার্থ অর্জন করা হারাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তা বর্ণনা করা এবাদতের অন্তর্ভূক্ত। আর যে জিনিষ এবাদতের অন্তর্ভূক্ত তাকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করাজায়েয নয়।

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবেনা। এরাই হল সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হয়েছে।" (সূরা হূদঃ ১৫-১৬) আল্লাহই সঠিক পথের সন্ধান দাতা।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি নূরের তৈরী ?

প্রশ্নঃ (৪৭) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষ নন; বরং তিনি আল্লাহর নূর। অতঃপর সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে, তিনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, তার হুকুম কি ? এ ধরণের লোকের পিছনে নামায আদায় করা জায়েয আছে কি ?

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু আহাদিছুল আম্বীয়া।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর- (বা আল্লাহর যাতী নূর) মানুষ নন, তিনি গায়েবের খবর জানেন, সে আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে কুফরী করল। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন, বন্ধু নয়। কেননা তার কথা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে কাফের। আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾

"আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।" (সূরা কাহফঃ১১০) আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"আসমান-যমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।" (সূরা নামলঃ ৬৫) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

"আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ অহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে।" (সূরা আন্‌আ'মঃ ৫০) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনো হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদদাতা।" (সূরা আ'রাফঃ ১৮৮) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي)

"আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।"[1] যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এই বিশ্বাস রাখলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালমন্দের মালিক, সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেনঃ

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাহ।

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾
অর্থঃ "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার এবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে অপমানিত অবস্থায়।" (সূরা গাফেরঃ ৬০) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدًا﴾
"বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাবনা।" (সূরা জ্বিনঃ ২১-২২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে বলেছেনঃ (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)
"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না।"[1] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁর বংশধর) তাঁর কন্যা ফাতেমা ও ফুফু সাফিয়াকে একই কথা বলেছেন। এই ব্যক্তিও অনুরূপ আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তির পিছনে নামায জায়েয নেই, এবং তাকে মুসলমানদের ইমাম নিয়োগ করা এবং তার পিছনে নামায আদায় করা বৈধ নয়।

প্রশ্নঃ- (৪৮) ইমাম মাহদীর আগমণ সংক্রান্ত হাদীছগুলো কি ছহীহ ?

উত্তরঃ- মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো চারভাগে বিভক্ত।

১) মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ
২) যঈফ হাদীছ
৩) হাসান হাদীছ।
৪) সহীহ হাদীছেও ইমাম মাহদীর আগমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে ইরাকের সিরদাব নামক স্থানে লুকায়িত রাফেজীদেরকল্পিত মাহদীর সাথে হাদীছে বর্ণিত মাহদীর কোন সম্পর্ক নেই। এটি রাফেজীদের পক্ষ থেকে একটি বানোয়াট কাহিনী। সহীহ হাদীছে যে মাহদীর কথা বলা হয়েছে, তিনি অন্যান্য বনী আদমের মতই একজন লোক হবেন। তিনি যথা সময়ে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং মানব সমাজে আত্ম প্রকাশ করবেন। এটিই ইমাম মাহদীর প্রকৃত ঘটনা। সুতরাং ইরাকের সিরদাব অঞ্চলে লুকায়িত মাহদীর আগমণে বিশ্বাস করা মারাত্মক ভুল এবং বিবেক বহির্ভূত ও ভিত্তিহীন ব্যাপার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছে বর্ণিত ইমাম মাহদীর আগমণ সত্য।

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওসায়া।

প্রশ্নঃ- (৪৯) ইয়াজুজ-মাজুজ কারা ?

উত্তরঃ- ইয়াজুজ মা'জুজ বনী আদমের অন্তর্ভূক্ত দু'টি জাতি। তারা বর্তমানে দুনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা যুল-কারনাইনের ঘটনায় বলেনঃ

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَـاذَا الْقَـرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَـالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾

"অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে যুল-কারনাইন, ইয়াজুজ ও মা'জুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রচীর নির্মাণ করে দিবেন। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাঁপরে ফুঁক দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস। আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজের দল তার উপরে আরোহণ করতে পারলনা এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলনা। যুল-কারনাইন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।" (সূরা কাহাফঃ ৯৩-৯৮) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَـالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا))

"আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন আদম (আঃ) কে ডাক দিবেন। আদম (আঃ) বলবেন হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে হাজির আছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার বংশধর থেকে জাহান্নামী দলকে পৃথক কর। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামের দল কারা ?

আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেক এক হাজারের মধ্যে থেকে নয়শত নিরানব্বই জন। তখন কোলের শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে। গর্ভবতী মহিলারা সন্তান প্রসব করে দেবে। মানুষদেরকে আপনি মাতাল অবস্থায় দেখবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন। ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে থেকে কে হবে সেই এক ব্যক্তি ? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের মধ্যে থেকে হবে সেই এক ব্যক্তি। আর বাকীরা হবে ইয়াজুজ-মাজুজের দল।”[1]

ইয়াজুজ-মাজুজের দল বের হয়ে আসা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগেই ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর হাদীছে আছে, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা পেরেশান ও রক্তিম চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বলছিলেনঃ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا﴾

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। অকল্যাণ নিকটবর্তী হয়ে গেছে। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এই বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি আঙ্গুলি দিয়ে গোলাকৃতি করে দেখালেন।”[2]

প্রশ্নঃ (৫০) নবীগণ কেন তাঁদের উম্মতকে দাজ্জালের ফিত্না থেকে সাবধান করেছেন ? অথচ দাজ্জাল তো শেষ যামানাতেই বের হবে।

উত্তরঃ আদম সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে দাজ্জালের ফিত্না হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সংবাদ দিয়েছেন। এই জন্য নূহ (আঃ) থেকে আরম্ভ করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল নবীই তাঁদের সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। যাতে তারা সাবধান থাকতে পারে এবং দাজ্জালের বিষয়টি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলদের দায়িত্ব ছিল উম্মতকে সকল প্রকার অনিষ্ট হতে সাবধান করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

“আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকাবস্থায় যদি দাজ্জাল বের হয়, তাহলে আমি একাই তার সাথে যুদ্ধ করব এবং তাকে প্রতিহত করব। আমি চলে গেলে যদি তার আগমণ

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আম্বিয়া।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

ঘটে, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে তার ফিতনা থেকে রক্ষা করবে। আমার পরে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হেফাজত করবেন।”[1]

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিত্না পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় ফিতনা, তাই বিশেষভাবে নামাযের মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি শেষ বৈঠকে এই দু'আটিও পাঠ করতেন,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ))

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিত্না হতে।”

দাজ্জাল শব্দটি (دجـــل) হতে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা ইত্যাদি। দাজ্জাল যেহেতু সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী এবং সবচেয়ে বড় প্রতারক। তাই তাকে দাজ্জাল বলে নাম রাখা হয়েছে।

প্রশ্নঃ(৫১) যারা পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস করে এবং বলে এ বিশ্বাস মধ্যযুগের একটি কল্পকাহিনী ও কুসংস্কার মাত্র- এ ধরণের মানুষকে কিভাবে বুঝানো সম্ভব?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করবে এবং বলবে এটি মধ্যযুগের কল্পিত কাহিনীমাত্র, সে কাফের। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

“তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন, অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।” (সূরা আনআ'মঃ ২৯-৩০) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾

“সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার

[1] - মুসলিম অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, ইহা পুরাতনকালের রূপকথা। কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো না তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।" (সূরা আত্-তাতফীফঃ ১০-১৭) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾

"বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি।" (সূরা ফুরক্বানঃ ১১) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থঃ "যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। তাদের জন্যই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (সূরা আনকাবুতঃ ২৩)

যারা পরকালকে অবিশ্বাস করে তাদের কাছে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করা হবেঃ

প্রথমতঃ কিয়ামত এবং পরকালের বিষয়টি যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে আসমানী কিতাবসমূহে মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তা কবূল করে নিয়েছে। অতএব তোমরা কিভাবে নবী-রাসূলদের কথা অমান্য করে পরকালকে অস্বীকার করতে পার ? অথচ তোমরা দার্শনিক কিংবা কোন বাতিল ফির্কার প্রবর্তকের কথা বিশ্বাস করে থাক।

দ্বিতীয়তঃ কিয়ামত হওয়ার বিষয়টি বিবেক দ্বারাও স্বীকৃত এবং সমর্থিত। তা কয়েকভাবে হতে পারেঃ

১) প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, সে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে। যিনি প্রথমবার অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾

"তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য তুলনা মূলক বেশী সহজ।" (সূরা রূমঃ ২৭) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।" (সূরা আম্বিয়াঃ ১০৪)

২) আকাশ-যমিনের সৃষ্টির বড়ত্ব ও অভিনবত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যিনি এ দু'টিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে এবং পুনরায় তাদের প্রথমবারের মত সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন,

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾

“নিশ্চয় আকাশ-যমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড়।” (সূরা গাফেরঃ ৫৭) আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“তারা কি জানে না যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন তিনি এবং এ গুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেন নি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (সূরা আহক্বাফঃ ৩৩) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

“যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলে দেন, হও তখনই তা হয়ে যায়।” (সূরা ইয়াসীনঃ ৮১-৮২)

৩) প্রত্যেক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি যমিনকে মৃত অবস্থায় দেখে। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে তা উর্বর হয়ে উঠে এবং সেখানে নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যিনি মৃত যমিনকে জীবিত করতে পারেন, তিনি মৃত মানুষকেও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর অবস্থায় পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।” (সূরা হা-মীম সাজদাহঃ ৩৯)

৪) বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা, যা আল্লাহ তাআ'লা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, তা পুনরুত্থান সম্ভব হওয়ার সত্যতা প্রমাণ বহন করে। সূরা বাকারাতে এ ধরণের পাঁচটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যা ছিল জনমানব শুণ্য, দেয়ালগুলো বিধ্বস্ত ছাদের উপর পড়ে ছিল ? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর এই জনপদকে পুনরায় জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়। বললেন, তা নয়, বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে। সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৫৯)

(৫) প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় কর্মের যথাযথ প্রতিদান পাওয়ার জন্য পুনরুত্থান আবশ্যক। তা না হলে মানুষ সৃষ্টির কোন মূল্য থাকে না এবং পার্থিব জীবনে মানুষ ও পশুর মাঝেও কোন পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

"তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না। অতএব মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।" (সূরা মু'মিনূনঃ ১১৫-১১৬) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾

"কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।" (সূরা ত্বো-হাঃ ১৫) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং কাফেরেরা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যায়।" (সূরা নাহলঃ ৩৮-৪০) আল্লাহ বলেনঃ

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"কাফেরেরা দাবী করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" (সূরা তাগাবুনঃ ৭)

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য উপরোক্ত প্রমাণগুলো পেশ করার পরও যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে তারা অতিসত্বরই তাদের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হবে।

প্রশ্নঃ- (৫২) কবরের আযাব কি সত্য?

উত্তরঃ- কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত, সুস্পষ্ট সুন্নাত এবং মুসলমানদের ঐকমত্যে কবরের আযাব সত্য। নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)

"তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কথাটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বলেছেন।"[1]

সকল মুসলমানই নামাযে বলে,

(أَعُوْذُ بِاللَّه مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)

"আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" সাধারণ মানুষ এবং আলেম-উলামা সবাই এই দু'আটি পাঠ করে থাকে।

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলেনঃ

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও।" (সূরা গাফেরঃ ৪৬) কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য জাহান্নামের আগুনের উপরে পেশ করা হবে না; বরং তার আযাব ভোগ করার জন্য।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

"আপনি যদি যালিমদেরকে ঐ সময়ে দেখতে পেতেন, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জান্নাত।

করে আন। তোমাদের আমলের কারণে আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছিলে এবং তোমরা তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার করেছিলে।” (সুরা আনআ'মঃ ৯৩) আর এই আয়াতের মধ্যে 'আজ' বলতে মৃত্যুর দিনকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলমানদের ঐক্যমতে কবরের আযাব সত্য।

স্বাভাবিক দাফন না হলেও কবরে আযাব হবে

প্রশ্নঃ (৫৩) মৃত লাশকে যদি হিংস্র পশুরা খেয়ে ফেলে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয় তবেও কি কবরের আযাব হবে?

উত্তরঃ অবশ্যই হবে। কারণ আযাব হবে রূহের উপর। কেননা শরীর তো মাটির সাথে মিশে যাবে। তাছাড়া যেহেতু বিষয়টি গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ কথা বলা যাবে না যে, দেহের কোন আযাবই হবে না। যদিও তা নষ্ট হয়ে গেছে বা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিষয়টি পরকালের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াতে দৃশ্যমান কোন বস্তুর সাথে পরকালের গায়েবী বিষয়ের তুলনা চলেনা।*

কবরের আযাব অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্নঃ (৫৪) এক শ্রেণীর লোক কবরের আযাব অস্বীকার করার পক্ষে দলীল পেশ করে যে, কবর খনন করলে দেখা যায় লাশ রয়ে গেছে, কোন পরিবর্তন হয়নি এবং কবর সংকীর্ণ অথবা প্রশস্তও হয়নি। আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?

উত্তরঃ আমরা বলব কবরের আযাব কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

“সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও।” (সূরা গাফেরঃ ৪৬) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

---

*. এরপরও বলা হয় যে, দেহটি পুড়ে গেলে বা অন্য কোন জন্তুতে ভক্ষণ করে ফেললে মানুষের জ্ঞানের পরিসর থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে গেলেও আল্লাহর জ্ঞান পরিসরে তা বিদ্যমানই থাকে। সুতরাং আল্লাহর পক্ষে সেই বিলীন দেহের উপর আযাব প্রয়োগ বা শাস্তি প্রদান অসম্ভব নয়। যেমন আমাদের কর্মের প্রভাবে একটি বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিলীন হয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ফ্যান পূর্ণ মাত্রা দিয়ে ঘুরানো হলে পাখাগুলো দৃষ্টি শক্তির অগোচরে হয়ে যায় অথচ তার অস্তিত্ব বিদ্যমানই থাকে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

(فَلَوْلا أَنْ لا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)

"তোমরা যদি দাফন না করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, যা আমি নিজে শ্রবণ করে থাকি। অর্থাৎ তোমরা যেহেতু একে অপরকে দাফন করে থাক, তাই আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা বাদ দিলাম। কারণ তোমরা কবরের আযাব শুনতে পেলে দাফন করা বাদ দিবে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। ছাহাবীগণ বললেনঃ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ) "আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। ছাহাবীগণ বললেনঃ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ) "আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[1] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেনঃ (يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ)"তার কবরকে চোখের দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।"[2]

এমনি আরো অনেক দলীল রয়েছে, যা শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করা মোটেই জায়েয নয়; বরং তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নেয়া আবশ্যক। তাছাড়া কবরের আযাব হবে রূহের উপরে। শরীরের উপরে নয়। শরীরের উপরে হলে তা দেখা যেত, তখন বিষয়টি গায়েবের উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হতনা। কিন্তু কবরের আযাবের বিষয়টি আলমে বরযখের তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার প্রকাশ্য বিষয়াদি দ্বারা এটাকে উপলব্ধি করা যাবে না।

কবরের আযাব, শান্তি, কবরের প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণতা এসব বিষয় কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে। অন্য কেউ নয়। কখনো কখনো মানুষ স্বপ্নে দেখে যে, সে কোথাও যাচ্ছে, আকাশে উড়ছে, কাউকে প্রহার করছে কিংবা তাকে কেউ প্রহার করছে। আরো দেখে যে, সে এক সংকীর্ণময় স্থানে আছে অথবা প্রশস্ত কোন স্থানে আনন্দময় জীবন যাপন করছে। অথচ ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশের লোকেরা কিছুই অনুভব করতে পারে

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জান্নাহ।
[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা।

না। সুতরাং আমাদের উচিৎ এই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করা, বিশ্বাস করা এবং সেগুলোর আনুগত্য করা।

প্রশ্নঃ (৫৫) পাপী মুমিনের কবরের আযাব কি হালকা করা হবে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, কখনো কখনো কবরের আযাব হালকা করা হবে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তিনি বললেন, এ দু'জনকে কবরের মধ্যে আযাব দেয়া হচ্ছে, তবে বড় কোন অপরাধের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করত না, আর দ্বিতীয়জন চুগলখোরী করত অর্থাৎ একজনের কথা অন্য জনের কাছে লাগাতো। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি তাজা খেজুরের শাখা নিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরের উপরে একটি করে পুঁতে দিয়ে বললেন, সম্ভবত খেজুরের শাখা দু'টি শুকানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব হালকা করা হবে। এ হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে, আযাব কখনো হালকা করা হয়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, আযাব হালকা হওয়ার সাথে খেজুরের শাখার সম্পর্ক কি ?

উত্তরে বলা যায় যে, খেজুরের শাখা তাজা থাকাকালে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তাসবীহ মৃতের কবরের আযাব হালকা করে থাকে। এর উপর ভিত্তি করে আযাব হালকা হওয়ার আশায় কেউ যদি কবরের পাশে তাসবীহ পাঠ করে, তাহলে জায়েয হবে না। কোন কোন আলেম বলেছেন, তাজা খেজুরের শাখা তাসবীহ পাঠ করে বলে আযাব হালকা করা হয়, এই কারণটি দুর্বল। তাজা বা শুকনো সকল বস্তুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে অর্থাৎ-পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৪৪) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাথরের তাসবীহ শুনতে পেতেন। অথচ পাথর জড় পদার্থের অন্তর্ভূক্ত। তাহলে আযাব হালকা করার মূল কারণ কি?

উত্তরে বলা যায় যে, তিনি খেজুরের শাখা দু'টি সজিব থাকা পর্যন্ত কবরের আযাব হালকা করার জন্য দু'আ করেছিলেন। বুঝা গেল শাস্তি মুলতবী থাকার সময়সীমা বেশী দিন দীর্ঘ ছিলনা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এ দু'টি কর্ম মানুষকে সাবধান করার জন্যই এরকম করেছিলেন। কারণ তাদের কাজ দু'টি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাদের একজন পেশাব থেকে ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করতনা। অন্যজন মানুষের মাঝে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাতো। এটা করা কবীরা গুনাহ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতকে সতর্ক করার জন্য সাময়িক সুপারিশ করেছেন।

কতক আলেম বলেছেন, কবরের আযাব হালকা করার জন্য কবরের উপরে খেজুরের শাখা অথবা গাছ পুঁতে রাখা সুন্নাত কিন্তু এ ধরণের দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। কারণঃ -

১) এ কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে কি না তা আমরা জানিনা, কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জানতে পেরেছন।

২) আমরা যদি কবরের উপরে তা রাখি, তাহলে আমরা মৃতের উপরে খারাপ আচরণ ও মন্দ ধারণা পোষণ করলাম। আমরা জানি না হতে পারে সে শান্তিতে আছে। হতে পারে আল্লাহ তাআ'লা অনুগ্রহ করে মৃত্যুর পূর্বে তাকে তাওবা করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই সে আযাব থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

৩) সালাফে ছালেহীনের কেউ কোন কবরের উপরে খেজুরের শাখা রাখতেন না। অথচ তারা আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

৪) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে খেজুরের শাখা পুঁতে রাখার চেয়ে ভাল জিনিষ শিক্ষা দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তির দাফন সমাধা করার পর তিনি বলতেনঃ

(اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ)

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য ঈমানের উপর অটল থাকার তাওফীক কামনা কর।" কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসা করা হবে।[1]

প্রশ্নঃ (৫৬) শাফায়া'ত কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তরঃ শাফায়া'ত শব্দটির আভিধানিক অর্থ মিলিয়ে নেয়া, নিজের সাথে একত্রিত করে নেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় কল্যাণ লাভ অথবা অকল্যাণ প্রতিহত করার আশায় অপরের জন্য মধ্যস্থতা করাকে শাফায়াত বলে। শাফায়াত দু'প্রকার। যথাঃ-

প্রথমতঃ শরীয়ত সম্মত শাফায়াত। কুরআন ও সুন্নাহয় এ প্রকার শাফায়াতের বর্ণনা এসেছে। তাওহীদপন্থীগণ এ ধরণের শাফায়াতের হকদার হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

(مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)

[1] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয।

"কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি আপনার শাফায়াতের বেশী হকদার হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার হাদীছ শেখার আগ্রহ দেখে আমার ধারণা ছিল যে, তোমার পূর্বে এ বিষয় সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফায়াতের সবচেয়ে বেশী হকদার হবে।[1] এ প্রকার শাফায়াতের জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে।

১- শাফায়াতকারীর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

২- যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার উপরও আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

৩- শাফায়াতকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি থাকা।

আল্লাহ তাআ'লা এই শর্তগুলো কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

"আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছেন, যাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হয়না। কিন্তু আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন এবং যাকে শাফায়া'ত করার অনুমতি দেন তার কথা ভিন্ন।" (সূরা নাজ্মঃ ২৬) আল্লাহ বলেনঃ

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

"কে এমন আছে যে, সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?" (সূরা বাকারাঃ ২৫৫) আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

"দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না।" (সূরা ত্বো-হাঃ ১০৯) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾

"তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।" (সূরা আম্বীয়াঃ ২৮) সুতরাং শাফায়াত পাওয়ার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্ত থাকা আবশ্যক। এই শাফায়ত আবার দু'প্রকারঃ

১) সাধারণ শাফায়াতঃ সাধারণ শাফায়াতের অর্থ হল, সৎ বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা এবং যার জন্য ইচ্ছা আল্লাহ শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন। এই ধরণের শাফায়াত আল্লাহর অনুমতি পেয়ে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম),

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম।

অন্যান্য নবী-রাসূল, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ করবেন। তাঁরা পাপী মুমিনদেরেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে আনার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন।

২) বিশেষ ও নির্দিষ্ট সুপারিশঃ এই ধরণের শাফায়াত নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্ট। এই শাফায়াতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল হাশরের মাঠের শাফায়াত। হাশরের মাঠে মানুষ যখন বিপদে পড়ে যাবে এবং অসহনীয় আযাবে গ্রেপ্তার হবে, তখন তারা একজন সুপারিশকারী খুঁজে ফিরবে। যাতে করে তারা এই ভীষণ সংকট থেকে রেহাই পেতে পারে। প্রথমে তারা আদম (আঃ)এর কাছে গমণ করবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) এর কাছে যাবে। তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। অবশেষে তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আসবে। তিনি মানুষকে এই বিপদজনক অবস্থা হতে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাঁর দু'আ এবং শাফায়াত কবূল করবেন। এটিই হল সুমহান মর্যাদা, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

“আপনি রাত্রির কিছু অংশ জাগ্রত থেকে আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত (নফল ইবাদত)। আপনার পালনকর্তা অচিরেই আপনাকে সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন।” (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৭৯)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত সুপারিশ করবেন, তার মধ্যে জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ অন্যতম। জান্নাতবাসীগণ যখন পুলসিরাত পার হবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সেতুর উপরে আটকানো হবে। সেখানে তাদের পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। প্রতিশোধ নেয়া ও পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন হতে পবিত্র করার পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশক্রমে বেহেশতের দরজা খোলা হবে।

দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত বিরোধী শাফায়াতঃ এধরণের শাফায়াত কোন কাজে আসবে না। মুশরেকরা আল্লাহর নিকটে তাদের বাতিল মা'বূদদের কাছ থেকে এধরণের শাফায়াতের আশা করে থাকে। অথচ এই শাফায়াত তাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

“কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের উপকারে আসবে না।” (সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ৪৮) কারণ আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের শির্কের উপরে সন্তুষ্ট নন। তাদের জন্য শাফায়াতের অনুমতি দেয়াও সম্ভব নয়। আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট হবেন, কেবল তার জন্যই সুপারিশ

বৈধ। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য ফাসাদ ও কুফরী পছন্দ করেন না। মুশরিকরা কি যুক্তিতে মূর্তী পূজা করত তা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেনঃ

﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

"এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮) সুতরাং মুশরিকরা তাদের বানোয়াট মূর্তিদের উপাসনা করার পিছনে যুক্তি ছিল যে, মূর্তিরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এটা তাদের মূর্খতার পরিচয়। কারণ তারা এমন জিনিষের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, যা তাদেরকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রশ্নঃ (৫৭) মুমিনদের শিশু বাচ্চাদের পরিণাম কি ? মুশরিকদের যে সমস্ত শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে, তাদের অবস্থা কি হবে ?

উত্তরঃ মুমিনদের শিশু সন্তানগণ তাদের পিতাদের অনুসরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

"যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে।" (সূরা তূরঃ ২১)

অমুসলিমদের নাবালক শিশুদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হল, আমরা বলব আল্লাহই ভাল জানেন বড় হলে তারা কি আমল করত। দুনিয়ার বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তারা তাদের পিতা-মাতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আখেরাতে তাদের অবস্থা কি হবে আল্লাহই ভাল জানেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।[1] পরকালে তাদের কি হবে সেটা জানার ভিতরে আমাদের কোন লাভ নেই। দুনিয়াতে তাদের বিধান হল, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক মুশরিকদের মতই হবে। মারা গেলে তাদেরকে গোসল দেয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না, তাদের উপর জানাযার নামায পড়া হবে না এবং মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা হবে না।

প্রশ্নঃ (৫৮) জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল মহিলাদের জন্য কি আছে ?

উত্তরঃ-জান্নাতীদের নেয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয।

"সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবী কর।" (সূরা হা-মীম সিজদাহঃ ৩১-৩২) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"এবং তথায় রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।" (সূরা যুখরুফঃ ৭১)

ইহা জানা কথা যে, মন যা চায়, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল বিবাহ করার মনোবাসনা। তা জান্নাতীদের জন্য অর্জিত হবে। চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। মহিলাকে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে তাঁকে তাঁর দুনিয়ার স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়ে দিবেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে প্রবেশ করাও চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা গাফেরঃ ৮) আর দুনিয়াতে যদি অবিবাহিত থাকে তাহলে জান্নাতে তার নয়ন জুড়ানো কোন পুরুষের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন

প্রশ্নঃ (৫৯) জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা-কথাটি কি ঠিক ? ঠিক হয়ে থাকলে কারণ কি ?

উত্তরঃ জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা-কথাটি ঠিক। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা খুৎবা প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

(يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)

"হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী করে সাদকা কর। কারণ আমি জাহান্নামের অধিকাংশকেই দেখেছি তোমাদের মধ্যে থেকে। জাহান্নামের অধিকংশ অধিবাসী কেন মহিলাদের মধ্যে থেকে হবে- এই প্রশ্ন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশী পরিমাণে মানুষের উপরে অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর সদাচরণ অস্বীকার কর।"[1] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদীছে নারীদের বেশী হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশী পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে, অভিশাপ করে, এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

তাকদীরের মাসআলা এড়িয়ে চলার বিধান

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হায়য।

প্রশ্নঃ (৬০) পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যারা তাকদীরের মাসআলাহ সহ আকীদার বিভিন্ন বিষয় পাঠ করা পছন্দ করেন না, তাদের জন্য আপনার উপদেশ কি ?

উত্তরঃ তাকদীরের বিষয়টি আকীদার অন্যান্য মাসআলার মতই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের উচিৎ এ মাসআলাটি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা অর্জন করা। কেননা এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্দেহের উপর থাকা ঠিক নয়। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় না শিখলে অথবা বিলম্বে শিখলে পথ ভ্রষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে, তা অবশ্যই শিখতে হবে। তাকদীরের মাসআলাটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ভালভাবে শিক্ষা করা প্রতিটি বান্দার উপর আবশ্যক। মূলতঃ তাকদীরের মাসআলায় কোন সমস্যা নেই। মানুষের কাছে আকীদার আলোচনা কঠিন হওয়ার অন্যতম কারণ হল, তারা আকীদা শিখতে গিয়ে 'কিভাবে' কথাটিকে 'কেন' কথার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ মানুষকে তার আমলের ব্যাপারে দু'টি প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। কেন করলে এবং কিভাবে করলে। আমলটি কেন করেছো এটি হল ইখলাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। আর কিভাবে করেছো এটি হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ কিভাবে করেছো এটির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেন করতে হবে এ বিষয়টির প্রতি তেমন কোন গুরুত্বই দেয়না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণের ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চায়। কিন্তু আকীদার বিষয়টির উপরে কোন গুরুত্ব দেয়না। দুনিয়াবী বিষয়ে মানুষ খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। অথচ তার অন্তর আল্লাহ (আক্বীদাহ, ইখলাছ ও তাওহীদের বিষয়) সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। মূলতঃ দেখা যায় কতিপয় মানুষ বর্তমানে দুনিয়া পূজারী হয়ে গেছে। অথচ সে টেরও পাচ্ছে না। অনেক মানুষ আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত হয়েছে। অথচ সে অনুভবও করতে পারে না। আকীদার বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেম সমাজ পর্যন্ত অনেকেই গুরুত্ব প্রদান করে না। এ বিষয়টি খুবই ভয়াবহ। অবশ্য বিনা আমলে শুধু মাত্র আকীদার উপরে গুরুত্ব দেয়াও ভুল। কারণ আমল হল আকীদা সংরক্ষণের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। আমরা রেডিও-টিভি এবং পত্র-পত্রিকায় শুনতে পাই যে, পরিচ্ছন্ন আকীদাই হল দ্বীন। আমল না করে এভাবে শুধুমাত্র আকীদার উপরে গুরুত্ব দেয়াতে দ্বীনের কিছু কিছু হারাম বিষয়কে হালাল করে নেয়ার আশংকা রয়েছে। এই যুক্তিতে যে, আকীদা ঠিক আছে।

মোট কথা এই যে, মানুষের উপর আকীদার বিষয়গুলো শিক্ষা করা আবশ্যক। যাতে করে তারা আল্লাহর নাম, গুণাবলী এবং কর্মক্ষমতা ও তাঁর বিধানাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে পারে। নিজে বিভ্রান্ত না হয় এবং অপরকে বিভ্রান্ত না করে। তাওহীদের

জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এ জন্য বিদ্বানগণ ইলমে তাওহীদকে 'ফিকহে আকবার' বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হ বলে নাম রেখেছেন।[1] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)

"আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"[2] দ্বীনের জ্ঞানের মধ্যে তাওহীদের জ্ঞানের গুরুত্ব সর্বপ্রথম। তাই মানুষের উপর আবশ্যক হল, এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করবে যে, কিভাবে সে তাওহীদের জ্ঞান অন্বেষণ করবে এবং কোন উৎস থেকে তা অর্জন করবে। প্রথমে সন্দেহ মুক্ত ও সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করবে। অতঃপর বিদ্‌আত ও সন্দেহ পূর্ণ বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জন করার পর সঠিক আকীদার আলোকে তার উত্তর দিবে। আকীদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ এবং ছাহাবীগণের বক্তব্য অতঃপর তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীনে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য আলেমগনের লেখনী ও বক্তব্য থেকে গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে থেকে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানুষ কি নিজ কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন?

প্রশ্নঃ (৬১) সম্মানিত শায়খ! আশা করি তাকদীরের মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। মানুষের মূল কাজ কি পূর্ব নির্ধারিত এবং কাজটি পালন করার নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ কি স্বাধীন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন মানুষের জন্য যদি লেখা থাকে যে, সে একটি মসজিদ বানাবে। সে অবশ্যই মসজিদ বানাবে। তবে কিভাবে বানাবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। এমনিভাবে পাপ কাজ নির্ধারিত থাকলে তা অবশ্যই করবে। কিভাবে করবে তা নির্ধারিত হয়নি। মোট কথা মানুষের তাকদীরের যে সমস্ত কর্ম নির্ধারিত আছে, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন কথাটি কি ঠিক ?

উত্তরঃ তাকদীরের মাসআলা নিয়ে বহু দিন যাবৎ মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এই জন্যই মানুষ তাকদীরের মাসআলাকে কেন্দ্র করে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে।

১) এক শ্রেণীর লোক বলে থাকে সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এতে মানুষের ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা নেই। এদের মতে প্রচন্ড বাতাসের কারণে

---

[1] -ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম "আল ফিকহুল আক্‌বার"। গ্রন্থটিতে প্রচলিত ফিকহী মাসআলা সম্পর্কে কোনই আলোচনা নেই। বইটিতে কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্‌হ তথা তাওহীদের বিষয় (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে) আলোচনা করা হয়েছে।

আফসোসের বিষয় এই যে, আমরা নিজেদেরকে হানাফী তথা ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করি। অথচ আমরা তাঁর গৃহীত আকীদার সাথে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের আকীদার কোন সম্পর্ক নেই।- অনুবাদক।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম।

ছাদের উপর থেকে কোন মানুষ নীচে পড়ে যাওয়া এবং স্বেচ্ছায় সিড়ি বেয়ে নেমে আসা একই রকম।

২) অন্য একদলের মতে মানুষ তার কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক লিখিত ভাগ্যকে তারা সরাসরি অস্বীকার করে। তাদের মতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন রূপে কর্ম সম্পাদন করে থাকে। ভাগ্য বলতে কিছু নেই।

৩) উভয় দলের মাঝখানে আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের আকীদা হল, তাঁরা আল্লাহ তাআ'লার নির্ধারিত তাকদীরে বিশ্বাস করেন। সাথে সাথে তারা কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে বান্দার স্বাধীনতাকেও স্বীকার করেন। বান্দার কর্ম আল্লাহর নির্ধারণ এবং বান্দার নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। ছাদের উপর থেকে বাতাসের চাপে মাটিতে পড়ে যাওয়া এবং স্বেচ্ছায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার মাঝে মানুষ অবশ্যই পার্থক্য করতে জানে। প্রথমটিতে তার কোন ইচ্ছা ছিলনা এবং দ্বিতীয়টি তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু উভয় কাজ আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয়না। বান্দা আপন ইচ্ছায় যা নির্ধারণ করে থাকে, তা সম্পর্কেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে তাকদীরের মাধ্যমে দলীল পেশ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা শরীয়ত বিরোধী কর্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সে আল্লাহর নির্ধারণ সম্পর্কে অবগত থাকে না। স্বেচ্ছায় পাপ কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়ার কারণেই দুনিয়া বা আখেরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কাউকে পাপ কাজের উপর বাধ্য করা হলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। যেমন একজন অন্য জনকে জোরপুর্বক মদ পান করিয়ে দিলে মদপানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কারণ এক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় সে পান করে নি। মানুষ ভাল করেই জানে যে, আগুন থেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা এবং বসবাসের জন্য সুন্দর ঘরবাড়ি নির্বাচন করা তার আপন পছন্দ অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুন্দর ঘরবাড়ি নির্ধারণ এবং আগুন থেকে বাঁচার সুযোগ থাকা সত্বেও যে মানুষ সে সুযোগ গ্রহণ করেনি, তাকে সুযোগ নষ্ট করার জন্য তিরস্কার করা হয়। তবে কি জন্যে সে পরকালের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার এবং জান্নাত আবশ্যককারী আমলগুলো ছেড়ে দেয়াকে নিজের অপরাধ মনে করবে না?

বর্ণিত প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি কারও তাকদীরে লিখে রাখেন যে, সে একটি মসজিদ বানাবে, সে অবশ্যই মসজিদটি বানাবে কিন্তু কিভাবে বানাবে সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এই উদাহরণটি ঠিক নয়। কেননা তাতে ধারণা করা হয় যে, নির্মাণের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বান্দার হাতে। এতে আল্লাহর কোন হাত নেই। সঠিক কথা এই যে, নির্মাণ করা এবং নির্মাণের পদ্ধতি সবই তাকদীরে নির্ধারিত। উভয়টি নির্বাচনে বান্দার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে তাকে বাধ্য করা হয়নি। যেমনভাবে তাকে আপন ঘরবাড়ি নির্মাণ বা মেরামত করতে বাধ্য করা হয়নি। তাকদীর সম্পূর্ণ গোপন বিষয়। অহীর মাধ্যমে যাকে আল্লাহ অবগত করান সেই কেবল জানতে পারে। এমনিভাবে নির্মাণের পদ্ধতিও আল্লাহর

নির্ধারণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সমস্ত জিনিষের বিবরণ বিস্তারিতভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাকদীরে লিখিত আছে।

আল্লাহ যে বিষয়ের ইচ্ছা করেন বা নির্ধারণ করেন, তা ব্যতীত বান্দার পক্ষে অন্য কিছু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। বরং বান্দা যখন কোন কিছু করে, তখন সে ভাল করেই জানে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সকল কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন আর বান্দা প্রকাশ্যভাবে তা সম্পাদন করে। বান্দা যখন কর্ম সম্পাদন করে, তখন সে অনুভবই করতে পারে না যে, কেউ তাকে কাজটি করতে বাধ্য করছে। বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে বান্দা যখন কাজটি করে ফেলে, তখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেরেখে ছেন।

প্রশ্নে বর্ণিত মানুষের পাপ কাজের যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, তাতে আমরা তাই বলব, যা আমরা মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বলেছি। বান্দা কর্তৃক স্বেচ্ছায় কোন কাজ নির্বাচন করা আল্লাহর নির্ধারণের পরিপন্থী নয়। কেননা কাজ করার জন্য বান্দা যখন অগ্রসর হয়, তখন সে সেচ্ছায় কাজটি নির্বাচন করেই অগ্রসর হয় এবং সে জানে না যে, কেউ তাকে কাজ করার জন্য বাধ্য করছে। কিন্তু যখন সে করে ফেলে, তখন সে জানতে পারে যে, আল্লাহ তার জন্যে কাজটি নির্ধারণ করেছেন। এমনিভাবে পাপকাজে লিপ্ত হওয়া এবং তার প্রতি অগ্রসর হওয়া বান্দার নির্বাচনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এটি তাকদীরের খেলাফ নয়। আল্লাহই সকল কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। সকল কর্ম বাস্তবায়নের উপকরণও তিনি সৃষ্টি করেছেন। বান্দার পক্ষ থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে সকল কাজ সংঘটিত হয়, তা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ বলেনঃ

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ জানেন যা আকাশে ও জমিনে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ।" (সূরা হুজঃ ৭০) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

"এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছি মানুষ ও জিন শয়তানদের। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ প্রবঞ্চনা মূলক কথা-বার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করতনা।" (সূরা আনআ'মঃ ১১২) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

"এমনিভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করতনা। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাচারিতাকে পরিত্যাগ করুন।" (সূরা আনআ'মঃ ১৩৭) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

"আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গাম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পরে লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।" (সূরা বাকারাঃ ২৫২)

কোন মানুষের উচিৎ নয় যে, নিজের ভিতরে বা অন্যের ভিতরে এমন কোন জিনিষের অনুসন্ধান করা, যা অপরের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে এবং তাকদীরের মাধ্যমে শরীয়তের বিরোধীতা করার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। ছাহাবীদের আমল এ রকম ছিলনা। অথচ তাঁরা সত্য জানতে ও উদ্‌ঘাটন করতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। ছহীহ বুখারীতে আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

﴿مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الْآيَةَ

"তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে লিখে দেয়া হয়নি। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা কি ভাগ্যের লেখার উপর ভরসা করে বসে থাকব না এবং আমল বর্জন করব না ? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "না; বরং তোমরা আমল কর। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে, তার জন্য সৌভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেয়া হবে আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে

দেয়া হবে।” অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

“অতএব, যে দান করে, আল্লাহ ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে। আমি তাকে সুখের বিষয়ের (জান্নাতের) জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের (জাহান্নামের) জন্যে সহজ পথ দান করব। (সূরা আল-লাইলঃ ৫-১০)”[1]

উপরোক্ত হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাগ্যের লিখনের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ কে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান, তা জানার কোন উপায় নেই এবং মানুষকে তার সাধ্যানুযায়ী আমল করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎ আমল করবে, তার জন্য কল্যাণের সহজ পথকে আরো সহজ করে দিবেন। এটিই ফলদায়ক ঔষধ। এর মাধ্যমেই বান্দা তার সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে এবং ঈমান আনার সাথে সাথে সৎ আমল করার জন্যে সদা স্বচেষ্ট থাকবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন সৎ আমল করার তাওফীক দেন, ভাল পথকে সহজ করে দেন, কঠিন পথ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখেন এবং দুনিয়া-আখেরাতে ক্ষমা করেন।

প্রশ্নঃ- (৬২) সৃষ্টির পূর্বে মানুষের ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, তা কি দু’আর মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব ?

উত্তরঃ- সন্দেহ নাই যে, ভাগ্যের লিখন পরিবর্তনে দু’আর প্রভাব রয়েছে। তবে জেনে রাখা দরকার, পরিবর্তনটাও পূর্বে লেখা আছে যে, দু’আর মাধ্যমে অমুকের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এই ধারণা যেন না হয় যে, আপনি ভাগ্যের কোন অলিখিত বস্তু পরিবর্তনের জন্যে দু’আ করছেন। সুতরাং দু’আ করবেন এটাও লেখা আছে। আর দু’আর মাধ্যমে যা অর্জিত হবে, তাও লিখিত আছে। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা হলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদল সৈনিক কোন একদিকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা কোন এক গোত্রের নিকটে মেহমান হিসাবে উপস্থিত হলে গোত্রের লোকেরা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। রাতের বেলা সেই গোত্রের নেতাকে বিষাক্ত সাঁপে দংশন করল। তাকে ঝাড়ার জন্য কবিরাজ অনুসন্ধান করা

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ তাফসীরুল কুরআন। মুসলিম, অধ্যায়ঃ তক্বদীর।

হল। কিন্তু কোন কবিরাজ পাওয়া গেলনা। অবশেষে লোকেরা ছাহাবীদের নিকট এসে কবিরাজ অন্বেষণ করল। একজন সাহাবী বললেন, আমি ঝাড়-ফুঁক করতে রাজি আছি, তবে আমাকে বিনিময় দিতে হবে। তারা একশটি ছাগল দিতে রাজি হলে উক্ত সাহাবী রোগীকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলেন। ফলে রোগী এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠল মনে হয় যেন রশির বাঁধন হতে মুক্ত করা হল।

উক্ত হাদীছ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রোগ মুক্তির জন্য ঝাড়-ফুঁক যথেষ্ট কার্যকর। দু'আর প্রভাব রয়েছে। তবে তাতে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়না; বরং ভাগ্যে এটাও লেখা রয়েছে যে দু'আ করবে তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। সব কিছুই সংঘটিত হয় ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী।

প্রশ্নঃ (৬৩) রিযিক এবং বিবাহ কি লাওহে মাহফুজে লিখিত আছে ?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআ'লা যেদিন কলম সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলুকাত সৃষ্টি হবে, সবই লাওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তাআ'লা কলম সৃষ্টি করে বললেন, লিখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি লিখব ? আল্লাহ তাআ'লা বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেল। সে সময় কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে, কলম সব কিছুই লিখে ফেলল।[1] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ভ্রুন মাতৃগর্ভে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআ'লা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন এবং লিখে দেন তার রিযিক, বয়স এবং তার কাজ অর্থাৎ সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগা হবে। রিযিক লিখা আছে এবং কিভাবে অর্জন করবে, তাও লিখা আছে। রিযিক অন্বেষণের সাথ সাথে রিযিক অন্বেষণের উপকরণও লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

"তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাতে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।" (সূরা মুলকঃ) রিযিক পাওয়ার এবং তা বৃদ্ধি হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল, পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.)

[1] - মুসনাদে আহমাদ।

“যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং বয়স বাড়িয়ে দেয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”[1] রিযিক বৃদ্ধির আরো মাধ্যম হল তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন।” (সূরা তালাকঃ ২-৩) এমন বলা যাবে না যে, রিযিক যেহেতু নির্ধারিত আছে, সুতরাং আমি এর উপকরণ অনুসন্ধান করব না। এটা বোকামীর পরিচয়। বুদ্ধিমানের পরিচয় হল রিযিক এর জন্য এবং দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

﴿الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ﴾

“বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের হিসাব নিল এবং পরকালের জন্য আমল করল। অক্ষম ও নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকল।”[2] রিযিক যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, বিবাহ করাও নির্ধারিত রয়েছে। এই পৃথিবীতে কে কার স্বামী বা স্ত্রী হবে, তাও নির্দিষ্ট রয়েছে। আসমান-যমিনের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

প্রশ্নঃ (৬৪) মুসিবত নাযিল হলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার হুকুম কি ?

উত্তরঃ বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার সময় মানুষ চার স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। যথাঃ-

প্রথম স্তরঃ অসন্তুষ প্রকাশ করা। এটি আবার কয়েক প্রকার।

১ম প্রকারঃ আল্লাহ যে বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তার কারণে অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা হারাম। কারণ এধরণের অসন্তুষ্টি কখনো কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে আল্লাহর এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ।” (সূরা হজ্জঃ ১১)

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ আল বির্ ওয়াস্ ছিলাহ্ ।

[2] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবু ছিফাতিল কিয়ামাহ।

২য় প্রকারঃ কখনো অসন্তুষ্টি কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন হতাশা প্রকাশ করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দু'আ করা। এটাও হারাম।

তৃতীয় প্রকারঃ কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন গাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছেড়া, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই হারাম এবং ধৈর্য্য ধারণের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় স্তরঃ বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করা। যেমন কোন আরবী কবি বলেছেন 'বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এর শেষ পরিণাম খুবই সুমধুর।' কেননা এই সবর করাটা তার নিকট খুবই কঠিন তবুও সে সবর করে। বিপদগ্রস্ত হওয়াটা যেমন অপছন্দ করে তেমনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাটাও তার নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু তার ঈমান তাকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। মোটকথা সে বিপদে আপতিত হওয়া এবং না হওয়াকে এক মনে করে না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আনফালঃ ৪৬)

তৃতীয় স্তরঃ বিপদ আসার পর সন্তুষ্ট থাকা এবং মুসিবত আসা ও না আসা উভয়কেই সমান মনে করা। তাই বিপদ আসলেও তার কাছে বিপদ সহ্য করা বেশী কঠিন মনে হয় না। গ্রহণযোগ্যমতে এধরণের ছবর মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। এটা এবং পূর্ববর্তী স্তরের মাঝে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। বিপদ হওয়া এবং না হওয়া সমান মনে হওয়া সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ প্রকারের এবং পূর্বের প্রকারের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের প্রকারে বিপদে আপতিত ব্যক্তি বিপদকে কঠিন মনে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে।

চতুর্থ স্তরঃ শুকরিয়া আদায় করা। এটা সর্বোচ্চ স্তর। তা এই যে, বিপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা। কারণ সে ভাল করেই জানে যে, এ সমস্ত বিপদাপদ গুনাহ মোচন এবং ছাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.)

অর্থঃ কোন মুসলিম বিপদাপদে পতিত হলে বিনিময়ে আল্লাহ তাআ'লা তার গুনাহ মোচন করেন। এমন কি শরীরে একটি কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গুনাহ মাফকরা হয়। [1]

রোগ কি একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়?

প্রশ্নঃ (৬৫) সম্মানিত শায়খ! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, (لا عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صـــفر) "একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়না। পাখী

[1] - বুখারী, কিতাবুল মারাজ্ব ওয়াত্ তিব্ব।

উড়িয়ে বা পাখীর ডাক শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণের নিয়ম ইসলামে নেই। সফর মাসকেও অশুভ মনে করাও ঠিক নয়। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাই। হাদীছে বর্ণিত জিনিষগুলোর প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলো কোন ধরণের অস্বীকার ? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, "কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন কর যেভাবে তুমি বাঘ থেকে ভয়ে পলায়ন কর"। এই হাদীছ ও প্রথমোক্ত হাদীছের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করব?

উত্তরঃ একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হওয়াকে আদ্‌ওয়া বলা হয়। শারীরিক রোগে যেমন এটা হয়, তেমনি চারিত্রিক রোগের ক্ষেত্রেও এমন হয়ে থাকে। এ জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, অসৎ বন্ধু কামারের ন্যায়। সে হয়ত তোমার জামা পুড়িয়ে ফেলবে। তা না হলে কমপক্ষে তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

কোন জিনিষ দেখে, কোন কথা শুনে বা জানার মাধ্যমে কুলক্ষণ মনে করাকে 'ত্বিয়ারা' বলা হয়। 'হামাহ' এর ব্যাখ্যা দু'ধরণ হতে পারে। ক) এমন রোগ, যা একজনকে আক্রমণ করে অন্যজনের নিকট সংক্রমিত হয়। খ) 'হামাহ' বলা হয়, আরবদের ধারণামতে এমন এক শ্রেণীর পাখিকে, যে গভীর রাতে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পরিবারের লোকদেরকে ডাকাডাকি করে এবং প্রতিশোধ নেয়ার উৎসাহ দেয়। কেউ কেউ ধারণা করে যে, এটি নিহত ব্যক্তির রূহ পাখির আকৃতি ধরে উপস্থিত হয়েছে। এই পাখিটিকে আমাদের পরিভাষায় হুতুম পেঁচা বলা হয়। তৎকালিন আরবরা এ পাখির ডাককে কুলক্ষণ মনে করত। কারো ঘরের পাশে এসে এ পাখি ডাকলে তারা বিশ্বাস করত যে, সে মৃত্যু বরণ করবে।

'ছফর' এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (১) আরবী ছফর মাস। আরবরা এ মাসকে অকল্যাণের মাস মনে করত। (২) এটি উটের এক ধরণের রোগের নাম, যা এক উটের শরীর থেকে অন্য উটের শরীরে সংক্রমিত হয়। (৩) ছফর মাসকে আরবরা কখনো হারাম মাসের সাথে গণনা করত। আবার কখনো হালাল মাস হিসাবে গণ্য করত। এটি আরবদের গোমরাহী মূলক একটি আচরণ।

তবে উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য কথা হল, জাহেলী সমাজের লোকেরা ছফর মাসকে অমঙ্গলের মাস মনে করত। মূলতঃ কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণে সময় বা মাসের কোন প্রভাব নেই। ছফর মাস অন্যান্য মাসের মতই। তাতে কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

উপরে বর্ণিত ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডন করতে গিয়ে কোন কোন মানুষ যখন ছফর মাসে কোন কাজ সমাধা করে, তখন সেই তারিখ লিখে রাখে এবং বলে কল্যাণের মাস ছফর মাসের অমুক তারিখে কাজটি সমাধা হল। এটি এক বিদ্‌আত দ্বারা অন্য বিদ্‌আতের এবং এক অজ্ঞতা দ্বারা অন্য অজ্ঞতার চিকিৎসা করার শামিল। এটি কল্যাণের মাসও নয় এবং

অকল্যাণের মাসও নয়। এই জন্যই কোন কোন বিদ্বান পেঁচার ডাক শুনে (خيرا ان شاء الله) "আল্লাহ চাহেতো ভাল হবে" এ কথা বলার প্রতিবাদ করেছেন। ভাল বা খারাপ কোন কিছুই বলা যাবে না। সে অন্যান্য পাখির মতই ডাকে।

উপরের চারটি বিষয়ের প্রভাবকে হাদীছে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহর উপর ভরসা করা সকল মু'মিনের উপর আবশ্যক। এতে ঈমান মজবুত হবে। এ সমস্ত কুসংস্কারের সামনে মুমিন ব্যক্তি কখনো দুর্বল হবে না।

কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন এ সমস্ত বিষয়ের প্রভাবকে বিশ্বাস করবে, তখন নিম্নলিখিত দু'অবস্থার এক অবস্থা হতে পারেঃ

(১) সে হয়ত বিশ্বাস করে সামনের দিকে অগ্রসর হবে অথবা থেমে যাবে। এ অবস্থায় তার কর্মসমূহ এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করল, যার কোন প্রভাব নেই।

(২) কোন কিছু পরওয়া না করে কাজের প্রতি অগ্রসর হবে, কিন্তু মনের ভিতরে দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তা থেকেই যাবে। কিন্তু এটি প্রথমটির চেয়ে হালকা। কারণ সে এ সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকে।

কিছু কিছু মানুষ শুভ-অশুভ নির্ধারণ করার জন্য কুরআন মাজীদ খুলে থাকে। খুলে জাহান্নামের আলোচনা দেখতে পেলে লক্ষণ ভাল নয় বলে মনে করে। আর জান্নাতের আলোচনা দেখতে পেলে খুশী হয়। এটি জাহেলী যামানার লোকদের কাজের মতই। যারা জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত জিনিষগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। কারণ এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এগুলোর প্রভাবকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেনে নেন নি। আল্লাহই সকল বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তারকারী। সুতরাং যদি জানা যায় যে, কোন বস্তু সংঘটিত হওয়াতে সঠিক কারণ রয়েছে, তাহলে তাকে কারণ হিসাবে বিশ্বাস করা বৈধ। কিন্তু নিছক ধারণা করে কোন ঘটনায় অন্য বস্তুর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কোন বস্তু নিজে নিজেই অন্য ঘটনার কারণ হতে পারে না। সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "অসুস্থ উটের মালিক যেন সুস্থ উটের মালিকের উটের কাছে অসুস্থ উটগুলো নিয়ে না যায়।"[1] সুস্থ উটগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ রকম বলেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ

(فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ)

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

সিংহের ভয়ে তুমি যেমন পলায়ন কর, জুযাম (কুষ্ঠ) রোগী দেখেও তুমি সেভাবে পলায়ন কর।[1] আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এখানে রোগের চলমান শক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে রোগ নিজস্ব ক্ষমতা বলে অন্যজনের কাছে চলে যায় তা অনিবার্য নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৫) এটা বলা যাবে না যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোগের সংক্রমন হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কেননা বাস্তব অবস্থা ও অন্যান্য হাদীছের মাধ্যমে এ রকম ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে।

যদি বলা হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বললেন, রোগ সংক্রামিত হয়না, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! মরুভূমিতে সম্পূর্ণ সুস্থ উট বিচরণ করে। উটগুলোর কাছে যখন একটি খুজ্লিযুক্ত উট আসে, তখন সব উটই খুজ্লিযুক্ত হয়ে যায়। তিনি বললেন, প্রথম উটটিকে কে খুজ্লিযুক্ত করল?[2]

উত্তর হল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্তি "প্রথমটিকে কে খুজ্লিযুক্ত করল ?" এর মাধ্যমেই জবাব দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগের জীবানু অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে সুস্থ ব্যক্তির নিকট গমণ করে থাকে। তাই আমরা বলব যে, প্রথম উটের উপরে সংক্রামক ব্যতীত আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগ নাযিল হয়েছে। কোন ঘটনার পিছনে কখনো প্রকাশ্য কারণ থাকে। আবার কখনো প্রকাশ্য কোন করণ থাকে না। প্রথম উট খুজ্লিযুক্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় উট খুজ্লিযুক্ত হওয়ার কারণ যদিও জানা যাচ্ছে, তথাপি আল্লাহ চাইলে খুজ্লিযুক্ত হত না। তাই কখনো খুজলিতে আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে ভালও হয়ে যায়। আবার কখনো মারাও যায়। এমনিভাবে প্লেগ, কলেরা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও একই কথা। একই ঘরের কয়েকজন আক্রান্ত হয়। কেউ মারা যায় আবার কেউ রেহাই পেয়ে যায়। মানুষের উচিৎ আল্লাহর উপর ভরসা করা। বর্ণিত আছে যে, 'একজন কুষ্ঠ রোগী লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আসল। তিনি তার হাত ধরে বললেন, আমার সাথে

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

খাও।'[1] আল্লাহর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা থকার কারণেই তিনি তাকে খানায় শরীক করেছিলেন।

উপরের বিরোধপূর্ণ হাদীছগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে যা বলা হল, তাই সর্বোৎকৃষ্ট। কেউ কেউ প্রশ্নের শেষোক্ত হাদীছকে মানসুখ বা রহিত বলেছেন। রহিত হওয়ার দাবী ঠিক নয়। কেননা রহিত হওয়ার অন্যতম শর্ত হল বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে সমঝোতা করা সম্ভব না হওয়া। উভয় হাদীছের মধ্যে মিল দেয়া সম্ভব হলে উভয় হাদীছের উপর আমল করতে হবে। আর রহিত হওয়ার দাবী করলে এক পক্ষের হাদীছের উপর আমল বাতিল হয়ে যায়। এক পক্ষের হাদীছগুলো বাতিল করার চেয়ে উভয় পক্ষের হাদীছগুলোর উপর আমল করাই উত্তম।

বদ নজরের প্রকৃতি কি এবং তার চিকিৎসা কি ?

প্রশ্নঃ- (৬৬) মানুষের উপর কি বদ নজর লাগে ? লাগলে তার চিকিৎসা কি ? এ থেকে বেঁচে থাকা কি আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী ?

উত্তরঃ- বদ নজরের প্রভাব সত্য। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ﴾

"কাফেরেরা তাদের দৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে চায়।" (সূরা আল-কলমঃ ৫১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا)

"বদ নজরের প্রভাব সত্য। কোন জিনিষ যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত, তাহলে বদ নজর তাকে অতিক্রম করত। তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করবে এবং গোসলে ব্যবহৃত পানি দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করবে।"[2] নাসাঈ এবং ইবনে মাজার হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা আমের ইবনে রাবীয়া সাহল ইবনে হুনাইফের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সাহল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) তখন গোসল করতে ছিলেন। আমের ইবনে রাবীয়া সাহলকে দেখে বলল, আমি আজকের মত লুকায়িত সুন্দর চামড়া আর কখনো দেখিনি। এ কথা বলার কিছুক্ষণ পর সাহ্ল অসুস্থ হয়ে পড়ে গেল। তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে নিয়ে এসে বলা হল, সাহ্ল বদ নজরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা কাকে সন্দেহ করছ? তারা বলল, আমের ইবনে রাবীয়াকে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কেন তোমাদের কেউ তার ভাইকে হত্যা করতে চায়। কেউ যদি কারো মধ্যে

---

[1] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

[2] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।

ভাল কিছু দেখে, তাহলে সে যেন তার জন্য ভাই এর কল্যাণ কামনা করে এবং দু'আ করে। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং আমেরকে অযু করতে বললেন। অযুতে মুখমন্ডল, কনুই সহ উভয় হাত এবং হাটু পর্যন্ত এমনকি লুঙ্গীর নীচ পর্যন্ত ধৌত করে সাহলের শরীরে ঢালতে বললেন।[1] কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় পানির পাত্র যেন পেছন থেকে ঢালে। এটি বাস্তব ঘটনা, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

বদ নজরে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা হলঃ

(১) হাদীছে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করে আক্রান্ত রোগীর উপর ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَـيْنٍ أَوْ حُمَـةٍ "বদ নজর এবং বিচ্ছুর বিষ নামানোর ঝাড়-ফুঁক ব্যতীত কোন ঝাড়-ফুঁক নেই।"[2] জিবরীল (আঃ) নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই দু'আর মাধ্যমে ঝাড়তেন,

(بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ)

"আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি প্রতিটি এমন জিনিষ হতে, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক জীবের অমঙ্গল হতে ও হিংসুকের বদ নজর হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি।"[3]

(২) যার বদ নজর লাগছে বলে সন্দেহ করা হয়, তাকে গোসল করিয়ে গোসলের পানি রোগীর শরীরে ঢালতে হবে। যেমনভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমের বিন রাবীয়াকে গোসল করতে বলেছিলেন। সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তির পেশাব-পায়খানা বা অন্য কোন কিছু দিয়ে চিকিৎসা করার কোন দলীল নেই। অনুরূপভাবে তার উচ্ছিষ্ট বা অযুর পানি ইত্যাদি ব্যবহার করাও ভিত্তিহীন। হাদীছে যা পাওয়া যায় তা হল তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং লুঙ্গির নিচের অংশ ধৌত করা এবং সম্ভবতঃ মাথার টুপি, পাগড়ী বা পরিধেয় কাপড়ের নিচের অংশ ধৌত করা এবং তা ব্যবহার করাও বৈধতার অন্তর্ভূক্ত হবে।

বদ নজর লাগার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়াতে কোন দোষ নেই। এটা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থীও নয়। কারণ আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসার স্বরূপ হল বান্দা বৈধ উপকরণ অবলম্বন করে বদনজর ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে এবং সেই সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান-হুসাইন (রাঃ) কে এই বাক্যগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেনঃ

(أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ)

---

[1] - ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

[3] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।

"আমি আল্লাহর কাছে তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান এবং বিষধর বস্তু ও কষ্ট দায়ক নযর হতে তোমাদের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি।"[1] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসহাক এবং ইসমাঈল (আঃ) কে এই দু'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুক করতেন।[2]

প্রশ্নঃ (৬৭) আকীদার মাসআলায় কি অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য ?

উত্তরঃ আকীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা হবে কি না এ বিষয়টি অন্যান্য ফিক্হী মাসআলার ন্যায় মতবিরোধপূর্ণ। ব্যক্তি বিশেষের উপর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এই মতভেদ শাব্দিক হতে পারে। অর্থ্যাৎ বিদ্বানগণ একমত যে, কোন একটি কথা বা কাজ করা বা ছেড়ে দেয়াটা কুফরী। কিন্তু যে ব্যক্তি এ কুফরীতে লিপ্ত হল, নির্দিষ্টভাবে তার উপর কি কুফরীর বিধান প্রযোজ্য হবে ? কেননা সেখানে কুফরীর শর্তসমূহ বিদ্যামান এবং কাফের না হওয়ার প্রতিবন্ধতা নেই। না কি কাফের হওয়ার দাবী অবর্তমান থাকায় বা কাফের হওয়ার কোন প্রতিবন্ধক থাকায় উক্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা প্রযোজ্য হবে না ? এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যে সমস্ত কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায় সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতা দু'ধরণের হতে পারে।

(১) এমন ব্যক্তি হতে কুফরী প্রকাশ পাওয়া, যে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারী অথবা সে কোন দ্বীনই বিশ্বাস করে না এবং সে এটা কোন সময় কল্পনাও করতে পারেনি যে, সে যে বিষয়ের উপর রয়েছে, তা ইসলাম বহির্ভুত। এই ব্যক্তির উপর দুনিয়াতে কাফেরের বিধান প্রয়োগ করা হবে। আখেরাতের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হল, আল্লাহ পরকালে তাকে যেভাবে পরীক্ষা করবেন। তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু আমরা এ কথা ভাল করেই জানি যে, বিনা অপরাধে কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"আপনার প্রতিপালক কাউকে জুলুম করবেন না।" (সূরা কাহ্ফঃ ৪৯) দুনিয়াতে তার উপর কুফরীর বিধান প্রয়োগ হওয়ার কারণ এই যে, সে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেনি। তাই তার উপর ইসলামের বিধান প্রয়োগ হবেনা। পক্ষান্তরে আখেরাতে তাকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কায়্যিম (রঃ) তাঁর রচিত "তরীকুল হিজরাতাইন" নামক বইয়ে মুশরিক শিশুদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন।

---

[1]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ নবীদের হাদীছ।

(২) এমন লোক থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়া, যার ধর্ম ইসলাম, কিন্তু সে এই কুফরী আকীদা নিয়ে বসবাস করছে অথচ সে জানে না যে, এই আকীদা ইসলাম বিরোধী। কেউ তাকে সতর্কও করে নাই। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুনিয়াতে ইসলামের বিধান প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হবে। পরকালের বিষয়টি আল্লাহর হাতে। কুরআন, সুন্নাহ এবং আলেমদের বাণী হতে এ মর্মে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

"রাসূল না পাঠিয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেবনা।" (সূরা ইসরাঃ ১৫) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾

"আপনার পালনকর্তা জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা যুলুম করে।" (সূরা কাসাস ৫৯) আল্লাহ বলেনঃ

﴿رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি ওজুহাত বা যুক্তি খাড়া করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" (সূরা নিসাঃ ১৬৫) আল্লাহ বলেন

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

"আমি সব রাসূলকেই তাদের জাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৪) আল্লাহ তাআ'লা সূরা তাওবায় এরশাদ করেনঃ

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾

"আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সে সব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার।" (সূরা তাওবাঃ ১১৫) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾

"এটি এমন একটি বরকতময় গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'টি সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিংবা এ কথা বলতে না পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা তাদের চাইতে অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অবশ্যই তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে।" (সূরা আন্‌আমঃ ১৫৫-৫৭) এমনি আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, মানুষের কাছে দ্বীনের শিক্ষা দান ও তা বর্ণনা করার পূর্বে হুজ্জত কায়েম হবে না।

ছহীহ মুসলিমর হাদীসে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)

"ঐ সত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এই উম্মাতের কোন ইয়াহুদী বা নাসারা আমার কথা শুনে আমার আনিত বিষয় সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন না করে মৃত্যু বরণ করলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।"[1]

আলেমগণ বলেন, কোন নও মুসলিম বা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী বা মুসলমানদের এলাকা থেকে দূরবর্তী স্থানের অধিবাসী হওয়ার কারণে কেউ যদি কুফরী কাজে লিপ্ত হয়, তাকে কাফের হওয়ার ফতওয়া দেয়া যাবেনা।[2] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যারা আমাকে চেনে, তারা অবশ্যই জানে যে, নির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফের বা ফাসেক বলা থেকে আমি কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকি। তবে যে ব্যক্তি কাফের বা ফাসেক হওয়ার কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত আছে, তার কথা ভিন্ন। আমি আবারও বলছি যে, এই উম্মতের কেউ ভুলক্রমে অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে আল্লাহ তাআ'লা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। চাই আকীদার মাসআলায় ভুল করুক কিংবা অন্য কোন মাসআলায়। **সালাফে সালেহীন অনেক মাসআলায় মতভেদ করেছেন। তারপরও কেউ কাউকে কাফের বলেন নি।** তাদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে, সে কাফের হয়ে যাবে, এটা ঠিক, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কর্মের উপরে হুকুম লাগানো এবং ব্যক্তির উপরে হুকুম লাগানোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। **শায়খুল ইসলাম আরো বলেন, কাউকে কাফের বলা অত্যন্ত ভয়ানক বিষয় করা হয়েছে।** কারণ কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি এমন হতে পারে

---

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

[2] - মুগনী, ৮/১৩১

যে, সে নও মুসলিম অথবা সে আলেম-উলামা থেকে দূরের কোন জনপদে বসবাস করছে। যার কারণে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারেনি। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে দ্বীনের কোন বিষয় অস্বীকার করলেই তাকে কাফের বলা যাবে না। যতক্ষণ না তার কাছে হুজ্জত (কুরআন-সুন্নাহর দলীল সমূহ) পেশ করা হবে। এও হতে পারে যে, সে দলীল-প্রমাণ শুনেনি অথবা শুনেছে কিন্তু বিশুদ্ধ সূত্রে তার কাছে পৌঁছেনি। কখনো এও হতে পারে যে, সে একজন আলেম। তার কাছে দলীল রয়েছে বা দলীলের ব্যাখ্যা রয়েছে। যদিও তা সঠিক নয়।[1]

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রঃ) বলেনঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলি, যে দ্বীনে মুহাম্মাদী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে গালি-গালাজ করল। শুধু তাই নয়; বরং মানুষকে আল্লাহর দ্বীন হতে বিরত রাখে এবং ধার্মিক লোকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আমি এই শ্রেণীর লোকদেরকে কাফের বলে থাকি।[2] তিনি আরো বলেন, যারা বলে আমরা ব্যাপকভাবে মানুষকে কাফের বলি এবং দ্বীন পালনে সক্ষম ব্যক্তিকেও আমাদের কাছে হিজরত করে চলে আসতে বলি, তারা অপবাদ প্রদানকারী মিথ্যুক। তারা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে বাঁধা দিয়ে থাকে। আব্দুল কাদের জিলানী এবং সায়্যেদ আহ্মাদ বাদভীর কবরের উপরে যে মূর্তি রয়েছে, তার উপাসকদেরকে যদি অজ্ঞতার কারণে এবং তাদেরকে কেউ সতর্ক না করার কারণে কাফের না বলি, তাহলে কিভাবে আমরা এমন নির্দোষ লোকদেরকে আমাদের দিকে হিজরত না করার কারণে কাফের বলব, যারা কখনো আল্লাহর সাথে শরীক করেনি এবং আমাদেরকে কুফর প্রতিপন্ন করেনি ও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে নি?[3]

আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাতএবং আলেমদের কথা অনুযায়ী দলীল-প্রমাণ পেশ করা ব্যতীত কাউকে কাফের বলা যাবে না। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের দাবীও তাই। তিনি অযুহাত পেশ করার সুযোগ দূর না করে কাউকে শাস্তি দিবেন না। বিবেক দ্বারা মানুষের উপরে আল্লাহর হক সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। যদি তাই হত, তাহলে রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে হুজ্জত পেশ করা যথেষ্ট হত না।

সুতরাং একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম হিসাবেই পরিগণিত হবে, যতক্ষণ না শরীয়তের দলীলের মাধ্যমে তার ইসলাম ভঙ্গ হবে। কাজেই কাফের বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ তা না হলে দু'টি বড় ধরণের ভয়ের কারণ রয়েছে।

---

[1] - মাজমূআয়ে ফাতোয়া ইবনে তাইমীয়াঃ ৩/৩৩৯।
[2] - আদ্ দুরারুস্ সানীয়াঃ ১/৫৬।
[3] - আদ্ দুরারুস্ সানীয়াঃ ১/৬৬।

(১) আল্লাহর উপর মিথ্যাচারিতার অপবাদ। সাথে সাথে যার উপর হুকুম লাগানো হল তাকেও এমন দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হল, যা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহর উপর মিথ্যাচারিতার অপবাদ এভাবে হয় যে, এমন ব্যক্তিকে কাফের বলা হয়েছে, যাকে আল্লাহ কাফের বলেন নি। এটি আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার শামিল। কেননা কাউকে কাফের বলা বা না বলা এটি কেবলমাত্র আল্লাহরই অধিকার। যেমনিভাবে কোন কিছু হারাম করা বা হালাল করার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে।

(২) দ্বিতীয় সমস্যাটি হল মুসলিম ব্যক্তি যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার বিপরীত অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। কেননা যখন কোন মুসলিমকে লক্ষ্য করে কাফের বলবে, তখন সে যদি কাফের না হয়, তাহলে ফতোয়াদানকারী নিজেই কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ছহীহ মুসলিমে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا))

"যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফের বলবে, তখন তাদের দু'জনের একজন কাফেরে পরিণত হবে।"[1] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যাকে কাফের বলা হল, সে যদি কাফের হয়ে থাকে তাহলে কাফের হবে। অন্যথায় ফতোয়া দানকারী নিজেই কাফেরে পরিণত হবে।[2] মুসলিম শরীফে আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

((وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ))

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের বলবে অথবা আল্লাহর শত্রু বলবে, সে অনুরূপ না হয়ে থাকলে যে বলল সে নিজেই কাফের বা আল্লাহর শত্রু হিসাবে পরিণত হয়ে যাবে।"[3] যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফের বলে, সে নিজের আমল নিয়ে অহংকার করে এবং অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে। এ ধরণের ব্যক্তি দু'টি সমস্যার সম্মুখীন। নিজের আমলকে খুব বড় মনে করলে আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার মধ্যে অহংকার আসার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ))

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।
[2] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।
[3] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

"আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর। বড়ত্ব আমার পোষাক। যে ব্যক্তি আমার এ দু'টির যে কোন একটি পোষাক নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"[1] সুতরাং কাউকে কাফের বলার পূর্বে দু'টি বিষয় খেয়াল করতে হবেঃ

(১) আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের হাদীসে কাজটিকে কুফরী বলা হয়েছে কি না। যাতে করে আল্লাহর উপর মিথ্যাচারিতায় লিপ্ত না হয়।

(২) যার ভিতরে কাফের হওয়ার কারণ ও শর্তসমূহ বিদ্যমান এবং কাফের না হওয়ার যাবতীয় বাঁধামুক্ত। কেবলমাত্র তার উপরই কুফরীর বিধান প্রয়োগ করা। কাফের হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, জেনে-শুনে শরীয়ত বিরোধী এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যা কুফরীকে আবশ্যক করে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তন করাবো, যাতে সে প্রত্যাবর্তন করতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর ওটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।" (সূরা নিসাঃ ১১৫) উক্ত আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার শর্ত হল হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধিতা করা।

কাজটি করলে কাফের হয়ে যাবে, এটা জানা কি জরুরী ? নাকি কাজটি শরীয়তে নিষেধ এতটুকু জানাই যথেষ্ট ? যদিও কাজটির ফলাফল সম্পর্কে অবগত না থাকে।

উত্তর হল, কাজটি শরীয়তে নিষেধ একথা জেনে তাতে লিপ্ত হলেই হুকুম লাগানোর জন্য যথেষ্ট। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে এক লোকের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছিলেন। কারণ সে জানতো দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা জানতো না। বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচারকে হারাম জেনে তাতে লিপ্ত হলে তাকে রজম করতে হবে। যদিও সে বিবাহিত যেনাকারীর শাস্তি যে রজম, তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

জোর পূর্বক কাউকে কুফরী কাজে বাধ্য করা হলে, তাকে কাফের বলা যাবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

[1] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস।

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

“কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহর সাথে কুফরীতে লিপ্ত হলে এবং কুফরীর জন্য অন্তরকে খুলে দিলে তার উপর আপততি হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।” (সূরা নাহ্‌লঃ ১০৬)

অধিক আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে বা চিন্তিত অবস্থায় অথবা রাগান্বিত হয়ে অথবা ভীত অবস্থায় কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফের হয়ে যাবে না। আল্লাহর বাণী,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

“ভুলক্রমে কোন অপরাধ করলে তোমাদেও কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমাদেও অন্তওে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আহ্‌যাবঃ ৫) ছহীহ মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

((لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ))

“গুনাহ করার পর বান্দা যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাআ'লা ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে একটি বাহনের উপর আরোহন করে মরুভূমির উপর দিয়ে পথ চলতে ছিল। এমন সময় বাহনটি তার খাদ্য-পানীয় সব নিয়ে পলায়ন করল। এতে লোকটি নিরাশ হয়ে একটি গাছের নিচে এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নিদ্রায় থাকার পর হঠাৎ উঠে দেখে বাহনটি তার সমস্ত আসবাব পত্রসহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে বলে উঠল, হে আল্লাহ! আপনি আমার গোলাম, আমি আপনার রব। খুশীতে আত্মহারা হয়েই সে এ ধরণের ভুল করেছে।”[1]

কাফের বলার পথে আরেকটি বাধা হল কাজটি কুফরী হওয়ার ব্যাপারে কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির কাছে **তা'বীল বা ব্যাখ্যা** থাকা। যে কারণে সে মনে করে যে, সে সত্যের উপরই আছে। কাজেই সে তার ধারণা মতে পাপ বা শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়নি। এমতাবস্থায় সে নিম্নোক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হবে যেখানে আল্লাহ বলেনঃ

---

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাওবাহ।

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"ভুলক্রমে কোন অপরাধ করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহ্‌যাবঃ ৫) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।" (সূরা বাকারাঃ ২৮৬)

ইমাম ইবনে কুদামা আলমাকদেসী বলেন, কোন প্রকার সন্দেহ বা ব্যাখ্যা ব্যাতীত কেউ যদি নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হালাল ভেবে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি তা'বীল করে কাফের ভেবে হত্যা করে এবং সম্পদ হালাল জেনে আত্মসাৎ করে, তবে তাদেরকে কাফের বলা হবে না। এ জন্যে খারেজীদেরকে অধিকাংশ আলেমগণ কাফের বলেন নি। অথচ তারা মুসলমানদের জান-মাল হালাল মনে করে এবং এ কাজের দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে বলে মনে করে। তাদেরকে কাফের না বলার কারণ এই যে, তারা তা'বীল বা অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল। তিনি আরো বলেনঃ খারেজীরা অনেক ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করত। শুধু তাই নয় এ কাজকে তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম মনে করত। তা সত্বেও আলেমগণ তাদেরকে কাফের বলেন নি। কারণ তাদের কাছে অপব্যাখ্যা ছিল।[1]

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেন, কুরআনের বিরোধীতা করা খারেজীদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং কুরআন বুঝতে গিয়ে ভুল করার কারণে তারা বিদ্‌আতে লিপ্ত হয়ে পাপী মুমিনদেরকে কাফের মনে করেছে।[2] তিনি আরো বলেনঃ খারেজীরা কুরআনের বিরোধীতা করে মুমিনদেরকে কাফের বলেছে। অথচ কুরআনের ভাষায় মুমিনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তারা বিনা ইলমে, সুন্নার অনুসরণ না করে এবং প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে না গিয়ে কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করেছে। তিনি আরো বলেনঃ ইমামগণ ঐক্যবদ্ধভাবে খারেজীদেরকে নিন্দা করেছেন এবং গোমরাহ বলেছেন। তবে তাদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, আলী (রাঃ) বা অন্য কোন ছাহাবী তাদেরকে কাফের বলেন নি; বরং তাদেরকে যালেম এবং সীমা লংঘনকারী মুসলমান হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও অন্যান্য ইমামগণ থেকেও এ ধরণের কথা বর্ণিত আছে। ইমাম

---

[1] - খারেজীর বিশ্বাস এই যে, কোন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যায় এবং তার জান-মাল হালাল হয়ে যায়।

[2] - মাজমূআয়ে ফতোয়া ইবনে তাইমীয়াঃ ১৩/৩০।

ইবনে তাইমীয়া আরো বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খারেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন। চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। ছাহাবী ও পরবর্তী উত্তম যুগের ইমামগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। আলী (রাঃ), সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বা অন্য কোন সাহাবী খারেজীদেরকে কাফের বলেন নি; বরং তাদেরকে মুসলমান মনে করেছেন। তারা যখন অন্যায়ভাবে মানুষের রক্তপাত শুরু করল এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের উপর আক্রমণ করল তখন আলী (রাঃ) তাদের এই যুলুম এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে কাফের মনে করে যুদ্ধ করেন নি। তাই তিনি তাদের মহিলাদেরকে দাসী হিসাবে বন্দী করেন নি এবং তাদের সম্পদকে গণীমত হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তাদের গোমরাহী কুরআনের দলীল, মুসলমানদের ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। তথাপিও আলেমগণ তাদেরকে কাফের বলেন নি। তাহলে কিভাবে এমন ফির্কার লোকদেরকে কাফের বলবেন, যাদের চেয়ে বড় আলেমগণ অনেক মাসআলায় ভুল করেছেন। সুতরাং এক দলের পক্ষে অপর দলকে কাফের বলা এবং জান-মাল হালাল মনে করা জায়েয নেই। যদিও তাদের ভিতরে বিদ্‌আত বর্তমান রয়েছে। মূল কথা তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে সে সম্পর্কে তারা সকলেই অজ্ঞ। তিনি আরো বলেনঃ কোন মুসলিম যদি তা'বীল করে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা কাউকে কাফের বলে, তবে উক্ত মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী থেকে যে হুকুম সাব্যস্ত হয়, দাওয়াত না পৌঁছিয়ে বান্দার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের তিন ধরণের বক্তব্য রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যই সঠিক। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

"রাসূল না পাঠিয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেবনা।" (সূরা ইসরাঃ ১৫)

﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

"সুসংবাদ দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি ওযুহাত পেশ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" (সূরা নিসাঃ ১৬৫) বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, আল্লাহর চেয়ে অধিক ওযর-অযুহাত গ্রহণকারী আর কেউ নেই। এই জন্যই আল্লাহ তাআ'লা সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূল প্রেরণ করেছেন।

মোট কথা অজ্ঞতার কারণে কেউ কুফরী করলে অথবা কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফের হবে না। এটাই আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাতএবং আলেমদের পথ।

প্রশ্নঃ (৬৮) যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে বানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের হুকুম কি ?

উত্তরঃ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বলছি যে, আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালানো বা বিচার-ফয়সালা করা তাওহীদে রুবূবীয়্যাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তাতে আল্লাহর রুবূবীয়্যাত,পরিপূর্ণ রাজত্ব এবং পরিচালনা ক্ষমতার দাবী অনুযায়ী তাঁর হুকুম কার্যকর করার নামান্তর। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বুদের এবাদত করবে, যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউ নয় তিনি তাদের অংশী স্থাপন করা হতে পবিত্র।" (সূরা তাওবাঃ ৩১) এখানে আল্লাহ তাআ'লা ইয়াহুদী-নাসারাদের ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসাবে নাম করণ করেছেন। কারণ তারাও আল্লাহর বিধানের মত বিধান রচনা করত। তাদের রচিত বিধানের অনুসারীদেরকে গোলাম বা বান্দা হিসাবে নাম দেয়া হয়েছে। কারণ তারা আল্লাহর বিধানের বিরোধীতা করে ঐ সব পাদ্রি ও আলেমদের কাছে নতি স্বীকার করত এবং তাদের অনুসরণ করত। আদী বিন হাতেম (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, তারা তো তাদের এবাদত করে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তারা হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে। আর সাধারণ লোকেরা তাদের অনুসরণ করে থাকে। এটার নামই এবাদত।[1]

আপনি জেনে নিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না; বরং অন্যের বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করতে চায়, তাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের আয়াতে তাদেরকে ঈমানহীন (মুনাফেক) দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতে কাফের, জালেম ও ফাসেক বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

[1] - তিরমিজী, অধ্যায় তাফসীরুল কুরআন।

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য শয়তানের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেনঃ তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং তাঁর রাসূলের দিকে এসো তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তখন কেমন হবে ? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ফিরে আসবে যে, কল্যাণ ও সমঝোতা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের (রাসূলগণের) আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবান রূপে পেত। অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল করে নিবে।" (সূরা নিসাঃ ৬০-৬৫)

এখানে আল্লাহ তাআ'লা ঈমানের দাবীদার মুনাফেকদের কয়েকটি বৈশিষ্ট তুলে ধরেছেনঃ

(১) মুনাফেকদের প্রথম বৈশিষ্ট হলো তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য গমণ করে থাকে। প্রত্যেক ঐ বিষয় বা ব্যক্তির নামই তাগুত, যে আল্লাহর বিধানের বিরোধীতা করে। সমস্ত বিচার-ফায়সালা এবং হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। আল্লাহ বলেনঃ

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"জেনে রাখ তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" (সূরা আ'রাফঃ ৫৪)

(২) তাদেরকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে আহবান করা হলে তারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৩) তারা কোন বিপদে পড়লে অথবা তাদের কৃতকর্ম মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলে শপথ করে বলে থাকে যে, সৎ উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বর্তমানে যারা ইসলামের বিধান বাদ দিয়ে বানব রচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট চালায়, তাদের কথাও একই রকম। তারা বলে, আমাদের উদ্দেশ্য হল যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধন করা।

আল্লাহ তাআ'লা উপরোক্ত চরিত্রের অধিকারী মুনাফেকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের অন্তরের খবর জানেন এবং তাদেরকে নসীহত করার জন্য এবং কঠোর ভাষায় কথা বলার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আদেশ দিয়েছেন। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হল, যাতে শুধুমাত্র তাঁদেরই অনুসরণ করা হয়। অন্য মানুষের অনুসরণ নয়। তাদের চিন্তাধারা ও মতবাদ যতই শক্তিশালী হোক না কেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা নিজের রুবূবীয়্যাতের শপথ করে তাঁর রাসূলকে বলছেন যে, তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ব্যতীত কারও ঈমান সংশোধন হবে না।

১) সকল প্রকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে রাসূলের দিকে ফিরে আসা।
২) রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য অন্তরকে প্রশস্ত করা।
৩) পরিপূর্ণভাবে রাসূলের ফায়সালাকে মেনে নেয়া এবং কোন প্রকার শীথিলতা ব্যতীত তা বাস্তবে রূপদান করা।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত সমূহে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফের।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৪)

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা যালেম।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৫)

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الفَاسِقُوْنَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা ফাসেক।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৭) যারা আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না তাদেরকে আল্লাহ উপরের তিনিটি আয়াতে পরপর কাফের, যালেম এবং ফাসেক বলেছেন। তিনটি গুণই কি এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পাওে ? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করল না, সে কাফের, ফাসেক এবং যালেমও বটে। কেননা আল্লাহ কাফেরদেরকে যালেম এবং ফাসেক হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾

"বস্তুতঃ কাফেরেরাই প্রকৃত জালেম।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৪) আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

"তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।" (সূরা তাওবাঃ ৮৪) প্রত্যেক কাফেরই কি যালেম এবং ফাসেক? নাকি আল্লাহর আইন দিয়ে ফায়সালা না করার কারণে বিভিন্ন প্রকার মানুষের উপর অবস্থাভেদে এ সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় মতটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য। **অর্থাৎ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার না করলে মানুষ কখনো কাফের হয়, কখনো যালেম হয় আবার অবস্থাভেদে কখনো ফাসেক হয়।**

সুতরাং আমরা বলব যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ মনে করে এবং অন্য বিধানকে অধিক উপযোগী ও উপকারী মনে করে তার মাধ্যমে মানুষের বিচার-ফায়সালা করে, তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাবে। এদের অন্তর্ভূক্ত ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের জন্য পথ হিসাবে ইসলাম বিরোধী বিধান রচনা করে। তারা তাদের রচিত বিধানকে মানুষের জন্য অধিক উত্তম ও উপযোগী মনে করেই তৈরী করে থাকে। এ কথা স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মানুষ এক পথ ছেড়ে দিয়ে যখন অন্য পথে চলে, তখন এটা মনে করেই চলে যে, প্রথম পথের চেয়ে দ্বিতীয় পথটি উত্তম।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং বিচার-ফায়সালা করে কিন্তু সে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে না এবং অন্য বিধানকে অধিক উপকারী এবং উপযোগীও মনে করে না বরং সে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এরূপ করে থাকে, তাহলে কাফের হবে না বরং যালেম হিসাবে গণ্য হবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধানের মাধ্যমে রাষ্টীয় বিচার-ফায়সালা করে কিন্তু সে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে না এবং অন্য বিধানকে অধিক উপকারী এবং উপযোগীও মনে করে না, বরং বিচার প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ঘুষ গ্রহণের জন্য কিংবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য এরূপ করে থাকে, তা হলে কাফের হবে না; বরং সে ফাসেক হিসাবে গণ্য হবে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব্ব (প্রভু) হিসাবে গ্রহণ করে, তারা দু'প্রকার।

(১) তারা জানে যে, তাদের গুরুরা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারপরও তারা তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের হালাল করা বস্তুকে হালাল ও হারামকে হারাম হিসাবে বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে তাদের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। তারা ভাল করেই জানে যে, তাদের নেতারা রাসূলদের আনীত দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। এটাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল শির্ক হিসাবে ব্যক্ত করেছেন।

(২) তারা কেবলমাত্র হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে। তারা আল্লাহর নাফরমানীতে তাদের নেতাদের অনুসরণ করেছে। যেমনভাবে

মুসলমানেরা হারাম জেনেও পাপকাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাদের হুকুম অন্যান্য পাপীদের মতই।

গাইরুল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করা বড় শির্ক

প্রশ্নঃ (৬৯)গাইরুল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করার হুকুম কি ? গাইরুল্লাহর নামে যবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয আছে কি ?

উত্তরঃ গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করা বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কেননা যবাই করা একটি এবাদত। আল্লাহ তাআ'লা এ মর্মে আদেশ দিয়ে বলেনঃ

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"আপনার প্রভুর জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।" (সূরা কাউছারঃ ২)

﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

"আপনি বলুন! আমার নামায, আমার সমস্ত এবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্যে আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।" (সূরা আনআ'মঃ ১৬২-১৬৩) সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে পশু যবাই করবে, চাই সে কোন ফেরেশতার উদ্দেশ্যে করুক বা নবী-রাসূলের উদ্দেশ্যে বা কোন অলী বা আলেমের উদ্দেশ্যে করুক, সবই শির্কে পরিণত হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হবে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ এ ধরণের শির্কে লিপ্ত না হওয়া। আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।" (সূরা মায়িদাঃ ৭২)

গাইরুল্লাহর জন্যে যবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

"তোমাদের জন্যে মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পতিত হয়ে মারা যাওয়া পশু, অন্য পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে যা তোমরা যবাই দ্বারা পবিত্র করেছ, তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে, তাও তোমাদের জন্য হারাম।" (সূরা মায়িদাঃ ৩)

প্রশ্নঃ (৭০) আল্লাহ বা তাঁর রাসূল অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ এই কাজটি অর্থাৎ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা কুরআন অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা কুফরী। যদিও তা মানুষকে হাসানোর নিয়তে হয়ে থাকে না কেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এ রকম বিদ্রুপের একটি ঘটনা ঘটেছিল। একদা মুনাফেকরা তাঁকে এবং সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা এ সমস্ত লোকদের চেয়ে অধিক পেট পূজারী, অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদের চেয়ে অধিক ভীতু আর কাউকে দেখিনি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা কেবল হাসি-তামাসা করছিলাম।" (সূরা তাওবাঃ ৬৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যখন অভিযোগ আসল, তখন তারা বলল, পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য যে সমস্ত কথা-বার্তা বলা হয়, আমরা শুধু তেমন কিছু কথাই বলছিলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিলেন।

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"বলুন! তোমরা কি আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-তামাসা করছিলে ? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান প্রকাশের পর কুফরী করেছো।" (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬) কাজেই আল্লাহ তাআ'লা, রিসালাত, অহী এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত পবিত্র। এগুলোর কোন একটি নিয়ে ঠাট্টা করা বৈধ নয়। যে এরূপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ তার কাজটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব এবং শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রমাণ বহন করে। যারা এ ধরণের কাজ করবে, তাদের উচিৎ আল্লাহর দরবারে তাওবা করে এবং ক্ষমা চেয়ে নিজেকে সংশোধন করা। তাদের উচিৎ আল্লাহর প্রতি ভয় ও সম্মান দিয়ে অন্তরকে পরিপূর্ণ করা।

প্রশ্নঃ- (৭১) কবরবাসীর কাছে দু'আ করার বিধান কি?

উত্তরঃ– দু'আ করাদু' প্রকারঃ

(১) এবাদতের মাধ্যমে দু'আ। যেমনঃ নামায, রোযা এবং অন্যান্য এবাদত। মানুষ যখন নামায আদায় করে কিংবা রোযা রাখে, তখন সে প্রভুর কাছে উক্ত এবাদতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। আল্লাহর বাণী,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين ﴾

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার করতঃ আমার এবাদত হতে বিমুখ হবে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা মুমিনঃ ৬০) আল্লাহ তাআ'লা দু'আকে এবাদত

হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এবাদতের কোন প্রকার আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে পেশ করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফেরে পরিণত হবে। সুতরাং কেউ যদি কোন বস্তুকে আল্লাহর মত সম্মানিত ভেবে তার সামনে রুকূ অথবা সেজদা করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফেরে পরিণত হবে। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শির্কের দরজা বন্ধ করার জন্য পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় কারো সামনে মাথা নত করতে নিষেধ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ব্যক্তি কি মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাতে মাথা নত করবে ? উত্তরে তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন। সালাম দেয়ার সময় অজ্ঞ লোকেরা যদি আপনার সামনে মাথা নত করে, তবে আপনার উপর আবশ্যক হল, তাদের কাছে বিষয়টি বর্ণনা করে দেয়া এবং তাকে নিষেধ করে দেয়া।

(২) কোন প্রয়োজনে কারো নিকট কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা। এটি সকল ক্ষেত্রে শির্ক নয়।

প্রথমতঃ যার কাছে দু'আ করা হবে, সে যদি জীবিত হয়ে থাকে এবং প্রার্থিত বস্তু প্রদান করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে শির্ক হবে না। যেমন আপনি কাউকে বললেন, আমাকে পানি পান করান, আমাকে দশটি টাকা দিন, ইত্যাদি। এ ধরণের কথা শির্ক নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদেরকে যখন কেউ আহবান করে, তবে তোমরা তার আহবানে সাড়া দাও।[1] আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾

"সম্পদ বন্টনের সময় আত্মীয়, ইয়াতীম এবং মিসকীন উপস্থিত হলে, তাদেরকে তা থেকে রিযিক হিসেবে কিছু দান কর।" (সূরা নিসাঃ ৮) সুতরাং ফকীর যদি হাত বাড়ায় এবং বলে আমাকে কিছু দান করুন, তাহলে তা জায়েয হবে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেনঃ "তোমরা তাদেরকে রিযিক হিসেবে কিছু দাও।"

দ্বিতীয়তঃ যার কাছে দু'আ করা হল, সে যদি মৃত হয়, তাহলে শির্ক হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হবে।

বড়ই আফসোসের বিষয় হলো যে, কিছু কিছু মুসলিম অধ্যষিত দেশে এমন অনেক মুসলমান রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কবরে দাফনকৃত মাটির সাথে মিশে যাওয়া মৃত লোকটি উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে অথবা সন্তানহীনকে সন্তান দিতে সক্ষম। এটি বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ ধরণের শির্ককে সমর্থন করা মদ্য পান, ব্যভিচার এবং অন্যান্য পাপ কাজ সমর্থন করার চেয়েও জঘণ্য। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন মুসলমানদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুন্ নিকাহ।

আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কি ?

প্রশ্নঃ (৭২) কাউকে আল্লাহর ওলী ভেবে তার কাছে বিপদে উদ্ধার কামনা করার জন্য ফরিয়াদ করা কি ? আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কি ?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআ'লা ওলী হওয়ার গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

"মনে রেখো যে, আল্লাহর ওলীদের না কোন আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে।" (সূরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩) ঈমান এবং তাকওয়া আল্লাহর ওলী হওয়ার প্রধান আলামত। সুতরাং যে মুমিন হবে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে, সেই আল্লাহর অলী বা বন্ধু। যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, তারা আল্লাহর বন্ধু নয়; বরং তারা আল্লাহর শত্রু। আলাহ বলেনঃ

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর ফেরেশতাগণের, জিবরীলের এবং মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফেরদের শত্রু।" (সূরা বাকারাঃ ৯৮) সুতরাং যে কোন মুসলিম গাইরুলাহর কাছে দু'আ করবে অথবা গাইরুলাহর কাছে এমন বিষয়ে ফরিয়াদ করবে, যে বিষয়ে তার কোন ক্ষমতা নেই, সে কাফের-মুশরিকে পরিণত হবে। সে কখনই আল্লাহর ওলী হতে পারে না। যদিও সে তা দাবী করে থাকে। বরং তাওহীদ, ঈমান এবং তাকওয়া বিহীন তার এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার উপদেশ হল, তারা যেন ভন্ড ওলীদের মাধ্যমে প্রতারিত না হয় এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব এবং ছহীহ হাদীছের দ্বারস্থ হয়। তবেই তাদের আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই হবে এবং মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করবে। এতে ভন্ডদের হাত থেকে তাদের ধন-সম্পদও হেফাজতে থাকবে। তেমনিভাবে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহকে আঁক ড়ে ধরার মধ্যে রয়েছে তাদেরকে ধোকার পথ হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা। যারা কখনো নিজেদেরকে সায়্যেদ আবার কখনো ওলী হিসাবে দাবী করে, আপনি যদি তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, তারা আল্লাহর ওলী বা সায়্যেদ হওয়ার গুণাগুণ হতে সম্পূর্ণ দূরে। প্রকৃত পক্ষে যিনি আল্লাহর ওলী হবেন, তিনি নিজেকে ওলী হিসাবে প্রকাশ করা থেকে দূরে থাকবেন। আপনি তাকে পরহেজগার মুমিন হিসাবে দেখতে পাবেন। তিনি প্রকাশ করবেন না। তিনি মানুষের মাঝে ওলী হিসাবে প্রকাশিত হন বা মানুষ তার দিকে ধাবিত হোক, কোনটাই পছন্দ করবেন না। কোন মানুষ যদি এতটুকু কামনা করে যে, লোকেরা তাকে সম্মান করুক, তার কাছে এসে ভীড় করুক, তাহলে এটা হবে তাকওয়া এবং ওলী হওয়ার পরিপন্থী। যে ব্যক্তি মূর্খদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলেমদের সাথে

বিতর্ক করা কিংবা লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অর্জন করবে, তার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কঠিন সতর্ক বাণী এসেছে। যারা নিজেদেরকে ওলী হিসাবে দাবী করে এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, তারা প্রকৃত ওলীর গুণাগুণ হতে অনেক দূরে। *

মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার নসীহত হল, তারা যেন এ সমস্ত ভন্ডদের থেকে সাবধান থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফিরে এসে আল্লাহকেই একমাত্র আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল হিসাবে গ্রহণ করেন।

প্রশ্নঃ (৭৩) যাদু কাকে বলে? যাদু শিক্ষার হুকুম কি?

উত্তরঃ আলেমগণ বলেন, যাদু বলা হয় প্রত্যেক এমন ক্রিয়া-কলাপকে, যার কারণ অস্পষ্ট ও গোপন থাকে, কিন্তু বাইরে তার প্রভাব দেখা যায়। গণক এবং জ্যোতিষের কার্যকলাপও যাদূর অন্তর্ভূক্ত। চাকচিক্যময় বক্তব্য ও ভাষার প্রভাবকেও যাদু বলা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِــحْرًا) "নিশ্চয়ই কিছু কিছু বক্তৃতার মধ্যে যাদু রয়েছে।"[1] সুতরাং প্রতিটি বস্তুর গোপন প্রভাবকে যাদু বলা হয়।

আর পরিভাষায় এমন কিছু গিরা এবং ঝাড়ফুঁকের নাম, যা মানুষের অন্তর, মস্তিস্ক এবং শরীরের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করতঃ কখনো জ্ঞান শুণ্য করে ফেলে, কখনো ভালবাসা বা ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। কখনো শরীর অসুস্থ করে দেয়। যাদু শিক্ষা করা হারাম। শুধু তাই নয়, বরং তা কখনো কুফরী এবং শির্কের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَــرُوا يُعَلِّمُــونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَــا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

"সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলায়মান (আঃ) অবিশ্বাসী হননি, কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করছিল, তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিতো এবং উভয়ে কাউকে ওটা শিক্ষা দেয়ার পূর্বে তারা

---

*. যারা নিজে এবং খলীফা উপাধীধারীদের মাধ্যমে মুরীদ সংগ্রহ করে তারা কস্মিনকালেও আল্লাহর ওলী নয় বরং তারা শয়তানের ওলী। পীর-মুরীদীর সম্পর্ক ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের কথা আছে। শিক্ষকের যেমন হাজার হাজার ছাত্র হতে পারে তেমন একজন ছাত্রের শত শত শিক্ষক থাকতে পারে। কিন্তু তথাকথিত পীর-মুরীদীর প্রথায় একজন মুরীদের একাধিক পীর ধরার কোন সুযোগ নেই। (সম্পাদক)

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ বিবাহ।

বলতো যে, আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করো না, অনন্তর যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তাই শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করত,যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয়। নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, যে কেউ ওটা ক্রয় করবে, তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই।" (সূরা বাকারাঃ ১০২) সুতরাং শয়তানকে শরীক বানানোর মাধ্যমে এ ধরণের যাদু শিক্ষা এবং ব্যবহার করা কুফরী এবং সীমা লংঘনের অন্তর্ভূক্ত। এই জন্যেই যাদুকরের শাস্তি হল মৃত্যু দন্ড। তার যাদুর সীমা যদি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে তাকে কাফের এবং মুরতাদ হিসাবে হত্যা করতে হবে। আর তার যাদু যদি কুফরী পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে মুসলমানদেরকে তার ক্ষতি হতে হেফাজত করার জন্য তাকে দন্ড প্রয়োগ করে করে হত্যা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭৪) যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মিশের ব্যবস্থা করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা তৈরী করা হারাম। অনুরূপভাবে যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করাও হারাম। কখনো কখনো শির্কে পরিণত হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

"এবং উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না, এমনকি তারা বলতো যে, আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করো না, অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তাই শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করত, যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয়, এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। (সূরা বাকারাঃ ১০২)

প্রশ্নঃ (৭৫) গণক কাকে বলে? গণকের কাছে যাওয়ার বিধান কি?

উত্তরঃ গণক এমন লোককে বলা হয়, যে অনুমানের উপর নির্ভর করে ভিত্তিহীন বিষয়ের অনুসন্ধান করে থাকে। জাহেলী যামানার কিছু পেশাদার লোকের সাথে শয়তানের যোগাযোগ ছিল। শয়তানেরা চুরিকরে আকাশের সংবাদ শ্রবণ করত এবং তাদের কাছে বলে দিত। আকাশ থেকে যা শ্রবণ করত, তার সাথে আরো অনেক মিথ্যা কথা সংযোগ করে মানুষের মধ্যে তা প্রকাশ করত। তারা যা বলত, তার একটি কথা সত্য হলে মানুষ ধোকায় পড়ে যেত এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য ও ভবিষ্যতে কি হবে, তা

জানতে গণকদের কাছে আসা শুরু করত। এই জন্যই আমরা বলি যে, গণক হচ্ছে সেই লোক, যে ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকে।

*** যারা গণকের কাছে আসে, তারা তিনভাগে বিভক্ত ঃ**

(১) গণক এর কাছে এসে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তার কথায় বিশ্বাস না করা। এটা হারাম। এ ধরণের লোক সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না।"[1]

(২) গণক এর কাছে এসে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তার কথায় বিশ্বাস করা। এটা আল্লাহর সাথে কুফরী করার অন্তর্ভূক্ত। কারণ সে ইলমে গায়েবের দাবীতে গণককে বিশ্বাস করেছে। মানুষ ইলমে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করলে আল্লাহর কথাকে অবিশ্বাস করা হবে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"বলুন, আকাশ এবং যমিনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের সংবাদ অন্য কেউ জানে না।" (সূরা নমলঃ ৬৫) ছহীহ হাদীছে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গমণ করে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ বিষয় (কুরআন ও সুন্নাহ)র সাথে কুফরী করল।"[2] এ ধরণের মানুষ তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করলে কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।

(৩) গণককে পরীক্ষার জন্য এবং মানুষের সামনে তার ধোঁকাবাজির কথা তুলে ধরার জন্য তার কাছে যেতে কোন অসুবিধা নেই। ইবনু সায়্যাদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আগমণ করলে তিনি মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে ইবনে সায়্যাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তো আমি কি গোপন করেছি? ইবনে সায়্যাদ বলল, আদ্-দুখ্ অর্থাৎ আদ্-দুখান (ধোঁয়া)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (৭৬) রিয়া বা মানুষকে দেখানো ও শুনানোর নিয়তে এবাদত করার বিধান কি?

---

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।

[2] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাহারাহ।

উত্তরঃ যে ইবাদতে 'রিয়া' মিশ্রিত হয় তা তিন প্রকার।

প্রথম প্রকারঃ ইবাদত মূলতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নামায আদায় করা। এঁা শির্ক এবং এ প্রকার ইবাদত বাতিল।

দ্বিতীয় প্রকারঃ ইবাদত করার মধ্যবর্তী অবস্থায় "রিয়ায়' পতিত হওয়া। অর্থাৎ যেমন ইবাদত শুরু করার সময় একনিষ্ঠভাবে আরম্ভ করে কিন্তু ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে 'রিয়া' সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ইবাদতের প্রকারভেদ অনুযায়ী তার হুকুম নির্ধরিত হবে।

১) যদি দ্বিতীয় ইবাদতটি প্রথমটির উপর ভিত্তিশীল না হয় তবে প্রথমটি শুদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয়টি বাতিল হবে। এর উদাহরণ হলো, যেমন কোন ব্যক্তি একশত রিয়াল দান করলো লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, এমতাবস্থায় প্রথম একশত রিয়ালের দানটি শুদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয় একশত রিয়ালের দানটি বাতিল হয়ে যাবে।

২) যদি ইবাতটির শেষাংশ প্রথমাংশের উপর ভিত্তিশীল হয় তবে এর দুটি অবস্থা ঃ

ক) ইবাদতকারী ব্যক্তি রিয়াকে প্রতিহত করবে এবং রিয়া উপর স্থির হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি নামাযে দাড়ালো একনিষ্ঠভাবে কিন্তু দ্বিতীয় রাকআতে স্বীয় অন্তরে রিয়া অনুভব করলো, অতঃপর নামায আদায়কারী স্বীয় অন্তরে রিয়া অনুভব করতে থাকলো, এমতাবস্থয় রিয়া ইবাতদতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না, অথবা কোন ক্ষতি করবে না।

খ) অপর অবস্থাটি হলোঃ ইবাদতকারী রিয়ার প্রতি তুষ্ট থাকবে এবং রিয়াকে অন্তরে শেষাংশের প্রথমমাংশের উপর ভিত্তিশীল। যেমন কোন ব্যক্তি নামাযে দাড়ালো ইখলাসের সাথে, অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে সে যখন লক্ষ করলো মানুষ তার নামাযের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, তখন তার অন্তরে রিয়ার উদয় হলো এবং নামাযরত উক্ত ব্যক্তি রিয়ার প্রতি তুষ্ট থাকলো, এমতাবস্থায় পূর্ণ নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা নামাযের শেষাংশের সাথে প্রথমাংশ সম্পৃক্ত রয়েছে।

তৃতীয় প্রকারঃ এটা হলো ইবাদত সমাপ্ত করার পর যদি ইবাদতকারীর অন্তরে রিয়ার উদ্ভব ঘটে, তবে তা ইবাদতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু যদি ইবাদতের সাথে সংঘর্ষকারী কিছু করে তবে ইবাদতটি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন দান খয়রাত করার পর দান গ্রহণকারীকে খোঁটা দেয়া বা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেয়া।

দ্রষ্টব্য: নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রিয়ার অন্তর্ভক্ত।

ইবাদত দেখে কেউ প্রশংসা করলে এবং তাতে ইবাদকারী খুশী হলেতা রিয়ার অন্তর্গত হবে না। কারণ, এটি ইবাত সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছে। অনুগত্যেও কাজ করার পর মানুষ খুশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। বরং এটি ইমানের প্রমাণ বহণ করে। নবী করীম (ﷺ) এরশাদ করেন:

(من سرته حسنته و سآئته سيئته فذلكم المؤمن– نلك عاجل بشرى المؤمن .)

"নেকীল কাজ করে যে খুশি হয় এবং পাপের কাজ করার পর যে খারাপ মনে করে, সেই প্রকৃত মু'মিন। এটা মুমিনদের আগাম শুভসংবাদ।" ইবনু মাজাহ

প্রশ্নঃ (৭৭) কুরআন নিয়ে শপথ করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তর একটু বিস্তারিতভাবে দেয়া প্রয়োজন। যখন একজন ব্যক্তি কোন বস্তুর নামে শপথ করে, তখন উক্ত বস্তুকে সম্মানিত মনে করেই করে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ বা তাঁর অন্য কোন নাম অথবা কোন সিফাত (গুণাবলী) ব্যতীত অন্য বস্তুর নামে শপথ করা জায়েয নেই। যেমন কেউ বলল, আল্লাহর শপথ! আমি একাজটি অবশ্যই করব অথবা বলল কাবা ঘরের প্রভুর শপথ! আল্লাহর বড়ত্বের শপথ! ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম (কথা)। আল্লাহর কথা তাঁর সিফাতের অন্তর্ভূক্ত। কথা বলা আল্লাহর সত্বাগত সিফাত। তিনি সদাসর্বদা এ গুণে গুণান্বিত। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি কথা বলেন। কথা বলার শক্তি থাকা বা বাকশক্তি থাকা একটি পূর্ণতার গুণ। আল্লাহ তাআ'লা সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ। তাই কথা বলা আল্লাহর একটি সত্বাগত গুণ। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি কথা বলেন, এই দৃষ্টি কোন থেকে কথা বলা একটি কর্মগত গুণ। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন ওকে বলেনঃ হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৮২) এখানে কথা বলাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ যখন ইচ্ছা কথা বলেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক দলীল রয়েছে। যারা বলে আল্লাহ সদাসর্বদা কথা বলার গুণে গুণান্বিত, কিন্তু আল্লাহর কথা তাঁর সত্বার সাথে সম্পৃক্ত, বাইরে এর কোন প্রভাব নেই বা কেউ তাঁর কথা শ্রবণ করতে পারে না, তাদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাদের মাযহাব বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ৯০টি যুক্তি বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু কুরআন মাজীদে আল্লাহর কালাম রয়েছে, আর আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাতের অন্তর্ভূক্ত, তাই কুরআনের শপথ করা জায়েয আছে। হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ এটাকে বৈধ বলেছেন। শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হয় এমন শব্দ উচ্চারণ করে শপথ করা ঠিক নয়। সাধারণ লোকেরা যাতে বুঝতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা শপথ করা উচিৎ। কেননা মানুষ বুঝতে পারে এবং তাদের অন্তরে স্বস্তি অর্জিত হয়, এমন বক্তব্য মানুষের কাছে পেশ করাই উত্তম। শপথ যেহেতু আল্লাহ, তাঁর নাম এবং সিফাতের মাধ্যমেই করতে হবে, তাই গাইরুল্লাহর নামে, নবীর নামে, জিবরীল ফেরেশতার নামে, কা'বার নামে বা অন্য কোন মাখলুকের নামে শপথ করা জায়েয নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)

"যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা যেন চুপ থাকে।"[1] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে কুফরী বা শির্‌ক করল"।[2] কেউ যদি কোন মানুষকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর হায়াত কিংবা অন্য ব্যক্তির নামে শপথ করতে দেখে, তা হলে সে যেন তাকে নিষেধ করে এবং বলে দেয় যে, এটা হারাম। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আদেশ বা নিষেধ যাতে নম্র ভাষায় হয়। যাতে করে সে সহজেই নসীহত কবূল করতে পারে। কেননা অনেক মানুষ রয়েছে, যারা রাগান্বিত হয়ে মানুষকে আদেশ-নিষেধ করে থাকে। অনেক সময় তাদের চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। মনে হয় সে যেন নিজের প্রতিশোধ নিচ্ছে। এতে করে শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়। মানুষ যদি পরস্পরকে সম্মান করতো, হিকমত এবং নম্রতার সাথে তাকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিতো, তা হলে তাদের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য হতো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَــى الْعُنْــفِ) "নিশ্চয় আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার মাধ্যমে তা দান করেন না।"[3]

একদা জনৈক গ্রাম্যলোক মসজিদে নববীতে এসে পেশাব করে দিল। লোকেরা তাকে ধমকাতে শুরু করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ধমকাতে নিষেধ করলেন। লোকটি যখন পেশাব শেষ করল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, এ সকল মসজিদ আল্লাহর ঘর, পেশাব বা ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান নয়। তা কেবলমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা, তাসবীহ পাঠ করা এবং কুরআন তেলাওয়াত করার জন্যই নির্দিষ্ট। অতঃপর তিনি ছাহাবীদেরকে পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার আদেশ দিলেন। এতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এবং মসজিদ পবিত্র হয়ে গেল। সাথে সাথে গ্রাম্য লোকটিকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যও সফল হয়ে গেল। আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকেও এরূপ হওয়া উচিৎ। আমরা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য পন্থায় সত্যকে তুলে ধরব। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন।

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার বিধান কি ?

প্রশ্নঃ (৭৮) নবীর নামে, কা'বার নামে এবং মান-মর্যাদা ও জিম্মাদারীর নামে শপথ করার বিধান কি ?

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুশ্ শাহাদাত।
[2] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর।
[3] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির্ ওয়াস্ সিলাহ

উত্তরঃ- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে শপথ করা জায়েয নয়; বরং ইহা শির্কের অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে কা'বার নামে শপথ করাশির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং কাবা উভয়টিই মাখলুক। আর কোন মাখলুকের নামে শপথ করাই শির্ক। এমনিভাবে সম্মান এবং জিম্মাদারীর শপথ করাও শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْــرَكَ) "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে কুফরী বা শির্ক করল"।[1] ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

((أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ))

"তিনি তাঁর পিতা উমার (রাঃ) কে পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফেলার লোকজনকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।"[2] কিন্তু "আমার জিম্মায়" এ কথাটি শপথ নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল অঙ্গিকার।

প্রশ্নঃ (৭৯) যে ব্যক্তি কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করে, কবরবাসীর কাছে দু'আ করে এবং তাদের জন্য নযর-মানত পেশসহ অন্যান্য এবাদত করে থাকে, তার হুকুম কি ?

উত্তরঃ এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। বিস্তারিতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া দরকার। তাই আমরা বলব যে, কবরবাসীগণ দু'প্রকারঃ

(১) যারা ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছে এবং মানুষ তাদের প্রশংসা করে থাকে, আশা করা যায় এদের পরিণতি ভাল হবে কিন্তু তারা মুসলমান ভাইয়ের দু'আর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

অর্থঃ "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়।" (সূরা হাশরঃ ১০) মৃত ব্যক্তি নিজের অকল্যাণ দূর করতে বা কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম নয়। তা হলে কিভাবে সে অপরের কল্যাণ করতে পারবে অথবা অপরের পক্ষ হতে অকল্যাণ দূর করতে পারবে?

---

[1] - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর (শপথ ও মানত)।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব।

(২) যারা ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় শির্কের মত পাপ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে তারা দাবী করতো যে তারা আল্লাহর ওলী, তারা গায়েবের খবর রাখে। এমনকি রুগীর আরোগ্য দান, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের দাবীও করে থাকে। এরা কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। এদের জন্য দু'আ করা এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রহমত কামনা করা জায়েয নেই।

﴿مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

"নবী ও মুমিনদের উচিৎ নয় মুশরেকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হোক-একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা দোযখী। আর ইবরাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল।" (সূরা তাওবাঃ ১১৩-১১৪) কবরবাসীগণ কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করতে পারে না। তাই কবরবাসীদের কাছে এগুলো কামনা করা জায়েয নেই। যদিও কোন কোন কবর থেকে কারামাত প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন কবর থেকে আলো বের হওয়া, সুঘ্রাণ বের হওয়া ইত্যাদি। অথচ তারা শির্কের উপরে মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের কবর থেকে যদি এরূপ কিছু বের হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটি ইবলীস শয়তানের ধোঁকা মাত্র।

মুসলমানদের উচিৎ শুধুমাত্র আল্লাহর উপর সকল প্রকার আশা-ভরসা করা। কেননা তাঁর হাতেই আকাশ-যমিনের একমাত্র রাজত্ব। তাঁর দিকেই সকলে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনিই ফরিয়াদকারীর দু'আ কবূল করেন এবং মানুষের অকল্যাণ দূর করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾

"তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর।" (সূরা নাহ্‌লঃ ৫৩) মুসলমানদের জন্য আমার আরো নসীহত এই যে, তারা যেন দ্বিনী বিষয়ে কারো তাকলীদ[1] না করে এবং একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিঃশর্ত অনুসরণ করে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾

[1] - বিনা দলীলে কারো কথাকে মেনে নিয়ে অন্ধভাবে তার অনুসরণ করাকে তাকলীদ বলে।- অনুবাদক।

“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।” (সূরা আহযাবঃ ২১) আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّه﴾

“বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।” (সূরা আল-ইমরানঃ ৩১)

মুসলমানদের উপর আবশ্যক হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবী করে, তারা যেন তার আমলগুলোকে কুরআন-সুন্নাহর কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখে। তার আমলগুলো যদি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক হয়, তাহলে আশা করা যায় যে, সে আল্লাহর ওলী। আর যদি তার ভিতরে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমল পাওয়া যায়, তাহলে কোন ক্রমেই সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কিতাবে ওলী হওয়ার মানদন্ড বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

“জেনে রেখো, যারা আল্লাহর ওলী, তাদের না আছে কোন ভয়-ভীতি, না তারা চিন্তিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং তারা ভয় করে চলে।” (সূরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩) সুতরাং যে মুমিন-মুত্তাকী, সেই আল্লাহর ওলী। আর যে ব্যক্তির ভিতরে ঈমান এবং তাকওয়া নেই, সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না। যার ভিতরে যতটুকু ঈমান ও আমল রয়েছে, তার ভিতরে ততটুকু আল্লাহর বন্ধুত্ব রয়েছে। তবে আমরা নির্দিষ্ট করে কাউকে আল্লাহর ওলী হিসাবে সার্টিফিকেট দিতে পারি না। আমরা বলতে পারি, যিনি মুমিন-মুত্তাকী হবেন তিনি আল্লাহর ওলী হবেন।

কবরের ভক্তরা কবরবাসীর কাছে দু'আ করলে অথবা কবর থেকে মাটি নিলে যদিও কখনো কখনো তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তথাপিও এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, কবরবাসীই উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের কারণ। এটি কবরবাসীর কাছে দু'আকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ফিতনার কারণও হতে পারে। কারণ আমরা জানি যে, কবরবাসী কারও দু'আ কবূল করার ক্ষমতা রাখেন না কিংবা কবরের মাটি কল্যাণ আনয়ন করতে বা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِين ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুকে আহবান করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? তারা তো তাদের আহবান সম্পর্কেও বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের এবাদত অস্বীকার করবে।” (সূরা আহকাফঃ ৫-৬) আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে তারা পুনরুত্থিত হবে, তাও জানে না।" (সূরা নাহলঃ ২০-২১)

এই মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ছাড়া যাকেই ডাকা হোক না কেন, ডাকে সাড়া দিবে না এবং আহবানকারীর কোন উপকারও করতে পারবে না।

তবে কখনও কখনও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করার সময় প্রার্থিত বস্তু অর্জিত হয়ে হয়ে থাকে। আল্লাহর পক্ষ হতে ইহা একটি পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পাপ কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। যাতে তিনি জানতে পারেন কে আল্লহর খাঁটি বান্দা আর কে প্রবৃত্তির অনুসারী।

আপনি জানেন না যে শনিবারের দিন আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের উপর মাছ শিকার করা হারাম করেছিলেন ? ঐ দিকে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য শনিবারের দিন প্রচুর পরিমাণ মাছ সাগরের কিনারায় পাঠিয়ে দিলেন। শনিবার ছাড়া অন্য দিনে মাছগুলো লুকিয়ে থাকত। এভাবে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হল। ইহুদীরা বললঃ কিভাবে আমরা এ মাছগুলো থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখব ? অতঃপর তারা চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা জাল তৈরী করে শনিবার দিন তা সাগরে ফেলে রাখবো আর রবিবারের দিন মাছ শিকার করব। আল্লাহর হারামকৃত জিনিষকে হালাল করার জন্য তারা কৌশল অবলম্ভন করল। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে বানরে পরিণত করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

"আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন যা ছিল সাগরের তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাক্রিম করতে লাগল। যখন শনিবারের দিন মাছগুলো আসতে লাগল তাদের কাছে দলে দলে। আর যেদিন শনিবার হতনা সে দিন আসতনা। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ তারা ছিল নাফরমান।" (সূরা আ'রাফঃ ১৬৩) লক্ষ করুন! যেদিন তাদের জন্য মাছ ধরা নিষেধ ছিল সেদিন কিভাবে আল্লাহ তাদের জন্য মাছগুলো তাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছিল ? কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। তাই আল্লাহর হারামকৃত জিনিষকে হালাল করার জন্য তারা কৌশল অবলম্ভন করল।

আরো লক্ষ করুন নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথীদের প্রতি। তারা ছিলেন ইহ্‌রাম অবস্থায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের নিকট এমন কিছু

শিকারযোগ্য প্রাণী পাঠিয়ে পরীক্ষা করলেন যা ছিল তাদের জন্য হারাম। প্রাণীগুলো তাদের হাতের নাগালে ছিল। কিন্তু সাহাবীগণ কোন জন্তু শিকার করেন নি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"হে মু'মিন আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছতে পারবে-যাতে আল্লাহ বুঝতে পারেন যে, কে তাঁকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব যে ব্যক্তি এরপরও সীমা অতিক্রম করবে তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা মায়িদাহঃ ৯৪)

সুতরাং শিকারগুলো ছিল তাদের হাতের নাগালে। মাটিতে চলাচলকারী প্রাণীগুলো হাতেই ধরা যেত। উড়ন্ত পাখিগুলো বর্শা দিয়েই শিকার করা যেত। শিকার ধরা ছিল অত্যন্ত সহজ। কিন্তু সাহাবীগণ আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং কোন প্রাণীই শিকার করেন নি।

এমনিভাবে কোন মানুষের জন্য যখন হারাম কাজ করা সহজ হয়ে যাবে তখন আল্লাহকে ভয় করে উক্ত হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবে। এবং এটা মনে রাখবে যে, কারো জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার পথ সহজ করে দেয়া তার জন্য একটি পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই ধৈর্য ধারণ করা উচিত। পরহেজগারদের জন্যই উত্তম পরিণতি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর মসজিদের ভিতরে হওয়ার জবাব ঃ

প্রশ্নঃ- (৮০) যে সমস্ত কবর পূজারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর মসজিদের ভিতরে হওয়াকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে, আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব ?

উত্তরঃ- উক্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা কয়েকভাবে দিতে পারিঃ-

১) মসজিদটি মূলতঃ কবরের উপর নির্মাণ করা হয়নি; বরং এ মসজিদ নির্মিত হয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায়।

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মসজিদে দাফন করা হয়নি। কাজেই একথা বলার অবকাশ নেই যে ইহাও সৎ ব্যক্তিদেরকে মসজিদে দাফন করার কুপ্রথার অন্তর্ভূক্ত। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর নিজ ঘরে দাফন করা হয়েছে।

৩) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরগুলোকে মসজিদে প্রবেশ করানো ছাহাবীদের যৌথ সিদ্ধান্তে হয়নি বরং তাদের অধিকাংশের মৃত্যুর পর হয়েছে। তখন

তাঁদের অল্প কয়েকজন মাত্র বেঁচে ছিলেন। উহা ঘটেছিল ৯৪ হিঃ সনে মসজিদ সম্প্রসারণ কালে। এই কাজটি ছাহাবীদের অনুমতি বা তাদের যৌথ সিদ্ধান্তে হয়নি। তাদের কেউ কেউ উহাতে বিরোধীতাও করেছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

৪) কবরটি মূলতঃ মসজিদের ভিতরে নয়। কারণ উহা মসজিদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক কক্ষে রয়েছে। আর মসজিদকে ওর উপর বানানো হয়নি। এজন্যই এই স্থানটিকে তিনটি প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত ও বেষ্টিত করা হয়েছে। আর উত্তর দিকের প্রাচীরটি ত্রিভুজের মত করে রাখা হয়েছে। এতে করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরটি সরাসরি মুছল্লীর সামনে পড়ে না। আশা করি কবর পূজারীদের দলীল খন্ডনে উপরোক্ত উত্তরগুলোই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্নঃ- (৮১) কবরের উপর নির্মাণ কাজ করা কি ?

উত্তরঃ- কবরের উপর নির্মাণ কাজ করা হারাম। যেমন কবর পাকা করা, কবরের চার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করা, গম্বুজ ইত্যাদি তৈরী করা ইত্যাদি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে কবরবাসীকে অতিরিক্ত সম্মান করার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কবরবাসীদেরকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করারও ভয় রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ কবরের অবস্থাই তাই। অধিকাংশ মানুষই কবরবাসীদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকে। আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার আশায় কবরবাসীর উসীলায় দু'আ করে থাকে। কবরবাসীদের কাছে দু'আ করা এবং বিপদা-পদ দূর করার জন্য তাদের কাছে ফরিয়াদ করা বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

প্রশ্নঃ- (৮২) মসজিদে দাফন করার বিধান কি ?

উত্তরঃ- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে দাফন করতে এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তেও কবরকে মসজিদে পরিণতকারীদের উপর লা'নত করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, কবরকে মসজিদে পরিণত করা ইহুদী-খৃষ্টানাদের কাজ।[1] কারণ মসজিদে দাফন করা এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা শির্কের মাধ্যম ও বাহন। মসজিদে মৃত ব্যক্তিদেরকে দাফন করা হলে মানুষ বিশ্বাস করবে যে, দাফনকৃত ব্যক্তি কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে অথবা তার এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তার আনুগত্যকে আবশ্যক করে। মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য হবে এই ভয়াবহ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। মসজিদগুলো যেন সকল প্রকার শির্ক

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয।

থেকে মুক্ত হয়ে ছহীহ আকীদা এবং নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় সে চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"এবং মসজিদসমূহ আল্লাহ তাআ'লার জন্য। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।" (সূরা জিনঃ ১৮) সুতরাং মসজিদসমূহ সকল প্রকার শির্কের চিহ্ন থেকে মুক্ত করতে হবে। তাতে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে, যাঁর কোন শরীক নেই। এটাই মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ (৮৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ যে কোন কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েয নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)

"তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে ভ্রমণ করো না। মসজিদুল হারাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদ এবং মাসজিদুল আকসা"[1] হাদীছের উদ্দেশ্য হল এবাদতের নিয়তে পৃথিবীর কোন স্থানের দিকে সফর করা যাবে না। কারণ এই তিনটি মসজিদের দিকেই এবাদতের নিয়তে সফর করা জায়েয। অন্য কোন মসজিদের দিকে ভ্রমণ করা জায়েয নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাঁর মসজিদে এবাদতের নিয়তে সফর করতে হবে। মসজিদে পৌঁছে গেলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারত করা সুন্নাত তা শু ধুমাত্র পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারত করা জায়েয নেই।

কবরের মাধ্যমে বরকত কামনা এবং তার চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা হারাম

প্রশ্নঃ (৮৪) কবরের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা বা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কিংবা নৈকট্য হাসিলের জন্য কবরের চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার হুকুম কি?

উত্তরঃ কবর থেকে বরকত কামনা করা হারাম এবং উহা শির্কের পর্যায়ে। কেননা এটা এমন এক বিশ্বাস, যার পক্ষে আল্লাহ তাআ'লা কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। সালাফে সালেহীন থেকে কবরের বরকত গ্রহণ করার কথা প্রমাণিত নয়। এ দৃষ্টিকোন

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু ফাযলিস্ সালাতি ফী মাসজিদে মক্কা ওয়াল মদীনাহ।

থেকে এটি বিদ্‌আতও বটে। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, কবরবাসী অকল্যাণ প্রতিহত করা এবং কল্যাণ আনয়নের ক্ষমতা রাখে, তাহলে এটি বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত হবে। এমনিভাবে রুকূ, সেজদাহ, নৈকট্য লাভ বা সম্মানের নিয়তে যদি কবরবাসীর জন্য কুরবানী করে তাও শির্কে পরিণত হবে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

"যে কেউ বিনা দলীলে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকে, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে। নিশ্চয় কাফেরেরা সফলকাম হবে না।" (সূরা মুমিনূনঃ ১১৭) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীরক না করে।" (সূরা কাহ্‌ফঃ ১১০) যে ব্যক্তি বড় শির্কে লিপ্ত হবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাঃ ৭২)

আল্লাহ ছাড়া যার নামে শপথ করা হল, তাকে যদি আল্লাহর সম পর্যায়ের সম্মানিত মনে করে, তাহলে বড় শির্কে পরিণত হবে। আর যদি শপথকারীর অন্তরে শপথকৃত বস্তুর প্রতি সম্মান থাকে, কিন্তু সেই সম্মান আল্লাহর সম্মানের পর্যায়ে মনে না করে তাহলে ছোট শির্কে পরিণত হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে কুফরী অথবা শির্ক করল।"[1]

যারা কবর থেকে বরকত হাসিল করে, কবরবাসীর কাছে দু'আ করেএবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করে, তাদের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব। তাদের যুক্তি,"আমরা পূর্ব পুরুষদেরকে এই অবস্থায় পেয়েছি"। একথা আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। যে সমস্ত কাফের নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তাদেরও যুক্তি এটিই ছিল। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾

[1] - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর।

"এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এই পথের পথিক পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।" (সূরা যুখরুফঃ ২৩) তাদের কাছে প্রেরিত রাসূল বললেনঃ

﴿ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

"তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদাপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না।" (সূরা যখরুফঃ ২৪) আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

"অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি।" (সূরা যুখরুফঃ ২৫) অতএব দেখুন, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হয়েছে। ভুলের উপর থেকে কারও পক্ষে বাপ-দাদাদের অথবা দেশাচলের দোহাই দেয়া বৈধ নয়। এসব দোহাই তাদের কোন উপকারে আসবে না। বরং তাদের উচিৎ আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং সত্যের অনুসরণ করা। দেশাচল এবং মানুষের তিরস্কারের ভয় যেন তাদেরকে সত্যের অনুসরণের পথে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। সত্যিকারের মুমিন কোন প্রকার সমালোচনাকারীর সমালোচনার ভয় করে না এবং আল্লাহর দ্বীন হতে কোন কিছুই বাঁধা দিতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৮৫) প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে নামায পড়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّـــورَةُ) "যে ঘরে ছবি রয়েছে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"[1] স্মৃতি স্বরূপ কারও ছবি যত্ন করে রেখে দেয়াও জায়েয নেই। কাজেই যার কাছে এ রকম ছবি রয়েছে, তার উচিৎ এগুলো নষ্ট করে দেয়া। চাই সেই ছবি দেয়ালে ঝুলন্ত থাকুক কিংবা এ্যালবামের ভিতরে সংরক্ষিত থাকুক অথবা অন্য কোন স্থানে থাকুক। কারণ ঘরের মধ্যে ছবি থাকলে ঘরের মালিক রহমতের ফেরেশতাদের প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (৮৬) ঘরের দেয়ালে ছবি ঝুলানোর বিধান কি ?

উত্তরঃ ঘরের দেয়ালে ছবি ঝুলিয়ে রাখা সম্পূর্ণ হারাম। বিশেষ করে বড় ছবিগুলা। যদিও শুধু মাথা এবং শরীরের কিছু অংশ বিশেষ দেখা যায়। সম্মান প্রদর্শনের জন্যই

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল্ লিবাস।

মানুষেরা এরকম করে থাকে। এ ধরণের সম্মান থেকেই শির্কের সূচনা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নূহ (আঃ) এর কাওমের লোকেরা প্রথমে কতিপয় সৎ লোকের ছবি উঠিয়ে রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দেখে তাদের এবাদতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর এবাদতে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা স্বয়ং উক্ত সৎ ব্যক্তিদের এবাদত শুরু করে দেয়।

প্রশ্নঃ (৮৭) ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি উঠানোর বিধান কি ?

উত্তরঃ ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এ জন্য হাতে কোন প্রকার কাজ করতে হয়না। এভাবে ছবি উঠালে নিষেধের অন্তর্ভূক্ত হবে না। তবে প্রশ্ন এই যে, ছবি তোলার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য যদি হয় ছবিকে সম্মান করা, তা হলে হারাম হবে। কারণ নিষিদ্ধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করাও হারাম। তাই স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ছবি সংগ্রহ করা নিষেধ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً)"যে ঘরে ছবি রয়েছে, সেই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"[1] এই হাদীছটি প্রমাণ করে যে, ঘরে ছবি রাখা অথবা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা জায়েয নয়।

ইসলামে বিদআতের কোন স্থান নেই

প্রশ্নঃ (৮৮) (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا) **অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোন সুন্নাত চালু করল, তার জন্য ছাওয়াব রয়েছে, এই হাদীছকে যে সমস্ত বিদ্আতী তাদের বিদ্আতের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে, আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?**

উত্তরঃ তাদের জবাবে আমরা বলব, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا)

"যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোন সুন্নাত চালু করল, তার জন্য ছাওয়াব রয়েছে।" তিনি তো এও বলেছেন যে,

(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَاةٍ فِى النَّارِ)

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর তোমরা নতুন আবিস্কৃত বিষয়

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস।

হতে সাবধান থাকবে। কারণ প্রতিটি নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদ্‌আত আর প্রতিটি বিদ্‌আতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।"[1]

প্রশ্নে বর্ণিত যে হাদীছটিকে বিদ্‌আতীরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, সেই হাদীছের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা এই যে, মুযার গোত্রের কিছু অভাবী লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আগমন করলে তিনি সাদকা করার প্রতি উৎসাহ দিলেন। এক ব্যক্তি থলে ভর্তি রূপা নিয়ে এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে হাজির হল। তখন তিনি বললেন,

(مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَاوَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَاوَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে উত্তম কোন সুন্নাতচালু করল, তার জন্য ছাওয়াব রয়েছে, এবং তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা সেই সুন্নাতের উপর আমল করবে, তাদের সমপরিমাণ ছাওয়াব পাবে।"[2] হাদীছের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, উত্তম সুন্নাতবলতে সুন্নাতের উপর নতুনভাবে আমল শুরু করাকে বুঝানো হয়েছে। নতুনভাবে কোন আমল তৈরী করার কথা বলা হয়নি। কেননা আল্লাহ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো জন্য শরীয়তের কোন বিধান প্রবর্তন করা জায়েয নেই। কাজেই হাদীছের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি যদি সুন্নাহর উপর আমল করে, তার আমল দেখে অন্যরাও যদি সেই সুন্নাহরউপর আমল করা শুরু করে, তাহলে প্রথম আমলকারী ব্যক্তি নিজে আমল করার ছাওয়াব পাওয়ার সাথে সাথে তাকে দেখে আমলকারীর অনুরূপ ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

অথবা হাদীছের উদ্দেশ্য হল, শরীয়ত সম্মত কোন এবাদত পালনের মাধ্যম বা উপকরণ যেমন ধর্মীয় কিতাব রচনা করা, ইলম প্রচার করা, মাদরাসা নির্মাণ করা ইত্যাদি। এমন নয় যে, নতুন এবাদত তৈরী করা। মানুষের ইচ্ছামত যদি শরীয়ত প্রবর্তন করা জায়েয হয়, তাহলে অর্থ এই হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় ইসলাম পরিপূর্ণ হয়নি। কোন বিদআত প্রবর্তন করে তাকে হাসানাহ বা উত্তম বলে ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। যেহেতু তিনি বলেনঃ প্রতিটি বিদ্‌আতই গোমরাহী।

প্রশ্নঃ (৮৯) ঈদে মীলাদুন্ নবী পালনের হুকুম কি ?

উত্তরঃ প্রথমতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঠিক জন্ম তারিখ অকাট্যভাবে জানা যায় নি। আধুনিক যুগের কতিপয় গবেষকের মতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাবীউল আওয়াল মাসের ৯ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। রাবীউল

---

[1] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ।

[2] - ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ আল-মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা)

আওয়ালের **১২** তারিখ নয়। সুতরাং **১২** রবীউল আওয়াল ঈদে মীলাদুন্ নবী পালন করা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের দিক থেকে যদি মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা সঠিক হত, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করতেন অথবা তাঁর উম্মতকে করতে বলতেন। আর কুরআনে বা হাদীছে অবশ্যই তা সংরক্ষিত থাকতো। আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজরঃ ৯) যেহেতু মীলাদের বিষয়টি সংরক্ষিত হয়নি, তাই বুঝা গেল যে, মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা দ্বীনের কোন অংশ নয়। আর যা দ্বীনের অংশ নয়, তা দ্বারা আল্লাহর এবাদত এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা বৈধ নয়। কিভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব, আল্লাহ তা বলে দিয়েছেন। তা হল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নিয়ে আসা দ্বীন। তাই আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে নতুন কিছু প্রবর্তন করা জায়েয নেই। এ রকম করা বিরাট অপরাধ। আল্লাহর কালামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার শামিল। আল্লাহ বলেনঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদাঃ ৩) অতএব, আমরা বলব যে, এই মীলাদ মাহফিল যদি পরিপূর্ণ দ্বীনের অংশ হতো, তাহলে অবশ্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পূর্বেই তা বলে যেতেন। আর যদি তাঁর দ্বীনের কোন অংশ না হয় তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তা দ্বীনের অংশ হতে পারেনা। যারা বলে মীলাদ মাহফিল পরিপূর্ণ দ্বীনের অংশ, তবে বলতে হবে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পরে শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, তাহলে এটা হবে আল্লাহর কথাকে মিথ্যা বলার শামিল।

কোন সন্দেহ নেই যে, যারা মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করে, তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মান এবং ভালবাসার জন্যই করে থাকে। রাসূলকে ভালবাসা, তাকে সম্মান করা সবই এবাদতের অন্তর্ভূক্ত। শুধু তাই নয়, কোন মানুষের কাছে যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সন্তান, পিতামাতা এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হতে প্রিয় না হয়, তা হলে সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালবাসা এবাদতের অন্তর্ভূক্ত, তাই এর ভিতরে বিদ্‌আত তৈরী করা জায়েয নেই। তাছাড়া আমরা শুনতে পাই যে, এই মিলাদ মাহফিলে এমন বড় বড় অপছন্দনীয় কাজ হয়, যা শরীয়ত বা কোন সুস্থ বিবেকও সমর্থন করে না।

এতে এমন এমন কবিতা পাঠ করা হয় যাতে রয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসায় খুবই বাড়াবাড়ি। অনেক সময় তাঁকে আল্লাহর চেয়েও বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। আরো দেখা যায় মীলাদ অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপস্থিত সবাই এক সাথে দাঁড়িয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করে যে মীলাদ মাহফিলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রূহ মোবারক এসে উপস্থিত হন। তাই তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়াতে হবে। এটি একটি চরম মুর্খতা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত থাকাবস্থায় তাঁর সম্মানের জন্য দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না। ছাহাবীগণও দাঁড়াতেন না। অথচ তারা তাঁকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতেন এবং সম্মান করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিতাবস্থায় দাঁড়নো পছন্দ করতেন না। তাহলে কিভাবে তাঁর মৃত্যুর পর এ রকম করা যেতে পারে?

মীলাদ নামের বিদ্‌আতটি সম্মানিত তিন যুগ চলে যাওয়ার পর আবিস্কৃত হয়েছে। এতে রয়েছে এমন কিছু অন্যায়আ মল, যা দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে আঘাত হানে। তাতে রয়েছে নারী-পুরুষের একত্রে মেলা-মেশাসহ অন্যান্য অপকর্ম।

প্রশ্নঃ (৯০) মাতৃ দিবসের উৎসব পালন করার হুকুম কি?

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে যে ঈদ রয়েছে, তা ব্যতীত সকল প্রকার ঈদ বা উৎসব পালন করা বিদ্‌আত, যা সালাফে সালেহীনের যুগে ছিলনা। হতে পারে এটি অমুসলিমদের কাছ থেকে আমদানী করা। তাই এতে অমুসলিমদের সাথে সদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলমানদের ঈদ মাত্র দু'টি। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা। তাছাড়া সপ্তাহিক ঈদ হল শুক্রবার। এই তিনটি ঈদ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোন ঈদ নেই। এছাড়া যত ঈদ রয়েছে, ইসলামী শরীয়তে সবই বিদ্‌আত এবং প্রত্যাখ্যাত এবং বাতিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরী করবে, যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[1] তিনি আরো বলেনঃ (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমার অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[2] সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উৎসব পালন করা বৈধ নয়। এতে ঈদের মত আনন্দ প্রকাশ এবং উপহার বিনিময় করাও বৈধ নয়। মুসলমাদের অবশ্য কর্তব্য তাদের দ্বীন নিয়ে গর্ববোধ করা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের জন্য যে দ্বীন মনোনীত করেছেন, কোন প্রকার বাড়ানো বা কমানো ছাড়াই তার অনুসরণ করা। প্রত্যেক মতবাদ এবং আহবায়কের পিছনে ছুটে

---

[1] - বুখারী ও মুসলিম।

[2] - সহীহ মুসলিম।

যাওয়া মুসলমানদের উচিৎ নয়। বরং তার উচিৎ আল্লাহর দ্বীন মোতাবেক জীবন গঠন ও পরিচালনা করা। অন্য ধর্মের কাউকে অনুসরণ না করা; বরং মানুষই তার অনুসরণ করবে এবং সে হবে তাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। কারণ ইসলামী শরীয়তকে সকল দিক থেকে পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদাঃ ৩) বছরে মাত্র একবার মাতৃ দিবস পালন করাই যথেষ্ট নয়। বরং সন্তানের উপর মায়ের রয়েছে অনেক হক, যা আদায় করা একান্ত জরুরী। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে মায়ের আনুগত্য করতে হবে। এর জন্য কোন স্থান বা সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ- (৯১) সন্তানদের জন্ম দিবস উপলক্ষে উৎসব পালন করা এবং বিবাহ উপলক্ষে উৎসব পালন করার হুকুম কি ?

উত্তলঃ- ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং সপ্তাহের ঈদ শুক্রবার ব্যতীত ইসলামে কোন ঈদের অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে আররাফা দিবসকে হাজীদের ঈদ হিসেবে নাম রাখা হয়েছে। ঈদুল আযহার পরের তিন দিনও ঈদ হিসেবে পরিচিত কোন মানুষের জম্ম দিবস পালন করা বা তার সন্তানের জম্ম দিবস পালন করা অথবা বিবাহ উপলক্ষে প্রতি বছর ঈদ বা উৎসব পালন করা শরীয়ত সম্মত নয়; বরং বিদ্আতের নিটবর্তী এবং এসমস্ত কাজ বিধর্মী খৃষ্টানদের অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কোন ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গল মনে করা প্রসঙ্গে

প্রশ্নঃ (৯২) জনৈক লোক একটি ঘরে বসবাস শুরু করার পর থেকেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হয়েছে আরো বড় বড় কয়েকটি মুসিবতে, যার কারণে সে এই ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গলের কারণ হিসাবে মনে করছে। তার জন্য কি ঘর ছেড়ে দেয়া জায়েয আছে ?

উত্তরঃ কোন কোন ঘর, যানবাহন এবং স্ত্রী লোকের ভিতরে আল্লাহ তাআ'লা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে অমঙ্গল নির্ধারণ করে থাকেন। হতে পারে ক্ষতির উদ্দেশ্যে কিংবা কল্যাণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে। তাই এই ঘর বিক্রি করে অন্য ঘরে চলে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। হতে পারে অন্য ঘরে চলে যাওয়াতেই তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। নবী (সাঃ) বলেছেনঃ

(إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ)

" তিনটি বস্তুর মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে। ঘোড়া, স্ত্রীলোক এবং গৃহে" [1]

কোন যানবাহন অকল্যাণকর হতে পারে, কোন কোন স্ত্রীলোকের মাঝে অকল্যাণ থাকতে পারে এবং কোন কোন ঘরেও তা থাকতে পারে। মানুষ যখন এ জাতীয় কিছু দেখতে পেলে যেন মনে করে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। কোন না কোন উদ্দেশ্যে আল্লাহ এ জাতীয় অকল্যাণ নির্ধারণ করে থাকেন। যাতে করে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

প্রশ্নঃ (৯৩) উসীলার হুকুম কি ?

উত্তরঃ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিস্তারিতভাবে এর উত্তর দিতে চাই। উসীলার অর্থ হচ্ছে কোন উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্যে মাধ্যম গ্রহণ করা। উসীলা দু'প্রকার।

(১) শরীয়ত সম্মত সঠিক উসীলা। তা হল শরীয়ত সম্মত সঠিক পন্থায় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছার চেষ্টা করা।

(২) শরীয়ত বহির্ভূত উসীলাঃ

প্রথম প্রকারের উসীলা আবার কয়েক প্রকার।

(ক) আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করাঃ এটি দু'ভাবে হতে পারে। সাধারণভাবে আল্লাহর নামগুলো উল্লেখ করে দু'আ করা। (১) যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আয় বলেছেনঃ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي﴾

"হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর পুত্র। আপনার হাতে আমার কর্তৃত্ব, আমার প্রতি আপনার নির্দেশ প্রতিফলন যোগ্য। আমার প্রতি আপনার ফায়সালা ন্যায়নিষ্ঠ। আপনার সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির উসীলায় আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেগুলো আপনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন, অথবা তা আপনার কোন সৃষ্টিকে জানিয়েছেন, অথবা কুরআনে তা নাযিল করেছেন, অথবা আপনার অদৃশ্য জ্ঞানে তা সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আপনি আমার জন্য কুরআনকে হৃদয়ের উর্বরতা স্বরূপ করুন---------।"[2] এখানে আল্লাহর প্রতিটি নামের উসীলায় আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়েছে।

(২) আল্লাহর নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর কাছে দু'আ

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ।

[2] - আহমাদ, হাকেম, সনদ ছহীহ্ ।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আজান।

করা। যেমন আবু বকর (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে নামাযের মধ্যে পঠিতব্য দু'আ শিক্ষা দেয়ার আবেদন জানালে তিনি নিম্নের দু'আটি শিক্ষা দিলেন,

(اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)

"হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অবিচার করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"[1] এখানে আল্লাহর দু'টি নাম যথাঃ 'গাফূর' এবং 'রাহীম' এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত কামনা করা হয়েছে।

(খ) আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করাঃ এটি দু'ভাবে হতে পারে। (১) এভাবে বলবে যে, হে আল্লাহ! আপনার সুন্দর নামগুলোর মাধ্যমে এবং উন্নত গুণাবলীর মাধ্যমে প্রার্থনা করছি। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন উল্লেখ করবে।

(২) নির্দিষ্ট কোন গুণাবলীর উসীলা দিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রার্থনা করা। যেমন হাদীছে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন

(اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي)

"হে আল্লাহ! আপনার ইলম এবং মাখলুকের উপর আপনার ক্ষমতার উসীলা দিয়ে এই দু'আ করছি যে, আমার জীবিত থাকা যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি জানেন যে, আমার মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণর, তাহলে আমাকে মৃত্যু দান করুন।"[2] এখানে ইলম ও কুদ্‌রাত-এই দু'টি গুণের মাধ্যমে উসীলা দেয়া হয়েছে। আর এটি প্রার্থনার সাথে খুবই সংগতিপূর্ণ।

(গ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে উসীলা দেয়াঃ এভাবে বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার উপর এবং আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। এই ঈমানের উসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাআ'লা ঈমানের উসীলা দিয়ে দু'আ করার নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا

[2] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ।

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾

"নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে অপমানিত করলে, আর যালেমদের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৯০-১৯৩) এখানে গুনাহ মাফ, দোষ-ত্রুটি দূর করা এবং নেক লোকদের সাথে যেন মৃত্যু হয় তার জন্য ঈমানের উসীলা দিয়ে দু'আ করা হয়েছে।

(ঘ) সৎ আমলের উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করাঃ এখানে তিন ব্যক্তির ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে একটি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে গুহা থেকে তাদের বের হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। অতঃপর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎ আমল তুলে ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিল। একজন পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার উসীলা দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উসীলা দিল এবং তৃতীয়জন তার চাকরের বেতন পূর্ণভাবে প্রদান করার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা আরম্ভ করল। তারা প্রত্যেকেই দু'আয় বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি যদি এই আমলটুকু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার পর পাথরটি সরে গেল এবং তারা গুহা থেকে বের হয়ে আসল।

এই ঘটনাটিতে সৎ আমলকে উসীলা ধরে দু'আ করার কথা প্রমাণিত হয়।

(ঙ) নিজের অবস্থা আল্লাহর কাছে তুলে ধরে উসীলা দেয়াঃ অর্থাৎ দু'আকারী যে অবস্থায় রয়েছে, তা আল্লাহর কাছে তুলে ধরবে। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

"হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।" (সূরা কাসাসঃ ২৪) যাকারিয়া (আঃ) নিজের দুর্বলতাকে তুলে ধরে উসীলা দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

"তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে, বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে, হে আমার পালনকর্তা আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি।" (মারইয়ামঃ ৪) উসীলার যে সমস্ত প্রকার উপরে বর্ণিত হয়েছে, তার সবই বৈধ।

(চ) সৎকর্মশীলদের দু'আর উসীলা দেয়াঃ ছাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে দু'আ চাইতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, জুমআর দিনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে, পশুপাল পিপাসায় মারা যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয় হাত উঠালেন এবং তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বার থেকে নামার আগেই বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং তাঁর দাড়ি মুবারক বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝরতে থাকল। এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকল। পরবর্তী জুমআয় সেই ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! পানিতে সব কিছু ডুবে যাচ্ছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর কাছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'হাত উঠালেন এবং বললেন, (أَللّــهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশের উঁচু ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয় এই বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকাশের এক পাশের দিকে ইঙ্গিত করার সাথে সাথে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল। মানুষেরা সূর্যের আলোতে বের হয়ে আসল।[1]

আরো অনেক ক্ষেত্রে ছাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বিশেষভাবে দু'আ চেয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা বললেন যে, তাঁর উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি এও বললেন যে, তারা ঐ সমস্ত লোক, যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, চিকিৎসার জন্য লোহা গরম করে দাগ দেয় না এবং পাখি উড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করে না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। এ কথা শুনে উকাশা ইবনে মিহসান (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত। এটাও এক প্রকার উসীলা। দু'আ কবুল হওয়ার আশা করা যায় এমন কোন সৎ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার কাছে দু'আ চাওয়া এবং তার দু'আর উসীলা গ্রহণ করা জায়েয

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ ইস্তিস্কার নামায।

আছে। কোন মুসলমান যদি তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দু'আ করে, তবে ফেরেশতাগণ আমীন বলতে থাকেন।

(২) অবৈধ উসীলাঃ

শরীয়ত সম্মত নয়, এমন জিনিষের মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা অবৈধ। কেননা এ সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে উসীলা দেয়া বিবেক এবং শরীয়ত সম্মত নয়। যেমন মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ চাওয়ার মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা। এধরণের উসীলা দেয়া জায়েয নেই। কারণ মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ চাওয়া একটি জঘণ্য মুর্খতাপূর্ণ কাজ। কেননা মানুষ যখন মারা যায়, তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষে কারও জন্য দু'আ করা সম্ভব নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষেও মৃত্যু বরণ করার পর কারও জন্য দু'আ করা সম্ভব নয়। তাই ছাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে এসে দু'আ চাননি। উমার (রাঃ) এর আমলে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত থাকাকালে তাঁর উসীলা দিয়ে আমরা আপনার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম। এবং আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করতেন। এখন আমরা নবীর চাচার উসীলায় আপনার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করুন। তারপর আব্বাস (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং দু'আ করলেন। মৃতের কাছে দু'আ চাওয়া যদি বৈধ হতো, তা হলে কোন ক্রমেই তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাদ দিয়ে আব্বাস (রাঃ) এর কাছে দু'আ চাওয়া বৈধ মনে করতেন না। কারণ আব্বাস (রাঃ) এর দু'আর চেয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'আ কবূল হওয়া অধিক উপযোগী। মোটকথা মৃত ব্যক্তির উসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয নেই।

অনুরূপভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানের উসীলা দেয়াও জায়েয নেই। কারণ আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান থাকা দু'আকারীর জন্য কোন উপকারে আসবে না। দু'আকারীর জন্য এমন বিষয়ের উসীলা দেয়া উচিৎ, যা তার কাজে আসবে। সুতরাং এভাবে বলা উচিৎ যে, হে আল্লাহ! আপনার প্রতি এবং আপনার রাসূলের প্রতি আমার ঈমান আনয়নের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করুন। এ জাতীয় অন্যান্য শরীয়ত সম্মত বিষয়ের উসীলা দেয়া বৈধ।

প্রশ্নঃ (৯৪) কাউকে বন্ধু বা শত্রু হিসাবে গ্রহণ করার মূলনীতি কি ?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআ'লা যে সমস্ত ব্যক্তি বা বিষয় হতে নিজেকে সম্পর্ক মুক্ত ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা। আল্লাহ বলেনঃ

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا﴾

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যাতীত যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" (সূরা মুমতাহানাহঃ ৪) আর এটা হবে মুশরিক্ক দর সাথে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

অর্থঃ "আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।" (সূরা তাওবাঃ ৩) সুতরাং প্রতিটি মুমিনের উপর আবশ্যক হল কাফেরমুশরেকদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা। এমনিভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব। যদিও তা কুফরীর পর্যায়ে না যায়। যেমন পাপাচারিতায় লিপ্ত হওয়া। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ﴾

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।" (সূরা হুজুরাতঃ ৭)

যদি কোন মুমিনের কাছে ঈমানের সাথে সাথে পাপাচারিতা থাকে, তাহলে আমরা মুমিন হওয়ার কারণে তাকে ভালবাসবো এবং পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঘৃণা করব। এধরণের সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হল, যেমন আমরা অরুচীকর ঔষধ গ্রহণ করি, অনিচ্ছা সত্বেও তা পান করি। কারণ তাতে আরোগ্যের আশা করা যায়।

কোন কোন মানুষ পাপী মুমিনকে কাফের-মুশরেকের চেয়েও ঘৃণা করে। এটি খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং বাস্তবতার বিপরীত। কাফের আল্লাহর শত্রু, রাসূলের শত্রু এবং সমস্ত মুমিনের শত্রু। তাদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য আগমণ করেছে, তারা তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করে, এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা

প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায়।” (সূরা মুমতাহানাহঃ ১) আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরে বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (সূরা মায়িদাহঃ ৫১) আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

“ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনই আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করবেন।” (সূরা বাকারাঃ ১২০) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾

“আহ্‌লে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসা বশতঃ কামনা করে যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে দেয়।” (সূরা বাকারাঃ ১০৯)

এমনিভাবে প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক। আমাদের জন্যে হারাম কাজের প্রতি ভালবাসা রাখা বৈধ নয়। আমরা পাপী মুমিনের পাপকাজকে ঘৃণা করি এবং তা থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখি। কিন্তু আমরা তাকে ঈমানের কারণে ভালবাসি।

প্রশ্নঃ (৯৫) অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার হুকুম কি ? পর্যটনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণের বিধান কি ?

উত্তরঃ তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধঃ

১) ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইল্‌ম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

২) তার কাছে এমন দ্বীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।

৩) অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে। এতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন চিকিৎসার জন্য অথবা শিক্ষা অর্জনের জন্য, যা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না, তা হলে কোন অসুবিধা নেই।

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোন দরকার নেই; বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া যায় যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। আমাদের

ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব।

প্রশ্নঃ (৯৬) যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে চাকুরী করে, তার জন্য আপনার উপদেশ কি ?

উত্তরঃ যে মুসলিম ভাই অমুসলিমদের সাথে চাকুরী করে, তার জন্য আমার উপদেশ হল, সে এমন একটি কর্মক্ষেত্র তালাশ করবে, যা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলদের শত্রু হতে মুক্ত। যদি পেয়ে যায়, তাহলে কতইনা সুন্দর। আর যদি না পায়, তাহলে কাফেরদের সাথে একই কর্মক্ষেত্রে চাকুরী করতে কোন অসুবিধা নেই। তারা তাদের কাজ করবে এবং সেও আপন কর্মে লিপ্ত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, তার অন্তরে যেন কাফেরদের প্রতি কোনরূপ ভালবাসা না থাকে। সালাম এবং তার উত্তর দেয়ার ব্যাপারে সে ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ করে চলবে। তাদের জানাযায় শরীক হবে না এবং তাদের অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করবে না। বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। সাধ্যানুসারে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করবে।

প্রশ্নঃ (৯৭) কাফেরদের কাছে যে সমস্ত প্রযুক্তি রয়েছে, অবৈধতায় পতিত না হয়ে তা দ্বারা কিভাবে আমরা উপকৃত হব ?

উত্তরঃ আল্লাহর শত্রু কাফেররা যে সমস্ত কাজ-কর্ম করে, তা তিন প্রকারঃ-

১) এবাদত ২) অভ্যাস এবং ৩) কারিগরি ও শিল্পকলা। এবাদতের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই কাফেরদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এবাদতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করবে, তার জন্য বিরাট ভয়ের কারণ রয়েছে। ইহা তাকে ইসলাম থেকে বেরও করে দিতে পারে। লেবাস-পোষাক, চাল-চলন ও রীতিনীতি ইত্যাদির কোন ক্ষেত্রেই কাফেরদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে।"[1] তবে যাতে জনগণের উপকার রয়েছে, তা কাফেরদের কাছ থেকে শিক্ষা করাতে কোন দোষ নেই। কারণ তা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাছাড়া এবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, তাতে দলীল থাকতে হবে। আর অভ্যাস বা পার্থিব বিষয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা সবই হালাল। একমাত্র শরীয়ত সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু হারাম করলে সেটা ভিন্ন কথা।*

প্রশ্নঃ (৯৮) আরব উপদ্বীপে অমুসলিমদের প্রবেশ করানোর হুকুম কি ?

[1] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল্ লিবাস।

*. এখানে শরীয়তের একটি মৌলনীতির ব্যাখ্যা ছিল। সাধারণ পাঠকের বোধগম্য না হওয়ার আশংকায় তা বাদ দেয়া হয়েছে।- অনুবাদক।

উত্তরঃ অমসুলিসমদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করানোতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীর বিরোধীতা করার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেনঃ (أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) "তোমরা মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।"[1] সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا) "আমি অবশ্যই ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেব। তাতে মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মানুষকে থাকতে দেব না।"[2]

যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয় এবং উক্ত প্রয়োজন পূরণ করার মত কোন মুসলমান পাওয়া না যায় তবে তাদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করানোতে কোন দোষ নেই। তবে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদান করা যাবে না। যেখানে শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলা হয়েছে, সেখানেও যদি আকীদাহ কিংবা চরিত্রগত কোন ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করানো হারাম। কেননা জায়েয বস্তুতে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তখন তা হারামে পরিণত হয়ে যায়। কাফেরদেরকে এখানে আনা হলে যে সমস্ত ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলো তাদেরকে ভালবাসা, তাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট থাকা এবং দ্বীনের প্রতি দৃঢ়তা চলে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বে যথেষ্ট পেশাদার লোক রয়েছে। আমরা তাদেরকেই যথেষ্ট মনে করতে পারি।

ধর্ম প্রত্যাখ্যানই কি উন্নতির চাবিকাঠি ?

প্রশ্নঃ (৯৯) কিছু সংখ্যক মানুষ দাবী করে যে, দ্বীনের অনুসরণই মুসলমানদেরকে উন্নতি থেকে পিছিয়ে রেখেছে। তাদের দলীল হলো পাশ্চাত্য দেশসমূহ সকল প্রকার দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেই বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এও বলে যে, পাশ্চাত্য বিশ্বেই বেশী করে বৃষ্টি ও ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই ?

উত্তরঃ দুর্বল ঈমানদার, ঈমানহীন এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাই কেবল এ ধরণের কথা বলতে পারে। মুসলিম জাতি ইসলামের প্রথম যুগে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেই সম্মান-মর্যাদা এবং শক্তি অর্জন করে পৃথিবীর সকল প্রান্তে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসলমানদের স্বর্ণ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ করেই বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব এতো উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ তাদের সঠিক দ্বীনকে ছেড়ে দিয়ে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদ্‌আতে লিপ্ত হওয়ার কারণেই সমস্ত জাতির পিছনে পড়ে আছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মুসলমানেরা যদি আবার তাদের দ্বীনের

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সায়ের।

[2] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সায়ের।

দিকে ফিরে যায়, তা'হলে আমারই সম্মানিত হবো এবং সমস্ত জাতির উপরে আমরা রাজত্ব করতে সক্ষম হবো। আবু সুফিয়ান যখন রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের সামনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের পরিচয় তুলে ধরল, তখন রোমের বাদশা মন্তব্য করে বলল যে, তুমি যা বলছ, তা সত্য হলে অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার পা রাখার স্থান পর্যন্ত চলে আসবে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হয়েছে, আমাদের দ্বীন তা গ্রহণ করতে বাধা দেয় না। আফসোসের কথা হলো মুসলমানেরা দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিকেই হারিয়ে ফেলেছে। পার্থিব উন্নতি সাধন করতে ইসলাম কখনো বিরোধীতা করে না। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم﴾

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়ার মধ্য থেকে। তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে।” (সূরা আনফালঃ ৬০) আল্লাহ বলেনঃ

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾

“তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার দিক-দিগন্তে ও রাস্তা সমূহে চলাফেরা কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর।” (সূরা মুলকঃ ১৫) তিনি আরো বলেনঃ

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা বাকারা-২৯) এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা মানুষকে পৃথিবীর সকল বস্তু উপার্জন করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রতি উৎসাহ যোগায়। দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার জন্য নয়। বরং তা দ্বারা পার্থিব জীবনে উপকৃত হওয়ার জন্য। অমুসলিম রাষ্ট্রের লোকেরা মৌলিক দিক থেকে কাফের। তারা যে দ্বীনের দাবী করে থাকে, তাও বাতিল ধর্ম। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।” (সূরা আল-ইমরান-৮৫) আহলে কিতাবরা যদিও অন্যান্য কাফের-মুশরেকদের থেকে আলাদা, কিন্তু পরকালে কোন পার্থক্য হবে না। এজন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শপথ করে বলেছেন, এই উম্মতের কোন ইয়াহুদী-নাসারা যদি তাঁর দাওয়াত শ্রবণ করার পরও ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তারা নিজেদেরকে ইয়াহুদী বলে দাবী করুক বা নাসারা হিসাবে দাবী করুক, সবই সমান।

অমুসলিমরা বৃষ্টিসহ অন্যান্য যে ধরণের নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তার কারণ হল এটা তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তাদের ভাল কাজের বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করা হয়ে থাকে। উমার (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিঠে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে দেখে বললেন, হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! পারস্য এবং রোমের বাদশারা অসংখ্য নেয়ামতের ভিতরে রয়েছে। আর আপনি এই জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, হে উমার এদেরকে পার্থিব জীবনেই সমস্ত নেয়ামত দেয়া হয়েছে। তুমি কি এতে রাজী নও যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য হবে আখেরাত।[1]

তাছাড়া তুমি কি দেখ না যে, তাদের মধ্যে হয়ে থাকে অনাবৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্পসহ নানা বিপদাপদ ? যা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় এবং রেডিওতে শুনা যায়। উল্লেখিত প্রশ্নের মত যারা প্রশ্ন করে, তারা অন্ধ। আল্লাহ তাদের অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে তারা বাস্তব অবস্থা দেখতে পায় না। তাদের জন্য আমার নসীহত এই যে, তারা যেন মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের দিকে ফিরে আসলেই আমাদের জন্য সম্মান, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব অর্জিত হবে। উপরোক্ত সন্দেহ পোষণকারীর এটাও বিশ্বাস করা জরুরী যে, পাশ্চাত্য বিশ্বের কাফেররা বাতিলের উপর রয়েছে। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পরকালে পূর্ণভাবে শাস্তি প্রদানের নিমিত্তেই তাদেরকে দুনিয়ার নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে। যখন তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, তখন তাদের দুঃখ ও হতাশা বেড়ে যাবে। তাদেরকে নেয়ামত প্রদানের উদ্দেশ্য এটিই।[2]

প্রশ্নঃ (১০০) কতক লোক বলে যে, অন্তর ঠিক থাকলে শব্দের উচ্চারণ ঠিক করার বেশী গুরুত্ব নেই। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ?

উত্তরঃ শব্দের উচ্চারণ বলতে যদি তার উদ্দেশ্য হয় আরবী ভাষা, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তার কারণ এই যে, আকীদা ঠিক থাকলে আরবী ভাষার সঠিক উচ্চারণ জরুরী নয়। অর্থ বোঝা গেলেই চলবে। আর যদি শব্দের উচ্চারণ বলতে এটা উদ্দেশ্য হয় যে, অন্তরের আকীদা যেহেতু ঠিক আছে, কাজেই মুখে যা ইচ্ছা তা উচ্চারণ করাতে কোন

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাযালিম।

[2] . আল্লাহর এই বাণীটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, তিনি বলেনঃ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ "যখন ওরা ভুলে গেল ঐ বিষয় যার উপদেশ গ্রহণ করার আদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তখন আমি তাদের জন্য সকল কিছুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তা নিয়ে তারা আনন্দ-খুশিতে মত্ত হয়ে পড়ল, তাদেরকে আমি হঠাৎ পাকড়াও করলাম, তখন তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল।" (সূরা আনআম-৪৪)

অসুবিধা নেই। যদিও তা কুফরী বাক্য হয়ে থাকে। তবে এটি ঠিক নয়। আমরা বলব যে, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখের ভাষাও ঠিক করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১০১) 'আল্লাহ আপনাকে চিরস্থায়ী করুন'একথাটি বলা কি ঠিক ?

উত্তরঃ- প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যটি বলা ঠিক নয়। বরং এটি দু'আর মধ্যে সীমালংঘন করার শামিল। কারণ আল্লাহ ব্যতীত কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ বলেনঃ

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারাব্যতীত।" (সূরা আর-রাহমানঃ ২৬-২৭) আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾

"আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?" (সূরা আম্বীয়াঃ ৩৪)

প্রশ্নঃ (১০২) আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে কোন কিছু চাওয়া জায়েয আছে কি ?

উত্তরঃ- আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে মানুষ দুনিয়ার কোন জিনিষ চাইবে, এ থেকে আল্লাহর চেহারা অনেক বড়। আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে (জান্নাত ছাড়া অন্য) কোন কিছু চাওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্নঃ (১০৩) আপনি দীর্ঘজীবি হোন, একথা বলার হুকুম কি?

উত্তরঃ সাধারণভাবে একথাটি বলা ঠিক নয়। কারণ হায়াত দীর্ঘ হওয়া কখনো ভাল হয় আবার কখনো মন্দ হয়। ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার বয়স বাড়ল, কিন্তু আমল মন্দ হলো। যদি বলে আল্লাহর আনুগত্যের উপর আপনার হায়াত দীর্ঘ হোক, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

একত্রে (الله) এবং (محمد) লেখার বিধান কি ?

(الله -محمد)

প্রশ্নঃ (১০৪) আমরা অনেক সময় দেখি যে, গাড়ী বা দেয়ালে এক দিকে (الله) এবং অন্য দিকে (محمد) লেখা থাকে, এমনিভাবে কাপড়ের টুকরায়, বইয়ের উপর এবং কুরআন মজীদের গেলাফের উপরও লেখা হয়ে থাকে। এরকমভাবে লেখা কি ঠিক?

উত্তরঃ এভাবে লেখা জায়েয নেই। কেননা এধরণের লেখাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর সমান করে দেয়া হয়ে থাকে এবং অজ্ঞ লোকেরা এভাবে লেখা দেখে উভয় নামকে মর্যাদার দিক থেকে সমান মনে করতে পারে। তাই প্রথমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম মুছে ফেলা উচিৎ। বাকী থাকবে শুধু আল্লাহর নাম। সুফীরা শুধু আল্লাহু, আল্লাহু যিকির করে থাকে। এজন্য আল্লাহু শব্দটিকেও মুছে

ফেলতে হবে। সুতরাং গাড়ীতে বা দেয়ালে বা কাপড়ে বা অন্য কোথাও 'আল্লাহু' বা 'মুহাম্মাদ' কোনটিই লেখা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১০৫) আল্লাহ্ আপনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, এই বাক্যটি বলা যাবে কি না ?

উত্তরঃ এই বাক্যটি উচ্চারণ করা জায়েয নেই। কারণ এতে ধারণা করা হয় যে, আল্লাহ তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তাই তিনি প্রশ্ন করেন। এটি একটি বিরাট অপছন্দনীয় বাক্য। যদিও বক্তা এধরণের উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু বাক্যের মাধ্যমে উক্ত অর্থ বুঝা যায়। তাই এভাবে বলা বর্জন করা উচিৎ।

মৃত ব্যক্তিকে মরহুম বলার হুকুম

প্রশ্নঃ- (১০৬) মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মরহুম বলা বা আল্লাহ তাকে রহমত দ্বারা ঢেকে নিয়েছেন অথবা অমুক ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের দিকে চলে গেছেন। এধরণের কথা বলার হুকুম কি ?

উত্তরঃ- উক্ত কথাগুলো বলাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এতে কেবলমাত্র তার জন্য কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়নি। শুভ ও ভাল আশাবাদ ব্যক্ত করে এধণের কথা বলে থাকেলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি (আল্লাহর রহমতের দিকে চলে গেছেন) শুভ ও ভাল আশাবাদ ব্যক্ত করে এধণের কথা বলে থাকেন তাহলেও আমি কোন অসুবিধা মনে করিনা। এবং তা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেয়ার বিষয় নয়। কেননা এধরণের কথা বলা গায়েবের অন্তর্ভুক্ত তাই দৃঢ়ভাবে বলা ঠিক নয়। এবং একই ভাবে রাফীকুল আলা (মহান অন্তরঙ্গ সঙ্গীর) দিকে চলে গেছেন বলাও ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ-(১০৭) ভাষণের শুরুতে 'দেশ, জাতি ও আরববাদের পক্ষ থেকে বলছি'- একথাটি বলা কি ঠিক ?

উত্তরঃ- বক্তার উদ্দেশ্য যদি হয় যে, সে দেশ ও জাতির মুখপত্র হিসাবে কথা বলছে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি বরকতের আশায় অথবা সাহায্য চাওয়ার নিয়তে কথাটি উচ্চারণ করে, তাহলে শির্কে পরিণত হবে। বক্তার অন্তরে দেশ-জাতির সম্মান যদি আল্লাহর সম্মানের মত হয় তাহলে বড় শির্কে পরিণত হতে পারি।

প্রশ্নঃ- (১০৮) অনেক মানুষ বলে থাকে "আপনি আমাদের জন্য বরকত স্বরূপ এভাবে বলার হুকুম কি ?

উত্তরঃ- একথার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আপনার আগমণের কারণে আমরা বরকত লাভ করলাম, তাহলে অসুবিধা নেই। কারণ বরকতকে মানুষের দিকে সম্পৃক্ত করা জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) এর গলার হার হারিয়ে যাওয়ার কারণে যখন তায়াম্মুমের

আয়াত নাযিল হল, উসাইদ ইবনে হুজায়ের (রাঃ) বললেন, হে আবু বকর পরিবারের নারী! এটিই আপনাদের প্রথম বরকত নয়।[1] বরকতের অনুসন্ধান দু'ভাবে হতে পারে।

১) শরীয়ত সম্মত বলে কোন জিনিষ থেকে বরকত হাসিল করাঃ যেমন আল-কুরআনুল কারীম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾

অর্থঃ "এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি।"(সূরা আনআ'ম-৯২) কুরআনের বরকত হল, যে ব্যক্তি তাকে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করবে এবং কুরআন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তার জন্য বিজয় অনিবার্য। এর মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে শির্ক থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কুরআনের অন্যতম বরকত হল, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে দশটি নেকী অর্জন করবে।

২) বাহ্যিক কোন জানা জিনিষ থেকে বরকত হাসিল করাঃ যেমন দ্বীনি ইলম। কোন ব্যক্তির ইলম এবং কল্যাণের পথে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে বরকত হাসিল করা। উসায়েদ ইবনে হুজায়ের বলেন, হে আবু বকরের বংশধর! এটিই তোমাদের প্রথম বরকত নয়। কেননা কোন কোন মানুষের হাতে এমন বরকত প্রকাশিত হয়, যা অন্যের হাতে প্রকাশিত হয়নি।

মৃত ব্যক্তি বা মিথ্যুকদের কল্পিত ওলী থেকে বরকত লাভের ধারণা করা সম্পূর্ণ বাতিল। এর কোন অস্তিত্ব নেই। কখনো বরকতের নামে শয়তানের সহযোগীতায় ভন্ডরা মানুষকে গোমরাহ করার জন্য কিছু কিছু অলৌকিক কান্ড দেখিয়ে থাকে। সঠিক বরকত এবং ভন্ডামীর মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি হল, যার কাছ থেকে কারামাত প্রকাশিত হল, তার ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সে যদি আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই সুন্নাহর অনুসারী হবে এবং বিদ্‌আত হতে মুক্ত হবে, আল্লাহ তাঁর হাতে এমন বরকত প্রকাশ করবেন, যা অন্যের হাতে প্রকাশ করবেন না। আর যদি কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীতাকারী হয় অথবা বাতিলের দিকে আহবানকারী হয় এবং তা সত্বেও তার হাতে বাহ্যিকভাবে কোন ভাল জিনিষ প্রকাশিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি শয়তানের পক্ষ হতে বাতিলের সহযোগিতা মাত্র।

প্রশ্নঃ (১০৯) মানুষ বলে থাকে "তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে" এধরণের কথা বলার বিধান কি ?

উত্তরঃ তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে-এধরণের কথা বলা ঠিক নয়। কারণ তাকদীর পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট। তাই অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলা হবে কিভাবে ? বরং বলা হবে তাকদীর

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তায়াম্মুম।

আগমণ করেছে বা বিজয় লাভ করেছে। এমনিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলাও ঠিক হবে না। বরং বলা হবে আল্লাহর অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়েছে।

"চিন্তার স্বাধীনতা" কথাটি কতটুকু সঠিক?

প্রশ্নঃ (১১০) "চিন্তার স্বাধীনতা" সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি এবং পত্রিকায় পড়ে থাকি। মূলতঃ এটি আকীদা গ্রহণের স্বাধীনতার দিকে আহবান মাত্র। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে আমাদের কথা হল, যে ব্যক্তি আকীদার স্বাধীনতার দাবী করে এবং যে কোন দ্বীনে বিশ্বাসের অধিকার রাখে বলে মনে করে, সে কাফের। কারণ যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন গ্রহণ করা বৈধ মনে করে, সে কাফেরে পরিণত হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

দ্বীনের বিষয় চিন্তা প্রসূত বিষয় বা কোন মতবাদ নয়। এটা আল্লাহর অহী, যা আল্লাহ তাঁর নবীদের উপর নাযিল করেছেন যেন মানুষ তার অনুসরণ করতে পারে। ইসলাম একটি চিন্তাধারা, খৃষ্ট ধর্ম একটি চিন্তা ধারা এবং ইহুদীবাদ একটি চিন্তা ধারা এভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ এই যে, আসমানী শরীয়তসমূহ নিছক মানবীয় চিন্তা প্রসূত বিষয়। আসমানী দ্বীনসমূহ আল্লাহর পক্ষ হতে অহী স্বরূপ আগমণ করেছে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর এবাদত করবে। সুতরাং এর ব্যাপারে চিন্তাধারা কথাটি ব্যবহার করা জায়েয নেই।

মোট কথা, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, সে নিজের খেয়াল-খুশী মত যে কোন দ্বীনে বিশ্বাস করতে পারে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।" (সূরা আল-ইমরানঃ ৮৫) আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

"ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম।" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৯) সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি তা করবে আলেমগণ তাকে সুস্পষ্ট কাফের হিসাবে ফতোয়া দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ (১১১) মুফতীর নিকট "এ বিষয়ে ইসলামের হুকুম কি বা ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি কি" এই ধরণের বাক্য দিয়ে প্রশ্ন করার বিধান কি ?

উত্তরঃ এভাবে বলা উচিৎ নয়। হতে পারে সে ফতোয়া দিতে ভুল করবে। কাজেই তার ভুল ফতোয়া ইসলামের বিধান হতে পারে না। তবে মাসআলাতে যদি সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি? উত্তর হবে এ বিষয়ে ইসলামের বিধান হল হারাম।

প্রশ্নঃ (১১২)"পরিস্থিতির ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে" "তাকদীদেরর ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে" এধরণের কথা বলার হুকুম কি ?

উত্তরঃ কথাগুলো অপছন্দনীয় এবং শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ পরিস্থিতির কোন ইচ্ছা নেই। এমনিভাবে তাকদীরেরও নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। যদি বলে 'তাকদীরের লিখন এরকম ছিল', তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (১১৩) কাউকে শহীদ বলার হুকুম কি ?

উত্তরঃ কাউকে শহীদ বলা দু'ভাবে হতে পারে। (১) নির্দিষ্ট কোন কাজকে উল্লেখ করে শহীদ বলা। এভাবে বলা, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হল সে শহীদ, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে শহীদ, প্লেগ রোগে মারা গেলে শহীদ---। এভাবে বলা জায়েয আছে। কেননা এখানে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করছেন। ২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দিষ্ট করে যাকে শহীদ বলেছেন এবং সমস্ত মুসলমান যাকে শহীদ বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে শহীদ বলা জায়েয নেই। ইমাম বুখারী এভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যে, "একথা বলা যাবে না যে অমুক ব্যক্তি শহীদ"। ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন, অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে অবগত হওয়া ব্যতীত অকাট্যভাবে কারও জন্য শাহাদাতের ফায়সালা দেয়া যাবে না। তিনি সম্ভবত উমার (রাঃ) এর একটি ভাষণের দিকে ইংগিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলে থাক অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। খবরদার এভাবে বলো না। কারণ তার অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মত বল যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল অথবা জীবন দিল সে শহীদ"।[1]

কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হলে সে বিষয়ে ইলম থাকতে হবে। শহীদ হওয়ার শর্ত হলো আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করা। আর এটি অন্তরের গোপন অবস্থা। তা জানার কোন উপায় নেই। এজন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِه) "আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো, আর আল্লাহই ভাল জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।"[2] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ

---

[1] - মসনাদে আহমাদ।

[2] - বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ)

"ঐ সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শরীরে জখম হবে, আর আল্লাহই ভাল জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকবে, রং হবে রক্তের, কিন্তু তার গন্ধ হবে মিসকের সুঘ্রাণের ন্যায়।"[1]

যারা জিহাদ করে নিহত হয়, তাদের বাহ্যিক অবস্থা ভাল। তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু তাদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করি না। তাদের প্রতি খারাপ ধারণাও করি না। তবে দুনিয়াতে তাদের উপর শহীদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকে তার পরিহিত কাপড়েই রক্ত সহকারে দাফন করা হবে এবং তার জানাযা পড়া হবেনা। আর যদি অন্যভাবে শহীদ হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল দেয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং জানাযার নামায পড়া হবে।

কাউকে 'শহীদ' হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ তাকে জান্নাতের সাক্ষ্য দেয়া। এটি আহলে সুন্নাহর মাযহাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলে সুন্নাতের লোকেরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে শহীদ বলেছেন, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শহীদ বলেন না। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে যাকে শহীদ বলা হয়েছে, তাকে শহীদ বলা যাবে।

প্রশ্নঃ (১১৪) 'হঠাৎ সাক্ষাত হয়ে গেল', 'হঠাৎ এসে গেলাম' এজাতীয় কথা বলা জায়েয কি না ?

উত্তরঃ আমরা এতে না জায়েযের কিছু মনে করি না। মনে হয় এ ধরণের কিছু হাদীছ পাওয়া যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে হঠাৎ দেখে ফেললেন। তবে এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোন হাদীছ আমার মনে আসছে না। মানুষ কোন কাজকে হঠাৎ মনে করতে পারে। কারণ সে গায়েবের খবর জানে না। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে না। কারণ তিনি সকল বিষয়ে অবগত আছেন। প্রতিটি বিষয় আল্লাহর কাছে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। তাই হঠাৎ করে তাঁর কোন কাজ হতেই পারে না।

প্রশ্নঃ (১১৫) ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী চিন্তাবিদ-এধরণের কথা বলা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ ইসলামী চিন্তাধারা বা অনুরূপ শব্দ বলা যাবে না। ইসলামকে যদি চিন্তাধারা বলি, তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে, এটি চিন্তাপ্রসূত বিষয় যা গ্রহণ বা বর্জন করার সম্ভাবনা রাখে।

---

[1] - বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।

এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাক্য, যা ইসলামের শত্রুরা আমাদের ভিতরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। অথচ আমরা জানি না।

কাউকে ইসলামী চিন্তাবিদ বলাতে কোন অসুবিধা নেই। একজন মুসলিম চিন্তাবিদ হবে এতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১১৬) দ্বীনকে খোসা এবং মূল এ ভাবে ভাগ করা কি ঠিক ?

উত্তরঃ দ্বীনকে খোসা এবং মূল হিসাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা বৈধ নয়। দ্বীনের সবই মূল এবং মানব জাতির জন্য উপকারী। তা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। পোষাক এবং বাহ্যিক বেশ-ভুশার ক্ষেত্রেও যদি মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর অনুসরণের নিয়ত করে, তাহলে তাতেও ছাওয়াব রয়েছে। খোসা এমন জিনিষকে বলা হয়, যা উপকারী নয় বলে ফেলে দেয়া হয়। ইসলামের ভিতরে বর্জনীয় কোন কিছু নেই। সবই মানুষের জন্য কল্যাণকর। যারা এধরণের কথার প্রচলন ঘটায়, তাদের ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার। যাতে করে তারা সত্যের সন্ধান পেতে পারে এবং তার অনুসরণ করতে পারে। তাদের উচিৎ ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া বর্জন করা। এ কথা ঠিক যে, ইসলামের মধ্যে কিছু জিনিষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ইসলামের রুকনসমূহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ))

"ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। ১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ২) নামায কায়েম করা ৩) যাকাত দেয়া ৪) রামাযানের রোযা রাখা ও ৫) কাবা ঘরের হজ্জ করা"[1] দ্বীনের মধ্যে এমন জিনিষও রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাতে খোসার মত এমন কিছু নেই যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবেনা; তার সম্পূর্ণটাই উপকারী।

দাড়ি লম্বা করার ব্যাপারে কথা হল নিঃসন্দেহে তা একটি এবাদত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা লম্বা করার আদেশ দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি আদেশ পালন করাই এবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। দাড়ি রাখা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর সুন্নাত। আল্লাহ তাআ'লা হারুন (আঃ) এর উক্তি বর্ণনা করে বলেনঃ

﴿قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾

"হে আমার ভাই! আমার দাড়িতে ও মাথায় ধরে টান দিবেন না।" (সূরা ত্বাহাঃ ৯৪) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে, দাড়ি লম্বা করা স্বভাবগত বিষয়ের

---

[1] - বুখারী , অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

অন্তর্গত। সুতরাং দাড়ি লম্বা করা একটি এবাদত, অভ্যাস নয় এবং তা খোসাও নয়। যেমনটি ধারণা করে থাকে কতিপয় লোক।

প্রশ্নঃ (১১৭) "তাকে সর্বশেষ বিছানায় দাফন করা হল" মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলার হুকুম কি?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে একথাটি বলা সম্পূর্ণ হারাম। যদি তুমি বল সে তার শেষ গন্তব্যে চলে গেছে, তার অর্থ হল কবরের পরে আর কিছু নেই। এ ধরণের কথা পুনরুত্থান অস্বীকার করার শামিল। ইসলামী আকীদার অন্যতম দিক হল কবরই শেষ নয়। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই কেবল বলে থাকে কবরই শেষ। তারপর আর কিছু নেই। আল্লাহ বলেনঃ

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ – حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।" (সূরা তাকাছুরঃ ১-২) জনৈক গ্রাম্য লোক আয়াতটি শুনার পর বলল, আল্লাহর শপথ ভ্রমণকারী কখনো স্থায়ী বসবাসকারী হতে পারে না। মোটকথা কবরকে শেষ নিবাস বলা যাবে না বরং কবর থেকে পুনরুত্থান হবে এবং কিয়মাতের দিন বিচার ফয়সালা হওয়ার পর জান্নাত বা জাহান্নামই হবে শেষ নিবাস।

প্রশ্নঃ (১১৮) নাসারাদেরকে 'মাসীহী' বলা কি ঠিক ?

উত্তরঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমণের পর, খৃষ্টানদেরকে মাসীহী বলা ঠিক নয়। তারা যদি সত্যিকার অর্থে মাসীহী হত, তাহলে অবশ্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করত। কেননা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে ঈমান আনয়ন এবং ঈসা (আঃ) এর উপর ঈমান আনয়ন একই কথা। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّــوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললেনঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি এমন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমণ করবেন। তাঁর নাম হবে আহমাদ। অতঃপর যখন তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমণ করেন, তখন তারা বলল, এ তো প্রকাশ্য এক যাদু।" (সূরা আস্ সাফঃ ৬) ঈসা (আঃ) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমণের সুসংবাদ এ জন্য দিয়েছেন, যাতে তারা তাঁর আনিত দ্বীন গ্রহণ করে। কেননা কোন বিষয়ের সুসংবাদ দেয়ার অর্থই হল তা গ্রহণ করা। ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে যার আগমণের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি যখন দলীল-প্রমাণসহ আগমণ করলেন, তখন তারা তাঁর সাথে কুফরী করল এবং যাদুকর বলে উড়িয়ে দিল।

আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কুফরী করার মাধ্যমে তারা ঈসার সাথেও কুফরী করল। কারণ একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকে অস্বীকার করা। তাই খৃষ্টানদের জন্য কখনো ঈসা (আঃ) এর অনুসারী হওয়ার দাবী করা বৈধ নয়। তারা যদি সত্যিকার অর্থে ঈসা নবীর অনুসারী হত, তাহলে অবশ্যই তারা তাঁর প্রদত্ত সুসংবাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করত। ঈসাসহ সকল নবীর নিকট থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾

"এবং আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যখন তোমাদেরকে কিতাব এবং জ্ঞান দান করব, অতঃপর যদি তোমাদের কাছে এমন একজন রাসূল আগমণ করেন, যিনি তোমাদের কিতাবকে সত্যায়ন করেন, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করলে এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিলে? তখন তাঁরা বললেন, আমরা অঙ্গীকার করলাম। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।" (সূরা আল-ইমরানঃ ৮১) যিনি তাদের কিতাবকে সত্যায়নকারী হিসেবে আগমণ করেছেন তিনি হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ﴾

"আর আমি এ কিতাবকে নাযিল করেছি যা হকের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণবহনকারী এবং ঐসব কিতাবের সংরক্ষও; অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংষ কর। তুমি যা প্রাপ্ত হয়েছ তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করোনা। (সূরা মায়িদাঃ ৪৮) অত্র আয়াতে রাসূল বলতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা খৃষ্টানদের জন্য ঈসা (আঃ) এর উম্মত হওয়ার দাবী করা ঠিক নয়। কারণ তারা ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়তকে অস্বীকার করেছে। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অস্বীকার করার অর্থ ঈসা (আঃ)কে অস্বীকার করা।

প্রশ্নঃ- (১১৯) 'আল্লাহ না করেন' এই কথাটি বলার হুকুম কি ?

উত্তরঃ- আমি এই কথাটি বলা অপছন্দ করি। কথাটিতে আল্লাহর উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। আল্লাহর উপর কোন কিছুর বাধ্যবাধকতা নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ))

“তোমাদের কেউ যেন না বলে হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন। বরং দৃঢ়তার সাথে যেন দু’আ করে এবং কবূলের আশা নিয়ে দু’আ করে। আল্লাহকে বাধ্যকারী কেউ নেই।”[1] আল্লাহ না করুন এর স্থলে আল্লাহ নির্ধারণ না করুন বলা অনেকটা সন্দেহ মুক্ত।

প্রশ্নঃ- (১২০) মানুষ মারা গেলে নিম্নের কথাটি বলা কি ঠিক ?

﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾

অর্থাৎ “হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার প্রভুর দিকে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে

উত্তরঃ- এই ধরণের কথা বলা জায়েয নেই। কে তাকে সংবাদ দিল যে, সন্তুষ্ট চিত্তে সে আল্লাহর দিকে ফেরত যাচ্ছে ? কাউকে এভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা কারও পক্ষে বৈধ নয়।

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ দাওয়াত।

فتاوى الصلاة (الطهارة)

অধ্যায়ঃ নামায (পবিত্রতা)

প্রশ্নঃ (১২১) অপবিত্রতা ও বাহ্যিক নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার প্রকৃত মাধ্যম কি ?

উত্তরঃ যে কোন নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে পানি। পানি ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। চাই উক্ত পানি পরিচ্ছন্ন হোক বা পবিত্র কোন বস্তু তাতে পড়ার কারণে তাতে কোন পরিবর্তন দেখা যাক। কেননা বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, পবিত্র কোন বস্তুর কারণে যদি পানির মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়, তবে তাকে পানিই বলা হবে। এর পবিত্র করণের ক্ষমতা বিনষ্ট হবে না। এই পানি নিজে পবিত্র অন্যকেও পবিত্র করতে পারে। পানি যদি না পাওয়া যায় বা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশংকা দেখা যায়, তবে তায়াম্মুমের দিকে অগ্রসর হবে। দু'হাত মাটিতে মেরে তা দ্বারা মুখমন্ডল মাসেহ করবে এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে।

আর বাহ্যিক ও প্রকাশ্য নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি হচ্ছে, যে কোন প্রকারে উক্ত নাপাক বস্তু অপসারিত করা। চাই তা পানি দ্বারা হোক বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা। কেননা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় এমন নাপাক বস্তুর পবিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা তা অপসারিত করা। অতএব পানি বা পেট্রোল বা কোন তরল পদার্থ বা শুস্ক বস্তু দ্বারা যদি পরিপূর্ণরূপে উক্ত নাপাকী অপসারিত করা সম্ভব হয়, তবেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু কুকুরের নাপাকী (মুখ দেয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র) পবিত্র করার জন্য অবশ্যই সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে এবং একবার মাটি দ্বারা মাজতে হবে। এ ভাবেই আমরা জানতে পারব প্রত্যক্ষ নাপাক বস্তু থেকে কিভাবে পবিত্র হতে হয় এবং কিভাবে আভ্যন্তরিন নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

প্রশ্নঃ (১২২) বাহ্যিক অপবিত্র বস্তু পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পবিত্র করা যাবে কি ? বাস্পের (Dry clean) মাধ্যমে কি কোট ইত্যাদি পবিত্র করা যায়?

উত্তরঃ বাহ্যিক নাপাক বস্তু অপসারিত করা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়। অর্থাৎ ইহা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত নাপাক বস্তু থেকে মুক্ত হওয়া। অতএব যে কোন বস্তু দ্বারা যদি তা অপসারিত করা সম্ভব হয় এবং তার চিহ্ন দূর করা যায়, তবে উক্ত বস্তু তাকে পবিত্রকারী হবে। চাই তা পানি হোক বা পেট্রোল অথবা যে কোন বস্তু হোক। এমনকি বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সূর্যের তাপ বা বাতাসের মাধ্যমেও যদি উক্ত বস্তু অপসারিত হয়, তবে সে স্থান পবিত্র হয়ে যাবে। এ কথাটি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এর পসন্দ। কেননা অপবিত্র বস্তুটি প্রত্যক্ষ থাকলেই উক্ত স্থানটি নাপাক থাকবে, যখনই উহা অপসারিত হয়ে যাবে তখনই উক্ত স্থান পবিত্র হবে। অবশ্য নাপাক বস্তুটির রং যদি উঠানো সম্ভব না হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। এ ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি

ড্রাই ক্লিনের মাধ্যমে যদি কোট ইত্যাদি সাফ করা হয় এবং তা থেকে বাহ্যিক নাপাকী দূরীভূত হয়ে যায়, তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১২৩) দীর্ঘকাল কোন স্থানে পানি জমে থাকার কারণে তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ পানির বিধান কি ?

উত্তরঃ যদিও এ পানি পরিবর্তন হয়ে থাকে তবুও উহা পবিত্র। কেননা বাইরের কোন নাপাক বস্তু দ্বারা তার পরিবর্তন সৃষ্টি হয়নি। বরং দীর্ঘ সময় থাকার কারণে এই পরিবর্তন এসেছে। এ দ্বারা ওযু বা গোসল করলে তা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি নিশ্চিত হয় যে, কোন অপবিত্র বস্তু পড়ার কারণে তাতে পরিবর্তন এসেছে তবে তা নাপাক বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (১২৪) পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার হেকমত কি ?

উত্তরঃ হে প্রশ্নকারী আপনি জেনে রাখুন! এবং যারাই এই প্রশ্নের উত্তর পাঠ করবে তাদেরও জেনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান সমূহের হেকমত হচ্ছে, আল্লাহর নিম্ন লিখিত এই বাণীটিঃ

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।" (সূরা আহযাব- ৩৬) কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত কোন বিষয় ওয়াজিব বা হারাম সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন উঠালেই আমরা তাকে বলবঃ এটা আপনার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ কিংবা আপনার রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ। বিষয়টি মেনে নেয়ার জন্য এটুকু কথাই একজন মুমিনের জন্য যথেষ্ট। এই কারণে আয়েশা (রাঃ) কে যখন জিজ্ঞেস করা হল, 'কি ব্যাপার, ঋতুবতী নারী রোযার কাযা আদায় করবে, অথচ নামাযের কাযা আদায় করবে না?' তিনি জবাবে বললেন, كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ "আমরা ঋতুবতী হতাম, আমাদেরকে রোযা কাযা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হত, কিন্তু নামায কাযা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হত না।"[1] কুরআন ও সুন্নাহ্র উক্তি পাওয়া গেলে অন্য কোন হেকমত অনুসন্ধান করা উচিত নয়। বিনা দ্বিধায় মু'মিন সেটা মেনে নিবে এবং আমল করবে। কোন প্রশ্ন করবে না। অবশ্য উক্ত নির্দেশের হেতু ও হেকমত অনুসন্ধান করা নিষেধ নয়। কেননা তাতে ১) আন্তরিক প্রশান্তি বৃদ্ধি হয়, (২) বিষয়টির কারণ ও হিকমত জানা থাকলে ইসলামী শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রস্ফুটিত হয়। (৩) তাছাড়া বিষয়টির কারণ জানা থাকলে, একই কারণ বিশিষ্ট

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী নামায কাযা আদায় করবে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদঃ ছিয়াম কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

অন্য কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন উক্তি না পাওয়া গেলে, সেখানে কেয়াস করা সম্ভব হবে। শরীয়তের বিষয়ে হেকমত জানা থাকলে উল্লেখিত তিনটি উপকার পাওয়া যায়। উল্লেখিত ভূমিকার পর উপরে বর্ণিত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম, নারীর জন্য হারাম নয়।[1]

এর কারণ হচ্ছে, মানুষের সৌন্দর্যের জন্য স্বর্ণ হচ্ছে সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু। বস্তুটি সৌন্দর্য ও গয়না হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। আর পুরুষের এটা দরকার নেই। অর্থাৎ পুরুষ এমন মানুষ নয় যে, তাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে পরিপূর্ণ হতে হবে। বরং তার পৌরুষত্বের কারণে সে নিজেই পরিপূর্ণ মানুষ। তাছাড়া নিজের দিকে অন্য মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য পুরুষের সৌন্দর্য অবলম্বন করারও দরকার নেই। কিন্তু নারী এর বিপরীত। নারী অপূর্ণ, তার সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করা দরকার। একারণে সর্বোচ্চ মূল্যে গয়না দিয়ে তাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করার প্রয়োজন দেখা যায়। যাতে করে তার ঐ সৌন্দর্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি করে, স্বামীর কাছে স্ত্রী হয়ে উঠে আবেগময়ী ও আকর্ষণীয়। আর একারণেই নারীর জন্য স্বর্ণ দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা বৈধ করা হয়েছে, পুরুষের জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা নারী প্রকৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে এরশাদ করেনঃ

﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾

"যে অলংকারে মন্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?" (তাকে কি তোমরা আল্লাহর সন্তান হিসেবে সাব্যস্ত করবে?) (সূরা যুখরুফঃ ১৮) আর এভাবেই শরীয়তে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার হেকমত সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

যে সমস্ত পুরুষ স্বর্ণ ব্যবহারে অভ্যস্থ, এ উপলক্ষ্যে আমি তাদেরকে নসীহত করে বলতে চাইঃ তারা এ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের নাফারমানী করেছে। নিজেদেরকে নারীদের কাতারে শামিল করেছে। নিজেদের হাতে বা গলায় জাহান্নামের আগুনের আঙ্গার পরিধান করেছে। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে।[2] তাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার কাছে

---

[1] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পোশাক, অনুচ্ছেদঃ স্বর্ণ ও রেশমের বিবরণ। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ সৌন্দর্য, অনুচ্ছেদঃ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।

[2] . কিছু কিছু লোক অযথা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, কাফনের কাপড়ের মূল্য পরিমাণ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। তারা প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রবৃত্তির পুজা করে থাকে। ওরা কি জানে যে কিভাবে কোথায় তার মৃত্যু হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চাইতে তারা কি মৃত্যুকে বেশী ভয় করে থাকে? রাসূল [ﷺ] তো এই যুক্তিতে কোন দিন স্বর্ণের আংটি পরিধান করেননি? বরং আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا

তওবা করা। তবে শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে পুরুষের জন্য রৌপ্য ব্যবহার বৈধ রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য পদার্থও ব্যবহার করা যাবে। যেমন আংটি বা ঘড়ি ইত্যাদিও ব্যবহারও করা যাবে। তবে কোন ক্রমেই যেন তা অপচয়ের পর্যায়ে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্নঃ (১২৫) স্বর্ণের দাঁত লাগানোর বিধান কি ?

উত্তরঃ একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে পুরুষের জন্য স্বর্ণের দাঁত লাগানো জায়েয নয়। কেননা পুরুষের জন্য স্বর্ণ পরিধাণ করা ও তা গয়না হিসেবে ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে যদি সচরাচর স্বর্ণের দ্বারা দাঁত বাঁধানো প্রচলিত থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই, স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করতে পারে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَـــى ذُكُورِهَـــا) "আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার বৈধ করা হয়েছে। এবং পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।"[1] অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে তা যেন অপচয়ের পর্যায়ে না পড়ে।

এ অবস্থায় নারী বা একান্ত প্রয়োজনে স্বর্ণের দাঁত ব্যবহারকারী পুরুষ যদি মৃত্যু বরণ করে তবে উক্ত স্বর্ণ খুলে নিতে হবে। কেননা স্বর্ণ একটি সম্পদ। যার অধিকারী হচ্ছে মৃতের উত্তরাধিকারীগণ। স্বর্ণসহ দাফন করে দিলে একটি সম্পদকে নষ্ট করা হল। কিন্তু যদি দাঁত খুলতে গিয়ে তার মাড়ি কাটা বা ভাঙ্গার দরকার পড়ে, তবে সে অবস্থায় স্বর্ণ বের করা যাবে না। কেননা মুসলমান জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় সম্মানিত।

প্রশ্নঃ (১২৬) ওযু করার স্থানে প্রস্রাব করার বিধান কি ? বিশেষ করে যদি এতে লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ?

উত্তরঃ কোন মানুষের জন্য এমন কারো সামনে নিজের লজ্জাস্থান উম্মুক্ত করা জায়েয নয় যার জন্য তার লজ্জাস্থান দেখা হালাল নয়। ওযুখানায় প্রস্রাব করার জন্য যদি লজ্জাস্থান উম্মুক্ত করে, তবে নিঃসন্দেহে মানুষ উহা প্রত্যক্ষ করবে, ফলে সে এতে হবে গুনাহগার হবে। ফিক্বাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন, এ অবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে পানি ব্যবহারের পরিবর্তে কুলুখ ব্যবহার করা। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে দূরে কোথাও গিয়ে হাজত পূরা করবে এবং পাথর

فِي يَدِه "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা জনৈক লোকের হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেলেন, তিনি তার হাত থেকে উহা খুলে নিয়ে ফেলে দিলেন, অতঃপর বললেন, তোমাদের কোন মানুষ কি নিজের হাতে জাহান্নামের আগুন রাখতে চায়?" (মুসলিম, অধ্যায়ঃ পোশাক ও সৌন্দর্য্য, হা/৩৮৯৭)- অতএব যারা স্বর্ণের আংটি পরিধান করে তারা সাবধান। সেই আংটি বিবাহের আংটিই হোক বা স্মৃতির আংটিই হোক সবগুলোই হারাম। -অনুবাদক।

[1] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পোশাক, অনুচ্ছেদঃ স্বর্ণ ও রেশমের বিবরণ। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ সৌন্দর্য, অনুচ্ছেদঃ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।

বা ঢিলা কিংবা টিসু প্রভৃতি দ্বারা কুলুখ করে নিবে। উক্ত বস্তু দ্বারা তিনবার লজ্জাস্থান মুছবে। তারা বলেন, যদি ইস্তেন্‌জা (পানি ব্যবহার) করে তবে মানুষের সামনে লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর এটা হারাম। আর যা না করলে হারাম কাজ থেকে বাঁচা যাবে না তা করা ওয়াজিব।

মোট কথা, কোন ক্রমেই মানুষের সামনে লজ্জাস্থান প্রকাশ করা জায়েয নয়। বরং সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে এমন স্থানে যাওয়া যা হবে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে।*

প্রশ্নঃ (১২৭) দন্ডায়মান অবস্থায় প্রস্রাব করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নিম্ন লিখিত দু'টি শর্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যায়ঃ

১) প্রস্রাবের ছিটা থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

২) কেউ যেন তার লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত না করতে পারে।

প্রশ্নঃ (১২৮) কুরআন মাজীদ সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ বিদ্বানগণ বলেন, কুরআন শরীফ সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা জায়েয নয়। কেননা একথা সর্বজন বিদিত যে, পবিত্র কুরআন এমন সম্মান ও মর্যাদাবান বস্তু যা সাথে নিয়ে টয়লেটের মত স্থানে প্রবেশ করা সমিচীন নয়।

প্রশ্নঃ (১২৯) আল্লাহর নাম সম্বলিত কাগজ সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ আল্লাহর নাম সম্বলিত কাগজ যদি বাইরে প্রকাশিত না থাকে বরং তা পকেটের মধ্যে থাকে বা গোপনে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে, তবে তা সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা জায়েয। সাধারণত অনেক নাম তো এমন রয়েছে যা আল্লাহ্‌র নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন আবদুল্লাহ বা আবদুল আজীজ প্রভৃতি।

প্রশ্নঃ (১৩০) টয়লেটের মধ্যে ওযু করার দরকার হলে সে সময় কিভাবে 'বিসমিল্লাহ্‌' বলবে ?

উত্তরঃ টয়লেটের মধ্যে ওযু করলে মনে মনে বিসমিল্লাহ্‌ বলবে, মুখে উচ্চারণ করে বলবে না। কেননা ওযু ও গোসলে 'বিসমিল্লাহ্‌' ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালী নয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'ওযুতে বিসমিল্লাহ্‌ বলার ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ কোন হাদীছ নেই।' এজন্যে মুগনী গ্রন্থের লিখক মুওয়াফ্‌ফাক বিন কুদামা মত প্রকাশ করেছেন যে, ওযুর সময় 'বিসমিল্লাহ্‌' বলা ওয়াজিব নয়।

---

*. আমাদের দেশে বা ভারত উপমহাদেশে কিছু অতি পরহেযগার মানুষ দেখা যায়। যারা প্রস্রাব করার পর লজ্জাস্থানে কুলুখ ধরে মানুষের সামনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে হাঁটা-চলা, উঠানাম ও পুরুষাঙ্গ ধরে টানাহিঁচড়া করে, গলা খেঁখড়ানী দেয়। তাদের এ কাজ যেমন একদিকে শরীয়ত বহির্ভূত ও বাড়াবাড়ী। অন্যদিকে তা অতি পবিত্রতার নামে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া এ চর্চা থেকে মুত্র নি:সরণ রোগেরও জন্ম হয়। আরব দেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশে পবিত্রতার নামে এ অপসংস্কৃতি কোথাও দেখা যায় না। (সম্পাদক)

প্রশ্নঃ (১৩১) প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলা সামনে বা পিছনে রাখার বিধান কি ?

উত্তরঃ এ মাসআলায় বিদ্বানদের থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়ঃ

একদল বিদ্বান বলেন, বন্ধ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কিবলা সামনে বা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা হারাম। তারা আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) এর হাদীছকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)

"তোমরা পেশাব-পায়খানায় গেলে পায়খানার সময় বা প্রস্রাব করার সময় কিবলাকে সামনে রাখবে না এবং পিছনেও রাখবে না। বরং পূর্ব ও পশ্চিম দিক ফিরে বসবে।"[1] আবু আইয়্যুব বলেন, আমরা শাম দেশে গিয়ে দেখি সেখানকার টয়লেট কা'বার দিকে তৈরী করা আছে। আমরা তা ব্যবহার করার সময় বাঁকা হয়ে বসতাম অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম। এ বিষয়টি ছিল খোলা মাঠে। কিন্তু বন্ধ ঘরের মধ্যে যদি হয়, তবে কিবলা সামনে বা পিছনে রাখাতে কোন দোষ নেই। ইবনু ওমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, তিনি বলেনঃ

(ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ)

"আমি একদা হাফসার বাড়ীর ছাদে উঠলাম। দেখলাম নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শামের দিকে মুখ করে কা'বার দিকে পিছন ফিরে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করছেন।"[2]

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, ঘেরা স্থানে হোক বা খোলা স্থানে হোক কোন সময়ই কিবলা সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখা যাবে না। তাদের দলীল হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত আবু আইয়্যুব আনসারীর হাদীছ। আর ইবনু ওমরের হাদীছ সম্পর্কে তাদের জবাব হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ ইবনু ওমারের হাদীছটি হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার পূর্বের।

দ্বিতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞাই প্রাধান্য পাবে। কেননা নিষেধাজ্ঞা আসল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর আসল হচ্ছে জায়েয। তাই জায়েয থেকে স্থানান্তর হয়ে নাজায়েযের বিধানই গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয়তঃ আবু আইয়্যুব বর্ণিত হাদীছ নবী (সাঃ) এর উক্তি। আর ইবনু ওমারের হাদীছ তাঁর কর্ম। রাসূল (সাঃ) এর মৌখিক নির্দেশের হাদীছ কর্মের হাদীছের সাথে

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ পেশাব ও পায়খানায় কিবলা সামনে রাখবে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ হাজত পূরা করে পবিত্রতা অর্জন করা।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ দু'টি ইঁটের উপর পায়খানা করা।

সংঘর্ষশীল হতে পারে না। কেননা কর্মে বিশেষত্ব ও ভুলের সম্ভাবনা থাকে বা অন্য কোন ওযরেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এ মাসআলায় আমার মতে, **প্রাধান্যযোগ্য কথা হচ্ছে,** খোলা ময়দানে ক্বিবলা সামনে বা পিছনে রেখে শৌচকার্য করা হারাম। চার দেয়ালে ঘেরা স্থানে কিবলাকে পিছনে রাখা জায়েয হবে সামনে রাখা জায়েয নয়। কেননা কিবলার সম্মুখবর্তী হওয়ার হাদীছ সংরক্ষিত। এখানে বিশেষত্বের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পশ্চাতে রাখার নিষেধাজ্ঞাকে নবীজীর কর্ম দ্বারা বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সম্মুখে রাখার চাইতে পশ্চাতে রাখার বিষয়টি সহজ, এই কারণে (আল্লাহ ভাল জানেন) ঘেরার মধ্যে থাকলে বিষয়টিকে হালকা করা হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে কিবলাকে সম্মুখে বা পশ্চাতে না রাখা।

প্রশ্নঃ (১৩২) বায়ু নির্গত হলে কি ইস্তেন্জা করা আবশ্যক ?

উত্তরঃ পশ্চাদদেশ থেকে বায়ু নির্গত হলে ওযু নষ্ট হবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) "নামায থেকে বের হবে না যে পর্যন্ত বায়ু বের হওয়ার আওয়াজ না শুনবে বা দুর্গন্ধ না পাবে।"[1] কিন্তু এতে ইস্তেন্জা করা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ-লজ্জাস্থান ধৌত করা আবশ্যক নয়। কেননা এমন কিছু তো বের হয়নি যা ধৌত করার দরকার হবে।

অতএব বায়ু নির্গত হলে ওযু নষ্ট হবে। এতে ওযু করে পবিত্র হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ- কুলি, নাক ঝাড়াসহ মুখমন্ডল ধৌত করবে, কনুইসহ দু'হাত ধৌত করবে, কানসহ মাথা মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত দু'পা ধৌত করবে।

এখানে একটি মাসআলার ব্যাপারে আমি মানুষকে সতর্ক করতে চাইঃ কিছু লোক নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে পেশাব-পায়খানা করলে ইস্তেন্জা করে। তারপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে ওযু করার পূর্বে ধারণা করে যে, পুনরায় তাদেরকে ইস্তেন্জা করতে হবে-পুনরায় লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা কোন কিছু বের হওয়ার পর উক্ত স্থান ধৌত করে নিলেই তো তা পবিত্র হয়ে গেল। আর পবিত্র হয়ে গেলে পুনরায় তা ধৌত করার কোন অর্থ নেই। কেননা ইস্তেন্জা ও শর্ত মোতাবেক কুলুখের উদ্দেশ্য হচ্ছে পেশাব-পায়খানা বের হওয়ার স্থানকে পবিত্র করা। একবার পবিত্র হয়ে গেলে নতুন করে কোন কিছু বের না হলে আর তা নাপাক হবে না।

প্রশ্নঃ (১৩৩) কখন মেসওয়াক ব্যবহার করার গুরুত্ব বেশী? খুতবা চলাবস্থায় নামাযের অপেক্ষাকারীর মেসওয়াক করার বিধান কি ?

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ সন্দেহের ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হলে ওযু করবে না, হা/ ১৩৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতায় নিশ্চিত থাকার পর ওযু ভঙ্গের ব্যাপারে সন্দেহ হলে ঐ পবিত্রতা নিয়েই নামায চালিয়ে যাবে একথার দলীল। হা/ ৩৬১।

উত্তরঃ নিম্ন লিখিত সময় মেসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণঃ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে, গৃহে প্রবেশ কালে, ওযুতে কুলি করার সময়, নামাযে দন্ডায়মান হওয়ার সময়। নামাযের অপেক্ষাকারীর মেসওয়াক করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু খুতবা চলাবস্থায় মেসওয়াক করবে না। কেননা এটা তাকে খুতবা শোনা থেকে ব্যস্ত করবে। কিন্তু তন্দ্রা কাটানোর প্রয়োজনে মেসওয়াক ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (১৩৪) ওযুর শুরুতেবিসমিল্লাহ' বলা কি ওয়াজিব ?

উত্তরঃ ওযুর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব নয়; বরং তা সুন্নাত। কেননা এক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ বলার ক্ষেত্রে অনেকের আপত্তি রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, 'এক্ষেত্রে কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি।' বলার অপেক্ষা রাখে না এবং কারো অজানা নয় যে, ইমাম আহমাদ হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম এবং হাফেয। তিনি যদি কোন ক্ষেত্রে বলেন, এ বিষয়ে কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি, তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্ন থেকে যায়। অতএব যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় তা মানুষের উপর আবশ্যক করা উচিত নয়। এ জন্যে আমি মনে করি ওযুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। কিন্তু কারো নিকট যদি এ ক্ষেত্রে হাদীছ ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়, তবে 'বিসমিল্লাহ' ওয়াজিব বলা তার জন্য আবশ্যক। কেননা হাদীছে বলা হয়েছেঃ لاَ وَضُــوْءَ অর্থাৎ- ওযু বিশুদ্ধ হবে না। ওযু পূর্ণ হবে না এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৩৫) পুরুষ ও নারীর খাতনা করার বিধান কি ?

উত্তরঃ খাতনার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। নিকটবর্তী মত হচ্ছে, পুরুষের খাতনা করা ওয়াজিব আর নারীর জন্য সুন্নাত। এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, পুরুষের খাতনার মাঝে একটি ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে নামাযের পবিত্রতা। যদি খাতনা না করা হয়, তবে পেশাব বের হলে তার কিছু অংশ লিঙ্গের ঢাকনা চামড়ার ভিতরে জমা হয়ে থাকে, যা জ্বলনের কারণ হয় বা সেখানে ইন্‌ফেকশ (Infection) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং সর্বনিম্ন অসুবিধা হচ্ছে, যখনই সে নড়াচড়া করবে, তখনই পেশাবের বিন্দু বের হবে এবং তার শরীর ও কাপড় নাপাক করে দিবে। আর নারীর খাতনা করার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা হচ্ছে, তার যৌন উত্তেজনা হ্রাস করা। আর এটা হচ্ছে তার একটি পূর্ণতা। এখানে খারাপ অতিরিক্ত কোন বিষয়কে বিদূরীত করা হচ্ছে না। যেমন পুরুষের বেলায় হয়ে থাকে।

বিদ্বানগণ খাতনার ক্ষেত্রে শর্ত করেছেন, খাতনা করলে যদি অসুস্থতা বা প্রাণনাশের আশংকা থাকে, তবে সে অবস্থায় খাতনা করা ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব বিষয় সমূহ অপারগতা, ধ্বংসের আশংকা ও ক্ষতির কারণে রহিত হয়ে যায়।

পুরুষের খাতনা ওয়াজিব হওয়ার দলীলঃ

প্রথমতঃ এ মর্মে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাতনা করার আদেশ করেছেন।[1] আর নবীজীর নির্দেশ মানেই তা পালন করা ওয়াজিব।

দ্বিতয়তঃ খাতনা হচ্ছে মুসলিম ও খৃষ্টান বা হিন্দুদের মাঝে পার্থক্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট। এমনকি মুসলমানগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে খাতনার মাধ্যমে নিজেদের নিহত ব্যক্তিদের খুঁজতেন। আর যা বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য তা হচ্ছে ওয়াজিব। কেননা মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য থাকা ওয়াজিব। এই কারণেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফেরদের সাথে সাদৃশাবলম্বন নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেনঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি কোন জাতির সদৃশ অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।"[2]

তৃতীয়তঃ খাতনা হচ্ছে শরীর থেকে একটি জিনিস কর্তন করা। বিনা কারণে শরীরের কোন অংশ কর্তন করা হারাম। আর ওয়াজিব কারণ ছাড়া হারামকে হালাল করা বৈধ নয়। অতএব খাতনা করা ওয়াজিব।

চতুর্থতঃ খাতনা করলে অভিভাবকের পক্ষ থেকে ইয়াতীমের উপর ও তার সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কেননা এতে খাতনাকারীকে পারিশ্রমিক দেয়া আবশ্যক। বিষয়টি ওয়াজিব না হলে তার শরীরে ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা জায়েয হত না।

হাদীছের বাণী ও উল্লেখিত যুক্তি দ্বারা আমরা প্রমাণ করলাম যে, পুরুষের খাতনা করা ওয়াজিব। কিন্তু নারীর খাতনা ওয়াজিব বলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সঠিক মত হচ্ছে, পুরুষের খাতনা করা ওয়াজিব, নারীর নয়। একটি যঈফ হাদীছ বলা হয়েছে, (الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ) "খাতনা পুরুষের জন্য সুন্নাত ও নারীর জন্য সম্মান।"[3] হাদীছটি বিশুদ্ধ হলে সকল মতভেদের সমাধান হয়ে যেত।

প্রশ্নঃ (১৩৬) কৃত্রিম দাঁত থাকলে কুলি করার সময় কি উহা খুলে রাখা ওয়াজিব ?

উত্তরঃ কারো মুখে যদি দাঁত বাধানো থাকে, তবে ওযুর সময় উহা খুলে রাখা আবশ্যক নয়। উহা হাতের আংটি বা ঘড়ি ব্যবহার করার মত। ওযুর সময় আংটি খোলা আবশ্যক নয়। বরং উত্তম হচ্ছে উহা নাড়িয়ে দেয়া, কিন্তু এই নাড়ানোও ওয়াজিব নয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আংটি পরিধান করতেন কিন্তু এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি ওযুর সময় উহা খুলে রাখতেন। অথচ মুখের মধ্যে বাঁধানো দাঁতের তুলনায় আংটিই পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে বাধার কারণ হতে পারে। তাছাড়া কোন কোন

---

[1]. মুসনাদে আহমাদ ৩/৪১৫।

[2]. আবু দাঊদ পোষাক অধ্যায় হা/৩৫১২। মুসনাদে আহমাদ হা/৪৮৬৯, ৫৪০৯।

[3]. মুসনাদের আহমাদ, ৫/৭৫। (দ্রঃ যঈফ জামে ছগীর- আলবানী হা/২৯৩৮।)

মানুষের দাঁত অনেক কষ্টে বাধাই করতে হয়- যা যখন তখন খোলা ও লাগানো সম্ভব হয় না।

প্রশ্নঃ (১৩৭) কান মাসেহ করার জন্য কি নতুন করে পানি নিতে হবে ?

উত্তরঃ কান মাসেহ করার জন্য হাতে নতুন পানি নেয়া আবশ্যক নয়। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুস্তাহাবও নয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ওযুর পদ্ধতি বর্ণনাকারী ছাহাবীদের মধ্যে কেউ এমন কথা উল্লেখ করেন নি যে, তিনি কান মাসেহ করার জন্য নতুন করে পানি নিতেন। অতএব মাথা মাসেহ করার পর হাতের অবশিষ্ট ভিজা দিয়েই কান মাসেহ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৩৮) ওযুতে ধারাবাহিকতার অর্থ কি ? ওযুতে মুওয়ালাত বা পরস্পর করার অর্থ কি ? এদু'টি কথার বিধান কি ?

উত্তরঃ ওযুর মধ্যে ধারাবাহিকতার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ যে ধারাবাহিকতার সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন সেভাবে ওযু করা। আল্লাহ প্রথমে মুখমন্ডল ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তারপর দু'হাত, এরপর মাথা মাসেহ করা এবং শেষে পা ধৌত করা। কোন মানুষ যদি উল্টাপাল্টা করে যেমন প্রথমে হাত তারপর পা তারপর মুখমন্ডল ধৌত করে তারপর মাথা মাসেহ করে, তবে তার ওযু হবে না। এই কারণে মুখমন্ডল ধৌত করার পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব নয়, সুন্নাত। অতএব আল্লাহ যে সিরিয়ালে ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন, তাকেই ধারাবাহিকতা বলে যা বজায় রাখা ওযুর অন্যতম ওয়াজিব। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জে গিয়ে সাঈ করতে গিয়ে প্রথমে ছাফা পর্বতে আরোহণ করে পাঠ করেন,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

"নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত।" (সূরা বাক্বারা- ১৫৮) এবং তিনি বলেন, (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّـهُ بِـهِ) 'আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন সেভাবে শুরু করছি।"[1] এখানে তিনি বর্ণনা করে দিলেন, কেন তিনি মাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে ছাফা পর্বতে আরোহন করলেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ যার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন সেখান থেকেই প্রথমে শুরু করা।

আর মুওয়ালাত বা ওযুর কাজ পরস্পর করার অর্থ হচ্ছে, ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বিরতি গ্রহণের মাধ্যমে পৃথক না করা। এর উদাহরণ হচ্ছে, মুখমন্ডল ধৌত করার পর পরই হাত না ধুয়ে দেরী করা। এ অবস্থায় তার পরস্পরতা নষ্ট হয়ে গেল, তাই তাকে নতুন করে ওযু আরম্ভ করতে হবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন জনৈক ব্যক্তি ওযু করেছে কিন্তু পায়ে তার নখ বরাবর একটি স্থান বাকি রয়েছে।

---
[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হজ্জের বর্ণনা।

তিনি তাকে বললেন, ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ "তুমি ফিরে গিয়ে সুন্দরভাবে ওযু করে এসো।"[1] আবু দাউদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি তাকে পুনরায় নতুন করে ওযু করার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, ওযুতে পরম্পরা রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা ওযু একটি ইবাদত। আর একটি ইবাদতের বিভিন্ন অংশের মাঝে বিচ্ছিন্ন করলে পরস্পরের উপর ভিত্তি করা চলে না। অতএব বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ধারাবাহিকতা ও পরস্পরতা রক্ষা করা ওযুর দু'টি ফরয।

প্রশ্নঃ (১৩৯) ওযুর সময় কেউ যদি কোন একটি অঙ্গ ধৌত করতে ভুলে যায়, তবে তার বিধান কি ?

উত্তরঃ ওযু করার সময় কেউ যদি একটি অঙ্গ ভুলে যায়, তবে যদি অচিরেই তা মনে পড়ে, তাহলে তা ধৌত করবে এবং তার পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করবে। যেমন কেউ ওযু করল, কিন্তু বাম হাত ধৌত করতে ভুলে গেল এবং শুধু ডান হাত ধৌত করে মাথা ও কান মাসেহ্ করে ফেলল। দু'পা ধৌত করার পর খেয়াল হল তার বাম হাত ধৌত করা হয়নি। তাকে আমরা বলব, আপনি বাম হাত ধৌত করুন, মাথা ও কান মাসেহ্ করুন এবং দু'পা ধৌত করুন। এই অঙ্গগুলো পুনরায় ধৌত করা এজন্যই ওয়াজিব যে, ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। কেননা ওযুর অঙ্গগুলো যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, সেভাবেই ধারবাহিকতা বজায় রেখে তা করতে হবে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"তোমরা মুখমন্ডল ধৌত কর, দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ্ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়েদা- ৬)

কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় পর স্মরণ হয়, তবে পুনরায় ওযু করবে। যেমন কেউ ওযু করার সময় বাম হাত ধৌত করতে ভুলে গেল এবং এভাবেই ওযু শেষ করে ফেলল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্মরণ হল সে তো বাম হাত ধৌত করেনি। তখন তার উপর আবশ্যক হচ্ছে পুনরায় প্রথম থেকে ওযু করা। কেননা ওযুর অঙ্গ সমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা আবশ্যক। বরং ওযু বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত।

জেনে রাখা উচিত, যদি তার সন্দেহে থাকে অর্থাৎ- ওযু শেষ হওয়ার পর সন্দেহ হল, সে ডান হাত বা বাম হাত ধৌত করেছে কি না ? কুলি করেছে কি না ? নাক ঝেড়েছে কি না ? তখন এ সন্দেহের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না। বরং সামনে অগ্রসর হবে এবং নামায আদায় করবে। কেননা ইবাদত শেষ হওয়ার পর কোন সন্দেহ দেখা দিলে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, তার কোন মূল্য নেই। এ ধরণের সন্দেহের প্রতি গুরুত্বারোপ

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতার অঙ্গের সমস্ত অংশ শামিল করে ওযু করা।

করলে মানুষের সামনে শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসার দরজা উম্মুক্ত করা হয়। তখন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ইবাদতে সন্দেহ করা শুরু করবে। অতএব আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, ইবাদত সম্পন্ন করার পর কোন সন্দেহ দেখা দিলে মানুষ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, তার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না। অবশ্য সন্দেহ যদি দৃঢ়তায় পরিণত হয়, তবে তার ব্যবস্থা নেয়া ওয়াজিব।

ওযু অবস্থায় পানি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার পানি পাওয়া গেল ঃ

প্রশ্নঃ (১৪০) ওযু চলছে এমন সময় পানি বন্ধ হয়ে গেল। পানি যখন ফিরে এল তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে গেছে। এখন ওযু কি নতুন করে করতে হবে নাকি বাকী অঙ্গ সমূহ ধৌত করলেই চলবে?

উত্তরঃ মাসআলাটির ভিত্তি হচ্ছে, ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা, ওযু বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত কি না ? এতে বিদ্বানদের মধ্যে দু'টি মত পাওয়া যায়।

একটি মত হচ্ছেঃ মুওয়ালাত বা ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ পরস্পর ধৌত করা অর্থাৎ- একটি না শুকাতে অপর অঙ্গ ধৌত করা ওযু বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। একটি অঙ্গ ধৌত করার পর অপর অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে যদি বিচ্ছিন্নতা হয়ে যায়, তবে ওযু শুদ্ধ হবে না। এটাই সঠিক মত। কেননা ওযু পূর্ণাঙ্গ একটি ইবাদত। এর একটি অংশের সাথে অপর অংশের সম্পর্ক থাকা জরুরী। অঙ্গ সমূহ পরস্পর ধৌত করার অর্থ কি ? এর অর্থ হচ্ছে, এক অঙ্গ ধোয়ার পর সাধারণভাবে এতটা সময় বিরতি গ্রহণ না করা যাতে পরের অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে তা শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই বিরতি গ্রহণ যদি পবিত্রতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে কোন অসুবিধা নেই। যেমন ওযু শুরু করেছে এমন সময় লক্ষ্য করে কোন এক অঙ্গে পেইন্ট বা এ জাতীয় কোন বস্তু লেগে আছে, তখন তা অপসারণ করতে গিয়ে যদি দীর্ঘ সময়ের দরকার হয় এবং আগের অঙ্গ শুস্ক হয়ে যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই, ওযু চালিয়ে যাবে, নতুন করে আবার শুরু করতে হবে না। কেননা এই দীর্ঘতা তো পবিত্রতার কাজের সাথেই সম্পর্কিত। তাছাড়া এখানে তো ওযুর কাজে বিরতি গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু পানির জন্য যদি বিরতি হয়, যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, এ অবস্থায় পরস্পর ধৌত করার শর্ত ক্ষুন্ন হল। অতএব তাকে পুনরায় নতুন করে ওযু শুরু করতে হবে। আবার কেউ বলেন, নতুন করে ওযু শুরু করার দরকার নেই। কেননা এখানে তো তার কোন এখতিয়ার নেই। সে তো ওযু পূর্ণ করারই অপেক্ষা করছে। তাই পানি আসলে ওযুর বাকী কাজ পূর্ণ করবে-যদিও ধৌতকৃত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

যে সমস্ত বিদ্বান পরস্পর ধৌত করা ওয়াজিব বলেন, তাদের কথা হচ্ছেঃ অঙ্গ শুস্ক হওয়া না হওয়ার সাথে পরস্পর ধৌত করার সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক পরিচিতির সাথে। সামাজিকভাবে যদি বলা হয় এখানে ওযুর মাঝে বিচ্ছিন্ন হল বা বিরতি নেয়া হল, তবে তাতে পরস্পরতা নষ্ট হবে। যেমন পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যারা

পানির অপেক্ষা করে তারা তো পানি নিয়ে আসার কাজে ব্যস্ত, সাধারণভাবে মানুষ এটাকে ওযুর প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মাঝে বিচ্ছিন্নতা বলে না। অতএব তারা পানি পাওয়ার পর ওযুর বাকী কাজ পূর্ণ করবে। আর এটাই উত্তম কথা। তবে যদি উক্ত বিরতি খুব বেশী দীর্ঘ হয়ে যায়, তবে নতুন করে শুরু করে নেয়াটাই ভাল। কেননা কাজটা খুবই সহজ।

প্রশ্নঃ (১৪১) নখ পালিশ ব্যবহার করে ওযু করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নখ পালিশ হচ্ছে এক প্রকার রং যা নারীরা তাদের নখে ব্যবহার করে থাকে। এটি গাঢ় হয়ে থাকে। নারী যদি নামাযী হয় তবে তার জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কেননা এটা নখে থাকলে ওযুর পানি নখে পৌঁছবে না। আর কোন বস্তুর কারণে যদি পানি পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি করে , তবে তা ওযু ও গোসলকারীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "তোমরা মুখমন্ডল ও হাতদ্বয় ধৌত কর।" (সূরা মায়েদা-৬) অতএব নারীর নখে যদি নখ পালিশ থাকে তবে তা তো পানি পৌঁছতে বাধা দিবে। সুতরাং তা থাকা অবস্থায় ওযু বা গোসল করলে তো তার একটি অঙ্গ শুস্কই থেকে গেল এবং ওযু বা গোসলের একটি ফরয কাজ পরিত্যাগ করল। কিন্তু নারী নামাযী না হলে, যেমন ঋতুবতী বা নেফাস বিশিষ্ট হলে, সে এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। তবে এ কাজ কাফের নারীদের বৈশিষ্টের অন্তর্গত। তাই উহা ব্যবহার না করাতেই কল্যাণ। কেননা এতে তাদের সাথে সদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি শুনেছি, কোন কোন মানুষ নাকি ফতোয়া দিয়েছেন যে, এটা হাত মোজা পরিধান করার ন্যায়। সুতরাং গৃহে অবস্থান করলে নারী তা একদিন একরাত, আর সফরে থাকলে তিনদিন তিন রাত ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এটি ভুল ফতোয়া ও অজ্ঞতা। মানুষের শরীর আচ্ছাদিত করে এমন প্রত্যেক বস্তুকেই মোজার সাথে তুলনা করা উচিত নয়। ইসলামী শরীয়তে যে মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র পায়ের মোজার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা প্রয়োজনের সময়। কেননা ঠান্ডার কারণে বা ময়লা-আবর্জনা থেকে সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য পায়ে মোজা পরিধাণ করার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য শরীয়ত মানুষের প্রতি সহজ করে এর উপর মাসেহ করা বৈধ করেছে।

অনেক সময় ওরা নখ পালিশ ব্যবহারকে পাগড়ীর উপর মাসেহ করার সাথে তুলনা করে। এটা আরেক অজ্ঞতা। কেননা পাগড়ীর স্থান হচ্ছে মাথা। আর মাথার ক্ষেত্রে আগে থেকেই সহজ করা রয়েছে। তা ধৌত করতে হবে না। সেখানে মাসেহ করতে হবে। কিন্তু হাত এর বিপরীত। হাতের ফরয হচ্ছে তা ধৌত করা। এ কারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের হাত মোজাতে মাসেহ করা বৈধ করেননি। অথচ তা হাত ঢেকে রাখে। অতএব পানি পৌঁছতে বাধাদানকারী যে কোন পর্দা হলেই তাকে পাগড়ী বা মোজার সাথে তুলনা করা জায়েয নয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সত্য জানার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। এমন কোন ফতোয়া না দেয়া যার জন্য আল্লাহ্র সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা এটা আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত, এখানে অনুমান ও ধারণা করে কোন কিছু বলার অবকাশ নেই। (আল্লাহ্ তাওফীক দাতা ও সঠিক পথ প্রদর্শক।)

প্রশ্নঃ (১৪২) শরীয়ত সম্মত ওযুর পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ শরীয়ত সম্মত ওযুর পদ্ধতি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ হচ্ছে: ওয়াজিব পদ্ধতি। যা না করলে ওযুই হবে না। আর তা হচ্ছে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত বিষয় সমূহ। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা মুখমন্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা- ৬) এর বর্ণনা হচ্ছে, মুখমন্ডল একবার ধৌত করতে হবে। কুলি করা ও নাক ঝাড়া মুখমন্ডল ধৌত করার অন্তর্গত। হাত ধৌত করার সীমানা হচ্ছে মধ্যমা আঙ্গুলের প্রান্ত সীমা থেকে কনুই পর্যন্ত একবার ধৌত করা। হাত ধৌত করার সময় কব্জি ধৌত করা হল কি না এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক লোক অসতর্কতা বশত: শুধু হাতের উপর অংশ ধৌত করে এবং কব্জি ছেড়ে দেয়। এটা বিরাট ভুল। তারপর একবার মাথা মাসেহ করা। কান মাসেহ করা মাথা মাসেহের অন্তর্গত। শেষে দু'পা টাখনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা। এটা হচ্ছে ওযুর সর্বনিম্ন ওয়াজিব পদ্ধতি।

দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছেঃ মুস্তাহাব পদ্ধতি। প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে ওযু শুরু করবে। দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। তারপর তিন চুল্লু পানি দ্বারা তিনবার কুলি করবে ও নাক ঝাড়বে। তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করবে। এরপর দু'হাত কনুইসহ তিন বার করে ধৌত করবে। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত। একবার মাথা মসেহ করবে। মাথা মাসেহের নিয়ম হচ্ছেঃ দু'হাত পানিতে ভিজিয়ে, ভিজা হাত মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, অতঃপর আবার তা সামনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এরপর কান মাসেহ করবে। দু'তর্জনী দু'কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের অংশ মাসেহ করবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ্ করবে। সব শেষে দু'পা টাখনুসহ তিনবার করে ধৌত করবে। প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা। এবং ওযু শেষ হলে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবেঃ

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ)

"আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ্ আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ্ আলনী মিনাল মুতাতাহ্হেরীন।" অর্থ- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য

কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল কর।" যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করবে তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এভাবেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সনদে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।[1]

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি ঃ

সম্মানিত শাইখ ইবনু উছাইমীন (রহঃ) বলেন,

অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন ও ছালাত আদায় করবে সে ব্যাপারে এটি একটি সংক্ষিপ্ত পত্র। অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থার বিচার করে তার জন্য ইসলামী শরীয়তে কিছু বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ক্ষমাশীল সর্বোত্তম সঠিক ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেন, যা হচ্ছে সহজ ও সরলতার বৈশিষ্টে অনন্য। আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য ধর্মে কোন অসুবিধা রাখেননি।" (সূরা হাজ্জ ৭৮) তিনি আরো বলেনঃ

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমরা অসুবিধায় পড় তিনি তা চান না।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৫) আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾

"তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কথা শোন ও আনুগত্য কর।" (সূরা তাগাবুন- ১৬) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) "নিশ্চয় এই ধর্ম অতি সহজ।"[2]

তিনি আরো বলেনঃ (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)"আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করি, তখন সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন কর।"[3]

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ ওযুর পর মুস্তাহাব দু'আ। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হা/ ৫০।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ ইসলাম ধর্ম সহজ। হা/৩৯

[3]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ই'তেছাম। অনুচ্ছেদঃ রাসূল [ﷺ] এর সুন্নাতের অনুসরণ। হা/ ৭২৮৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ নবী [ﷺ] কে সম্মান করা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন প্রশ্ন তাকে না করা।

উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ওযর বিশিষ্ট লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইবাদতকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন। যাতে করে তারা কোন অসুবিধা ও কষ্ট ছাড়াই তাঁর ইবাদত সম্পাদন করতে পারে। (আল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন)

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতিঃ

১। অসুস্থ ব্যক্তির অবশ্যক হলো ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন্নর জন্য পানি দ্বারা ওযু করা এবং বড় নাপাকী থেকে পত্রিতা হাসিলের জন্য পানি দ্বারা গোসল করা।

২)যদি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে না পারে -অপারগতার কারণে বা রোগ বেড়ে যাবে এ ভয়ের কারণে বা সুস্থ হতে দেরী হয়ে যাবে - তবে এই পরিস্থিতিতে সে তায়াম্মুম করবে।

৩) তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো- হাত দু'টিকে পবিত্র মাটিতে একবার মারবে তারপর তা দিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করবে। অতঃপর উভয় হাতকে কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। আগে ডান হাত এবং পরে বাম হাত।

৪) রুগী নিজে যদি পবিত্রতা অর্জন করতে অক্ষম হয়, তবে অন্য ব্যক্তি তাকে ওযু বা তায়াম্মুম করিয়ে দিবে।

৫) ওযু বা গোসলের কোন অঙ্গে যদি যখম থাকে আর পানি দিয়ে ধৌত করলে তাতে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে, তবে পানি দিয়ে হাতকে ভিজিয়ে সে স্থানকে মুছে দিবে। এভাবে মুছে দেয়াতে যদি ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করে নিবে।

৬) ভাঙ্গ- মচকা ইত্যাদি কারণে যদি শরীরের কোন অঙ্গে পট্রি বা ব্যান্ডেজ থাকে তবে সে স্থান ধৌত করার পরিবর্তে পানির মাধ্যমে তার উপর মাসেহ করে নিবে। এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করবে না। কেননা মাসেহ ধোয়ার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।

৭) কোন বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করবে? দেয়াল বা অন্য কোন বস্তু যেখানে ধূলা লেগে আছে তা দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। দেয়াল যদি মাটি জাতীয় বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা লেপন করা থাকে যেমন রং বা পেইন্ট, তবে সেখানে তায়াম্মুম করা জায়েয হবেনা। কিন্তু যদি উক্ত দেয়ালে ধূলা লেড়ে তাকে তবে তাতে তায়াম্মুম করতে অসুবিধা নেই।

৮) জমিনের উপর হাত রেখে বা দেয়াল থেকে বা যে বস্তুতে ধূলা আছেন তা থেকে তায়াম্মুম করা সম্ভব না হয় তবে কোন পাত্র বা রুমালের মধ্যে মধ্যে কিছু মাটি রেখে দিতে পারে এবং তা দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

৯) এক ওয়াক্তের নামায আদায়ের উদ্দেশে তায়াম্মুম করার পর যদি তায়াম্মুম অবশিষ্ট থাকে তবে তা দিয়ে আর এক ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী নামাযের জন্য আবার তায়াম্মুম করার দরকার নেই। কেননা সে তো পবিত্রই আছে। এবং পবিত্রতা ভঙ্গকারী কোন কারণও ঘটোন। এমনিভাবে বড় নাপাকী থেকে যদি তায়াম্মুম করে তবে পরবর্তী বড় নাপাকীতে লিপ্ত হওযা আগ পর্যন্ত আর তায়াম্মুম করতে হবে না। কিন্তু এর মাঝে ছোট নাপাকীতে লিপ্ত হলে তার জন্য তায়াম্মুম করতে হবে।

১০) অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়অজিব হলো সকল প্রকার নাপাকী থেকে স্বীয় শরীরকে পাক- পবিত্র করা। যদি পাক- পবিত্র হতে সক্ষম না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট নাপাকী নিয়েই নামায আদায় করবে। তার উক্ত নামায শুদ্ধ হবে এবং পুনরায় উক্ত নামায দোহরাতে হবে না।

১১) পবিত্র কাপড় নিয়ে নামায আদায় করা অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। কাপড় নাপাক হয়ে গেলে তা ধৌত করা অথবা তা বদলিয়ে অন্য কাপড় পরিধান করা ওয়াজিব। কিন্তু এরূপ করা যদি সাধ্যাতীত হয় তবে সংশ্লি নাপাকী নিয়েই নামায আদায় করবে। উক্ত নামায শুদ্ধ হবে এবং তা আর ফিরিয়ে পড়তে হবে না।

১২) পবিত্র স্থান ও পবিত্র বস্তুর উপর নামায আদায় করাও রুগীর উপর ওয়াজিব। যদি নামাযের স্থান নাপাক হয় তবে তা ধৌত করা বা কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করা বা সেখানে কোন পবিত্র বস্তু বিছিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি এর কোটাই সম্ভব না হয় তবুও ঐ অবস্থায় নামায আদায় করবে এবং তার নামায শুদ্ধ হবে।

১৩) পবিত্রতা হাসিল করতে অপারগতা কারণে কোন রুগীর জন্য নামায পরিত্যাগ করা বা কাযা করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। সাধ্যানুযায়ী সে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করে নিবে- যদিও তখন তার শরীরে বা কাপড়ে বা নামায আদায়ের স্থানে নাপাকী লেগেই থাকে যা দূরীভূত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ" তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো।" [সূরা তাগাবূন- ১৬]

১৪ কোন মানুষ যদি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত থাকে, তবে সে নামাযের ওয়াক্ত হাজির হলে তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে, তারপর উক্ত স্থানে পবিত্র কোন বস্তু বেঁধে দিবে যাতে পেশাব কাপড় বা শরীরে ছড়িয়ে না যায়। তারপর ওযু করে নামায নামায আদায় করবে। এরূপ সে প্রত্যেক ফরয নামাযের সময় করবে। এরূপ করা যদি তার উপর অধিক কষ্টকর হয় তবে দু'নামায একতে পড়া তার জন্য জায়য আছে। যোহর এবং আসর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করবে। আর ফরয নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত নামাযের জন্য আলাদা ওযু করার কোন দরকার নেই। তবে অন্য কোন নফল নামায আদয় করতে চাইলে তাকে ফরযের নিয়মে পবিত্র অর্জন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৪৩) সতর্কতা বশতঃ প্রত্যেকবার ওযু করার সময় সুতার মোজা খোলার বিধান কি ?

উত্তরঃ এটা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। এতে ভ্রান্ত মতবাদ শিয়া রাফেযীদের সাথে সদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা তারা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয মনে করে না। অথচ মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মোজা খুলতে চাইলেন, তিনি তাকে বললেনঃ (**دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا**)"খুলতে হবে

না। কেননা পবিত্র অবস্থায় আমি ও দু'টি পরিধান করেছি।" তারপর তার উপর মাসেহ করলেন।"[1]

মোজার উপর মাসেহ্ করার সময় সীমা

প্রশ্নঃ (১৪৪) সুতার মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা কখন থেকে গণনা শুরু করতে হবে ?

উত্তরঃ এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা। এর সঠিক বিবরণ মানুষের জানা দরকার। তাই বিস্তারিতভাবে আমি প্রশ্নটির জবাব দিব। ইন্‌শাআল্লাহ্।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলীলের ভিত্তিতে মোজার উপর মাসেহ্ করার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা মুখমন্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা- ৬)

উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে أَرْجُلَكُمْ শব্দটিতে لام অক্ষরটিতে যবর এবং যের দিয়ে উভয় ভাবে পড়া যায়। যবর দিয়ে পাঠ করলে তা وُجُوهَكُمْ শব্দের উপর ভিত্তি করবে। তখন মুখমন্ডল ধৌত করার মত পাও ধৌত করতে হবে। আর যের দিয়ে পাঠ করলে তখন তার ভিত্তি হবে بِرُءُوسِكُمْ শব্দের উপর। তখন পা ও মাথা মাসেহের অন্তর্ভূক্ত হবে। অতএব পূর্বোল্লিখিত দু'ক্বিরাত অনুযায়ী পদ যুগল ধৌতও করা যায় এবং মাসেহও করা যায়। সুন্নাতে নববীতে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, কখন ধৌত করতে হবে এবং কখন মাসেহ করতে হবে ? সুতরাং পা যখন অনাবৃত থাকবে তখন তা ধৌত করতে হবে। আর মোজা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত করা থাকলে তা মাসেহ করবে। হাদীছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির সনদে মোজার উপর মাসেহ করা প্রমাণিত হয়েছে। যেমনটি জনৈক কবি বলেছেনঃ

মোতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীছ সমূহ হচ্ছেঃ (১) নবীজীর উপর মিথ্যারোপ করা (২) আল্লাহর জন্য ঘর (মসজিদ) তৈরী করা। (৩) ক্বিয়ামত দিবসে আল্লার দিদার লাভ। (৪) শাফাআতের বর্ণনা।(৫) হাওয কাওছার (৬) মোজার উপর মাসেহ করা।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ পা'দুটি পবিত্র করার পর যখন মোজা পরিধান করবে। হা/২০৬ মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ করা। হ/ ৭৯, ২৭৪।

মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত। তাই পবিত্র (ওযু) অবস্থায় কোন মানুষ মোজা পরিধান করে থাকলে- ওযু করার সময় মোজা খুলে পা ধৌত করার চাইতে উক্ত মোজার উপর মাসেহ করাই উত্তম। এই কারণে মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওযুর সময় তাঁর পরিহিত মোজা খুলতে চাইলেন, তিনি বললেন, "খুলতে হবে না। কেননা পবিত্র অবস্থায় আমি তা পরিধান করেছি।" তারপর তার উপর মাসেহ করলেন।[1]

মোজার উপর মাসেহ করার কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ

প্রথম শর্তঃ ছোট বড় সবধরণের নাপাকী থেকে পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করার পর মোজা পরিধান করবে। যদি পবিত্রতা অর্জন না করে মোজা পরিধান করে, তবে তাতে মাসেহ করা বিশুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় শর্তঃ মাসেহ করার নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে মাসেহ করতে হবে। এর বর্ণনা অচিরেই আসবে। ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় শর্তঃ ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন তথা ওযুর ক্ষেত্রে মাসেহ হতে হবে। কিন্তু গোসল ফরয হলে মোজা অবশ্যই খুলতে হবে এবং সমস্ত শরীর ধৌত করতে হবে। এ জন্য জানাবতের ক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ করা যাবে না। যেমনটি ছাফওয়ান বিন আস্‌সাল (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছেঃ তিনি বলেন, আমরা সফরে থাকলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে আদেশ করতেন, নাপাক না হলে আমরা যেন তিন দিন তিন রাত মোজা না খোলি।[2]

মোজার উপর মাসেহ করার সময় সীমাঃ মুক্বীম তথা গৃহে অবস্থানকারীর জন্য একদিন একরাত তথা ২৪ ঘন্টা। আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত তথা ৭২ ঘন্টা। নামায কয় ওয়াক্ত হল সেটা বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সময় গণনা কখন থেকে শুরু হবে? এই হিসাব শুরু হবে প্রথম বার মাসেহ করার সময় থেকে। মোজা পরিধান বা ওযু ভঙ্গের সময় থেকে হিসাব শুরু হবে না। কেননা হাদীছে 'মাসেহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যখন এই কাজটি হবে তখনই শব্দটির ব্যবহার হবে। "মুক্বীম একদিন একরাত্র মাসেহ করবে এবং মুসাফির তিনদিন তিন রাত মাসেহ করবে।" প্রথমবার মাসেহ করার সময় থেকে হিসাব শুরু হবে। তখন থেকে নিয়ে

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ পা'দুটি পবিত্র করার পর যখন মোজা পরিধান করবে। হা/২০৬ মুসলিম, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ করা। হ/ ৭৯, ২৭৪।

[2] . নাসাঈ, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ করার সময় সীমা। তিরমিযী, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ মুসাফির ও মুক্বীমের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা।

২৪ ঘন্টা পূর্ণ হলেই মুক্বীমের নির্দিষ্ট সময় শেষ। আর ৭২ ঘন্টা পূর্ণ হলে মুসাফিরের নির্দিষ্ট সময় শেষ।

বিষয়টিকে অধিক সুস্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে ঃ

জনৈক ব্যক্তি ফজরের সময় পবিত্রতা অর্জন করে মোজা পরিধান করেছে। এরপর যোহর পর্যন্ত পবিত্র অবস্থায় থেকেছে। এমনকি আছর পর্যন্ত তার ওযু নষ্ট হয়নি। তাই সে ঐ ওযুতে যোহর ও আছর নামায সময়মত আদায় করেছে। তারপর মাগরিবের পূর্বে বিকাল ৫টার সময় ওযু করেছে এবং মোজার উপর মাসেহ করেছে। এই ৫টা থেকে তার সময়ের হিসাব শুরু হবে। সে পরবর্তী দিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। যদি পরবর্তী দিন ৫টা বাজার পনর মিনিট আগে মোজাতে মাসেহ করে এবং এশা পর্যন্ত তার ওযু ভঙ্গ না হয়, তবে ঐ মাসেহকৃত ওযু দ্বারা মাগরিব নামায আদায় করতে পারবে কোন অসুবিধা নেই। অতএব এই লোক প্রথমবার ওযু করার পর প্রথম দিন যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং দ্বিতীয় দিন ফজর যোহর, আছর, মাগরিব, ও এশা মোট নয়টি নামায আদায় করতে পারছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে, মাসেহের মাধ্যমে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায়। অথচ একথার কোন ভিত্তি নেই।

শরীয়তে মাসেহ করার যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা শুরু হবে প্রথমবার মাসেহ করার সময় থেকে। এই উদাহরণে আপনি দেখলেন কতগুলো ছালাত আদায় করা সম্ভব। উল্লেখিত উদাহরণে যে সময় দেখানো হয়েছে, তা যদি শেষ হয়ে যায় এবং তারপর মাসেহ করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার ওযু হবে না। কিন্তু মাসেহের নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে মাসেহ করে যদি আর ওযু ভঙ্গ না হয়, তবে যতক্ষণ ওযু ভঙ্গ না হবে নামায পড়তে পারবে- যদিও নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা নামায আদায় করার সময় সে তো পবিত্র অবস্থাতেই রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেই মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে এমন কথা দলীল বিহীন। কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আর মাসেহ করা যাবে না। এমন অর্থ নয় যে, সে আর পবিত্র থাকবে না। যে সময় সীমা দেয়া হয়েছে তা মাসেহের জন্য প্রজোয্য পবিত্রতার জন্য নয়। তাই সময় অতিবাহিত হলেই ওযু নষ্ট হয়ে যাবে এর কোন দলীল নেই। অতএব আমরা বলব, যখন কিনা এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ শরঈ দলীলের ভিত্তিতে ওযু করে পবিত্র হয়েছে, তখন তার ওযু নষ্ট হয়েছে একথার পক্ষেও বিশুদ্ধ শরঈ দলীল দরকার। আর যেহেতু সময় অতিবাহিত হলেই ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এরকম কোন দলীল নেই, সেহেতু ওযু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত সে পবিত্র হিসেবেই অবশিষ্ট থাকবে।

মুসাফিরের সময়সীমা তিনদিন তিনরাত। অর্থাৎ ৭২ ঘন্টা। এই হিসেব শুরু হবে প্রথমবার মাসেহের সময় থেকে। এজন্য হাম্বলী মাযহাবের ফিক্বাহবীদগণ উল্লেখ করেছেন, কোন লোক যদি মুক্বীম অবস্থায় মোজা পরিধান করে অতঃপর নিজ শহরে

থাকাবস্থাতেই তার ওযু ভঙ্গ হয়, এরপর সফর করে এবং সফরের স্থানে গিয়ে ওযু করে মাসেহ করে, তবে তাঁরা বলেন, সে মুসাফিরের সময়সীমা পূর্ণ করবে। এ দ্বারা বুঝা যায় যারা বলেন, মোজা পরিধান করে প্রথমবার ওযু ভঙ্গ হওয়ার পর থেকে সময় গণনা শুরু হবে, তাদের এই কথা দুর্বল।

কখন মোজার উপর মাসেহ বাতিল হবে? (১) সময় অতিবাহিত হলে এবং (২) মোজা খুলে ফেললে। অর্থাৎ- মোজা খুলে ফেললে আর মাসেহ করা যাবে না, কিন্তু সে পবিত্র অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ তার ওযু ভঙ্গ না হয়। একথার দলীল হচ্ছে ছাফ্‌ওয়ান বিন আস্‌সালের পূর্ববর্তী হাদীছ। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মোজা না খোলার।' এ থেকে বুঝা যায়, মোজা খুলে ফেললে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ- একবার মাসেহ করার পর যদি মোজা খুলে ফেলে, তবে পুনরায় তা পরিধান করে তাতে মাসেহ করতে পারবে না-যতক্ষণ না সে নতুন করে পূর্ণ ওযুর মাধ্যমে পা ধৌত করে মোজা পরিধান করবে।

কিন্তু মোজা খুলে ফেললে পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকবে। কেননা মাসেহ করার মাধ্যমে যখন কোন ব্যক্তি ওযু করবে তখন শরঈ দলীলের ভিত্তিতেই সে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে, সুতরাং তার এই পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে একথা বলার জন্য শরঈ দীলল দরকার। আর মাসেহ করে ওযু করার পর মোজা খুলে ফেললে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে একথার পক্ষে কোন দলীল নেই। কিন্তু একথার দলীল আছে যে, একবার মাসেহ করার পর মোজা খুলে ফেললে পুনরায় পরিধান করে আবার তাতে মাসেহ করা যাবে না। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (আল্লাহ্ তাওফীক্ব দাতা)

প্রশ্নঃ (১৪৫) পাতলা বা ছেঁড়া মোজাতে মাসেহ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ সঠিক মত হচ্ছে, ছেঁড়া মোজা এবং বাইরে থেকে চামড়া দেখা যায় এমন পাতলা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। যে অঙ্গের উপর মাসেহ হবে তাকে পরিপূর্ণরূপে ঢেকে রাখতে হবে এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা পা তো আর সতর নয়। মাসেহ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওযুকারী ব্যক্তির উপর সহজতা ও হাল্কা করা। অর্থাৎ-আমরা প্রত্যেক ওযুর সময় মোজা পরিধানকারীকে মোজা খুলে পা ধৌত করতে বাধ্য করব না। বরং বলব, এর উপর মাসেহ করাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর এই সহজতার উদ্দেশ্যেই মোজার উপর মাসেহ শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে। অতএব কোন পার্থক্য নেই চাই মোজা ছেঁড়া হোক বা ভাল হোক, পাতলা হোক বা মোটা হোক।

প্রশ্নঃ (১৪৬) পট্টির উপর মাসেহ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ প্রথমত আমাদের জানা উচিত যে, পট্টি কি ?

পট্টি বা ব্যান্ডেজ হচ্ছে এমন বস্তু যা ভাঙ্গা-মচকা জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ফিক্বাহবিদদের ভাষায়ঃ “বিশেষ প্রয়োজনে পবিত্রতা অর্জনের অঙ্গে কোন কিছু

লাগিয়ে রাখা।” ভেঙ্গে যাওয়া স্থানে বা ফোঁড়ার স্থানে বা পিঠের ব্যাথায় বা অন্য কোন কারণে যে পট্টি বা ব্যান্ডেজ লাগানো হয় এখানে সেটাই উদ্দেশ্য। ধৌত করার পরিবর্তে সেখানে মাসেহ করলেই যথেষ্ট হবে।

যেমন কোন লোকের হাতে ফোঁড়ার কারণে যদি পট্টি বাধা থাকে, তখন ওযু করার সময় অন্যান্য স্থান ধৌত করে পট্টির উপর শুধু মাসেহ করবে। তাহলেই তার পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি তার ওযু ভঙ্গ না হয়ে থাকে, তবে পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে ফেলার কারণে তার পবিত্রতা নষ্ট হবে না। কেননা শরঈ দীললের ভিত্তিতে সে পবিত্রতা অর্জন করেছে, সুতরাং পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে একথা বলার জন্য শরঈ দলীল দরকার। আর পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে ফেললে ওযু বা পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে একথার পক্ষে কোন দীলল নেই।

পট্টির উপর মাসেহ করার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ সবগুলোই ভেজালপূর্ণ। সবগুলোই যঈফ বা দুর্বল। একদল বিদ্বান বলেন, তবে সবগুলো হাদীছের সমম্বয়ে তা দলীল হিসেবে যোগ্য হতে পারে। আরেক দল বিদ্বান বলেন, হাদীছগুলো যঈফ হওয়ার কারণে তার উপর ভিত্তি করা চলবে না। এদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, যেহেতু মাসেহ করার দলীল নেই তাই পট্টি বা ব্যান্ডেজ বাধা স্থানের পবিত্রতা রহিত হয়ে যাবে। সেখানে কিছুই করতে হবে না। কেননা সে অপারগ। আবার কেউ বলেন, উক্ত স্থানে মাসেহ করবে না বরং তায়াম্মুম করবে।

কিন্তু হাদীছের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে শরঈ মূলনীতির ভিত্তিতে দেখা যায় নিকটতম মত হচ্ছে মাসেহ করা। মাসেহ করলে তায়াম্মুমের কোন দরকার নেই। এই অবস্থায় আমরা বলবঃ ওযু গোসলের কোন অঙ্গে যদি যখম বা ফোঁড়া বা এরকম কিছু থাকে, তবে তা কয়েকটি স্তরে বিভক্তঃ

প্রথম স্তরঃ যখম বা ফোঁড়ার স্থানটি উম্মুক্ত। ধৌত করলে কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং উহা ধৌত করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় স্তরঃ স্থানটি উম্মুক্ত কিন্তু ধৌত করলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তখন সেখানে মাসেহ করা ওয়াজিব।

তৃতীয় স্তরঃ স্থানটি উম্মুক্ত কিন্তু ধৌত বা মাসেহ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তখন সেখানে তায়াম্মুম করা ওয়াজিব।

চতুর্থ স্তরঃ স্থানটি পট্টি বা ব্যান্ডেজ জাতীয় বস্তু দ্বারা ঢাকা আছে। তখন সেই বস্তুর উপর মাসেহ করবে। ধৌত বা তায়ম্মুম করার দরকার হবে না।

প্রশ্নঃ (১৪৭) পট্টি বা ব্যান্ডেজের উপর কি একই সাথে মাসেহ ও তায়াম্মুম করতে হবে?

উত্তরঃ না, একই সাথে মাসেহ ও তায়াম্মুম করতে হবে না। কেননা একটি অঙ্গে পবিত্রতার দু'টি পদ্ধতি ব্যবহার করা শরঈ মূলনীতির পরিপন্থী। তাই আমরা বলবঃ পট্টি সম্বলিত অঙ্গটির পবিত্রতা হয় মাসেহের মাধ্যমে অথবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে অর্জন

করবে। কিন্তু দু'রকম পদ্ধতি ব্যবহার করার আবশ্যকতা শরীয়ত বহির্ভূত কাজ। তাছাড়া একটি ক্ষেত্রে বান্দাকে দু'টি ইবাদতের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১৪৮) ওযু শেষে প্রথমে ডান পা ধৌত করে মোজা পরিধান করার পর বাম পা ধৌত করে মোজা পরিধান করার বিধান কি ? এভাবে মোজা পরলে কি তার উপর মাসেহ করা যাবে ?

উত্তরঃ মাসআলাটি বিদ্বানদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। একদল বিদ্বান বলেন, পবিত্রতা পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার পর মোজা পরিধান করবে। অন্যদল বলেন, যদি প্রথমে ডান পা ধৌত করে তাতে মোজা পরিধান করে, তারপর বাম পা ধৌত করে তাতে মোজা পরিধান করে, তবে তা জায়েয। কেননা ডান পা পবিত্র করার পরই তো তা মোজাতে প্রবেশ করিয়েছে। অনুরূপভাবে বাম পা। অতএব সে তো পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করেই মোজা দু'টি পরিধান করেছে। কিন্তু একটি হাদীছ পাওয়া যায় দারাকুতনী ও হাকেম উহা বর্ণনা করেন। হাকেম তা ছহীহ্ বলেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কেউ ওযু সম্পাদন করে এবং মোজা পরিধান করে।" এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, যে লোক এখনও বাম পা ধৌত করেনি সে তো পূর্ণরূপে ওযু সম্পাদন করেনি। তাই প্রথম মতটিই অধিক উত্তম ও বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (১৪৯) মুক্বীম অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করে সফর আরম্ভ করলে কি সফরের সময়সীমা অনুযায়ী আমল করতে হবে ?

উত্তরঃ মুক্বীম অবস্থায় কোন লোক যদি মোজার উপর মাসেহ করে এরপর সফর করে, তবে সে সফরের সময়সীমা অনুযায়ী আমল করবে, এটাই বিশুদ্ধ মত। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ উল্লেখ করেছেন, মুক্বীম অবস্থায় মাসেহ করে সফর করলে মুক্বীমের সময় সীমা অনুসরণ করবে। কিন্তু প্রথম কথাটিই বিশুদ্ধ। কেননা সফর করার পূর্বে এই লোকের মাসেহ করার সময় সীমা তো অবশিষ্ট রয়েছে, তারপর সে সফর করেছে। অতএব সে মুসাফিরের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তিন দিন তিন রাত মাসেহ করবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) দ্বিতীয় মত পোষণ করে পরবর্তীতে প্রথম মত পোষণ করেছেন।

প্রশ্নঃ (১৫০) প্রথমবার কখন মাসেহ করেছে এ ব্যাপারে কোন মানুষ যদি সন্দেহে পড়ে, তবে সে কি করবে ?

উত্তরঃ এ অবস্থায় নিশ্চিয়তার উপর নির্ভর করবে। যদি সন্দেহ করে যে, যোহরের সময় মাসেহ করেছে না আছরের সময়। তখন সে আছরের সময়টাকে প্রথম মাসেহ গণ্য করবে। কেননা মূল হচ্ছে মাসেহ না করা। এই মূলনীতির দলীল হচ্ছে, 'কোন বস্তু যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতে থাকাটাই তার দাবী।' তার বিপরীত না হওয়াটাই মূল। যখন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করল,

নামায অবস্থায় তার যেন কিছু বের হয়ে যাচ্ছে। সে কি করবে? তিনি বললেন, "নামায ছাড়বে না যে পর্যন্ত আওয়াজ না শুনবে বা দুর্গন্ধ না পাবে।"[1]

প্রশ্নঃ (১৫১) কোন মানুষ যদি পায়ের লম্বা জুতায় (যা পায়ের টাখনু ঢেকে পরা হয়) মাসেহ করার পর তা খুলে ফেলে এবং মোজার উপর মাসেহ করে, তবে তার মাসেহ বিশুদ্ধ হবে কি ?

উত্তরঃ বিদ্বানদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, কেউ যদি পরিহিত দু'টি মোজার কোন একটিতে মাসেহ করে তবে সেটারই মাসেহ হবে দ্বিতীয়টির মাসেহ হবে না। কেউ কেউ বলেন, যদি নীচের মোজায় মাসেহ করা হয়, তবে সময়সীমা বাকী থাকলে দ্বিতীয়টিতে মাসেহ করা জায়েয হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। অর্থাৎ-কেউ ওযু করে মোজার উপর মাসেহ করল, এরপর দ্বিতীয় আরেকটি মোজা, বা জুতা পরিধান করল, অতঃপর উপরেরটির উপর মাসেহ করল, তবে প্রাধান্যযোগ্য মতানুযায়ী সময়সীমা বাকী থাকলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রথমটির উপর মাসেহ করার পর থেকে সময়সীমা হিসাব করতে হবে, দ্বিতীয়টির উপর মাসেহের সময় থেকে নয়।

প্রশ্নঃ (১৫২) কোন মানুষ যদি মোজা খুলে ফেলে, তারপর ওযু নষ্ট হওয়ার আগেই তা আবার পরিধান করে নেয়, তবে তার উপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি না ?

উত্তরঃ মোজা খোলার পর ওযু থাকাবস্থায় আবার তা পরিধান করার দু'টি অবস্থাঃ

প্রথম অবস্থাঃ হয়তো এটা তার প্রথম ওযু হবে। অর্থাৎ- প্রথমবার ওযু করার পর মোজা পরিধান করেছে কিন্তু সেই ওযু ভঙ্গ হয়নি, তাহলে তো কোন অসুবিধা নেই। মোজা খুলে আবার পরিধান করলে তাতে প্রয়োজনের সময় মাসেহ করতে পারবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ মোজার উপর একবার মাসেহ করার পর উহা খুলে ফেলেছে, তবে উহা পুনরায় পরিধান করলে তাতে আবার মাসেহ করা জায়েয হবে না। কেননা মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত হচ্ছে পানি দ্বারা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করার পর তা পরিধান করা। কিন্তু এই লোক তো মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেছে। বিদ্বানদের কথা থেকে এটাই জানা যায়।

কিন্তু কেউ যদি বলে যে, পবিত্র থাকাবস্থায় যদি পুনরায় মোজা পরিধান করে-যদিও মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে-তবে তো সময় সীমা থাকলে মাসেহ করতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। এটা শক্তিশালী কথা। কিন্তু আমি জানি না কেউ এরকম মত প্রকাশ করেছেন। এ ধরণের কথা কে বলেছেন এরকম কারো নাম না জানার কারণে আমি এ

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ নিশ্চিত না হলে সন্দেহের কারণে ওযু করবে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতা অর্জন করার পর যদি সন্দেহ হয় তবে উক্ত পবিত্রতা দ্বারা নামায আদায় করার দলীল। হা/ ৩৬১।

মত পোষণ করতে চাই না। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ যদি বলে থাকেন, তবে আমার মতে সেটাই বিশুদ্ধ। কেননা মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন তো পরিপূর্ণ। এখানে কোন ত্রুটি নেই। সুতরাং ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে যদি মাসেহ করা যায়, তবে মাসেহের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেও তো তাতে মাসেহ জায়েয হওয়া উচিত। কিন্তু এ রকম মত প্রকাশের পক্ষে আমি কোন আলেমে দ্বীনকে পাইনি। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

মাসেহের সময়-সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর তাতে মাসেহ্ করা ঃ

প্রশ্নঃ (১৫৩) মাসেহ বৈধ হওয়ার সময় সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ যদি তাতে মাসেহ করে নামায আদায় করে, তবে তার নামাযের বিধান কি ?

উত্তরঃ মাসেহ বৈধ হওয়ার সময় সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর যদি ওযু ভঙ্গ হয় এবং তাতে মাসেহ করে নামায আদায় করে, তবে পুনরায় পা ধৌতসহ ওযু করতে হবে এবং পুনরায় উক্ত নামায আদায় করতে হবে। কেননা সে পা ধৌত করেনি, ফলে অপূর্ণ ওযু দ্বারা নামায আদায় করেছে। কিন্তু যদি মাসেহ করার সময় সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর সে পবিত্র অবস্থাতেই থাকে ওযু ভঙ্গ না হয় এবং নামায আদায় করে, তবে তার নামায বিশুদ্ধ। কেননা মাসেহ করার সময় সীমা শেষ হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। যদিও কতিপয় বিদ্বান বলেন, সময় সীমা শেষ হলেই ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা বিনা দীললের কথা।

অতএব মাসেহের নির্দিষ্ট সীমা শেষ হওয়ার পর কেউ যদি পবিত্র অবস্থাতেই থাকে-যদিও পূর্ণ এক দিন-তবে সে নামায পড়ে যাবে। কেননা শরঈ দীলেলের ভিত্তিতে তার পবিত্রতা বা ওযু প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তার ওযু ভঙ্গ হয়েছে, দীলল ছাড়া একথা বলা যাবে না। আর মাসেহের সময়সীমা শেষ হলেই ওযু নষ্ট হয়ে যাবে এমন কথা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্নঃ (১৫৪) ওযু নষ্টের কারণ গুলো কি কি ?

উত্তর ঃ ওযু নষ্টের কারণগুলো কি কি সে সম্পর্কে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ওযু বিনষ্টের কারণ হিসেবে দলীলের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত হবে, আমরা সেটাই এখানে আলোচনা করবঃ

*** ওযু ভঙ্গের কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ**

প্রথমতঃ পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হওয়া। চাই তা পেশাব, পায়খানা, বীর্য, বায়ু বা মযী[1] বা অন্য কিছু হোক-বের হলেই তা ওযু ভঙ্গের কারণ

[1] . উত্তেজনার কারণে লিঙ্গের আগায় আঠালো জাতীয় যে তরল পদার্থ বের হয়, তাকে আরবীতে মযী বলে।

হিসেবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বীর্য যদি উত্তেজনার সাথে বের হয়, তবে সকলের জানা যে, তখন গোসল ওয়াজিব হবে। কিন্তু মযী বের হলে অন্ডকোষসহ পুরুষাঙ্গ ধৌত করে শুধু ওযু করলেই চলবে।

দ্বিতীয়তঃ নিদ্রা যদি এমন অধিক পরিমাণে হয়, যাতে ওযু ভঙ্গ হয়েছে কিনা অনুভুতি না থাকে, তবে তা ওযু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু নিদ্রা অল্প পরিমাণে হলে ওযু ভঙ্গ হবে না। কেননা এ অবস্থায় ওযু ভঙ্গ হলে সাধারণতঃ অনুভব করা যায়। চাই চিৎ হয়ে শুয়ে নিদ্রা যাক বা হেলান ছাড়া বসে বা হেলান দিয়ে বসে নিদ্রা যাক। মোট কথা অন্তরের অনুভুতি উপস্থিত থাকা। কিন্তু যদি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাতে কোন কিছু বুঝতে পারে না, তবে ওযু করা ওয়াজিব। কারণ হচ্ছে, নিদ্রা মূলতঃ ওযু ভঙ্গের কারণ নয়; বরং এ সময় ওযু ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। অতএব অনুভুতি থাকাবস্থায় যেহেতু ওযু ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই নিদ্রা এলেই ওযু ভঙ্গ হবে না। নিদ্রা যে মূলতঃ ওযু ভঙ্গের কারণ নয় তার দলীল হচ্ছে, অল্প নিদ্রাতে ওযু ভঙ্গ হয় না। নিদ্রা গেলেই যদি ওযু ভঙ্গ হত, তবে নিদ্রা অল্প হোক বেশী হোক ওযু ভঙ্গ হওয়ার কথা। যেমনটি পেশাব অল্প হোক বেশী হোক ওযু ভঙ্গ হবে।

তৃতীয়তঃ উটের মাংস ভক্ষণ করা। উটের গোস্ত রান্না করে হোক, কাঁচা হোক তা খেলেই ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি ছাগলের মাংস খেয়ে ওযু করব ? তিনি বললেন, যদি চাও তো করতে পার। বলা হল, আমরা উটের মাংস খেয়ে কি ওযু করব ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"।[1] নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ছগালের মাংস খেয়ে ওযু করার বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন রেখেছেন, তখন বুঝা যায় উটের গোস্ত খেয়ে ওযুর ব্যাপারে মানুষের কোন ইচ্ছা স্বাধীনতা নেই। অবশ্যই ওযু করতে হবে। অতএব উটের গোস্ত কাঁচা হোক বা পাকানো হোক কোন পার্থক্য নেই, গোস্ত লাল বর্ণ হোক বা অন্য বর্ণ খেলেই ওযু ভঙ্গ হবে। উটের নাড়ী-ভুঁড়ি, কলিজা, হৃতপিন্ড, চর্বি, মোটকথা উটের যে কোন অংশ ভক্ষণ করলে ওযু ভঙ্গ হবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি জানতেন মানুষ উটের সব অংশ থেকেই খেয়ে থাকে। উটের কোন অংশ থেকে অপর অংশের বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা অবশ্যই বর্ণনা করে দিতেন। যাতে করে মানুষ ধর্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। তাছাড়া ইসলামী শরীয়তে আমরা এমন কোন প্রাণীর বিধান সম্পর্কে অবগত নই যে, উহার মধ্যে বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা আলাদ কোন বিধান আছে। কেননা প্রাণীকুল কোনটা হয় হালাল আবার কোনটা হয় হারাম। কোনটা খেলে ওযু আবশ্যক

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ উটের মাংস খেয়ে ওযু করা।

হবে কোনটা খেলে ওযু আবশ্যক হবে না। কিন্তু একটি প্রাণীর মধ্যে এক অংশের এই বিধান আর অন্য অংশের এই বিধান, এরকম পার্থক্য ইসলামী শরীয়তে নেই। যদিও ইহুদীদের শরীয়তে এ রকম পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾

"ইহুদীদের জন্য প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিম্বা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে, (তা বৈধ ছিল)।" (সূরা আনআম- ১৪৬) এ জন্য বিদ্বানগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, শুকরের মাংস যেমন হারাম তেমনি শুকরের চর্বিও হারাম। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শুকরের ব্যাপারে তার মংশ হারাম হওয়ার কথাই শুধু উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং গাইরুল্লাহর জন্যে যবেহকৃত প্রাণী।" (সূরা মায়েদা-৩) আমি জানিনা শুকরের চর্বি হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ আছে। তাই উটের মাংস খেলে ওযু ভঙ্গ হবে সেই সাথে উটের চর্বি, নাড়ী-ভুঁড়ি প্রভৃতি খেলেও ওযু ভঙ্গ হবে।

প্রশ্নঃ (১৫৫) স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কি ওযু ভঙ্গ হবে ?

উত্তরঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কখনোই ওযু ভঙ্গ হবে না। একথার দলীল হচ্ছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তিনি স্ত্রীকে চুম্বন করে নামায পড়তে বের হয়েছেন কিন্তু ওযু করেন নি। কেননা আসল হচ্ছে দলীল না থাকলে ওযু ভঙ্গ না হওয়া। কেননা শরঈ দলীলের ভিত্তিতে তার ওযু প্রমাণিত হয়েছে। আর যা শরঈ দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা শরঈ দলীল ছাড়া নষ্ট হবে না। যদি বলা হয়, আল্লাহ্ তো বলেছেন, أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ "অথবা যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ কর।" উত্তরে বলা হবেঃ আয়াতে স্ত্রীদের স্পর্শ করার অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আয়াতের মধ্যে তাহারাত বা পবিত্রতাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ প্রকৃতরূপ ও বদলীরূপ এবং পবিত্রতাকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ ছোট পবিত্রতা ও বড় পবিত্রতা। অনুরূপভাবে ছোট পবিত্রতার কারণ ও বড় পবিত্রতার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর, তখন তোমরা মুখমন্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা-৬) এখানে পানি দ্বারা প্রকৃত ছোট পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ বলেন, وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" এখানে পানি দ্বারা প্রকৃত বড় পবিত্রতা অর্জনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ আবার বলেন,

﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

"তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খান করে অথবা তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ কর, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা তায়াম্মুম কর।" এখানে (তায়াম্মুম কর) কথাটি পানি দ্বারা প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন করার বদলীরূপ (পরিবর্তীত পদ্ধতি) আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 'তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খান করে' এ কথা দ্বারা অপবিত্রতার ছোট একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এবং 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা অপবিত্রতার বড় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এখন যদি 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা সাধারণভাবে হাত দ্বারা স্পর্শ করার অর্থ করা হয়, তবে তো আল্লাহ্ এই আয়াতে অপবিত্রতার দু'টিই ছোট কারণ উল্লেখ করলেন এবং বড় কারণ উল্লেখ করা ছেড়ে দিলেন। অথচ তিনি এর আগে বলেছেন, "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" এটা কুরআনের বালাগাতের বা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের পরিপন্থী। তাই আয়াতে 'স্ত্রীদের স্পর্শ কর' কথাটি দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা। তাহলেই তো আয়াতে দু'টি তাহারাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। বড় কারণ এবং ছোট কারণ। ছোট পবিত্রতা হচ্ছে, শরীরের চারটি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। আর বড় পবিত্রতা সমস্ত শরীরের সাথে সম্পর্কিত। আর বদলী পবিত্রতা তায়াম্মুম শুধুমাত্র দু'টি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত চাই তা বড় পবিত্রতার ক্ষেত্রে হোক বা ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে।

এই ভিত্তিতে আমরা বলব, স্ত্রীকে স্পর্শ করা কখনই ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। চাই স্পর্শ উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনার সাথে না হোক। তবে স্পর্শ করার কারণে যদি কোন কিছু নির্গত হয় তবে তার বিধান ভিন্ন। যদি বীর্য বের হয়, তবে গোসল করা ফরয আর মযী নির্গত হলে অন্ডোকোষসহ লিঙ্গ ধৌত করে ওযু করা আবশ্যক।[1]

পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করাঃ

---

[1] . তাছাড়া বিষয়টির সমাধান নবী ﷺ এর কর্ম থেকে ছহীহ্ হাদীছে পাওয়া যায়ঃ عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন অতঃপর নামায পড়তেন কিন্তু ওযু করতেন না।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্, আহমাদ)

প্রশ্নঃ (১৫৬) জনৈক শিক্ষক ছাত্রদের কুরআনের দরস প্রদান করেন। মাদ্রাসায় বা তার আশেপাশে পানি নেই। এখন তিনি কি করবেন? কেননা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া তো কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না ?

উত্তরঃ মাদ্রাসায় বা তার আশেপাশে যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে শিক্ষক ছাত্রদের সতর্ক করবেন, তারা যেন পবিত্র না হয়ে কুরআন বহন বা স্পর্শ না করে। কেননা আমর বিন হাযম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লিখেছেন, **أَنْ لا يَمَسَّ الْقُـــرْآنَ إِلا طَـــاهِرٌ** "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।"[1] এখানে পবিত্রতা বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ওযু বা গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে অর্জিত পবিত্রতা। যেমনটি আল্লাহ ওযুর আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে কোন অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তাঁর নে'য়ামত সমূহ পূর্ণরূপে দান করতে চান, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।" (সূরা মায়েদা- ৬) এখানে 'তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান' কথা দ্বারা বুঝা যায়, পবিত্রতা অর্জন না করলে পবিত্র হওয়া যাবে না। তাই ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন না করে কারো জন্য কুরআন স্পর্শ করা সমিচীন নয়। তবে কোন কোন বিদ্বান ছোটদের জন্য বিনা ওযুতে কুরআন স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা কুরআন হাতে নেয়া তাদের জন্য খুবই দরকার। অথচ তারা ওযুর গুরুত্ব বোঝে না। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, ছাত্রদেরকে ওযুর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তারা পবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে।

প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন, 'পবিত্র ছাড়া তো কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না' সম্ভবতঃ একথা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, কুরআন স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বর্ণিত আয়াতে এ দলীল পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ বলেন,

(**لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّـــرُونَ**) "পবিত্রগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না।" (সূরা ওয়াক্বেয়া- ৭৯) এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিতাবুল মাকনূন বা লুকায়িত গ্রন্থ অর্থাৎ লওহে মাহফূয। আর 'পবিত্রগণ' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেরেশতাগণ। এখানে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য হলে এরূপ বলা হত, 'পবিত্রতা অর্জনকারীগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করেনা'। এখানে একথাও বলা হয়নি যে, পবিত্রতা অর্জন না করলে উহা স্পর্শ করা জায়েয নয়। কিন্তু পূর্বে যে হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে, তাই ওযুর নির্দেশ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ (১৫৭) কি কি কারণে গোসল ফরয হয় ?

[1] . দারেমী, অধ্যায়ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ নং৩ হা/ ২১৬৬। মুআত্বা মালেক অধ্যায়ঃ নামাযের জন্য আহবান হা/৪১৯।

উত্তরঃ গোসল ফরয হওয়ার কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ

১) জাগ্রত বা নিদ্রা অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। কিন্তু নিদ্রা অবস্থায় উত্তেজনার অনুভব না হলেও গোসল করা ফরয। কেননা নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে মানুষ অনেক সময় তা বুঝতে পারে না।

২) স্ত্রী সহবাস। সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের সর্বনিম্ন আগাটুকু প্রবেশ করালেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। কেননা প্রথমটির ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "পানি নির্গত হলেই পানি ঢালতে হবে।"[1] অর্থাৎ বীর্যের পানি নির্গত হলেই গোসল করতে হবে। আর দ্বিতীয় কারণের ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)

"স্ত্রীর চার শাখার (দু'হাত দু'পায়ের) মাঝে বসে, তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেই গোসল ফরয হবে।"[2] যদিও বীর্যপাত না হয়। এ বিষয়টি অনেক মানুষের জানা নেই। অনেক লোক স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না করলে অজ্ঞতা বশতঃ সপ্তাহ মাস কাটিয়ে দেয় গোসল করে না। এটি মারাত্মক ধরণের ভুল। এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়তের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। অতএব উল্লেখিত হাদীছের ভিত্তিতে, সহবাস করে বীর্যপাত না হলেও গোসল করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর ফরয।

৩) নারীদের ঋতু বা নেফাস (সন্তান প্রসোবত্তোর স্রাব) হওয়া। ঋতুবতী নারীর স্রাব বন্ধ হলে, গোসলের মাধ্যমে তাকে পবিত্র হতে হবে। এই গোসলও ফরয গোসলের অন্তর্ভূক্ত। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿يسألونَكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾

অর্থাৎ "তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমণ কর তাদের কাছে। যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।" (সূরা বাক্বারা- ২২২)

তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইস্তেহাজা বিশিষ্ট নারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, ঋতুর নির্দিষ্ট দিন সমূহ সে বিরত থাকবে তারপর গোসল করবে। নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান। তার উপরও গোসল করা ফরয।

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ পানি নির্গত হলেই পানি ঢালা। হা/ ৩৪৩।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ গোসল, অনুচ্ছেদঃ উভয় লিঙ্গ মিলিত হলে করণীয়, হা/ ২৯১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ পানি ঢালার সম্পর্ক পানি নির্গত হওয়ার সাথে। হা/ ৩৪৮।

হায়েয ও নেফাস থেকে গোসল করার পদ্ধতি নাপাকী থেকে গোসল করার পদ্ধতির অনুরূপ। তবে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ ঋতুবতীর গোসলের সময় বরই পাতা ব্যবহার করা মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা এতে অধিক পরিষ্কার ও পবিত্র হওয়া যায়। বরই পাতার বদলে সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করলেও উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ফরয বলে উল্লেখ করেছেন। দলীল হচ্ছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা যয়নবকে যারা গোসল দিচ্ছিলেন, তিনি তাদেরকে বললেন, (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ) "যয়নবকে তিনবার গোসল করাও, অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার অথবা এর চাইতে অধিকবার- যদি তোমরা তা মনে কর।"[1] তাছাড়া বিদায় হজ্জে আরাফা দিবসে জনৈক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বাহণ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ "তোমরা তাকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং পরিহিত দু'টি কাপড়েই কাফন পরাও।"[2] বিদ্বানগণ বলেন, মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরয। কিন্তু এটা জীবিতের সাথে সম্পর্কিত। কেননা মৃত্যু বরণ করার কারণে উক্ত ব্যক্তির উপর শরীয়তের বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে গেছে। তাই জীবিতদের উপর ফরয হচ্ছে, তাকে গোসল করিয়ে দাফন করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ (১৫৮) স্ত্রীকে স্পর্শ, আলিঙ্গন ও তাকে চুম্বন করলে কি গোসল করতে হবে?

উত্তরঃ সাধারণ স্পর্শ, শৃঙ্গার, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আনন্দ বিনোদন করলে তাদের উপর গোসল ফরয হবে না। তবে যদি উভয়ের থেকে বীর্যস্খলিত হয়, তবে উভয়ের উপর গোসল করা ফরয হবে। একজনের থেকে বীর্যস্খলিত হলে শুধু তার উপরই গোসল ফরয হবে। এ বিধান হচ্ছে সাধারণ শৃঙ্গার, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি তারা সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে নারী-পুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে-যদিও তাদের কারোই বীর্যস্খলিত না হয়। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) "স্ত্রীর চার শাখার (দু'হাত, দা'পা) মাঝে বসে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেই গোসল ফরয হবে।"[3] মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "যদিও বীর্যপাত না হয়।" এ বিষয়টি

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মৃতকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দেয়া ও ওযু করানো। হা/১২৫৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মৃতকে গোসল দেয়া, হা/৯৩৯।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ ইহরামকারী মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন পরাতে হয়। হা/ ১২৬৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ইহরামকারী মৃত্যুবরণ করলে কি করতে হবে। হা/১২০৬।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ গোসল, অনুচ্ছেদঃ উভয় লিঙ্গ মিলিত হলে করণীয়, হা/ ২৯১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ পানি প্রবাহিত করার সম্পর্ক পানি নির্গত হওয়ার সাথে। হা/ ৩৪৮।

অনেক লোকের অজানা। তাদের ধারণা নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে বীর্যপাত না হলে তাদের উপর গোসল ফরয নয়। কিন্তু এটা বড় ধরণের অজ্ঞতা। অতএব সহবাস হলেই সর্বাবস্থায় গোসল ফরয হবে। কিন্তু সহবাস না করে যে কোন প্রকারে আনন্দ-ফুর্তি করলে গোসল ফরয হবে না।

প্রশ্নঃ (১৫৯) নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে কি করবে ?

উত্তরঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা পেলে তিনটি অবস্থা হতে পারেঃ

প্রথম অবস্থা ঃ নিশ্চিত হবে যে, এই ভিজা বীর্যপাতের কারণে হয়েছে। তখন স্বপ্ন স্মরণ থাক বা ভুলে যাক গোসল করা ফরয।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ নিশ্চিত হবে এটা বীর্য নয়। তখন গোসল করা ফরয নয়। কিন্তু ঐ ভিজা স্থান ধৌত করা ওয়াজিব। কেননা তখন উহা পেশাবের বিধানের মধ্যে শামিল হবে।

তৃতীয় অবস্থাঃ ভিজাটা কি বীর্যের কারণে না অন্য কারণে বিষয়টি অজানা। তখন ব্যাখ্যার দাবী রাখেঃ

প্রথমতঃ যদি স্মরণ থাকে যে স্বপ্নে কিছু দেখেছে, তাহলে উক্ত ভিজা বীর্য ধরে নিয়ে গোসল করবে। কেননা উম্মু সালামার হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করলেন, পুরুষ যা স্বপ্নে দেখে থাকে নারী যদি তা দেখে, তবে তাকেও কি গোসল করতে হবে ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যদি সে পানি দেখে।"[1] এথেকে বুঝা যায় স্বপ্নে কিছু দেখে যদি পানির ভিজা পাওয়া যায়, তবে গোসল করা ফরয।

দ্বিতীয়তঃ স্বপ্নে কিছুই দেখেনি। যদি নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সহবাসের চিন্তা মনে এসে থাকে, তবে উক্ত ভিজাকে মযীর ভিজা মনে করবে। কিন্তু ঘুমানোর পূর্বে সহবাসের কোন চিন্তা মাথায় না আসলে কি করতে হবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, সতর্কতা বশতঃ গোসল করা ওয়াজিব। আবার কেউ বলেছেন, ওয়াজিব নয়। এটাই বিশুদ্ধ কথা। কেননা আসল হচ্ছে যিম্মামুক্ত থাকা।

প্রশ্নঃ (১৬০) নাপাক অবস্থায় কি কি বিধান প্রজোয় ?

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় প্রজোয্য বিধান সমূহ নিম্নরূপঃ

প্রথমঃ নাপাক ব্যক্তির জন্য নামায আদায় করা হারাম। ফরয, নফল, জানাযা সবধরণের নামায। কেননা আল্লাহ্ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَــاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা মায়িদা- ৬)

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ নারীর বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা। হা/ ৩১১।

দ্বিতীয়ঃ নাপাক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করা হারাম। কেননা কা'বা ঘরের তওয়াফ করলে মসজিদে অবস্থান করতে হয়। আর তওয়াফকে নামায বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটে যেয়ো না, যে পর্যন্ত তোমরা কি বলছ তা বুঝতে না পার। এবং নাপাক অবস্থাতেও না, যতক্ষণ তোমরা গোসল না কর। তবে মসজিদে (অবস্থান না করে তার) ভিতর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে চাইলে ভিন্ন কথা।" (সূরা নিসা-৪৩) তাছাড়া বিদায় হজ্জে আয়েশা (রাঃ) ঋতুবতী হয়ে পড়লে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেনঃ

(افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)

"হে আয়শা! হজ্জ পালনকারীগণ যা যা করে তুমিও তাই করে যাও, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করো না।"[1]

তৃতীয়ঃ কুরআন স্পর্শ করা হারাম। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।"[2]

চতুর্থঃ গোসল না করে মসজিদে অবস্থান করা হারাম। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটে যেয়ো না, যে পর্যন্ত তোমরা কি বলছ তা বুঝতে না পার। এবং নাপাক অবস্থাতেও না, যতক্ষণ তোমরা গোসল না কর। তবে মসজিদে (অবস্থান না করে তার) ভিতর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে চাইলে ভিন্ন কথা।" (সূরা নিসা- ৪৩)

পঞ্চমঃ গোসল না করে কুরআন পাঠ করা হারাম। কেননা আলী (রাঃ) বলেন,

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا)

"রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাপাক অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায় আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন"।[3] নাপাক ব্যক্তির জন্য এই পাঁচটি বিধান প্রজোয্য।

প্রশ্নঃ (১৬১) জনবী গোসল করার পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ গোসল করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে ঃ

প্রথম পদ্ধতিঃ ওয়াজিব পদ্ধতি। আর তা হচ্ছে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। অবশ্য কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া এর অন্তর্গত। অতএব যে কোন প্রকারে

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী তওয়াফ ছাড়া হজ্জের যাবতীয় কাজ করবে।
[2]. দারেমী, অধ্যায়ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ নং৩ হা/ ২১৬৬। মুআত্বা মালেক অধ্যায়ঃ নামাযের জন্য আহবান হা/৪১৯।
[3]. তিরমিযী, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন পাঠ করা।

সমস্ত শরীরে পানি ঢালতে পারলে বড় নাপাকী দূর হয়ে যাবে এবং পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা মায়িদা- ৬)

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ পরিপূর্ণ পদ্ধতি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে গোসল করেছেন ঠিক সেইভাবে গোসল করা। নাপাকী থেকে গোসল করতে চাইলে প্রথমে হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে, তারপর নাপাকী সংশ্লিষ্ট স্থান এবং লজ্জাস্থান ধৌত করে নিবে। এরপর পরিপূর্ণরূপে সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী ওযু করবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢেলে তা ভালভাবে ভিজিয়ে নিবে। সবশেষে সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে। এটাই গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি।

প্রশ্নঃ (১৬২) গোসলের সময় কুলি না করলে বা নাক না ঝাড়লে গোসল বিশুদ্ধ হবে কি?

উত্তরঃ কুলি না করলে এবং নাকে পানি দিয়ে নাক না ঝাড়লে গোসল বিশুদ্ধ হবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা মায়িদা-৬) অর্থাৎ সমস্ত শরীর। আর মুখের ভিতর ও নাকের ভিতরের অংশ শরীরের অন্তর্গত যা পবিত্র করা ওয়াজিব। এই কারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযুতে কুলি করতে ও নাক ঝাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা উহা আল্লাহর এই নির্দেশের অন্তর্গতঃ "তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা-৬) অতএব যখন কিনা ঐ দু'টি স্থান মুখমন্ডলের মধ্যে শামিল-আর মুখমন্ডল ধৌত করা ওয়াজিব বড় পবিত্রতায়, তখন নাপাকীর গোসলে কুলি করা ও নাক ঝাড়াও ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ (১৬৩) পানি ব্যবহার করতে অপারগ হলে, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে ?

উত্তরঃ পানি না থাকার কারণে বা পানি ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকার কারণে পানি ব্যবহার করতে অপারগ হলে, তায়াম্মুম করবে। এর পদ্ধতি হচ্ছে, পবিত্র মাটিতে দু'হাত (একবার) মারবে, অতঃপর তা দ্বারা মুখমন্ডল মাসেহ করবে এবং উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এই নিয়ম ছোট-বড় অপ্রকাশ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত।

কিন্তু নাপাকী যদি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ্য হয়, তবে সেখানে তায়াম্মুম নেই। চাই উহা শরীরে হোক বা কাপড়ে কিংবা মাটিতে। কেননা প্রকাশ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত মূল বস্তুটির অপসারণ করা। এখানে ইবাদতের শর্ত নেই। এই কারণে মানুষের অনিচ্ছায় যদি মূল নাপাক বস্তুটি যে কোন প্রকারে বিদূরিত হয়ে যায়, তবে স্থানটি পবিত্র হয়ে গেল। যেমন কোন নাপাক স্থানে বা কাপড়ে যদি বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টির পানির সাথে উক্ত নাপাকী চলে যায়, তবে স্থানটি পবিত্র হয়ে গেল-যদিও এ সম্পর্কে মানুষের জানা না থাকে। কিন্তু অপ্রকাশ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের

বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা একটি ইবাদত। তাই অবশ্যই এখানে মানুষকে নিয়ত বা দৃঢ় সংকল্প করে তা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৬৪) ঠান্ডার সময় কেউ যদি নাপাক হয়, তবে কি সে তায়াম্মুম করবে ?

উত্তরঃ নাপাক হলেই গোসল করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَــاطَّهَّرُوا "তোমরা যদি অপবিত্র হও, তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা মায়িদা- ৬) কিন্তু রাতে যদি শীত প্রচন্ড হয় এবং ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে সক্ষম না হয়, তবে সম্ভব হলে পানি গরম করে নিবে। কিন্তু পানি গরম করার ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম করবে এবং নামায আদায় করবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করে অথবা স্ত্রীদের স্পর্শ করে, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। স্বীয় হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তাঁর নে'য়ামত সমূহ পূর্ণরূপে দান করতে চান, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করতে পার।" (সূরা মায়েদা-৬) পানি না পাওয়া পর্যন্ত সে পবিত্রই থাকবে। পানি পেয়ে গেলে গোসল করা ওয়াজিব। কেননা ছহীহ বুখারীতে ইমরান বিন হুছাইন কর্তৃক দীর্ঘ হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, মানুষের সাথে নামায আদায় না করে আলাদা হয়ে বসে আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, "নামায পড়লে না কেন?" লোকটি বলল, আমি নাপাক হয়ে গেছি, কিন্তু পানি নেই। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি মাটি ব্যবহার কর, সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।" এরপর পানি এল, তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পানি দিয়ে বললেন, এটা তোমার শরীরে বইয়ে দাও।[1] এ থেকে বুঝা যায়, পানি পেলেই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা তায়াম্মুমকারীর জন্য ওয়াজিব। চাই ছোট নাপাকীর ক্ষেত্রে হোক বা বড় নাপাকীর ক্ষেত্রে।

তায়াম্মুমকারী বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করলে পুনরায় নাপাক না হওয়া পর্যন্ত বা পানি না পাওয়া পর্যন্ত পবিত্র অবস্থাতেই থাকতে পারবে। তাই প্রত্যেক নামাযের জন্য বারবার তায়াম্মুম করবে না। অবশ্য ছোট নাপাকী হলে তা থেকে পবিত্রতার জন্য তায়াম্মুম করবে।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদঃ পানির বদলে পবিত্র মাটিই মুসলিম ব্যক্তির ওযু। হা/ ৩৪৪।

প্রশ্নঃ (১৬৫) যে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা হয় তাতে কি ধুলা থাকা শর্ত ? আল্লাহর বাণী "তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় তা দ্বারা মুছে ফেল।" এখানে "তা দ্বারা" বলতে কি বুঝা যায় যে,তায়াম্মুম করার সময় অবশ্যই ধুলা থাকতে হবে ?

উত্তরঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে ধুলা লেগে থাকা শর্ত নয়। বরং মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলেই যথেষ্ট হবে, চাই তাতে ধুলা থাক বা না থাক। অতএব মাটির উপর যদি বৃষ্টি নাযিল হয়, আর ঐ মাটিতে মানুষ হাত মেরে মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করে তবে যথেষ্ট হবে। যদিও মাটিতে কোন ধুলা না থাকে। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

"তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। স্বীয় হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল মাটি দ্বারা মুছে ফেল।" (সূরা মায়েদা-৬) তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ কখনো এমন স্থানে সফর করতেন যেখানে বালু ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যেত না। কখনো বৃষ্টিপাত হত। তারপরও তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তায়াম্মুম করতেন। অতএব বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, যে কোন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলেই তা বিশুদ্ধ হবে। চাই সেখানে ধুলা থাক বা না থাক। আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় তা দ্বারা মুছে ফেল।" এখানে منه শব্দে مِنْ অব্যয়টি দ্বারা 'কিছু সংখ্যক' বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং কোন কাজের শুরু বুঝানো হয়েছে। এই জন্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়াম্মুমের পদ্ধতি দেখাতে গিয়ে মাটিতে হাত মেরে তাতে ফুঁ দিয়েছেন।[1]

প্রশ্নঃ (১৬৬) মাটি না পেয়ে দেয়ালে বা বিছানায় তায়াম্মুম করলে বিশুদ্ধ হবে কি ?

উত্তরঃ দেয়াল হচ্ছে পবিত্র মাটির অন্তর্ভূক্ত। দেয়াল যদি পাথর বা মাটির তৈরী ইট দ্বারা নির্মিত হয়, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। কিন্তু কাঠ বা পেইন্ট প্রভৃতি দ্বারা যদি দেয়ালকে ঢেকে দেয়া হয়-আর এর উপর ধুলা জমে থাকে, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম করতে কোন অসুবিধা নেই। আর তা মাটিতে তায়াম্মুমের অন্তর্ভূক্ত হবে। কেননা ধুলা মাটিরই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু উক্ত দেয়ালে যদি কোন ধুলা বা মাটি না থাকে, তবে সেখানে তায়াম্মুম করা যাবে না। কেননা সেখানে তো কোন মাটি নেই। আর বিছানার ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, যদি তাতে ধুলা থাকে, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম চলবে অন্যথায় নয়। কেননা বিছানা মাটির অন্তর্গত নয়।

প্রশ্নঃ (১৬৭) ছোট্ট শিশুর পেশাব যদি কাপড়ে লাগে, তবে তার বিধান কি ?

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুমকারী কি দু'হাতে ফুঁক দিবে। হা/ ৩৩৮।

উত্তরঃ এই মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, শিশু যদি পুরুষ হয় এবং শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ তার খাদ্য হয়, তবে তার পেশাব হালকা নাপাক। এটাকে পবিত্র করার জন্য পানির ছিটা দেয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ হাতে পানি নিয়ে কাপড়ের উপর এমনভাবে ছিটিয়ে দিবে যাতে সম্পূর্ণ স্থানকে শামিল করে, ঘঁষতে হবে না এবং তাতে এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালতে হবে না যে, চিপে পানি বের করতে হয়। এর কারণ হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে, একদা একটি শিশু পুত্র নিয়ে এসে তাঁর কোলে রেখে দেয়া হল। সে পেশাব করে দিলে, তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন, অতঃপর তার উপর ছিটা দিলেন, কিন্তু তা ধৌত করলেন না।[1] আর শিশু যদি কন্যা সন্তান হয়, তবে তার পেশাব অবশ্যই ধৌত করতে হবে। কেননা পেশাব মূলতঃ অপবিত্র। উহা ধৌত করা ওয়াজিব। কিন্তু শিশু পুত্রের পেশাব এর ব্যতীক্রম। কেননা সুন্নাতে নববীতে এর প্রমাণ বিদ্যমান।[2]

পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম হওয়ার পর নারীর ঋতু স্রাবের বিধান ঃ

প্রশ্নঃ (১৬৮) জনৈক নারী পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করেছে। কিন্তু সাধারণ নিয়মেই তার স্রাব প্রবাহিত হচ্ছে। আরেক পঞ্চাশোর্ধ নারীর স্রাব পরিচিত নিয়মে হয় না; বরং হলদে রং বা মেটে রঙ্গের পানি নির্গত হয়। এদের বিধান কি ?

উত্তরঃ নির্দিষ্ট ও পরিচিত নিয়মে যে নারীর স্রাব নির্গত হচ্ছে, তার উক্ত স্রাব বিশুদ্ধ মতে হায়েয বা ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ঋতুবতী হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ কোন বয়স নেই। অতএব ঋতুর নির্দিষ্ট বিধান সমূহ এই নারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ-নামায, রোযা ও স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকা। স্রাব বন্ধ হলে ফরয গোসল করা এবং ছুটে যাওয়া ছিয়ামের কাযা আদায় করা।

আর যে নারীর হলদে রং বা মেটে রঙ্গের পানি নির্গত হচ্ছে, যদি ইহা ঋতুর নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে থাকে, তবে তা হায়েয বা ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। আর ঋতুর সময়ে না হলে তা হায়েয নয়। কিন্তু তার স্রাব যদি পরিচিত ঋতুস্রাবের মত হয় কিন্তু কখনো আগে হয় কখনো পরে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। যখন স্রাব আসবে তখন ছালাত, ছিয়াম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে আর যখন স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে তখন গোসল করে পবিত্র হবে। এ সমস্ত কথা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী- ঋতুর জন্য বয়সের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ শিশু পুত্রের পেশাব। হা/২২৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের বিধান ও তা ধোয়ার পদ্ধতি। হা/ ২৮৬।

[2] . আবুস্ সামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ "শিশু মেয়ের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং শিশু ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।" (নাসাঈ, আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ্)

কিন্তু হাম্বলী মাযহাব মতে পঞ্চাশ বছর বয়সের উর্ধে হলে আর ঋতু নেই। যদিও কৃষ্ণ বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। তখন সে ছালাত, ছিয়াম, প্রভৃতি যথা নিয়মে চালিয়ে যাবে। রক্ত বন্ধ হলে গোসল করার দরকার নেই। কিন্তু এ মতটি বিশুদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ (১৬৯) গর্ভবতীর রক্তস্রাব দেখা গেলে তা কি ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে ?

উত্তরঃ গর্ভবতীর হায়েয হয় না। যেমনটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেছেন। কেননা নারীর গর্ভ তো হায়েয বন্ধ হওয়ার মাধ্যমেই জানা যায়। বিদ্বানগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হিকমতে হায়েযের রক্তকে মাতৃগর্ভে ভ্রুণের খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকেন। গর্ভে সন্তান এসে গেলে ঐ হায়েয বাইরে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন নারীর গর্ভধারণের পরও সঠিক নিয়মে হায়েয হতে থাকে। যেমনটি গর্ভধারণের পূর্বে হচ্ছিল। তাদের এই স্রাব ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। কেননা গর্ভধারণ তার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলেনি। ফলে ঋতু আপন গতিতে চলমান রয়েছে। অতএব তার এই স্রাব ঋতুর সবধরণের বিধানকে শামিল করবে। মোটকথা গর্ভবতী থেকে যে স্রাব নির্গত হয়, তা দু'ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ গর্ভধারণের পূর্বে যে নিয়মে ঋতু চলছিল গর্ভের পরেও যদি সেই নিয়মে স্রাব চলতে থাকে, তবে উহা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এখানে গর্ভধারণ তার স্বাভাবিক স্রাবের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে উহা হায়েয বা ঋতু হিসেবেই গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ আকস্মিক কোন কারণ বশতঃ স্রাব নির্গত হওয়া। দুর্ঘটনাবশতঃ, ভারী কোন বস্তু বহণ করা বা কোন স্থান থেকে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে রক্ত প্রবাহিত হওয়া। তখন তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তা শিরা থেকে নির্গত। তাই সে নামায, রোযা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে না; পবিত্র অবস্থায় যা করতো তা সবই স্বাভাবিক নিয়মে করতে থাকবে।

প্রশ্নঃ (১৭০) ঋতুর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট দিন বলে কি কিছু আছে?

উত্তরঃ বিশুদ্ধ মতে ঋতুর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দিন নির্দিষ্ট বলে কিছু নেই। কেননা আল্লাহ বলেনঃ

﴿يسألونَكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

অর্থাৎ "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।" (সূরা বাক্বারা-২২২) এখানে স্ত্রী সহবাসের নিষিদ্ধতা নির্দিষ্ট দিনের সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। এর সম্পর্ক হচ্ছে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে।

এ থেকে বুঝা যায়, বিধানটির কারণ হচ্ছে ঋতু থাকা বা না থাকা। যখনই ঋতু পাওয়া যাবে, তখনই বিধান প্রযোজ্য হবে। যখনই পবিত্র হয়ে যাবে, তার বিধান সমূহও রহিত হবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট দিন বেঁধে দেয়ার কোন দলীলও নেই। অথচ বিষয়টি বর্ণনা

করে দেয়ার দরকার ছিল। বয়স বা দিনের নির্দিষ্টতা যদি শরীয়ত সম্মত হত, তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতে বর্ণিত হত।

অতএব এই ভিত্তিতে নারীদের কাছে পরিচিত স্রাব যখনই দেখা যাবে, নারী তখনই নিজেকে ঋতুবতী গণ্য করবে। এখানে কোন দিন নির্দিষ্ট করবে না। কিন্তু নারীর স্রাব যদি চলতেই থাকে বন্ধ না হয়, অথবা সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ হয়, যেমন মাসে একদিন বা দু'দিন তবে তা ইস্তেহাযার স্রাব (বা অসুস্থতা) বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (১৭১) কোন নারীর ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে ঋতুস্রাব চালু করে নামায পরিত্যাগ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নিজের ইচ্ছায় ঋতুস্রাব চালু করার কারণে যদি স্রাব চালু হয়ে যায় এবং নারী নামায পরিত্যাগ করে তবে উক্ত নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা ঋতুস্রাব যখনই দেখা যাবে, তখনই তার বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে নারী যদি ঋতুস্রাব বন্ধ করার জন্য কোন ঔষুধ গ্রহণ করে এবং তার ফলে স্রাব না আসে, তবে নামায ও ছিয়াম আদায় করবে এবং ছিয়ামের কাযা করবে না। কেননা সে তো ঋতুবতী নয়। অতএব কারণ পাওয়া গেলেই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেনঃ "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র।" (সূরা বাকারা- ২২২) অতএব যখনই এই অপবিত্রতা পাওয়া যাবে, তার বিধান পাওয়াও যাবে। যখন অপবিত্রতা থাকবে না, কোন বিধি-বিধানও থাকবে না।

প্রশ্নঃ (১৭২) ঋতুবতী নারীর কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ প্রয়োজন দেখা দিলে ঋতুবতী নারীর কুরআন পাঠ করা জায়েয। যেমন সে যদি শিক্ষিকা হয়, তবে পাঠ দানের জন্য কুরআন পড়তে পারবে। অথবা ছাত্রী কুরআন শিক্ষা লাভ করার জন্য পাঠ করতে পারবে। অথবা নারী তার শিশু সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠ করবে, শিখানোর জন্য তাদের আগে আগে কুরআন পাঠ করবে। মোটকথা যখনই ঋতুবতী নারী কুরআন পাঠ করার প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই তার জন্য তা পাঠ করা জায়েয কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কুরআন পাঠ না করার কারণে যদি ভুলে যাওয়ার আশংকা করে, তবে স্মরণ রাখার জন্য তেলাওয়াত করবে- কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বিনা প্রয়োজনেও তথা সাধারণ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে ঋতুবতীর জন্য কুরআন পাঠ করা জায়েয। অবশ্য কোন কোন বিদ্বান বলেন, প্রয়োজন থাকলেও ঋতুবতী নারীর কুরআন পাঠ করা হারাম। এখানে তিনটি মত পাওয়া গেল। কিন্তু আমার মতে যে কথা বলা উচিত তা হচ্ছে, ঋতুবতী নারী যদি কুরআন পাঠ দান বা শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে বা ভুলে যাওয়ার আশংকা করে, তবে কুরআন পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই।

হায়েযের রক্ত না ইস্তেহাযার রক্ত সন্দেহ হলে কি করবে ?

প্রশ্নঃ (১৭৩) নির্গত স্রাবের ব্যাপারে নারী যদি সন্দিহান হয় যে, এটা কি হায়েযের রক্ত না কি ইস্তেহাযার রক্ত না কি অন্য কিছুর রক্ত? এবং সে পার্থক্যও করতে পারে না। তবে সে উহা কি গণ্য করবে ?

উত্তরঃ আসল কথা হচ্ছে, নারীর গর্ভ থেকে নির্গত রক্ত হায়েযেরই হয়ে থাকে। কিন্তু যখন প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তা ইস্তেহাযার স্রাব তখন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করবে। অন্যথায় ইস্তেহাযা কিনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্গত রক্ত হায়েয বা ঋতু হিসেবেই গণ্য করবে।

প্রশ্নঃ (১৭৪) নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার পর ঋতু শুরু হলে তার বিধান কি ?

উত্তরঃ নামাযের সময় প্রবেশ করার পর যদি নারীর ঋতুস্রাব শুরু হয়, যেমন উদাহরণ স্বরূপ যোহরের নামায শুরু হওয়ার আধাঘন্টা পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হল, তবে পবিত্র হওয়ার পর এই ওয়াক্তের নামায কাযা আদায় করবে। কেননা সে পবিত্র থাকাবস্থায় তার উপর নামায আবশ্যক হয়েছিল। আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসা- ১০৩) আর ঋতু চলমান অবস্থায় যে সমস্ত নামায পরিত্যাগ করবে, তার কাযা আদায় করবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীছে তিনি বলেনঃ(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ) "নারী কি এমন নয় যে, সে ঋতুবতী হলে নামায পড়ে না ও রোযা রাখে না?"[1] সমস্ত উলামায়ে কেরাম একথার উপর ঐকমত্য যে, ঋতু চলাবস্থায় ছুটে যাওয়া ছালাতের কাযা আদায় করতে হবে না।

নারী যদি এমন সময় পবিত্র হয় যখন নামাযের এক রাকাত বা ততোধিক রাকাত আদায় করা সম্ভব, তখন সে সেই নামায আদায় করে নিবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) "যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের এক রাকাত নামায আদায় করতে পারবে সে আছর নামায পেয়ে গেল।"[2] যদি আছরের শেষ সময় পবিত্র হয় এবং সূর্যাস্তের জন্য এতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে যখন এক রাকাত নামায আদায় করা সম্ভব, অথবা সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়, যখন কমপক্ষে ফজরের এক রাকাত নামায আদায় করা সম্ভব, তবে

---

[1] . ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতীর ছিয়াম পরিত্যাগ করা। হা/ ৩০৪।

[2] . ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, হা/৫৪৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ এক রাকাত নামায পেলে ঐ নামায পেয়ে গেল।

উভয় অবস্থায় তাকে গোসল করার পর আছর বা ফজরের নামায কাযা আদায় করতে হবে।

নারীর ঋতুর নির্দিষ্ট দিন বৃদ্ধি হয়ে গেলে

প্রশ্নঃ (১৭৫) জনৈক নারীর ঋতুর নির্দিষ্ট দিন ছিল ছয় দিন। অতঃপর এই দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গেছে। সে এখন কি করবে ?

উত্তরঃ এই নারীর ঋতুর দিন ছিল ছয় দিন। কিন্তু তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে নয় দিন বা দশ দিন বা এগার দিন হয়ে গেছে, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত নামায-রোযা থেকে বিরত থাকবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঋতুর জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র।" (সূরা বাকারা- ২২২) অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্রাব অবশিষ্ট থাকবে, নারীও নিজ অবস্থায় থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে ছালাত-ছিয়াম আদায় করবে। পরবর্তী মাসে যদি তার স্রাবের দিন কম হয়ে যায়, তবে স্রাব বন্ধ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও আগের মাসের সমান দিন পূর্ণ না হয়।

মোটকথা নারী যতদিন ঋতু অবস্থায় থাকবে ততদিন সে ছালাত-ছিয়াম থেকে বিরত থাকবে। চাই ঋতুর দিন পূর্ববর্তী মাসের বরাবর হোক বা কম হোক বা বেশী হোক। স্রাব বন্ধ হয়ে পবিত্র হলেই গোসল করবে।

হায়েযের দিন সমূহ বিচ্ছিন্নভাবে হলে কি করবে ?

প্রশ্নঃ (১৭৬) জনৈক নারী মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে নামায শুরু করেছে। এভাবে নয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার স্রাব দেখা গেছে। তিন দিন স্রাব প্রবাহমান ছিল। তখন নামায পড়েনি। তারপর পবিত্র হলে গোসল করে এগার দিন নামায আদায় করেছে। তারপর আবার তার স্বাভাবিক মাসিক শুরু হয়েছে। সে কি ঐ তিন দিনের নামায কাযা আদায় করবে ? নাকি তা হায়েযের দিন হিসেবে গণ্য করবে ?

উত্তরঃ নারীর গর্ভ থেকে যখনই রক্ত প্রবাহিত হবে তখনই তা ঋতু বা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। চাই সেই ঋতুর সময় পূর্বের ঋতুর সময়ের চাইতে দীর্ঘ হোক বা কম হোক। ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পাঁচ দিন বা ছয় দিন বা দশ দিন পর পুনরায় স্রাব দেখা গেছে, তবে সে পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে এবং নামায পড়বে না। কেননা এটা ঋতু। সর্বাবস্থায় এরূপই করবে। পবিত্র হওয়ার পর আবার যদি ঋতু দেখা যায়, তবে অবশ্যই নামায-রোযা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু স্রাব যদি চলমান থাকে-সামান্য সময় ব্যতীত কখনই বন্ধ না হয়, তবে তা ইস্তেহাযা বা অসুস্থতা বলে গণ্য হবে। তখন তার নির্দিষ্ট দিন সমূহ শুধু ছালাত-ছিয়াম থেকে বিরত থাকবে।

প্রশ্নঃ (১৭৭) ঋতু শুরু হওয়ার দু'দিন পূর্বে নারীর গর্ভ থেকে যে হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ নির্গত হয় তার বিধান কি ?

উত্তরঃ হলুদ রংয়ের এই তরল পদার্থ যদি ঋতুর সময় হওয়ার পূর্বে নির্গত হয়, তবে তা কিছু নয়। কেননা উম্মে আত্বীয়্যা (রাঃ) বলেন, (كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا) "আমরা হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে তা কোন কিছুই গণ্য করতাম না।"[1] (বুখারী) আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, উম্মে আত্বীয়্যা (রাঃ) বলেন, (كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا) "পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে আমরা তাকে কোন কিছুই গণ্য করতাম না।"[2] ঋতুর পূর্বের এই হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ যদি ঋতু বের হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তা কোন কিছু নয়। কিন্তু নারী যদি উহা ঋতুর সূচনা স্বরূপ মনে করে, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করবে এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

প্রশ্নঃ (১৭৮) পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হওয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ ঋতুর ক্ষেত্রে নারীদের সমস্যা সাগরতুল্য যার কোন কুল কিনারা নেই। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, গর্ভ বা মাসিক নিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা। পূর্বে মানুষ এত ধরণের সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিল না। সন্দেহ নেই সৃষ্টি লগ্ন থেকে নারীর নানান সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এর আধিক্য এত বেশী যে মানুষ তার সমাধানের ক্ষেত্রে হয়রান হয়ে যায়; যা দুঃখজনক বিষয়।

তবে মূলনীতি হচ্ছে, নারী যদি নিশ্চিতভাবে ঋতু থেকে পবিত্রতা দেখতে পায়, যেমন নারীদের কাছে পরিচিত সাদা পানি বের হওয়া, বা হলুদ বা মেটে রং বের হওয়া বা ভিজা পাওয়া এগুলো সবই হায়েয বা ঋতু নয়। এগুলো নামায বা ছিয়াম থেকে বাধা দিবে না। স্বামী সহবাসে বাধা থাকবে না। কেননা এটা হায়েয নয়। উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) বলেন, "পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হলে, আমরা তা কোন কিছুই গণ্য করতাম না।"[3] এর সনদ ছহীহ।

এই ভিত্তিতে, নিশ্চিতভাবে পবিত্র হওয়ার পর এ ধরণের যা কিছুই ঘটুক, তাতে নারীর কোন অসুবিধা নেই। ছালাত-ছিয়াম ও স্বামী সহবাসে কোন বাধা নেই। কিন্তু পবিত্রতা না

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ হায়েযের দিন ছাড়া অন্য সময় হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হওয়া। হা/৩২৬।

[2] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ পবিত্র হওয়ার পর নারী যদি হলুদ রং ও মেটে রংয়ের তরল পদার্থ বের হতে দেখে।

[3] . আবু দাউদ, ঐ

দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করবে না। কেননা কোন কোন নারী রক্ত বের হওয়াতে কিছুটা শুস্কতা দেখলেই পবিত্রতার চিহ্ন না দেখেই তাড়াহুড়া করে গোসল করে নেয়। এই জন্য মহিলা ছাহাবীগণ উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রাঃ) কে দেখানোর জন্য তুলা নিয়ে আসতেন যাতে পীত রংয়ের তরল পদার্থ লেগে থাকতো। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, "সাদা পানি নির্গত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করবে না।"[1]

প্রশ্নঃ (১৭৯) ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ (ট্যাবলেট) ব্যবহার করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ (ট্যাবলেট) ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে তাতে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে। কিন্তু এযাবত আমি যা জেনেছি তাতে এ সমস্ত ঔষধ নারীর জন্য ক্ষতিকারক। একথা সবার জানা যে, মাসিকের রক্ত প্রবাহিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর সময় মত স্বাভাবিক বিষয়ের গতিতে বাধা দিলে সেখানে অবশ্যই ক্ষতির আশংকা থাকে। নারীর শরীরে তার ক্ষতিকর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ইহা ব্যবহার করলে অনেক সময় নারীর স্বাভাবিক মাসিক বাধাগ্রস্থ হয় এবং সে পেরেশানী ও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়। নামায-রোযা ও স্বামীর সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখিন হয়। এ জন্য আমি বলিনা যে এটা হারাম। কিন্তু নারীর ক্ষতির দিক চিন্তা করে বলি, এটা ব্যবহার করা উচিত নয়। আমার মতে এ পদক্ষেপ পসন্দনীয় নয়। আরো বলি, আল্লাহ নারীর জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিদায় হজ্জে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি কাঁদছেন। তখন আয়েশা (রাঃ) ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।

﴿فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ﴾

"তিনি তাঁকে বললেন, "কি হয়েছে তোমার, কাঁদছো কেন ? আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ এ বছর আমি হজ্জ না করলেই ভাল হত। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তুমি ঋতুবতী হয়ে গেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা এমন এক বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের মেয়েদের জন্য লিখে দিয়েছেন।" (সুতরাং দুঃখ করার কিছু নেই।)[2] অতএব নারীর উচিত হচ্ছে, এ সময় ধৈর্য ধারণ করা। ঋতুর কারণে ছালাত-ছিয়াম করতে না পারলে তো আল্লাহর যিক্‌রের দরজা উম্মুক্ত রয়েছে। তাসবীহ-তাহলীল করবে, দান-সাদকা করবে, মানুষের

---

[1] . বুখারী মুআল্লাকভাবে বর্ণনা করেন। অধ্যায়ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদঃ মাসিক আগমণ ও নির্গমণ।

[2] . ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ ঋতু, অনুচ্ছেদঃ নারীদের ঋতু হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ইহরামের পদ্ধতি বর্ণনা করা।

সাথে সদাচরণ করবে, কথা-কাজে মানুষের উপকার করার চেষ্টা করবে, ইত্যাদি কাজ তো সুন্দর ও অত্যাধিক ফযীলতপূর্ণ আমল।

প্রশ্নঃ (১৮০) চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও নেফাসের স্রাব চলতে থাকলে কি করবে ?

উত্তরঃ কোন পরিবর্তন ছাড়াই যদি নেফাস বিশিষ্ট নারীর স্রাব চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও চলতে থাকে-যদি চল্লিশ দিনের পরের স্রাব ঋতুস্রাবের সময়ে হয়ে থাকে, তবে তা হায়েয বা ঋতু স্রাব হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু পূর্ববর্তী স্বাভাবিক ঋতু স্রাবের সময়ে না হয়, তবে সে সম্পর্কে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল বিদ্বান বলেন, চল্লিশ দিন পূর্ণ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ছালাত-ছিয়াম আদায় করবে। আর প্রবাহিত রক্ত ইস্তেহাযা বা অসুস্থতা গণ্য করবে।

আরেকদল বিদ্বান বলেন, সে অপেক্ষা করবে এবং ষাট দিন পূর্ণ করবে। কেননা ষাট দিন পর্যন্ত নেফাস হয়েছে, এমন অনেক নারীও পাওয়া গেছে। এটা বাস্তব বিষয়। কেননা প্রকৃত পক্ষে কোন কোন নারীর ষাট দিন পর্যন্তই নেফাস হয়েছে। অতএব এই ভিত্তিতে ষাট দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর স্বাভাবিক ঋতু স্রাবের দিকে ফিরে যাবে। আর সেই মাসিকের সময় অপেক্ষা করে পবিত্র হলে গোসল করে নামায-রোযা আদায় করবে। এরপরও যদি স্রাব চলতেই থাকে তখন উহা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করবে।[1]

প্রশ্নঃ (১৮১) নেফাসের চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার আগেই পবিত্র হয়ে গেলে বা চল্লিশ দিনের পর পূণরায় স্রাব দেখা গেলে কি করবে ?

উত্তরঃ নেফাস বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য জায়েয নয়। যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে সে পবিত্র হয়ে যায়, তবে গোসল করে নামায আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব এবং নামাযও বিশুদ্ধ। এ অবস্থায় স্বামী সহবাসও তার জন্য জায়েয। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿يسألونَكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

[1] . কিন্তু উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে নেফাস বিশিষ্টি নারীগণ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। [দ্রঃ ছহীহ তিরমিযী হা/১৩৯, ছহীহ আবু দাউদ হা/৩২৯, ছহীহ ইবনে মাজাহ্ হা/৬৪৮- আলবানী] অধিকাংশ বিদ্বান (সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মোবারক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ) এমতই পোষণ করেন যে, চল্লিশ দিনের পর স্রাব নির্গত হতে থাকলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। বরং গোসল করে নামায ইত্যাদি শুরু করবে। আর হাসান বাছরী বলেন, ৫০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর ৬০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা আত্বা ও শা'বী থেকে বর্ণিত আছে। (তিরমিযী- হা/১১৯)- অনুবাদক।

"আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।" (সূরা বাক্বারা- ২২২) যতক্ষণ অপবিত্রতা তথা রক্ত বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ স্বামীর সাথে সহবাস জায়েয হবে না। পবিত্র হয়ে গেলেই সহবাস জায়েয হবে। যেমনটি নামায আদায় করাও তার জন্য ওয়াজিব। চল্লিশ দিনের পূর্বে পবিত্র হলে, নেফাস অবস্থার যাবতীয় নিষিদ্ধতা শেষ হয়ে যাবে। তবে সহবাসের ক্ষেত্রে কিছুটা ধৈর্যাবলম্বন করা উচিত। কেননা সহবাসের ফলে পুনরায় রক্ত চালু হয়ে যেতে পারে।

চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর এবং পবিত্র হওয়ার পর যদি আবার রক্ত দেখা যায়, তবে উহা মাসিকের রক্ত হিসেবে গণ্য করবে। নেফাসের রক্ত নয়। মাসিকের রক্ত নারীদের কাছে পরিচিত। যখনই উহা অনুভব করবে মনে করবে উহা ঋতুস্রাব। এই রক্ত যদি প্রবাহমান থাকে এবং সামান্য সময় ব্যতীত কখনই বন্ধ না হয়, তবে উহা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। তখন ঋতুর নির্দিষ্ট দিন সমূহ অপেক্ষা করবে এবং অবশিষ্ট দিন সমূহ পবিত্র হিসেবে গণ্য করবে এবং গোসল করে নামায আদায় করবে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

অকাল গর্ভপাত হলে কি করবে ?

প্রশ্নঃ (১৮২) জনৈক নারীর তৃতীয় মাসেই গর্ভপাত হয়ে গেছে। সে কি নামায আদায় করবে, না নামায পরিত্যাগ করবে?

উত্তরঃ বিদ্বানদের নিকট পরিচিত কথা হচ্ছে, নারীর গর্ভ যদি তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পড়ে যায়, তবে সে নামায পড়বে না। কেননা নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণে মানুষের আকৃতি সৃষ্টি হয়ে গেছে। তখন তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সে নামায থেকে বিরত থাকবে।

বিদ্বানগণ বলেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বয়স ৮১ (একাশি) দিন অতিবাহিত হলে মানুষের আকৃতি ধারণ করে। এ সময়টি তো তিন মাসের অনেক কম। যদি নিশ্চিত হয় যে, তিন মাস বয়সের ভ্রূণ পতিত হয়ে গেছে, তবে নির্গত রক্ত নেফাসের রক্ত বলেই গণ্য হবে। কিন্তু এই গর্ভপাত যদি আশি দিনের কমে হয়, তবে নির্গত রক্ত নষ্ট রক্ত বলে গণ্য হবে। আর সে কারণে নামায প্রভৃতি পরিত্যাগ করবে না।

প্রশ্নকারী এই নারীর উপর আবশ্যক হচ্ছে, স্মরণ করার চেষ্টা করবে ৮০ দিনের কম বয়সে যদি গর্ভপাত হয়ে থাকে এবং সে জন্য নামায পরিত্যাগ করে থাকে, তবে পরিত্যাক্ত নামাযের কাযা আদায় করবে। নামায কত ওয়াক্ত ছুটেছে তা নিশ্চিতভাবে স্মরণ করতে না পারলে অনুমানের ভিত্তিতে কাযা আদায় করবে।

ইস্তেহাযা হলে নারী কি করবে ?

প্রশ্নঃ (১৮৩) অসুস্থতার কারণে যদি কোন নারীর রক্তস্রাব নির্গত হতেই থাকে, তবে কিভাবে সে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করবে ?

উত্তরঃ এই নারীর অসুখ শুরু হওয়ার পূর্বে তথা গত মাসে তার ঋতুর যে দিন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল, সেই নির্দিষ্ট দিন সমূহে সে নিজেকে ঋতুবতী হিসেবে গণ্য করে ছালাত-ছিয়াম প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বিগত মাসগুলোর প্রথম দিকে তার ছয়দিন ঋতু ছিল, তারপর এক সময় তার অসুখ শুরু হয়েছে, এক্ষেত্রে সে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিকে ছয় দিন অপেক্ষা করবে এবং ছালাত ছিয়াম থেকে বিরত থাকবে। এ দিন সমূহ শেষ হলেই গোসল করে ছালাত-ছিয়াম আদায় করবে।

*** এ নারী বা তার মত নারীদের নামাযের পদ্ধতি হচ্ছে,**

ক) ফরয নামাযের সময় হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গরূপে লজ্জাস্থান ধৌত করবে।

খ) তারপর সেখানে প্যাড বা পট্টি জাতীয় কোন কিছু বেঁধে দিবে,

গ) এরপর ওযু করবে এবং নামায আদায় করবে।

নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এরূপ ওযু ইত্যাদি কাজ করবে না। ফরয নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময় নফল নামায পড়তে চাইলেও এভাবে ওযু ইত্যাদি করবে।

এ অবস্থায় যেহেতু বারবার এতকাজ করা তার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই দু'নামাযকে একত্রিত জমা' করা জায়েয। যোহরের সাথে আছরের নামায আদায় করে নিবে বা আছরের সাথে যোহরের নামাযকে আদায় করবে। এবং মাগরিবের সাথে এশার নামায আদায় করবে অথবা এশার সময় মাগরিব ও এশার নামায আদায় করবে। যাতে করে তার একবারের পরিশ্রম দু'নামায যোহর ও আছরের জন্য যথেষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়বারের পরিশ্রম মাগরিব ও এশার জন্য যথেষ্ট হয়। আর একবার ফজর নামাযের জন্য। অর্থাৎ-পাঁচবার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য লজ্জাস্থান ধৌত করা, পট্টি বাঁধা, ওযু করা প্রভৃতি কষ্টকর বিষয়। তাই এর পরিবর্তে তিনবারেই একাজ আদায় হয়ে যাবে। কষ্টও অনেক লাঘব হবে। (আল্লাহই তাওফীক দাতা ও তিনিই অধিক জ্ঞাত আছেন)

❁❁❁

فتاوى الصلاة

অধ্যায়ঃ নামায

প্রশ্নঃ (১৮৪) ইসলামে নামাযের বিধান কি ? কার উপর নামায ফরয ?

উত্তরঃ নামায ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন; বরং এটা কালেমায়ে শাহাদাতের পর দ্বিতীয় রুকন। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা ইসলামের মূল খুঁটি। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ "ইসলামের মূল খুঁটি হচ্ছে, নামায।"[1] আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নামায ফরয করেন এমন উঁচু স্থানে যেখানে মানুষের পক্ষে পৌঁছা অসম্ভব। কোন মাধ্যম ছাড়াই রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি রাত মে'রাজের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সপ্তাকাশের উপর আরশে নিয়ে এই নামায ফরয করেন। প্রথমে রাত-দিনে নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি দয়া করে এর সংখ্যা কমিয়ে নির্ধারণ করেন পাঁচ ওয়াক্ত। আর প্রতিদান ঘোষণা করেন পঞ্চাশ ওয়াক্তের বরাবর। এ থেকে প্রমাণিত হয় নামায কত গুরুত্বপূর্ণ। নামাযকে আল্লাহ্ কত ভালাবসেন। সুতরাং মানুষের জীবনের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সময় এই ক্ষেত্রে ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরী। নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে দলীল হচ্ছে: কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের এজমা বা ঐকমত্য।

কুরআন থেকে দলীলঃ

আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন নামায প্রতিষ্ঠা কর; নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিসাঃ ১০৩)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আয বিন জাবাল (রা:) কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেনঃ (أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) "তুমি তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিদিন (দিনে-রাতে) তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।"[2]

নামায ফরয হওয়ার উপর সমস্ত মুসলমান ঐকমত্য হয়েছে। এ জন্য উলামাগণ (রহঃ) বলেন, কোন মানুষ যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়াকে

---

[1]. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ নামাযের সম্মান, ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ ফিতনা, অনুচ্ছেদঃ ফিতনার সময় যবান বন্ধ রাখা। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীছটি ছহীহ হাসান।

[2]. বুখারী, কিতাবু যাকাত, হা/ ১৩৯৫), মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

অস্বীকার করে, তবে সে কাফের মুরতাদ ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। তার রক্ত ও সম্পদ হালাল। কিন্তু যদি সে তওবা করে তার কথা ভিন্ন। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি যদি নতুন মুসলমান হয়-ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং অনুরূপ কথা বলে তবে তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে। তাকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। তারপরও যদি সে নামায ফরয হওয়ার বিষয়টিকে অমান্য করে তবে সেও কাফের বলে গণ্য হবে। **নিম্ন লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নামায ফরযঃ মুসলিম, বালেগ, আকেল, নারী বা পুরুষ।**

মুসলিমের বিপরীত হচ্ছে কাফের। কাফেরের উপর নামায ফরয নয়। অর্থাৎ-কাফের অবস্থায় তার জন্য নামায আদায় করা আবশ্যক নয়। ইসলাম গ্রহণ করলেও আগের নামায ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু এ কারণে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، عَنْ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ.﴾

"কিন্তু ডানদিকস্থরা,তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করেছে ? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। আর আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।" (সূরা মুদ্দাস্সির- ৩৯-৪৬) 'আমরা নামায পড়তাম না' কথা থেকে বুঝা যায়, তারা কাফের ও ক্বিয়ামত দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্বেও নামায পরিত্যাগ করার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

প্রাপ্ত বয়স্কঃ যার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কোন একটি চিহ্ন প্রকাশ পাবে তাকেই বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক বলা হবে। উক্ত চিহ্ন পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি আর নারীর ক্ষেত্রে চারটি।

(ক) পনর বছর পূর্ণ হওয়া। (খ) উত্তেজনার সাথে নিদ্রা বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া।(গ) নাভীমূল গজানো। অর্থাৎ-লজ্জাস্থানের আশে-পাশে শক্ত লোম দেখা দেয়া। এ তিনটি চিহ্ন নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রে প্রজোয্য। নারীর ক্ষেত্রে চতুর্থ চিহ্নটি হচ্ছে, হায়েয বা ঋতুস্রাব হওয়া। কেননা তা বালেগ হওয়ার আলামত।

আকেল বা বুদ্ধিমান হচ্ছে বিবেকহীন পাগলের বিপরীত শব্দ। কোন নারী বা পুরুষ যদি অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহীত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তবে সেও এ শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এ অবস্থায় বিবেকহীন হওয়ার কারণে তার উপর নামায ফরয হবে না। ঋতুস্রাব বা নেফাস হলে নামায ওয়াজিব নয়। কেননা নবী (ﷺ) বলেন, **أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ**

لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ "নারী কি এমন নয় যে, সে ঋতুবতী হলে নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না?"[1]

প্রশ্নঃ (১৮৫) বেহুঁশ এবং স্মৃতি শক্তিহীন ব্যক্তির জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা কি আবশ্যক ?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর আবশ্যক করেছেন যাবতীয় ইবাদত বাস্তবায়ন করা-যদি তার মধ্যে সে যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকে। যেমন সে বিবেক সম্পন্ন হবে। সবকিছু বুঝতে পারবে। কিন্তু যে লোক বিবেকশুণ্য, সে শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য নয়। এ কারণে পাগল, শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার উপর কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। এটা আল্লাহ্র বিশেষ রহমত। অনুরূপ হচ্ছে আধাপাগল-যার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে কিন্তু পুরোপুরি পাগল হয়নি এবং অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহীত জ্ঞানশুণ্য ব্যক্তির উপরও নামায-রোযা আবশ্যক নয়। কেননা সে তো স্মৃতি শক্তিহীন মানুষ। সে ঐ শিশুর মত যার মধ্যে ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং সমস্ত বিধি-বিধান তার উপর থেকে রহিত, কোন কিছুই তার উপর আবশ্যক নয়। তবে সম্পদের যাকাত সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা তার উপর বজায় থাকবে। কেননা যাকাতের সম্পর্ক সম্পদের সাথে। তখন ঐ ব্যক্তির অভিভাবক তার পক্ষ থেকে যাকাতের অংশ বের করে দিবেন। কেননা যাকাত ওয়াজিব হয় সম্পদের উপর। এজন্য আল্লাহ্ বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। উহা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" (সূরা তওবা-১০৩) এখানে আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পদ থেকে যাকাত নিতে বলেছেন, ব্যক্তি থেকে যাকাত নিতে বলেননি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আযকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তাকে বলেন,

(أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)

"তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের সম্পদে ছাদকা বা যাকাত ফরয করেছেন। তা ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"(বুখারী ও মুসলিম) এ হাদীছের ভিত্তিতে সম্পদের আবশ্যকতা স্মৃতিহীন লোকের উপর থেকে রহিত হবে না। কিন্তু শারীরিক ইবাদত যেমন ছালাত, রোযা, পবিত্রতা প্রভৃতি রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে বিবেকহীন। কিন্তু অসুস্থতা প্রভৃতির করণে বেহুঁশ হলে অধিকাংশ বিদ্যানের মতে তার উপর নামায আবশ্যক হবে না। এ রকম অসুস্থ ব্যক্তি যদি একদিন বা দু'দিন বেহুঁশ থাকে তবে তাকে নামায কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা বিবেকশুণ্য বেহুঁশ

---

[1] . ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ ঋুবতীর রোযা পরিত্যাগ করা। হা/ ৩০৪।

মানুষকে ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা চলবে না। যার সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)"যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে ভুলে যায় অথবা নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে যখনই স্মরণ হবে, তখনই সে তা আদায় করে নিবে।"[1] কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি হুঁশ সম্পন্ন এ অর্থে যে, তাকে জাগানো হলে জাগ্রত হবে। কিন্তু বেহুঁশকে জাগানো হলেও তার হুঁশ ফিরবে না। এ বিধান হচ্ছে ঐ অবস্থায়, যখন বেহুঁশী কোন কারণ ছাড়াই ঘটবে। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ হলে যেমন সংজ্ঞা লোপ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করে, তবে উক্ত বেহুঁশ অবস্থার নামায সমূহ তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

দীর্ঘকাল সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নামায-রোযা আদায় করতে না পরলে তার হুকুম

প্রশ্নঃ (১৮৬) জনৈক ব্যক্তি দু'মাস যাবত বেহুশ অবস্থায় ছিল। কোন কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে না নামায আদায় করেছে না রামাযানের রোযা পালন করেছে। এখন তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ সংজ্ঞাহীন হওয়ার কারণে তার উপর কোন কিছুই আবশ্যক নয়। আল্লাহ্ যদি তার জ্ঞান ফিরিয়ে দেন, তবে সে রামাযানের রোযা ক্বাযা আদায় করবে। কিন্তু আল্লাহ্ যদি তার মৃত্যুর ফায়সালা করেন, তবে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। তবে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর যদি সার্বক্ষণিক ওযর বিশিষ্ট হয়, যেমন অতি বয়স্ক প্রভৃতি, তবে ফরয হচ্ছেঃ তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। তবে নামায ক্বাযা আদায় করার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে দু'রকম মত পাওয়া যায়।

১) অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কেননা ইবনু ওমর (রাঃ) একদিন একরাত্রি বেহুঁশ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছুটে যাওয়া নামায ক্বাযা আদায় করেননি। (মালেক, হা/ ২৩)

২) তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে। এ মত পোষণ করেছেন পরবর্তী যুগের হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ। ইনছাফ গ্রন্থের লিখক বলেন, এটা মাযহাবের বিচ্ছিন্ন মতামত সমূহের অন্তর্গত। এ মতটি আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তিন দিন বেহুঁশ ছিলেন। তারপর ছুটে যাওয়া নামায ক্বাযা আদায় করেছেন। (মালেক, হা/ ২৩)

---

[1]. ছহীহ্ বুখারী অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামায ভুলে যায় স্মরণ হলেই যেন আদায় করে নেয়। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদঃ কাযা নামায আদায় করা।

নামাযের শর্ত পূর্ণ করতে গিয়ে সময় পার হয়ে গেলে

প্রশ্নঃ (১৮৭) নামাযের কোন একটি শর্ত (যেমন পানি সংগ্রহ) পূর্ণ করতে গিয়ে যদি নামাযের সময় পার হয়ে যায় তবে তার বিধান কি ?

উত্তরঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, কোনভাবেই নামাযের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করা বৈধ নয়। কোন লোক যদি সময় পার হয়ে যাওয়ার ভয় করে, তবে যে অবস্থাতেই থাকুক নামায আদায় করে নিবে। যদিও একটু পর উক্ত শর্ত পূর্ণ করা সম্ভব হয়। কেননা আল্লাহ্ বলেন, (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) "নিশ্চয় নিদিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা মুমিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসা- ১০৩) অনুরূপভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি নামাযের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং ঐ সময়ে আদায় করাটাই ওয়াজিব। কেননা শর্ত পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করা যদি বৈধ হত, তবে তায়াম্মুমের কোন প্রয়োজন ছিল না। সময় পার হওয়ার পর পানি সংগ্রহ করা সম্ভব। সুতরাং দীর্ঘ সময়ের জন্য ছালাতকে দেরী করা বা অল্প সময়ের জন্য দেরী করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থায় নামাযের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তাই যে অবস্থাতেই থাক না কেন সময়ের মধ্যেই (তায়াম্মুম করে হলেও) নামায আদায় করে নিবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া এমত পোষণ করেছেন।

প্রশ্নঃ (১৮৮) রাত জাগার কারণে সূর্য উঠার পর নামায আদায় করলে কবূল হবে কি ? অন্যান্য নামায সে সময়মতই আদায় করে। সেগুলোর বিধান কি ?

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে সময় পার করে সূর্য উঠার পর ফজরনামায আদায় করলে তা কবূল হবে না। কেননা রাত না জেগে আগেভাগে নিদ্রা গেলে সময়মত উক্ত নামায আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। সুতরাং বিনা ওযরে সময় অতিবাহিত করে নামায আদায় করলে উক্ত নামায কবূল হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

"যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার পক্ষে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তবে উহা প্রত্যাখ্যাত।"[1] আর যে ব্যক্তি বিনা ওযরে সময় অতিবাহিত করে নামায আদায় করে, সে তো এমন আমল করল, যার অনুমতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল দেননি। সুতরাং উহা প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু সে বলতে পারে আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)

[1] . মুসলিম, কিতাবুল আকযিয়া।

"যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে ভুলে যায় অথবা নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তার কাফ্ফারা হচ্ছে যখনই স্মরণ হবে তখনই সে উহা আদায় করে নিবে।" [1]

আমরা তাকে বলব, যখন তার জন্য সম্ভব ছিল যে, সময় মত ঘুম থেকে জাগার জন্য আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়বে বা এলার্ম ঘড়ি প্রস্তুত করবে বা কাউকে অনুরোধ করবে তাকে জাগিয়ে দেয়ার জন্য। তখন এগুলো না করে সময় অতিবাহিত করে ঘুমের ওজুহাত খাড়া করা, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করারই অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে। সুতরাং পরবর্তীতে আদায় করলে উহা কবূল হবে না। আর অন্যান্য নামায সময়মত আদায় করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

এ উপলক্ষ্যে আমি কিছু নসীহত করতে চাইঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে, এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, যেভাবে করলে তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। এ দুনিয়ায় তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল মাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। কেউ জানেনা কখন তার মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠবে। তাকে পাড়ি জমাতে হবে পরপারের জগতে। যেখানে হিসাব-নিকাশের সম্মুখিন হবে। তখন আমলই হবে একমাত্র তার সহযোগী। মৃত্যুর পর আমল করার আর কোন অবকাশ থাকবে না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

"যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। ছাদকায়ে জারিয়া, উপকারী বিদ্যা, সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।"[2]

বিলম্ব করে ফজরের নামায আদায় করার বিধান

প্রশ্নঃ (১৮৯) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযবিলম্ব করে আদায় করে, এমনকি তার সময় পার হয়ে যায়। তার বিধান কি ?

উত্তরঃ যারা ফজর নামায বিলম্ব করে আদায় করে এমনকি তার সময় পার হয়ে যায়- যদি বিশ্বাস করে যে, এরূপ করা বৈধ, তবে তা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী হল। কেননা বিনা কারণে নামাযের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করা হালাল বা জায়েয, যে ব্যক্তি একথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে সে কাফের। এই কারণে যে, সে কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের ইজমার বিরোধীতা করেছে। কিন্তু যদি তা হালাল না ভেবে বিশ্বাস করে যে, দেরী করে নামায আদায় করলে গোনাহ্গার হতে হবে। তারপরও প্রবৃত্তির তাড়নায় বা ঘুমের কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সময় পার করে দেয়। তবে সে সাধারণ পাপী বলে গণ্য হবে। তাকে

---

[1]. ছহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাওয়াক্বীত, মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ।
[2]. মুসলিম, কিতাবুল অছিয়্যাহ্।

আল্লাহ্র কাছে তওবা করতে হবে। অন্যায় থেকে বিরত হতে হবে। বড় বড় কাফেরের জন্যও তওবার দরজা উন্মুক্ত। আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, অতিব দয়ালু।" (সূরা যুমার- ৫৩) এদের ব্যাপারে যারা জানবে তারা তাদেরকে নসীহত করবে, তাদেরকে কল্যাণের নির্দেশ দিবে। যদি তারা তওবা না করে, তবে তাদের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে হবে। যাতে করে তারা যিম্মামুক্ত হতে পারে। আর কর্তৃপক্ষও তাদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকে সংশোধন করতে পারে।

বেনামাযী যুবকের সাথে মেয়ের বিবাহ্ দেয়া

প্রশ্নঃ (১৯০) জনৈক যুবক এক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ্ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, সে নামায আদায় করে না। কিন্তু বলা হচ্ছে, 'ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত করবেন।' এই যুবকের সাথে মেয়ে বিবাহ্ দেয়া কি বৈধ ?

উত্তরঃ বিবাহের প্রস্তাবকারী যদি জামাআতের সাথে ছালাত আদায় না করে, তবে সে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফারমান-গোনাহ্গার। মুসলমানদের ইজমার বিরোধীতাকারী। কেননা জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করা সর্বোত্তম ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত, এ ব্যাপারে মুসলমানগণ ঐকমত্য হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) (মাজমু' ফাতাওয়া ২৩/ ২২২ গ্রন্থে) বলেন, 'আলেমগণ একথার উপর ঐকমত্য হয়েছেন যে, জামাআতের সাথে নামায আদায় করা অতিব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, শ্রেষ্ঠ আনুগত্য ও ইসলামের অন্যতম বড় নিদর্শন।'

কিন্তু তার এই ফাসেক্বী তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না। এর সাথে মুসলিম মেয়ের বিবাহ্ দেয়া জায়েয। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত সচ্চরিত্রবান যুবকের সাথে বিবাহ্ দেয়াই উত্তম। যদিও সে অর্থ-সম্পদ ও বংশ-মর্যাদায় উন্নত না হয়। কেননা হাদীছে এসেছেঃ "তোমাদের কাছে যদি এমন ব্যক্তি (বিবাহের প্রস্তাব দেয়) যার ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থা সন্তোষ জনক, তবে তার সাথে বিবাহ্ দাও। যদি এরূপ না কর তবে পৃথিবীতে ফিৎনা হবে এবং বিরাট ফাসাদ হবে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি এরূপ লোক না পাওয়া যায় ? তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তি আসে (বিবাহের প্রস্তাব দেয়) যার ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থা সন্তোষ

জনক তবে তার সাথে বিবাহ দাও।" কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।[1] ছহীহ্ বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)

"চারটি গুণাগুণ দেখে কোন নারীকে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্ম। ধর্মভীরু নারীকে বিবাহ করে তুমি বিজয়ী হও। তোমার দু'হাত ধুলোলুণ্ঠিত হোক।"[2] এ দু'টি হাদীছ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে বিষয়টির গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক,তা হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে-ধর্মভীরুতা ও সচ্চরিত্রবান হওয়া। আর আল্লাহ্‌ভীরু ও দায়িত্ব সচেতন অভিভাবকের জন্য আবশ্যক হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। কেননা ক্বিয়ামত দিবসে এ বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ﴾

"আর সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণের আহবানে কি সাড়া দিয়েছিলে?" (সূরা ক্বাছাছ- ৬৫) তিনি আরো বলেন,

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾

"অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রাসূল প্রেরীত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। তাদের উপর সব কিছুর বিজ্ঞচিতভাবে বর্ণনা প্রদান করব। আর আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। " (সূরা আ'রাফ- ৬-৭)

আর যদি বিবাহের প্রস্তাবক এমন ব্যক্তি হয়, যে না জামাআতের সাথে নামায আদায় করে না একাকী নামায আদায় করে। অর্থাৎ- মোটেও নামায আদায় করে না। তবে সে কাফের ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। তার তওবা করা জরুরী। যদি খালেছভাবে তওবা নাসূহা করে নামায আদায় শুরু করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তওবা না করলে তাকে কাফের ও মুরতাদ অবস্থায় হত্যা করতে হবে। গোসল না দিয়ে, কাফন না পরিয়ে, জানাযা না পড়িয়ে, দাফন করতে হবে। মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলীল নিম্নে প্রদত্ব হলোঃ
কুরআনের দলীলঃ আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾

---

[1]. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ বিবাহ, হা/ ১০৮৫। ইবনু মাজাহ্, কিতাবুন্নিকাহ্ হা/ ১৯৬৭।
[2]. ছহীহ্ বুখারী, কিতাবুন্নিকাহ্ হা/ ৪৭০০। ছহীহ্ মুসলিম, কিতাবুর রযা' হা/ ২৬৬১।

"অতঃপর এদের পর এল অপদার্থ লোকেরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে।" (সূরা মারইয়াম-৫৯-৬০) এখানে 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে।' একথা দ্বারা বুঝা যায়, নামায বিনষ্ট ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার সময় তারা ঈমানদার ছিল না। আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

"যদি তারা তওবা করে ও নামায আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" (সূরা- তওবা-১১) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, ছালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান না করলে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যাকাত পরিত্যাগকারী যদি তার আবশ্যকতা স্বীকার করে, কিন্তু কৃপণতার কারণে তা আদায় না করে, তবে সে কাফের হবে না। অতএব নামায প্রতিষ্ঠা করা ঈমানী ভ্রাতৃত্বের শর্ত হিসেবে অবশিষ্ট রইল। তাই এর দাবী হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা কুফরী। এই কারণে বেনামাযীর সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। বেনামাযী ফাসেক নয় বা ছোট কাফের নয়। কেননা ফাসেক্বী এবং ছোট কুফরী ঈমানী ভ্রাতৃত্ব থেকে বের করে দেয় না। যেমনটি মু'মিনদের পরস্পর দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে, তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মাঝে সংশোধন কর।" (সূরা হুজুরাত-১০) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত দু'টি দল ঈমানের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়নি। অথচ মু'মিনের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরীর অন্তর্ভূক্ত। যেমনটি ছহীহ্ বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) "কোন মুসলিমকে গালিগালাজ করা ফাসেক্বী, আর তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরী।"[1]

হাদীছের দলীলঃ নামায পরিত্যাগকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে সুন্নাহ্ থেকে দলীল সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (بَيْنَ الرَّجُلِ والْكُفْرِ والشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) "মুসলিম বান্দা এবং কাফের ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হল নামায পরিত্যাগ করা।"[2] বুরায়দা বিন হুছাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী (ছাল্লাল্লাহু

[1]. ছহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান হা/৪৬। মুসলিম কিতাবুল ঈমান হা/ ৯৭।
[2]. ছহীহ্ মুসলিম, কিতবুল ঈমান হা/১১৬।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,(الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) "তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে ছালাতের, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।"[1]

উবাদাহ্ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বাইআত করেছেন এই মর্মে যে, ''তারা শাসকের সাথে বিরোধীতায় লিপ্ত হবেন না। যতক্ষণ না তারা তাদের থেকে সুস্পষ্ট কুফরী অবলোকন করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে।"[2] অর্থাৎ- শাসকদেরকে আল্লাহ্ যে দায়িত্ব দিয়েছেন, লোকেরা সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সুপ্রমাণিত কোন কুফরী দেখতে পায়। আপনি যখন এটা বুঝলেন তখন এই হাদীছটি দেখুন সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا)

"অচিরেই তোমাদের মাঝে এমন কিছু আমীর বা শাসকের আগমণ ঘটবে, যাদের মধ্যে ভাল বিষয় লক্ষ্য করবে খারাপ বিষয়ও লক্ষ্য করবে। যে ব্যক্তি মন্দ বিষয়গুলো চিনলো (অন্য বর্ণনায়, অপসন্দ করল) সে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সেগুলোর প্রতিবাদ করল সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে সন্তুষ্ট হয় ও তাদের অনুসরণ করে। তাঁরা বললেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না ? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে।"[3] এ হাদীছ থেকে জানা গেল, তারা যদি নামায আদায় না করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। পূর্বে ঊবাদার হাদীছটিতে বলা হয়েছে কোন ক্রমেই শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপ্রমাণিত কোন কুফরী ছাড়া তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না। সুতরাং এ দু'টি হাদীছ দ্বারা জানা গেল, নামায পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপ্রমাণিত সুস্পষ্ট কুফরী।

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দলীল-প্রমাণ। নামায পরিত্যাগকারী কাফের। মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। যেমনটি অন্যান্য সুস্পষ্ট বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইবনু আবী হাতেম সুনান গ্রন্থে ঊবাদা বিন

---

[1] . আহমাদ, তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান হা/২৫৪৫। নাসাঈ, কিতাবুছ ছালাত হা/৪৫৯। ইবনু মাজাহ্, কিতাবুছ ছালাত ওয়াস সুন্নাহ্ ফীহা হা/ ১০৬৯।

[2] . বুখারী, কিতাবুল ফিতান। মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্।

[3] . ছহীহ্ মুসলিম। কিতাবুল ইমারাহ্ হা/ ৩৪৪৫, ৩৪৪৬।

ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নসীহত করেছেনঃ

﴿لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عامداً متعمداً خرج من الملة﴾

"তোমরা কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায পরিত্যাগ করবে সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।"[1] এব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তি সমূহ নিম্নরূপঃ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (لا إسلام لمن ترك الصلاة) "যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে, ইসলামে তার কোন অংশ নেই।" [2] আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছাহাবীগণ নামায ব্যতীত কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে কাউকে কাফের মনে করতেন না।"[3]

উল্লেখিত শ্রুতিগত উক্ত দলীল সমূহ ছাড়া সাধারণ যুক্তিও প্রমাণ করে যে, নামায পরিত্যাগকারী কাফের। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'নামাযে অলসতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই তাকে অবজ্ঞাকারী। সুতরাং সে ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন এবং অবজ্ঞাকারী। ছালাতে যাদের যতটুকু অংশ রয়েছে ইসলামে তাদের ততটুকু অংশ রয়েছে। ছালাতের প্রতি যার যতটুকু আগ্রহ রয়েছে ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ ততটুকু আছে।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) (কিতাবুছ ছালাত পৃ: ৪০০) বলেন, হাদীছের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয়ঃ "যে লোক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, তা ফরয করেছেন, সে কখনই নামায পরিত্যাগ করবে না। সে কখনই ধারাবাহিকভাবে সমস্ত নামায থেকে বিরত থাকবে না। কারণ সাধারণ বিবেক ও যুক্তিতে একথা কখনই সম্ভব নয় যে, একজন লোক অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, এর পরিত্যাগকারীকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন; অথচ তারপরও সে তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং সার্বক্ষণিক এ নামাযকে পরিত্যাগ করে চলবে। এটা নিঃসন্দেহে অবাস্তব কথা। সুতরাং নামাযের ফরযকে সত্যায়নকারী কখনই উহা পরিত্যাগ করে সন্তুষ্ট চিত্তে বসে থাকতে পারে না। ঈমানের দাবী হচ্ছে নামায আদায় করা। তার হৃদয় যদি তাকে নামাযের নির্দেশ না দেয়, তবে তার অন্তরে যে ঈমানের লেশ মাত্র নেই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তর

[1]. হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/২১৬। হাকেমও অনুরূপ বর্ণনা করেন, মুস্তাদরাক, ৪/৪৪।
[2]. ইবনু আবী শায়বা, কিতাবুল ঈমান ৩৪।
[3]. তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান। হাকেম।

সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও তার আমল সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই তাদের কথায় কান দিবেন না।" ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম সত্য বলেছেন। যে নামাযে রয়েছে অশেষ, অফুরন্ত ও অসংখ্য ছাওয়াব। তা আদায় করাও অতি সহজ সাধ্য। নামায পরিত্যাগ করাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান রয়েছে সে কখনও উক্ত নামায পরিত্যাগ করতে পারে না। এটা অসম্ভব ব্যাপার।

যখন কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলীলাদী দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত মুরতাদ-তখন তার সাথে কোন মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পাদন করা বৈধ নয়। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

"আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্যই মুসলিম ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও তাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে।" (সূরা বাক্বারা-২২১) আর আল্লাহ্ মুহাজির নারীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যও হালাল নয়।" (সূরা মুমতাহিনা-১০) এই দু'টি আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম নারীর সাথে কাফেরের বিবাহ বৈধ নয়। অতএব কোন অভিভাবক যদি নিজ মেয়ে বা অধিনস্থ কোন মেয়ের বিবাহ বেনামাযী ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করে, তবে সে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। এই বিবাহের মাধ্যমে উক্ত নারী তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা এটা এমন সম্পর্ক যাতে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ নেই। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আয়েশা (রাঃ) এর বরাতে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন,(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)"যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম) অতএব স্বামী যদি নামায পরিত্যাগ করার পর তওবা করে নামায আদায়ের মাধ্যমে ইসলামে ফিরে না আসে, তবে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই বেনামাযী বিবাহের প্রস্তাবদানকারীর সাথে বিবাহের আক্বদ করার কোন প্রশ্নই আসে না।

সারকথা, বিবাহের প্রস্তাবকারী এই ব্যক্তি যদি জামাতের সাথে নামায আদায় না করে, তবে সে ফাসেক্ব-কাফের নয়। এর সাথে বিবাহ দেয়া যায়। তবে তাকে বাদ দিয়ে নামাযে পাবন্দ চরিত্রবান যুবকের সাথে বিবাহ দেয়া বেশী উত্তম। কিন্তু যদি সে মোটেও নামায আদায় না করে-না জামাতের সাথে না একাকী-তবে কাফের, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত মুরতাদ। কোনভাবেই তার সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয

নয়। তবে যদি সে সত্যিকারভাবে তওবা করে নামায আদায় করে ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন যে, প্রস্তাবকারীর ব্যাপারে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বলেছে 'ঠিক হয়ে যাবে-আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত করবেন।' এটা তো ভবিষ্যতের কথা। সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাই ভাল জানেন। অজানা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে কোন কিছু ভিত্তি করা চলে না। কেননা আমরা শুধু বর্তমান অবস্থার উপর জিজ্ঞাসিত হব; ভবিষ্যতের উপর নয়। আর এ ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা হচ্ছে কুফরী। সুতরাং এই কুফরী অবস্থায় কি করে তার সাথে মুসলিম রমণীর বিবাহ সম্পন্ন করা যায় ? আমরা আল্লাহর কাছে তার হেদায়াত এবং ইসলামে ফিরে আসার জন্য দু'আ করি। যাতে করে তার সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়। আল্লাহই হেদায়াতের মালিক।

পরিবারের বেনামাযী লোকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার হুকুম

প্রশ্নঃ (১৯১) জনৈক ব্যক্তি পরিবারের লোকদের নামাযের আদেশ করছেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনে না। এ অবস্থায় তিনি কি করবেন ? তিনি কি তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করবেন, নাকি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবেন ?

উত্তরঃ পরিবারের লোকেরা যদি একেবারেই নামায আদায় না করে, তবে তারা কাফের ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদে পরিণত হবে। তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করা জায়েয নয়। কিন্তু তার উপর আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়া। বারবার অনুরোধ করবেন। হতে পারে আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়াত করবেন। কেননা নামায পরিত্যাগকারী কাফের-নাউযুবিল্লাহ্। কুরআন, সুন্নাহ্, ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এর দলীল।

যারা বেনামাযীকে কাফের বলার পক্ষপাতী নয়, তাদের দলীলগুলো চারটি অবস্থার বাইরে নয়। যথাঃ

ক) মূলতঃ উক্ত দলীল সমূহে তাদের মতের পক্ষে দলীল নেই।

খ) সেগুলা এমন গুণ সম্পন্ন যে তা বিদ্যমান থাকাবস্থায়, নামায পরিত্যাগের বিষয়টি তার অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়।

গ) অথবা এমন কিছু ওযর ও অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে, যে কারণে নামায পরিত্যাগ করা মার্জনীয়।

ঘ) অথবা উক্ত দলীল সমূহ আম বা ব্যাপক। নামায পরিত্যাগকারী কাফের হওয়ার হাদীছগুলো দ্বারা তা খাছ বা বিশিষ্ট করা হয়েছে।

বেনামাযী মু'মিন বা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বা সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে কুরআন-সুন্নাহ্র উক্তি সমূহে এ রকম কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং ' নামায পরিত্যাগ করা

কুফরী' এ ব্যাপারে যে দলীল সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে, তা নেয়া'মতের কুফরী বা ছোট কুফরী এ রকম ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই।

যখন সুস্পষ্ট হলো, নামায পরিত্যাগকারী কাফের মুরতাদ, তখন তার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিধান সমূহ প্রজোয্য হবেঃ

প্রথমতঃ মুসলিম নারীর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করা বৈধ হবে না। বিবাহের চুক্তি হয়ে গেলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না। কেননা আল্লাহ্ মুহাজির নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্য হালাল নয়।" (সূরা মুমতাহিনাঃ ১০)

দ্বিতীয়তঃ বিবাহের বন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর যদি ছালাত পরিত্যাগ শুরু করে তবে উক্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে-স্ত্রী ব্যবহার তার জন্য হালাল হবে না। পূর্বোল্লিখিত আয়াত এর দলীল।

তৃতীয়তঃ বেনামাযীর যবেহ্ করা প্রাণীর গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে না। কেননা এটা হারাম। ইহুদী বা খৃষ্টানের যবেহ্ করা প্রাণীর গোস্ত খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ। কেননা আল্লাহ্ তা আমাদের জন্য হালাল করেছেন। (দেখুন সূরা মায়েদা-৫ নং আয়াত) অতএব বেনামাযীর যবেহ করা গোস্ত ইহুদী খৃষ্টানের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট।

চতুর্থতঃ বেনামাযীর জন্য বৈধ নয় মক্কা বা তার হারাম সীমানায় প্রবেশ করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকগণ তো নাপাক। সুতরাং তারা যেন এই বছরের পর আর মসজিদে হারামে প্রবেশ না ক রে।" (সূরা তওবাঃ ২৮)

পঞ্চমতঃ বেনামাযীর কোন নিকটাত্মীয় মারা গেলে সে তাদের মীরাছ লাভ করবে না। যেমন কোন নামাযী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল, রেখে গেল একজন ছেলে এবং এক চাচাতো ভাই; কিন্তু ছেলে বেনামাযী আর চাচাতো ভাই নামাযী। এ অবস্থায় দূরের সেই চাচাতো ভাই মীরাছ পাবে ছেলে পাবে না। কেননা উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: (لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ)

"কোন মুসলিম কাফেরের মীরাছ লাভ করতে পারবে না। কোন কাফেরও কোন মুসলিমের মীরাছ লাভ করতে পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেন: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) "ফারায়েয তথা মীরাছ সমূহ তার অধিকারীদের মাঝে বন্টন করে দাও। কিছু অবশিষ্ট থাকলে মৃত ব্যক্তির নিকটতম

পুরুষের জন্য নির্ধারিত হবে।” (বুখারী ও মুসলিম) এই উদাহরণ প্রজোয্য হবে সমস্ত ওয়ারীসদের ক্ষেত্রে।

ষষ্ঠতঃ বেনামাযী মৃত্যু বরণ করলে-তাকে গোসল দেয়া যাবে না, কাফন পরানো যাবে না, জানাযা নামায পড়া যাবেনা, মুসলমানদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তাকে কি করতে হবে? মাঠে-ময়দানে গর্ত খনন করে পরিহিত কাপড়েই পুঁতে ফেলতে হবে। কেননা তার কোনই মর্যাদা নেই। এভিত্তিতে কোন লোক যদি মৃত্যু বরণ করে, আর তার সম্পর্কে জানা যায় যে সে বেনামাযী, তবে জানাযা পড়ার জন্য লাশকে মুসলমানদের সামনে উপস্থিত করা বৈধ হবে না।

সপ্তমতঃ ক্বিয়ামত দিবসে বেনামাযীর হাশর-নশর হবে ফেরাউন, হামান, ক্বারূন ও উবাই বিন খালাফের সাথে। এরা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাফের। তারা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাই বেনামাযীর পরিবারের পক্ষ থেকে তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করাও জায়েয নয়। কেননা কাফের কোন দু'আ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

“নবী ও ঈমানদারদের জন্য সমিচীন নয় যে তারা কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয় না কেন। যখন প্রমাণিত হল যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।” (সূরা তওবাঃ ১১৩)

সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ানক। কিন্তু আফসোস! মানুষ বর্তমানে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। নিজেদের গৃহে এমন লোকদের স্থান দিচ্ছে, যারা ছালাত আদায় করে না। অথচ এটা মোটেও ঠিক নয়। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

বেনামাযী স্বামীর সাথে নামাযী স্ত্রীর বসবাস করার হুকুম

প্রশ্নঃ (১৯২) বেনামাযী স্বামীর সাথে মুসলিম নামাযী স্ত্রীর বসবাস করার বিধান কি ? তাদের কয়েকজন সন্তানও আছে। বেনামাযীর সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ কোন নারী যদি এমন লোককে বিবাহ করে, যে নামায আদায় করে না, জামাআতের সাথেও না বাড়ীতে একাকিও না। তার বিবাহ বিশুদ্ধ নয়। কেননা নামায পরিত্যাগকারী কাফের। যেমনটি আল্লাহর সম্মানিত কিতাব, পবিত্র সুন্নাত ও ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি সমূহ এ কথাটি প্রমাণ করে। আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব বলেন,

(كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ)

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছাহাবীগণ নামায ব্যতীত কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে কাউকে কাফের মনে করতেন না।"[1] কাফেরের জন্য কোন মুসলিম নারী বৈধ নয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্য হালাল নয়।" (সূরা মুমতাহিনাঃ ১০)

বিবাহের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি স্বামী নামায পরিত্যাগ করা শুরু করে তবে তওবা করে ইসলামে ফিরে না আসলে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, বিবাহ ভঙ্গের বিষয়টি ঈদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত। যদি ঈদ্দত পার হয়ে যায় তারপর সে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে তবে নতুন চুক্তি করে আবার উক্ত স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। উক্ত মহিলার জন্য আবশ্যক হচ্ছে বেনামাযী স্বামী থেকে আলাদা থাকবে। তাকে মেলামেশা করতে দিবে না-যতক্ষণ না সে তওবা করে ছালাত আদায় করে। যদিও তাদের সন্তান থাকে। কেননা এ অবস্থায় পিতার কোন অধিকার নেই সন্তানদের প্রতিপালনের।

এ উপলক্ষে আমি মুসলিম ভাইদেরকে সতর্ক করছি ও নসীহত করছি, তারা যেন কোন বেনামাযীর সাথে তাদের মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন না করেন। কেননা বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ানক। এক্ষেত্রে তারা যেন নিকটাত্মীয় বা বন্ধুর সাথে কোন আপোষ না করেন। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত আছেন)

প্রশ্নঃ (১৯৩) তওবা করার পর কি ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা আদায় করতে হবে ?

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করার পর তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসলে ছেড়ে দেয়া নামায সমূহ কাযা আদায় করতে হবে কিনা এব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। এক্ষেত্রে দু'টি মত পাওয়া যায়।

আমার কাছে প্রাধান্যযোগ মতটি হচ্ছে যা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া পছন্দ করেছেন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করে এমনকি সময় পার করে দেয়, তার কাযা আদায় করাতে কোন ফায়দা নেই। কেননা নির্দিষ্ট সময়ের ইবাদত অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত সময়েই আদায় করতে হবে। সময়ের আগে আদায় করলে যেমন হবে না, অনুরূপ সময় পার হওয়ার পর আদায় করলেও তা বিশুদ্ধ হবেনা। আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ হেফাযত করা অত্যন্ত জরূরী। শরীয়ত প্রণেতা আমাদের উপর নামায ফরয করে তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন-এই সময় থেকে এই সময়ের মধ্যে নামায

[1]. তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান। হাকেম।

আদায় করতে হবে। অতএব যে স্থানকে নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি সেখানে যেমন নামায বিশুদ্ধ হবে না। তেমনি যে সময়কে নামাযের সময় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি, সে সময়ে নামায আদায় করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না।

অবশ্য যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করেছে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে বেশী বেশী তওবা ইস্তেগফার করা এবং বেশী বেশী নফল ইবাদত ও নেক কাজে লিপ্ত হওয়া। আশা করা যায় এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন ও পরিত্যাক্ত নামায সমূহকে ক্ষমা করবেন। (আল্লাহ্ই তাওফীক্ব দাতা)

প্রশ্নঃ (১৯৪) বেনামাযী সন্তানদের ব্যাপারে পরিবারের কর্তার কর্তব্য কি ?

উত্তরঃ পরিবারের কোন সন্তান যদি বেনামাযী হয়, তবে কর্তার উপর আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে নামাযের ব্যাপারে বাধ্য করা। তিনি তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিবেন, বুঝাবেন, প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করবেন। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ) "দশ বছর বয়সে নামায আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে।" [1] এতে যদি কাজ না হয়, তবে (ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিযুক্ত) দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে তাকে সোপর্দ করবেন। যাতে করে তাকে নামায আদায় করতে বাধ্য করা হয়। এক্ষেত্রে চুপ থাকা জায়েয হবে না। কেননা এতে অন্যায় কাজে সমর্থন হয়ে যায়। নামায পরিত্যাগ করা কুফরী। ছালাত আদায় না করলে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। বেনামাযী কাফের চিরকাল জাহান্নামী। তাই সে মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, জানাযা পড়া বা মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। (আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা কামনা করি)

প্রশ্নঃ (১৯৫) সফর অবস্থায় আযান দেয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। সঠিক কথা হচ্ছে সফর অবস্থায় আযান দেয়া ওয়াজিব। দলীলঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মালেক বিন হুওয়াইরিছ ও তার সফর সঙ্গীদের বলেছিলেনঃ (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) "নামাযের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের মধ্যে যেন একজন আযান দেয়।"[2] এরা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ইসলামের তা'লীম নিতে এসেছিলেন। ফেরত যাওয়ার সময় নবীজী তাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর বা গৃহে যেখানেই থাকতেন কখনই আযান বা ইক্বামত পরিত্যাগ করেননি। সফরে থাকাবস্থায় তিনি বেলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

---

[1]. আহমাদ ২/১৮৭। আবু দাউদ, কিতাবুছ্ ছালাত (৪৯৫, ৪৯৬)ছহী হুল জামে' (হা/৫৮৬৮)

[2]. ছহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান। ছহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ।

প্রশ্নঃ (১৯৬) একক ব্যক্তির জন্য আযান ও ইক্বামতের বিধান কি ?

উত্তরঃ একক ব্যক্তির জন্য আযান ও ইক্বামত সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। কেননা তার আশে-পাশে এমন লোক নেই যাদেরকে আযান দিয়ে ডাকা দরকার। যেহেতু আযানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র যিকর ও তাঁর সম্মানের কথা উল্লেখ আছে এবং নিজেকে নামায ও মুক্তির দিকে আহ্বান করা হয়েছে, অনুরূপভাবে ইক্বামতেও, তাই আযান ও ইক্বামত উভয়টি সুন্নাত। আযান মুস্তাহাব বা সুন্নাত হওয়ার দীলল হচ্ছে, উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ)

"তোমার পালনকর্তা আশ্চার্যান্বিত হন এমন ছাগলের রাখালের কাজে। পাহাড়ের চুঁড়া থেকে নামাযের জন্য আযান দেয়। আল্লাহ্‌ বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখ! নামাযের জন্য সে আযান ও ইক্বামত দিচ্ছে। সে আমাকে ভয় করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম ও জান্নাতে প্রবেশ করালাম।"[1]

দু'নামায একত্রিত আদায় করলে আলাদা আলাদা ইক্বামত দিতে হবে

প্রশ্নঃ (১৯৭) কোন ব্যক্তি যদি যোহর ও আছর নামায একত্রিত আদায় করে, তবে কি প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদাভাবে ইক্বামত দিবে ? নফল নামাযের জন্য ইক্বামত আছে কি ?

উত্তরঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদাভাবে ইক্বামত দিতে হবে। জাবের (রাঃ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিদায় হজ্জের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি মুযদালিফায় (মাগরিব এশা) দু'নামাযকে একত্রিত করেছেন। ইক্বামত দিয়ে প্রথমে মাগরিব নামায আদায় করেন। তারপর ইক্বামত দিয়ে এশা নামায আদায় করেন। উভয় ছালাতের মাঝে কোন সুন্নাত আদায় করেননি।[2] নফল নামাযের জন্য কোন ইক্বামত নেই।

প্রশ্নঃ (১৯৮) (الصلاة خير من النوم) "আছ্‌ছালাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম" কথাটি কি ফজরের প্রথম আযানে বলতে হবে না দ্বিতীয় আযানে ?

উত্তরঃ (الصلاة خير من النوم) "আছ্‌ছালাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম" কথাটি ফজরের প্রথম আযানে বলতে হবে। যেমনটি হাদীছে এসেছেঃ "সকালের প্রথম আযান প্রদান করলে

---

[1]. আহমাদ হা/১৬৬৭৪, ১৬৮০১। আবূ দাঊদ কিতাবুছ ছালাত হা/১০১৭। নাসাঈ, কিতাবুল আযান হা/৬৬০।

[2]. ছহীহ্‌ বুখারী, কিতাবুল হজ্জ। মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ।

বলবে, (الصلاة خير من النوم) "আছ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম" ঘুম থেকে নামায উত্তম। এটা প্রথম আযানে দ্বিতীয় আযানে নয়।

কিন্তু জানা দরকার এ হাদীছে প্রথম আযান বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এটা হচ্ছে সেই আযান যা নামাযের সময় হওয়ার পর প্রদান করা হয়। আর দ্বিতীয় আযান হচ্ছেঃ ইক্বামত। কেননা ইক্বামতকেও 'আযান' বলা হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) "প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে।"[1] এখানে দু'আযান বলতে 'আযান ও ইক্বামত' উদ্দেশ্য। ছহীহ্ বুখারীতে বলা হয়েছেঃ আমীরুল মু'মেনীন উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) জুমআর জন্য তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। অতএব, বেলালকে প্রথম আযানে যে "আছ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম" বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফজর নামাযের আযান।

ফজর উদিত হওয়ার আগে যে আযানের কথা পাওয়া যায় তা ফজরের আযান নয়। লোকেরা শেষ রাতের ঐ আযানকে ফজর নামাযের প্রথম আযানরূপে আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ফজর নামাযের জন্য নয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,(إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ) "বেলাল রাতে আযান দিয়ে থাকে। যাতে করে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হয় এবং নফল নামায আদায়কারী ফিরে যায়।"[2] অর্থাৎ- ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে সাহরী খাবে আর ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারী নামায শেষ করে সাহরী খাবে। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মালেক বিন হুওয়াইরিছকে বলেছিলেনঃ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ "নামাযের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের মধ্যে একজন যেন আযান দেয়।" [3] আর আমরা জানি যে, ফজর উদিত না হলে নামাযের সময় উপস্থিত হবে না। অতএব ফজর হওয়ার আগের আযান ফজর নামাযের

জন্য নয়। অতএব সাধারণভাবে মানুষ ফজরের আযানে যে "আছ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম" বলে থাকে সেটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ। কিন্তু যারা ধারণা করে থাকে যে, প্রথম আযান বলতে ফজরের পূর্বের আযান উদ্দেশ্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। তারা দলীল পেশ করে থাকে যে, প্রথম আযান বলতে সেই আযানই উদ্দেশ্য যা শেষ রাতে নফল বা তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দেয়া হয় এবং সেজন্য বলা হয়ঃ "আছ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম" অর্থাৎ- ঘুম থেকে নামায উত্তম। এখানে 'উত্তম' শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় এ আহবানটি নফল নামাযের জন্যই।

---

[1]. ছহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান। ছহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আযান।

[2]. ছহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান। ছহীহ্ মুসলিম, কিতাবুছ ছিয়াম।

[3]. ছহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আযান। ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ।

আমরা জবাবে বলবঃ 'উত্তম' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব কাজের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে ? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন পন করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।" (সূরা ছফ্ফঃ ১০, ১১) আল্লাহ্ জুমআর নামায সম্পর্কে বলেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিনে ছালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হও, বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য উত্তম।" (সূরা জুমআঃ ৯) অতএব 'উত্তম' শব্দটি যেমন ফরয বিষয়ে ব্যবহার হয় তেমনি মুস্তাহাব ও নফলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়।

প্রশ্নঃ (১৯৯) টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে আযান দিলে আযান হবে কি ?

উত্তমঃ টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে আযান দিলে বিশুদ্ধ হবে না। কেননা আযান একটি ইবাদত। আর ইবাদত করার আগে নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২০০) মসজিদে প্রবেশ করার সময় দেখলাম আযান হচ্ছে। এ সময় কোন কাজটি উত্তম ?

উত্তরঃ উত্তম হচ্ছে, আগে আযানের জবাব দিবে। অতঃপর আযান শেষে দু'আ পাঠ করবে। তারপর তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা সুন্নাত নামায শুরু করবে। তবে বিদ্বানদের মধ্যে অনেকে জুমআর দিনের বিষয়টিকে ব্যতিক্রম বলেছেন। অর্থাৎ-মসজিদে প্রবেশ করার সময় যদি দেখে যে, খুতবার জন্য দ্বিতীয় আযান শুরু হয়ে গেছে, তখন আযানের জবাব না দিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায শুরু করে দিবে। যাতে করে খুতবা শোনতে পারে। কারণ হচ্ছে, খুতবা শোনা ওয়াজিব, আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। সুতরাং যা ওয়াজিব নয় তার চাইতে ওয়াজিবের গুরুত্ব দেয়া উত্তম।

প্রশ্নঃ (২০১) আযানের জবাবে 'রাযিতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলামি দী-না, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা।' দু'আটি কখন বলতে হবে ?

উত্তরঃ হাদীছের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, মুআয্যিন যখন 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্ বলবে তখন তার জবাব দিয়ে বলবে, 'রাযীতু

বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলা-মি দী-না, ওয়াবি মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা।' কেননা হাদীছে এসেছেঃ

(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا وَبِالإِسْلام دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)

"যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবেঃ 'আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্ রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা।' অন্য রেওয়াতে বলা হয়েছেঃ "যে বলবে, 'আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি'।" এই কথাটি প্রমাণ করে যে, উক্ত দু'আটি মুআয্যিনের 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্' বলার পর পরই বলবে।

প্রশ্নঃ (২০২) আযানের দু'আর শেষে "ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল মীআ'দ" বাক্যটি বৃদ্ধি করে পড়া কি ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ?

উত্তরঃ হাদীছ শাস্ত্রের পন্ডিতদের মধ্যে এ বাক্যটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইহা ছহীহ্ নয়। ইহা শায[1]। কেননা আযানের দু'আর ব্যাপারে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের অধিকাংশই এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। বিশুদ্ধ হলে তো তা বাদ দেয়া বৈধ নয়। দু'আ ও প্রশংসার বাক্যে বা অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন শব্দ ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা এটা দ্বারা ইবাদত সম্পন্ন করা হয়। বিদ্বানদের মধ্যে অন্যরা বলেছেনঃ এর সনদ ছহীহ্। এটা বলা যায় এতে কোন বাধা নেই। শায়খ আবদুল আযীয বিন বায বলেছেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ্। বায়হাক্বী ছহীহ্ সনদে এটা বর্ণনা করেছেন।[2]

প্রশ্নঃ (২০৩) ইক্বামতের শব্দগুলো কি মুক্তাদীদেরকেও বলতে হবে ?

উত্তরঃ ইক্বামত বলার সময় তার পিছে পিছে শব্দগুলো উচ্চারণ করার ব্যাপারে একটি হাদীছ আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।[3] কিন্তু তা যঈফ। যা গ্রহণের অযোগ্য। অতএব তা না বলাই ভাল।

প্রশ্নঃ (২০৪) ইক্বামতে 'ক্বাদক্বামাতিছ্ ছালাত' বলার সময় 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা কি ঠিক ?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। মুআয্যিন যখন ইক্বামতে 'ক্বাদক্বামাতিছ ছালাত' বলত, তখন তিনি

---

[1] . নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারী যদি এমন হাদীছ বর্ণনা করেন, যা তার চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীছের বিপরীত, তবে সেই হাদীছকে শায বলা হয়। শায হাদীছ দুর্বল হাদীছের অন্তর্গত।

[2] . বায়হাকী সুনান গ্রন্থে ১/৪১০। দ্রষ্টব্যঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৮৮ ফ তোয়া বিন বাযঃ ১০/ ৩৬৪, ৩৬৫।

[3] .আবু দাউদ, কিতাবুছ ছালাত। ইবনু হাজার 'তালখীছ' গ্রন্থে (১/২১২)বলেন, হাদীছটি যঈফ।

বলতেন, 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'।[1] কিন্তু হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ (২০৫) নামায আদায় করার জন্য উত্তম সময় কি ? প্রথম সময়ই কি সর্বোত্তম ?

উত্তরঃ শরীয়ত নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করাই ছালাতের পূর্ণাঙ্গরূপ। এজন্য 'আল্লাহ্‌র কাছে কোন্ আমলটি উত্তম ?' এ প্রশ্নের জবাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সময়মত নামায আদায় করা।"[2] হাদীছে একথা বলা হয়নি' নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা।' কেননা কিছু নামায তো এমন আছে যা সময়ের আগেই আদায় করা সুন্নাত।[3] আর কিছু নামায এমন আছে যা সময় হওয়ার পরও দেরী করে আদায় করা সুন্নাত। যেমন এশা নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা সুন্নাত। অতএব কোন নারী যদি প্রশ্ন করে, গৃহে অবস্থানের সময় যদি আমি এশার নামাযের আযান শুনি, তবে আমার জন্য কোনটি উত্তম-আযানের পর পর এশা নামায আদায় করে নেয়া নাকি রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা ?

জবাবে বলব, তার জন্য উত্তম হচ্ছে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে এশা নামায আদায় করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা রাতে বের হতে দেরী করলেন। এমনকি লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নারী ও শিশুরা তো ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর তিনি বের হয়ে নামায আদায় করলেন এবং বললেন, إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي "এটাই এ নামাযের সময়। আমার উম্মতের উপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম (তবে এশা নামাযের জন্য এ সময়টাকে নির্ধারণ করে দিতাম।)[4] অতএব নারী নিজ গৃহে অবস্থানের সময় তার জন্য উত্তম হচ্ছে দেরী করে এশা নামায আদায় করা। অনুরূপভাবে একদল লোক যদি [সফরে] থাকে (যেখানে আশে পাশে কোন মসজিদ নেই।) তারা যদি প্রশ্ন করে এশা নামায কি আমরা দ্রুত পড়ে নিব নাকি দেরী করব ? জবাবে বলবঃ তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে, দেরী করা। অবশ্য দেরী করলে যদি কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে আগেভাগে পড়ে নেয়াই উত্তম। অন্যান্য নামাযগুলোর ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, আগেভাগে প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করা। ফজর, যোহর, আছর ও মাগরিব নামায সমূহ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করবে। কিন্তু যদি দেরী করার কোন কারণ থাকে, তবে দেরী করাই উত্তম হবে।

---

[1] . আবু দাউদ, কিতাবুছ ছালাত। হাফেয ইবনু হাজার 'তালখীছ' (১/২১১) গ্রন্থে বলেন, হাদীছটি যঈফ। শায়খ আলবানীও 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে হাদীছটিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন ১/২৫৮।

[2] . ছহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাওয়াক্বীত। ছহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

[3] . যেমন সফর অবস্থায় কখনো কখনো আছরের নামাযকে যোহরের সাথে অগ্রীম আদায় করা এবং এশা নামাযকে অগ্রীম মাগরিবের নামাযের সাথে আদায় করা জায়েয।

[4] . ছহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ।

দেরী করার কারণ যেমন, গ্রীষ্মকালে যখন প্রচন্ড তাপদাহ শুরু হয়, তখন যোহর নামায দেরী করে ঠান্ডা সময়ে আদায় করা উত্তম। অর্থাৎ-আছর নামাযের কিছুক্ষণ আগে। কেননা আছরের ওয়াক্ত নিকটবর্তী হলে তাপমাত্রা কমে আসে। একথার দলীলঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ "তাপমাত্রা প্রচন্ড হলে, যোহর নামাযকে দেরী করে ঠান্ডার সময়ে আদায় করবে। কেননা প্রচন্ড গরম জাহান্নামের কঠিন প্রখরতা থেকে আসে।"[1] নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে থাকাবস্থায় নামাযের সময় হলে বেলাল আযান দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেন। তখন তিনি তাকে বলতেন "ঠান্ডা কর"। কিছুক্ষণ পর আবার আযানের জন্য উঠতেন। তিনি বলতেন, "ঠান্ডা কর।" (অর্থাৎ-রোদের তাপ কম হওয়ার অপেক্ষা কর।) কিছুক্ষণ পর বেলাল আযান দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন। তখন তিনি তাকে আযান দেয়ার অনুমতি দিতেন।[2]

দেরী করে নামায আদায় করা উত্তম হওয়ার আরো কারণ এমন হতে পারেঃ যেমন, প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করলে জামাআত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় দেরী করে জামাআতের সাথে নামায আদায় করাই উত্তম। যেমন একজন লোক মাঠে-ময়দানে কর্মরত অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেছে। সে জানে, লোকালয়ে গেলে শেষ সময়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে পারবে। এর জন্য কোনটি উত্তম-সময় হওয়ার সাথে সাথে একাকি নামায আদায় করে নেয়া, নাকি দেরী করে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ? জবাবে বলব, এর জন্য উত্তম হচ্ছেঃ দেরী করে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা। বরং আমি বলি, জামাআতের সাথে নামায আদায় করার জন্য দেরী করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ (২০৬) অজ্ঞতা বশতঃ সময় হওয়ার আগেই নামায আদায় করে নেয়ার বিধান কি?

উত্তরঃ সময় হওয়ার আগে নামায আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে।" (সূরা নিসাঃ১০৩) তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক নামাযের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

---

[1] .বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ কঠিন গরমের সময় যোহর নামাযকে ঠান্ডা করে আদায় করা। ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ যোহর নামাযকে ঠান্ডার সময়ে আদায় করা।

[2] .বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ কঠিন গরমের সময় যোহর নামাযকে ঠান্ডা করে আদায় করা। ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ যোহর নামাযকে ঠান্ডার সময়ে আদায় করা।

"যোহরের সময় শুরু হবে-সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে...।"[1] এভাবে প্রত্যেক নামাযের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি সময় হওয়ার আগেই নামায আদায় করে নিবে তা ফরয হিসেবে আদায় হবে না। তবে তা নফল হয়ে যাবে। তাকে নফলের ছাওয়াব দেয়া হবে। অতএব সময় হওয়ার পর ঐ ছালাত তাকে পুনরায় পড়তে হবে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

ক্বাযা নামাযের তারতীব বা ধারাবাহিকতা

প্রশ্নঃ (২০৭) ভুল এবং অজ্ঞতার কারণে ক্বাযা নামায সমূহের তারতীব বা ধারাবাহিকতা কি রহিত হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকড়াও করিও না।" (সূরা বাক্বারা-২৮৬) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন আমার উম্মতের ভুলে যাওয়া ও ভুল ক্রমে করে ফেলা বিষয়ের পাপ এবং যে বিষয়ে তাকে জোর-জবরদস্তি করা হয়।"[2]

প্রশ্নঃ (২০৮) এশার নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে মনে পড়ল, মাগরিব নামাযবাকী আছে, এখন তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে যে, এশার নামায দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর মনে পড়ল যে, মাগরিব নামায আদায় করে নি। তখন মাগরিব নামাযের নিয়ত করে এশার জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। ইমাম তৃতীয় রাকাআত শেষে চতুর্থ রাকাআতের জন্য দন্ডায়মান হলে-বসে পড়বে এবং পূর্ণ তাশাহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে ইমামের অপেক্ষা করবে। তারপর ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। অবশ্য একাকী সালাম ফিরিয়ে ইমামের অবশিষ্ট নামাযে এশার নিয়তে শামিল হলেও কোন অসুবিধা নেই। ইমামের সাথে নিয়তের ভিন্নতা হলে কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে এব্যাপারে মতভেদ থাকলেও এটিই বিশুদ্ধ মত। আর যদি একাকী মাগরিব নামায আদায় করার পর এশার জামাতে শামিল হয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

একাধিক নামায ছুটে গেলে কাযা আদায় করার নিয়ম

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ এশার পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ।

[2]. ইবনু মাজাহ্, আধ্যায়ঃ তালাক, অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে ও বাধ্যগত ব্যক্তির তালাক।

প্রশ্নঃ (২০৯) নিদ্রা বা ভুলে যাওয়ার কারণে যদি আমার এক বা ততোধিক ফরয নামায ছুটে যায়, তবে তা কাযা আদায় করার নিয়ম কি ? প্রথমে কি বর্তমান সময়ের নামায আদায় করব তারপর কাযা নামায আদায় করব ? নাকি আগে কাযা নামায সমূহ তারপর বর্তমান নামায আদায় করব ?

উত্তরঃ ছুটে যাওয়া কাযা নামায সমূহ প্রথমে আদায় করবে। তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। দেরী করা ঠিক হবে না। মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, কারো যদি একাধিক ফরয নামায ছুটে গিয়ে থাকে, তবে ঐ নামাযের সময় উপস্থিত হলে তার কাযা আদায় করবে। যেমন, আজ কারো ফজর নামায ছুটে গেছে। সে উক্ত নামায পরবর্তী দিন ফজরের সময়ে কাযা আদায় করবে। এটা মারাত্মক ভুল এবং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী ও কর্মের বিরোধী।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ

(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)

"যে ব্যক্তি নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, সে যেন ইহা আদায় করে যখনই স্মরণ হবে।"[1] এখানে এরূপ বলা হয়নি, দ্বিতীয় দিন উহা আদায় করে নিবে। খন্দক যুদ্ধের সময় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েক ওয়াক্ত নামায ছুটে যায়। তখন তিনি বর্তমান সময়ের নামাযের আগেই উক্ত নামাযগুলোর কাযা আদায় করেন।

অতএব ছুটে যাওয়া নামাযের ক্বাযা প্রথমে আদায় করবে তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। কিন্তু যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ ক্বাযা নামাযের আগে বর্তমান সময়ের নামায আদায় করে ফেলে তবে তা বিশুদ্ধ হবে। কেননা এটা তার ওযর। **উল্লেখ্য যে, ক্বাযা নামায সমূহ তিন ভাগে বিভক্তঃ**

প্রথম প্রকারঃ দেরী করার ওযর দূর হয়ে গেলেই ক্বাযা আদায় করে নিবে। তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে বিতর ও সুন্নাত নামায সমূহ।

দ্বিতীয় প্রকারঃ যার পরিবর্তে অন্য নামায ক্বাযা হিসেবে আদায় করবে। তা হচ্ছে, জুমআর নামায। এ নামায ছুটে গেলে তার পরিবর্তে যোহর নামায আদায় করবে। কেউ যদি জুমআর দিন ইমামের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর নামাযে শামিল হয়, তবে সে যোহর নামায আদায় করবে। ঐ অবস্থায় যোহরের নিয়ত করে ইমামের সাথে নামাযে শামিল হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইমামের সালামের পর আসে তবে সেও যোহর পড়বে।

---

[1]. ছহীহ্ বুখারী অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামায ভুলে যায় স্মরণ হলেই যেন আদায় করে নেয়। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদঃ কাযা নামায আদায় করা।

তবে কেউ যদি দ্বিতীয় রাকাআতে ইমামের সাথে রুকূ পায়, তবে সে জুমআর নামাযই আদায় করবে। অর্থাৎ ইমাম সালাম ফিরালে সে এক রাকাআত আদায় করবে। অনেক লোক ইমামের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর জুমআর নামাযে শামিল হয়। অতঃপর সালাম শেষে জুমআর নামায হিসেবে দু'রাকাআত নামায আদায় করে। এটা ভুল। বরং তার জন্য উচিত হচ্ছে ইমামের সালাম ফেরানোর পর যোহর হিসেবে চার রাকাআত নামায আদায় করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)
"যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকআত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ নামায পেয়ে গেল।"[1] এদ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ যদি এর কম পায় সে নামায পেল না। তখন জুমআর কাযা আদায় করবে যোহর নামায আদায় করার মাধ্যমে। এই কারণে নারীরা বাড়িতে, মসজিদে আসতে অপারগ অসুস্থ ব্যক্তিরা যোহর নামায আদায় করবে। তারা জুমআ আদায় করবে না। তারা যদি জুমআ আদায়ও করে, তাদের নামায প্রত্যাখ্যাত হবে- বাতিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় প্রকারঃ এমন নামায যা ছুটে যাওয়া সময়েই কাযা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে ঈদের নামায। ঈদের দিন সম্পর্কে জানা গেল না। কিন্তু সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর জানা গেল যে আজকে ঈদের দিন ছিল। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ বলেন, পরবর্তী দিন সকাল বেলা উক্ত ঈদের নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। কেননা ঈদের নামায আদায় করার সময় হচ্ছে সকাল বেলা।

অধিক পাতলা পোশাকে নামায আদায় করার বিধান

প্রশ্নঃ (২১০) কোন কোন লোক এমন পাতলা পোশাকে নামায আদায় করে যে, বাইরে থেকে তার শরীরের রং বুঝা যায়। নীচে রানের আধা-আধি পর্যন্ত ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়া পরিধান করে। পাতলা কাপড়ের কারণে রানের বাকী অর্ধেক অংশ স্পষ্টই দেখা যায়। এদের নামাযের বিধান কি ?

উত্তরঃ এদের নামাযের বিধান ঐ লোকদের নামাযের মত যারা বিনা কাপড়ে শুধু খাট পায়জামা বা জাঙ্গিয়া পরিধান করে নামায পড়ে। কেননা এমন পাতলা পোশাক যা দ্বারা শরীরের সুস্পষ্ট বিবরণ বুঝা যায়, সতরের স্থান সমূহ ঢেকে রাখে না তা পরিধান করা না করা উভয়ই সমান। তাই তাদের নামাযও বিশুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে উলামাদের দু'টি মত পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক মতটি হচ্ছে, তাদের নামাযও বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম আহমাদ (রঃ) এর মাযহাবেও এ মতটি

[1] . ছহীহ্ বুখারী অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাআত পায়। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাআত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ নামায পেয়ে গেল ।

ব্যাপক প্রসিদ্ধ। কেননা নামাযে পুরুষের জন্য সর্ব নিম্ন সতর হচ্ছে-নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণীর বাস্তবায়ন হয়। আল্লাহ্‌ বলেনঃ

﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সৌন্দর্য গ্রহণ কর।" (সূরা আ'রাফঃ ৩১) অর্থাৎ পোশাক পরিধান কর। সুতরাং আবশ্যক হচ্ছে, তারা এমন পোশাক পরিধান করবে যা দ্বারা নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যায়। অথবা ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়ার উপরে এমন ধরণের মোটা কাপড় পরিধান করবে, যাতে বাইরে থেকে শরীরের রং বুঝা না যায়।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি বিরাট ভুল ও ভয়ানক। এদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা। নামাযে এমন পোশাক পরিধান করার চেষ্ট করা-যা আবশ্যক সতর ঢেকে রাখে। আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে ও মুসলমান ভাইদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাঁর পছন্দনীয় ও রেজামন্দীর পথে চলার তাওফীক দিন। নিশ্চয় তিনি দানশীল ও সম্মানিত।

সামনে, পিছনে ও উভয় পার্শ্বে খোলা থাকে এমন পোশাক পরে নারীর নামায

প্রশ্নঃ (২১১) অনেক মহিলা পোশাক পরিধান করে। যার সামনে, পিছনে ও উভয় পার্শ্বে খোলা থাকে। ফলে পায়ের অনেকাংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এদের কথা হচ্ছে, আমরা তো শুধু নারীদের সামনেই এরূপ পোশাক পরিধান করি ? এদের এই পোশাকের বিধান কি ?

উত্তরঃ আমি যা সঠিক মনে করি তা হচ্ছে নারী এমন পোশাক পরিধান করবে, যা তার শরীরের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নারীরা এমন ধরণের কামিছ পরিধান করতেন যা পায়ের টাখনুদ্বয় এবং হাতের কব্জিদ্বয় পর্যন্ত প্রলম্বিত হত। অতএব নারীর উপর আবশ্যক হচ্ছে নিজ সম্ভ্রমের প্রতি যত্নবান হওয়া। এমন পোশাক পরিধান করা যা তার শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিবে। যাতে করে সে নিম্ন লিখিত এই হাদীছের আওতাভুক্ত না হয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)

"দু'ধরণের জাহান্নামী লোক। এদেরকে আমি এখনো দেখিনি। একদল, যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় লাঠি থাকবে। লোকদেরকে তারা প্রহার করবে। দ্বিতীয় দল, এমন নারী যারা পোশাক পরিধান করা সত্বেও যেন উলঙ্গ থাকে। তারা লোকদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে, অহংকারের সাথে হেলে-দুলে চলে। তাদের মাথাগুলো যেন হেলে যাওয়া উটের চুঁড়ার মত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার সুঘ্রাণও পাবে না। নিশ্চয়

জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়।"[1]

প্রশ্নঃ (২১২) নিক্বাব ও হাত মোজা পরিধান করে কি নারীর নামায আদায় করা বৈধ ?

উত্তরঃ নারী যদি নিজ গৃহে অথবা এমন স্থানে নামায আদায় করে, যেখানে পরপুরুষ আগমণ করবে না। তবে তার জন্য শরীয়ত সম্মত হচ্ছে, মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় খোলা রাখা। যাতে করে সিজদার সময় কপাল ও নাক এবং উভয় হাত মাটিতে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে যদি এমন স্থানে নামায পড়ে যেখানে বেগানা পুরুষের আনাগোনা রয়েছে, তবে অবশ্যই মুখমন্ডল ঢেকে রাখবে। কেননা গাইর মাহরাম (যার সাথে বিবাহ সিদ্ধ এমন পর পুরুষের) সামনে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তাদের সামনে মুখ খোলা জায়েয নয়। একথার দলীল হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি। যা থেকে কোন মুমিন তো দূরে থাক সাধারণ বিবেকবানও ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না। হাত মোজা পরিধান করা শরীয়ত সম্মত। মহিলা ছাহাবীরা এরূপই করতেন। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের ইহরাম বাঁধার নিয়মের মধ্যে উল্লেখ করেছেনঃ (وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) "ইহরামকারী নারী নিক্বাব পরবে না হাত মোজাও পরিধান করবে না।"[2] এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, তাদের সাধারণ অভ্যাস ছিল হাত মোজা পরিধান করা। অতএব পরপুরুষের উপস্থিতিতে হাত মোজা পরিধান করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মুখমন্ডল ঢেকে রাখবে দাঁড়ানো, বসা-সর্বাবস্থায়। তবে সিজদার সময় মুখমন্ডলের কাপড় সরিয়ে কপাল ও নাকের উপর সিজদা করবে।

প্রশ্নঃ (২১৩) অজানা অবস্থায় কাপড়ে নাপাকি নিয়ে নামায আদায় করলে তার বিধান কি ?

উত্তরঃ নামায সম্পন্ন করার পর জানা গেল যে, কাপড়ে নাপাকি ছিল। অথবা কাপড়ে নাপাকি থাকার কথা আগে থেকেই জানতো কিন্তু ভুলে গিয়েছে। নামায শেষ হওয়ার পর সেকথা স্মরণ হল। এ অবস্থায় তাদের নামায বিশুদ্ধ হবে। পুনরায় নামায ফিরিয়ে পড়ার দরকার নেই। কেননা সে তো এই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে না জেনে অথবা ভুলক্রমে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারা- ২৮৬) "আল্লাহ্ বলেন, আমি তাই করলাম।"[3] অর্থাৎ- পাকড়াও করলাম না।

---

[1] . ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদঃ পোশাক পরা উলঙ্গ নারী।

[2] . ছহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করার জরিমানা। অনুচ্ছেদঃ ইহরামকারী নারী পুরুষের সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

[3] . ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ সাধ্যের বাইরে আল্লাহ্ কোন কিছু চাপিয়ে দেননি।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুতা নিয়ে নামায আদায় করছিলেন, কিন্তু তাতে ছিল নাপাকি। তিনি তা জানতেন না। জিবরীল (আঃ) সে ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলে নামায চলাবস্থায় তিনি তা খুলে ফেললেন।[1] এক্ষেত্রে তিনি নতুন করে নামায আদায় করেননি। এথেকে প্রমাণিত হয়, নামায অবস্থায় যদি নাপাকির ব্যাপারে জানতে পারে, তবে নামায অবস্থাতেই উহা বিদূরীত করার চেষ্টা করবে-যদি উহা বিদূরীত করতে গিয়ে সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়। অনুরূপভাবে যদি ভুলে যায় আর নামাযরত অবস্থায় তা স্মরণ হয়, তবে সতরের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হলে নামায না ভেঙ্গেই উক্ত কাপড় খুলে ফেলবে। কিন্তু যদি নামায শেষ হওয়ার পর স্মরণ হয় বা নাপাকি সম্পর্কে জানতে পারে, তবে নামায বিশুদ্ধ হবে ফিরিয়ে পড়ার দরকার হবে না। তবে কেউ যদি ভুলক্রমে ওযু না করে নামায আদায় করে। তারপর নামায শেষে স্মরণ হলো যে, সে বিনা ওযুতে নামায আদায় করেছে। তবে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, ওযু সম্পাদন করে নামায ফিরিয়ে পড়া। অনুরূপভাবে কেউ যদি অজ্ঞতা বশতঃ বা ভুলক্রমে শরীরে নাপাকি নিয়ে নামায আদায় করে, অতঃপর কাপড়ে বীর্য দেখে জানতে পারে বা নাপাকির কথা স্মরণ হয়, তবে যতগুলো নামায সে অপবিত্রাবস্থায় আদায় করেছিল সবগুলোই ফিরিয়ে পড়বে।

উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথম মাসআলাটি-অর্থাৎ কাপড়ে নাপাকী নিয়ে নামায আদায় করা-হচ্ছে, নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করা। আর দ্বিতীয়টি-অর্থাৎ-বিনা ওযুতে বা শরীর নাপাক অবস্থায় নামায আদায় করা-হচ্ছে, নির্দেশিত বিষয় যা ওযু-গোসলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হয়। আর নির্দেশিত বিষয় অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। বিষয়টির উপস্থিতি ব্যতিরেকে ইবাদত বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু কাপড়ে নাপাকির বিষয়টি হচ্ছে না থাকা। অর্থাৎ-ওটার অনুপস্থিতি ব্যতীত নামায বিশুদ্ধ হবে না। অতএব অজ্ঞতা বশতঃ বা ভুলক্রমে যদি তা উপস্থিত থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা নামাযের আবশ্যক কোন কিছু এখানে ছুটে যায়নি।

টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করার শাস্তি

প্রশ্নঃ (২১৪) টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা যদি অহংকার বশতঃ হয় তবে তার শাস্তি কি ? কিন্তু যদি অহংকার বশতঃ না হয় তবে তার শাস্তি কি ? আবু বকরের হাদীছ দ্বারা যারা দলীল পেশ করে তাদের দাবীর কি জবাব ?

উত্তরঃ লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্রাদি কাপড় যদি পায়ের টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করা হয় এবং তার উদ্দেশ্র হয় অহংকা করা, তবে তার শাশি্ত হলো-কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে দৃষ্টি দিবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ জুতা পরে নামায আদায় করা।

করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আর যদি অহংকারের সাথে নয় বরং সাধারণ ভাবে ভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তবে তার শাস্তি হলো- তার টাখনুদ্বয়কে জাহানআমের আগুনে পোড়ানো হবে। কেননা নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْم: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)

" কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদেও দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদেও জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সেই তিন ব্যক্তি হলো- (১)পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী। (২) দান করে খোটাদানকারী (৩) মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী।[1] তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ **(مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)**

" যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে।"

যে ব্যক্তি অহংকারের উদ্দেশ্য ছাড়া কাপড় ঝুলিয়ে পরবে তার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (مَا أَسْفَلَ الكعبين مِنَ الإِزَارِ فَفِيْ النَّارِ) "যে টাখনুদ্বয়ের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হলো তা আগুনের মধ্যে জ্বলবে।" [সহীহুল বুখারী] এ হাদীসে দোযখের আগুনে টাখনু জ্বলার ব্যাপারে অহংকারের কথা উল্লেখ নেই।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে,রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

(إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وما كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

"মুমিন ব্যক্তির কাপড় নেসফে সাক তথা অর্ধ হাটু পর্যন্ত, এতে কোন অসুবিধা নেই। (হাটু থেকে পায়ের তলার মধ্যভাগকে নেসফে সাক বলা হয়) অন্য বর্ণনায় নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ পায়ের টাখনু এবং মধ্যবর্তী স্থানে কাপড় পরিধান করতে কোন অসুবিধা নেই। যে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হবে তা

[1] . ছহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করা কঠিনতম হারাম হওয়ার বর্ণনা।

জাহান্নামে যাবে। এবং যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।" [আহমদ, ইবনু মাজাহ ও নাসয়ী]

অনেকে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে এবং যুক্তি দেখায় যে আমি তো অহংকার বশতঃ কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরি নাই, সুতরাং এতে তেমন কোন অসুবিধা নেই। উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ ব্যক্তির যুক্তি সম্পূর্ণ অসার।

অতএব অহংকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিই সাধারণ ভাবে কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরলেই জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আর তার সাথে যদি অহংকারযুক্ত হয় তবে তার শাস্তি আরো কঠিন, তা হলো- আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আবু বাকর (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যারা দলীল পেশ করতে চায় দ'দিক থেকে তাদের যুক্তি অসার।

প্রথম কথাঃ আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, আমার কাপড়ের এক পার্শ্ব (অনিচ্ছাকৃত) ঝুলে পড়ে কিন্তু আমি তা বারবার উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।"[1] অতএব তিনি তো ইচ্ছাকৃত একাজ করতেন না। বরং তাঁর শরীর অধিক ক্ষীণ হওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলে যেত। তাছাড়া তিনি তা উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যারা কাপড় ঝুলিয়ে পরে এবং ধারণা করে যে তারা অহংকার করে না, তারা তো ইচ্ছাকৃত একাজ করে। অতএব তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলব, অহংকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলিয়ে পরলে তার টাখনু জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। যেমনটি আবু হুরায়রার হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি অহংকার বশতঃ হয় তবে তার শাস্তি হচ্ছে,আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকাবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

দ্বিতীয় কথাঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই আবু বকর (রাঃ) কে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত নন, যারা অহংকার বশতঃ একাজ করে থাকে। অতএব বর্তমানে এরা কি নবীজীর পক্ষ থেকে এরূপ সচ্চরিত্রের সনদ ও তাঁর সাক্ষ্য লাভ করেছে ? কিন্তু শয়তান প্রবৃত্তির অনুসারী লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি সমূহকে খেয়াল-খুশির উপর ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন তারা বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন।

---

[1] . ছহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ লিবাস বা পোশাক, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে।

ফরয গোসল না করেই নামায পড়ে ফেললে করণীয়

প্রশ্নঃ (২১৫) এক ব্যক্তি নামায সম্পন্ন করার পর জানল যে, সে 'জুনুব' অপবিত্র অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ তার উপর গোসল ফরয ছিল। এখন তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ যে কোন মানুষ নামায আদায় করার পর যদি জানতে পারে যে, সে ছোট নাপাকী বা বড় নাপাকীতে লিপ্ত ছিল। তথা ওযু বা গোসল ফরয ছিল। তবে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন করে উক্ত নামায পুনরায় আদায় করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُور)"পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামায কবূল করা হবে না।"[1]

প্রশ্নঃ (২১৬) নামাযরত অবস্থায় নাক থেকে রক্ত বের হলে কি করবে ?

উত্তরঃ নাক থেকে রক্ত বের হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। চাই রক্ত কম বের হোক বা বেশী। অনুরূপভাবে দু'রাস্তা (পেশাব-পায়খানার রাস্তা) ছাড়া শরীরের অন্য যে কোন স্থান থেকে কোন কিছু বের হলে ওযু ভঙ্গ হবে না। যেমন বমী, পুঁজ প্রভৃতি। চাই তা কম হোক বা বেশী হোক ওযু ভঙ্গ হবে না। কেননা এগুলোর ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন ছহীহ্ হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। আসল হচ্ছে পবিত্রতা। এই পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে শরঈ দলীলের ভিত্তিতে। আর যা শরঈ দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তা খন্ডন করার জন্য শরঈ দলীল প্রয়োজন। কিন্তু দু'টি রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য স্থান থেকে কোন কিছু বের হলে, ওযু ভঙ্গের কোন শরঈ দলীল নেই। অতএব নাক থেকে রক্ত বের হলে বা বমী হলে ওযু ভঙ্গ হবে না। কম হোক বা বেশী হোক।

যেহেতু এ অবস্থায় বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা দুস্কর হয়ে পড়ে, এজন্য নামায থেকে বের হতে কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে নামায যদি মসজিদের মধ্যে হয় আর নাকের রক্ত বা বমি পড়ে মসজিদের পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে মসজিদ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। কিন্তু অল্প রক্ত কাপড়ে পড়লে কাপড় নাপাক হবে না।

প্রশ্নঃ (২১৭) কোন মসিজদে কবর থাকলে সেখানে নামায আদায় করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ কবর সংশ্লিষ্ট মসজিদে নামায আদায় করা দু'ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ প্রথমে কবর ছিল। পরবর্তীতে তাকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে এই মসজিদ পরিত্যাগ করা; বরং মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা। যদি না করা হয় তবে মুসলিম শাসকের উপর আবশ্যক হচ্ছে উক্ত মসজিদ ধ্বংস করে ফেলা।

দ্বিতীয় প্রকারঃ প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। পরে সেখানে কোন মৃতকে দাফন করা হয়েছে। তখন ওয়াজিব হচ্ছে, কবর খনন করে মৃত ব্যক্তি বা তার হাড়-হাড্ডি সেখান থেকে

---

[1] . ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ নামাযের জন্য পবিত্রতা আবশ্যক।

উত্তোলন করে, মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা। এই মসজিদে শর্ত সাপেক্ষে নামায আদায় করা জায়েয। আর তা হচ্ছে, কবর যেন মসজিদের সম্মুখভাগে না হয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের দিকে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কবর তো মসজিদের মধ্যে ? এর জবাব কি?

এর জবাব হচ্ছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পূর্বেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। একথা সবার জানা যে, তাঁকে মসজিদের মধ্যে দাফন করা হয়নি; বরং মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্থান, তাঁর নিজ গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ৮৮ হিঃ সনে খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তার অধিনস্থ মদীনার আমীর ওমর বিন আবদুল আযীযকে পত্র মারফত নির্দেশ প্রদান করেন, মসজিদে নববী ভেঙ্গে পূণঃনির্মাণ করার সময় যেন উম্মুল মু'মেনীন তথা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীদের গৃহগুলোকে মসজিদের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। তখন ওমর বিন আবদুল আযীয মদীনার নেতৃস্থানীয় লোক এবং ফিক্বাহবিদদেরকে একত্রিত করে তাঁদের সামনে খলীফার পত্র পড়ে শোনান। বিষয়টি তাদের কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। তাঁরা বললেন, কবর ও গৃহগুলোকে বর্তমান অবস্থাতেই রেখে দেয়া উচিত। উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এটাই সর্বাধিক সঠিক উপায়। বর্ণিত আছে যে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব আয়েশা (রাঃ) এর গৃহ তথা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর শরীফকে মসজিদের মধ্যে শামিল করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে বাধা প্রদান করেন। কেননা তিনি আশংকা করছিলেন যে, এই কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হতে পারে। যা হাদীছের ভাষায় নিষিদ্ধ। বিষয়টি ওমর লিখে পাঠালেন খলীফা ওয়ালিদের কাছে। কিন্তু ওয়ালিদ তার নির্দেশই বাস্তবায়ন করার আদেশে অটল রইলেন। ফলে বাধ্য হয়ে ওমর খলীফার নির্দেশ মোতাবেক কবরকে মসজিদের মধ্যে শামিল করে ফেললেন।

অতএব আপনি দেখলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর মূলতঃ মসজিদের মধ্যে দেয়া হয়নি। আর কবরের উপর মসজিদও বানানো হয়নি। সুতরাং যারা মসজিদে দাফন করা বা কবরের উপর মসজিদ তৈরীর বৈধতার পক্ষে কথা বলে তাদের কোন দলীল নেই। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে তিনি বলেনঃ (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)"ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিসম্পাত), তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।"[1]

---

[1] . ছহীহ্ বুখারী অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ উপাসনালয়ে নামায আদায় করা। ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ কবরের উপর মসজিদ বানানো নিষেধ।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমূর্ষু অবস্থায় ইহুদী খৃষ্টানদের কার্যকলাপ থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বাণী পেশ করেন। উম্মে সালামা (রাঃ) হাবশায় হিজরত করে খৃষ্টানদের গীর্জা বা উপাসনালয়ে স্থাপিত বহু মূর্তী দেখেছিলেন। বিষয়টি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন:

(أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)

"ওরা এমন জাতি, তাদের মধ্যে কোন নেক বান্দা বা সৎলোক মৃত্যু বরণ করলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরী করত এবং ঐ মূর্তিগুলো স্থাপন করত। ওরা আল্লাহ্র কাছে সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট।"[1] আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হচ্ছে তারা, যাদের জীবদ্দশায় ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আর যারা কবর সমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।"[2] ইমাম আহমাদ উত্তম সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেন। অতএব মু'মিন কখনই ইহুদী-খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্তুষ্ট হবে না এবং সৃষ্টি কুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হবে না।

টয়লেটের ছাদের উপর নামায আদায় করার বিধান

প্রশ্নঃ (২১৮) টয়লেটের ছাদের উপর নামায আদায় করার হুকুম কি ? নাপাক উচ্ছিষ্ট একত্রিত করা হয় এমন ঘরের ছাদে নামায আদায় করার বিধান কি ?

উত্তরঃ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত টয়লেট সমূহের ছাদের উপর নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আমাদের টয়লেট সমূহ বিশেষভাবে আলাদা করে বানানো হয়না। এর ছাদ অন্যান্য ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট করেই বানানো হয়। অনুরূপভাবে নাপাক উচ্ছিষ্ট একত্রিত করা হয় এ রকম ঘরের ছাদে নামায আদায় করতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا "যমিনের সকল স্থান আমার জন্য মসজিদ তথা ছালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করে দেয়া হয়েছে।"[3]

প্রশ্নঃ (২১৯) মসজিদুল হারামের যমিনে (Floor) জুতা নিয়ে হাঁটার বিধান কি ?

---

[1]. ছহীহ্ বুখারী অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ। ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ।

[2]. আহমাদ, ১/ ৪০৫, ৪৩৫

[3]. ছহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ নবী [ﷺ] এর বাণীঃ আমার জন্য যমীনকে মসজিদ করা হয়েছে...।

উত্তরঃ মসজিদুল হারামের যমীনে (Floor) জুতা নিয়ে হাঁটা-হাঁটি করা উচিত নয়। কেননা যারা মসজিদের সম্মান বুঝে না এতে তারা সুযোগ পাবে। ফলে জুতায় পানি বা ময়লা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং মসজিদের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে ফেলবে। বিদ্বানদের নিকট মূলনীতি হচ্ছেঃ "কল্যাণ ও ক্ষতির সংঘর্ষ যদি বরাবর হয় অথবা ক্ষতির আশংকা বেশী হয়; তখন কল্যাণের দিকে যাওয়ার চেয়ে ক্ষতিকর বিষয়কে প্রতিহত করা অধিক উত্তম।"

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের পর কা'বা শরীফ ভেঙ্গে, ইবরাহীম (আঃ) এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা কুফরী ছেড়ে ইসলামে নতুন প্রবেশ করার কারণে, তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তাই তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বললেন,

(لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ)

"তোমার স্বজাতির লোকেরা যদি কুফরী ছেড়ে ইসলামে নতুন প্রবেশকারী না হতো, তবে আমি এই কা'বা ঘর ভেঙ্গে (ইবরাহীমের ভিত্তির উপর) পূণঃনির্মাণ করতাম। ঘরের দু'টি দরজা রাখতাম, একটিতে লোকেরা প্রবেশ করতো অন্যটি দ্বারা বের হতো।"[1]

প্রশ্নঃ (২২০) ক্বিবলা থেকে সামান্য সরে গিয়ে নামায আদায় করলে কি নামায ফিরিয়ে পড়তে হবে ?

উত্তরঃ ক্বিবলার দিক থেকে সামান্য সরে গেলে নামাযে কোন ক্ষতি হবে না। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে মসজিদে হারামের বাইরে থাকে। কেননা মসজিদে হারামে নামায আদায়কারীর ক্বিবলা হচ্ছে মূল কা'বা। এজন্যই উলামাগণ বলেছেনঃ কা'বা শরীফ অবলোকন করা যার জন্য সম্ভব হবে, তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মূল কা'বার সম্মুখবর্তী হওয়া। সুতরাং এ ধরণের ব্যক্তি যদি মূল কা'বার সম্মুখবর্তী না হয়ে শুধু ক্বিবলার দিকে মুখ ফেরায় তবে তার নামায বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

"আপনার মুখমন্ডল মসজিদে হারামের দিকে ফেরান। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন সেদিকেই তোমাদের মুখমন্ডল ফেরাবে।" (সূরা বাক্বারাঃ-১৪৪)

কিন্তু মানুষ দূরে থাকার কারণে যদি কা'বা দেখতে না পায়-যদিও সে মক্কায় থাকে- তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে ক্বিবলার দিকে মুখ ফেরানো। এ ক্ষেত্রে মূল ক্বিবলা থেকে সামান্য সরে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। এ কারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাবাসীদের বলেন, (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) "পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও তার বাড়ি ঘরের ফযীলত। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কা'বা ও তার দেয়াল ভাঙ্গা।

স্থানে রয়েছে ক্বিবলা।"[1] কেননা মদীনার অধিবাসীগণ দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। সুতরাং তা যদি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি স্থানে হয়, তবেই ক্বিবলা ঠিক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যারা পশ্চিম দিকে নামায পড়ে, তাদের ক্বিবলা হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণের মাঝামাঝি স্থানে।

প্রশ্নঃ (২২১) একদল লোক ক্বিবলামুখী না হয়েই নামাযআদায় করে নিয়েছে। তাদের এই নামাযের কি হবে ?

উত্তরঃ এ মাসআলাটির দু'টি অবস্থা হতে পারেঃ

প্রথম অবস্থাঃ তারা এমন স্থানে ছিল, যেখানে থেকে ক্বিবলা কোন দিকে জানা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেমন তারা সফরে ছিল এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফলে ক্বিবলা কোন দিকে বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় অনুমান ও গবেষণা করে ক্বিবলা নির্ধারণ করবে। নামায শেষে যদি জানা যায় তাদের ক্বিবলা ঠিক ছিলনা, তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা তারা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করেছে। আল্লাহ্ বলেন, **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর।"(সূরা তাগাবুনঃ-১৬) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (**إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ**) "আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ করলে, সাধ্যানুযায়ী তোমরা তা বাস্তবায়ন করবে।"[2] আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ করে এই মাসআলায় বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্র অধিকারে। তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ্র মুখমন্ডল রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুপ্রশস্থ মহাজ্ঞানী।" (সূরা বাক্বারাঃ ১১৫)

দ্বিতীয় অবস্থাঃ তারা এমন স্থানে ছিল, কাউকে ক্বিবলা বিষয়ে প্রশ্ন করলেই সমাধান পেয়ে যেত। কিন্তু তারা উদাসীনতা দেখিয়েছে। তাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে এই নামায ফিরিয়ে পড়া। এই ভুলের কথা নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে জানা যাক বা পরে। কেননা এক্ষেত্রে ক্বিবলা নির্ধারণ করতে তাদের ভূল হয়ে গেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ক্বিবলা ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু তারা মানুষকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করে ভুল করেছে। অলসতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। তবে জানা উচিত ক্বিবলার দিক থেকে সামান্য সরে গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। ডান দিকে বা বাম দিকে সামান্য সরে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[1] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্বিবলা। ইবনু মাজাহ্ (হা/ ১০১১) মুস্তাদরাক হাকেম (১/ ২২৫)তিনি হাদীছটি কে ছহীহ্ বলেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাব ও সুন্নাত আঁকড়ে ধরা, অনুচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ্ [ﷺ] এর সুন্নাতের অনুসরণ করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ জীবনে একবার হজ্জ ফরয।

সাল্লাম) মদীনার অধিবাসীদের বলেন, (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَـــةٌ) "পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে ক্বিবলা।"[1] অতএব যারা কা'বা থেকে উত্তর দিকে রয়েছে তাদেরকে আমরা বলবঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্বিবলা। অনুরূপ তাদের ক্ষেত্রে যারা দক্ষীণ দিকে থাকে। আর যারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে থাকে, তাদের ক্বিবলা হচ্ছে উত্তর ও দক্ষীণ দিকের মধ্যবর্তী স্থানে। অতএব সামান্য বাঁকা হলে নামাযে কোন প্রভাব পড়বে না বা ক্ষতি হবেনা।

উল্লেখ্য যে, মসজিদুল হারামে যারা কা'বা ঘর প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম তাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মূল কা'বাকে সামনে রাখা। কেননা মূল কা'বা থেকে কিছুটা বাঁকা হয়ে দাঁড়ালে সে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালোনা। দেখা যায় অনেক লোক মসজিদুল হারামে দীর্ঘ কাতারে দাঁড়িয়ে পড়ে, অথচ মূল কা'বার সম্মুখবর্তী হয় না। নিশ্চিতভাবে এদের অনেকেই মূল কা'বা থেকে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। এটা বিরাট ধরণের ভুল। এব্যাপারে সতর্ক হওয়া ওয়াজিব। উদাসীন হওয়া উচিত নয়। কেননা এভাবে নামায আদায় করলে ক্বিবলা ছাড়া নামায পড়া হবে। ফলে নামায বিশুদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অনুপস্থিত রয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (২২২) নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) "কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করবে।"[2] (বুখারী ও মুসলিম) নিয়ত আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প। নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর। তা মুখে উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি যখন ওযু করবেন তখন এটাই একটা নিয়ত। একজন বিবেকবান, সুস্থ মস্তিস্ক, বাধ্য করা হয়নি এমন লোক কোন কাজ করবে আর সেখানে তার কোন নিয়ত বা ইচ্ছা থাকবে না এটা সম্ভব নয়। এজন্য কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, (নিয়ত ছাড়া কোন আমল করা যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি আবশ্যক করতেন, তবে তা হতো সাধ্যাতিত কাজ চাপিয়ে দেয়ার অন্তর্গত।)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে কোন দলীল প্রমাণিত নেই। না প্রমাণিত আছে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে। যারা মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করে আপনি দেখবেন তারা হয় মূর্খ নতুবা কোন আলেম বা মুরব্বীর অন্ধানুসারী। মুখে নিয়ত পাঠকারীদের যুক্তি হচ্ছে, অন্তরের ইচ্ছার সাথে মুখের কথা ও

---

[1]. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্বিবলা। ইবনু মাজাহ্ (হা/ ১০১১) মুস্তাদরাক হাকেম (১/ ২২৫)তিনি হাদীছটি কে ছহীহ্ বলেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন।

[2]. বুখারী অধ্যায়ঃ ওহীর সূচনা। হা/১ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত হা/ ৩৫৩০

কাজের মিলের জন্য নিয়ত পাঠ করা উচিত। কিন্তু তাদের এ যুক্তি অসাড়। একাজ শরীয়ত সম্মত হলে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা বা কাজে উম্মতের সামনে তার বর্ণনা পাওয়া যেত। (আল্লাহ্ই তাওফীক দাতা)

প্রশ্নঃ (২২৩) নফল নামায আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ফরয নামায আদায় করার বিধান কি ? যেমন তারাবীহ্র নামাযের ইমামের পিছনে এশা ছালাত আদায় করা?

উত্তরঃ তারাবীহ্র নামাযের ইমামের পিছনে এশা ছালাত আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, কোন লোক যদি সফরে থাকে আর তথাকার ইমামকে নামাযের প্রথম থেকেই পায়, তবে তার সাথেই সালাম ফেরাবে। নতুবা ইমামের সালামের পর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে।

মুসাফিরের মুকীম ইমামের পিছনে নামায পড়ার বিধান

প্রশ্নঃ (২২৪) মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের শেষ দু'রাকাত নামাযে শরীক হয়। তবে কছরের নিয়ত করে উক্ত দু'রাকাআত শেষে ইমামের সাথে সালাম ফেরানো জায়েয হবে কি ?

উত্তরঃ কোন মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের পিছনে নামাযে দন্ডায়মান হয়, তবে কছরের নিয়ত করা জায়েয হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا "ইমামের সাথে তোমরা যেটুকু ছালাত পাবে তা আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা সালামের পর পূর্ণ করবে।"[1] অতএব মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের সাথে শেষ দু'রাকাআতে শামিল হয়, তবে ইমামের সালামের পর অবশিষ্ট দু'রাকআত পূর্ণ করা ওয়াজিব। (আল্লাহ্ অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্নঃ (২২৫) নামাযে শামিল হওয়ার জন্য দ্রুত পায়ে হেঁটে আসার বিধান কি ?

উত্তরঃ নামাযে শামিল হওয়ার জন্য দ্রুত পায়ে হেঁটে আসা নিষিদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

"যখন নামাযের ইক্বামত প্রদান করা হয় তখন তাড়াহুড়া করে নামাযের দিকে আসবে না। বরং হেঁটে হেঁটে ধীরস্থীরতা এবং শান্তভাবে আগমন করবে। অতঃপর নামাযের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।"[2] অবশ্য কোন কোন বিদ্বান বলেন, ইমাম যদি রুকূতে থাকে তখন রুকূ পাওয়ার জন্য

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে দ্রুত যাবেনা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ ধীরস্থীরভাবে মসজিদে আগমণ করা।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ ধীরস্থীরভাবে মসজিদে আগমণ করা।

সামান্য জোরে হেঁটে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু লোকেরা খুব জোরে হাঁটে বা দৌড় শুরু করে। এটাই নিষিদ্ধ। কিন্তু হাদীছের প্রতি আমল করে ধীর-স্থীর ও প্রশান্তির সাথে হেঁটে যাওয়াই উত্তম-যদিও এক বা ততোধিক রাকাআত ছুটে যায়।

প্রশ্নঃ (২২৬) জামাআত চলাবস্থায় ইমামের সাথে রাকাআত ধরার জন্য দ্রুত চলার বিধান কি ?

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ করে আপনি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেলে তাড়াহুড়া করে দ্রুত হেঁটে বা দৌড়িয়ে নামাযে শামিল হবেন না। কাতারে মিলিত না হয়ে একাকীও নামাযে দাঁড়াবেন না। কেননা জনৈক ছাহাবী আবু বাকরা (রাঃ) একাকী নামাযে দাঁড়ানোতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ "আল্লাহ্ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করে দিন। তুমি এরূপ আর কখনো করিও না।"[1]

প্রশ্নঃ (২২৭) মুছল্লীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করার বিধান কি ?

উত্তরঃ মসজিদে বসে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করলে যদি মুছল্লীদের বা শিক্ষার্থীদের বা অন্য কুরআন পাঠকের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তবে তা হারাম। কেননা এব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল বায়াযী (ফারওয়া বিন আমর) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে এসে দেখেন লোকেরা নামায আদায় করছে কিন্তু কুরআন পাঠের কণ্ঠ উঁচু শোনা যাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন,

﴿إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ﴾

"একজন মুছল্লী নামাযে আপন পালনকর্তার সাথে গোপনে কথা বলে। অতএব সে যেন লক্ষ্য করে কি বলছে তার পালনকর্তাকে। আর পরস্পরে উঁচু স্বরে কুরআন পাঠ করবে না।" [2] অনুরূপভাবে হাদীছটি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে আবু দাঊদও বর্ণনা করেন।[3]

তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযের বিধান

প্রশ্নঃ (২২৮) অনেক মানুষ ইক্বামতের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে নামায শুরু হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করে না। এরূপ করার বিধান কি ?

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ কাতারের বাইরে রুকু করা।

[2]. মুআত্বা মালেক, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ কিভাবে কুরআন পাঠ করবে। মুসনাদে আহমাদ হা/৫০৯৬।

[3]. আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ রাতের নামাযে উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করা।

উত্তরঃ নামায শুরু হওয়ার সময় যদি অতি অল্প থাকে তবে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে কোন দোষ নেই। কিন্তু ইমাম কখন আসবেন তা যদি জানা না থাকে তবে উত্তম হচ্ছে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায শুরু করে দেয়া। তারপর ইমাম যদি এসে পড়েন আর আপনি প্রথম রাকাআতে থাকেন তবে তা ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শামিল হবেন। আর দ্বিতীয় রাকাআতে থাকলে হালকাভাবে তা পূর্ণ করে নিবেন।

মসজিদুল হারামে (মক্কায়) নারী-পুরুষের কাতারের নিয়ম

প্রশ্নঃ (২২৯) মসজিদুল হারামে দেখা যায় অনেক পুরুষ ফরয নামাযের জামাআতে নারীদের পিছনেই কাতার বন্দী হয়। তাদের নামায কি বিশুদ্ধ হবে ? তাদের জন্য আপনি কিছু নসীহত করবেন কি ?

উত্তরঃ নারীদের কাতারের পিছনে পুরুষদের কাতার বেঁধে নামায আদায় করার ব্যাপারে বিদ্বানগণ বলেন এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তা সুন্নাতের বিপরীত। কেননা সুন্নাত হচ্ছে, নারীরা পুরুষদের পিছনে দাঁড়াবে। তবে মসজিদুল হারামে বর্তমান সময়ে প্রচন্ড ভীড় দেখা যায়; ফলে নারীরা কাতারবন্দী হওয়ার পর পুরুষেরা মসজিদে এসে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই কাতারবন্দী হয়। তখন অনেক সময় নারীদের কাতারের পিছনে বাধ্য হয়ে তাদেরকে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু প্রতিটি মুছল্লীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী নারীদের পিছনে কাতারবন্দী হওয়া থেকে বিরত থাকা। কেননা এতে পুরুষদের জন্য ফিতনার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব পুরুষ নারীর পিছনে নামায আদায় করা থেকে সতর্ক থাকবে। যদিও ফিক্বাহ্‌বিদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কাজ জায়েয। আর নারীদেরও উচিত দেখে শুনে পুরুষদের দাঁড়ানোর স্থান থেকে দূরে অন্য কোথাও দাঁড়ানো।

প্রশ্নঃ (২৩০) কাতার থেকে শিশু-কিশোরদেরকে সরিয়ে দেয়া জায়েয কি ?

উত্তরঃ কিশোর বা বালক যদি নামাযের কাতারে দন্ডায়মান হয়, তবে তাকে কাতার থেকে সরিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) "কোন লোক যেন অন্য লোককে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে।"[1] তাছাড়া এতে বালকের অধিকার হরণ করা হয়, তার অন্তরে দুঃখ দেয়া হয়, হতে পারে সে নামাযকে ঘৃণা করবে বা তার অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। শিশুদেরকে যদি কাতারের শেষে দাঁড় করানো হয়, তবে তারা তো একস্থানে সমবেত হয়ে হাসাহাসি ও

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ জুমআর নামায, অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে যেন না বসে। হা/৮৬০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ বৈধ কোন স্থানে যদি কেউ আগে বসে থাকে তবে তাকে সেখান থেকে উঠানো হারাম। হা/৪০৪৪।

খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়বে। ফলে মুছল্লীদের নামাযের আরো ক্ষতি হবে। কিন্তু দু'জন বা ততোধিক যদি একই স্থানে দন্ডায়মান হয় তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দু'জনের মাঝে বড়দের দাঁড়ানোতে কোন অসুবিধা নেই।[1]

প্রশ্নঃ (২৩১) দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে নামায আদায় করার বিধান কি ?

উত্তরঃ কাতারে জায়গা থাকলে দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে নামায আদায় করা জায়েয নয়। কেননা এ কারণে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[2] কিন্তু যদি স্থানের সংকুলান না হয় জায়গা না পাওয়া যায়, তবে দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই।

নারীদের জন্য উত্তম কাতার

প্রশ্নঃ (২৩২) নারীদের কাতারের বিধান কি ? তাদের জন্য উত্তম কাতার শেষেরটি এবং অনুত্তোম কাতার প্রথমটি একথাটি কি সর্বাবস্থায় নাকি একথা নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী স্থানে কোন আড়াল না থাকলে ?

উত্তরঃ নারী ও পুরুষ যদি একই স্থানে জামাআতবদ্ধ হয়ে নামাযে দাঁড়ায় তবে সেক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রথম কাতারের চেয়ে শেষের কাতার উত্তম। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) "নারীদের জন্য উত্তম কাতার হচ্ছে শেষেরগুলো আর অনুত্তোম কাতার হচ্ছে প্রথমগুলো।"[3] এটা এ কারণেই যে, কাতার যত পিছন দিকে হবে ততই তা পুরুষদের থেকে দূরে হবে। আর যত আগের দিকে হবে ততই পুরুষদের নিকটবর্তী হবে। তাই তাদের কাতার পুরুষদের থেকে যতদূরে হবে ততই কল্যাণ জনক হবে। অবশ্য এটা একই মসজিদের ভিতরের কথা। আর নারীদের নামাযের জন্য যদি স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণ করা থাকে-যেমনটি বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে দেখা যায়-তবে সেক্ষেত্রে পুরুষদের মত তাদের প্রথম কাতারই উত্তম।

প্রশ্নঃ (২৩৩) মসজিদের বাইরে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় নামায আদায় করার বিধান কি ?

উত্তরঃ মসজিদে যদি মুছল্লীদের সংকুলান না হয়, তবে বাইরে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় নামায পড়লে কোন অসুবিধা নেই। তবে ইমামের অনুসরণ করা ইমামের তাকবীর

---

[1] . কিন্তু যে সমস্ত শিশু নামায বা তার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন কিছুই বুঝে না, তাদেরকে মসজিদে না নিয়ে আসাই উত্তম। কেননা তাদের অতিরিক্ত নড়াচড়া বা খেলাধুলার কারণে মুছল্লীদের নামাযের খুশু-খুযু (বিনয়-নম্রতা) নষ্ট হয়। কেউ যদি তাদেরকে সাথে নিয়ে যদি আসতেই চায় তবে কাতারের মাঝে দাঁড় করাবে না। কাতারের একপ্রান্তে বসিয়ে রাখবে।- অনুবাদক।

[2] . আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা এটা (দু'-স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে নামাযে দাঁড়ানো) থেকে বেঁচে থাকতাম। (তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে নামাযে দাঁড়ানো মাকরূহ। ইবনু মাজার বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে নামাযে দাঁড়ালে আমাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হতো।

[3] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা।

ধ্বনী শোনা আবশ্যক।

কাতারে মুছল্লীদের পরস্পর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানোর বিধান

প্রশ্নঃ (২৩৪) কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা কি ? মুছল্লীদের পরস্পর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো কি আবশ্যক ?

উত্তরঃ কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে পায়ের গোড়ালী সমূহ বরাবর করে নেয়া, পায়ের আঙ্গুল সমূহ বরাবর করা আবশ্যক নয়। কেননা শরীরের ভিত্তি থাকে পায়ের গোড়ালীর উপর। আর পায়ের সাইজ অনুযায়ী আঙ্গুলের বিভিন্নতা হয়ে থাকে। কোন পা দীর্ঘ থাকে কোনটা খাট। সুতরাং কাতার বরাবর ও সোজা করা গোড়ালী মিলানো ছাড়া অন্য কোন ভাবে সম্ভব নয়। আর পায়ের গোড়ালী সমূহ পরস্পরে মিলিত করা নিঃসন্দেহে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তাঁরা কাতার বন্দী হওয়ার সময় গোড়ালী সমূহ একজন অপরজনের সাথে মিলিত করে দিতেন।[1] অর্থাৎ-প্রকৃতভাবে কাতার সোজা ও বরাবর করার জন্য তাঁদের একজন পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিত করে দাঁড়াতেন। কিন্তু কাতার বন্দীর ক্ষেত্রে এটাই আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কাজ কাতার বরাবর সোজা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য করতে হয়। এ কারণে কাতারে দাঁড়ানোর পর উচিত হচ্ছে প্রত্যেকে পার্শবর্তী মুছল্লীর পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিবে, যাতে নিশ্চিত হতে পারে যে, কাতার সোজা হয়েছে। পূর্ণ নামাযে এভাবে পরস্পরের পাগুলোকে মিলিয়ে রাখা আবশ্যক নয়।

অনেকে বাড়াবাড়ি করে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর পায়ের সাথে গোড়ালী মিলাতে গিয়ে নিজের দু'পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক সৃষ্টি করে ফেলে। এটা যেমন সুন্নাত বিরোধী হয় অনুরূপভাবে পরস্পরের কাঁধ থেকেও বহু দূরে চলে যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে গোড়ালী ও কাঁধ সমূহ বরাবর থাকা।

নামাযে রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলনের বিধান

প্রশ্নঃ (২৩৫) নামাযে চারটি স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হাত উত্তোলনের কথা কি প্রমাণিত আছে ? অনুরূপভাবে জানাযা ও দু'ঈদের নামাযের তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করার কি বিধান ?

উত্তরঃ নামাযে যে চার স্থানে রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা সুন্নাত তা জেনে

---

[1] . আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমাদের একজন পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন। (বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ পরস্পরে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো।)

নেয়া আবশ্যক। (১) নামাযের প্রারম্ভে তাকবীর তাহরিমা বলার সময় (২) রুকূতে যাওয়ার সময় (৩) রুকূ থেকে উঠার সময় (৪) প্রথম তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় রাকাআতে উঠার সময়। এচারটি স্থানের বিষয়ে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা এসেছে। ইবনু ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)

"রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'কাঁধ বরাবর হাত দু'টিকে উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন) করতেন-যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ হাত দু'টিকে উঠাতেন এবং বলতেন 'সামিয়াল্লাহুলিমান হামীদাহ্ রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু।' তিনি বলেন, সিজদার সময় তিনি এরূপ করতেন না।" [1]

ইবনু ওমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্রিয়াকলাপ সমূহ অতি সুক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করতেন ও তার অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর নামাযের নিয়ম-কানুনগুলো অনুসন্ধান করে যা দেখেছেন তা ছিল-তাকবীরে তাহরিমা, রুকূ করা, রুকূ থেকে উঠা এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলন করা। আর তিনি বলেছেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ হাত উঠানো সিজদার সময় করতেন না। এরকম বলা ঠিক হবে না যে, হয়তো ইবনু ওমার সিজদার সময় হাত উঠানোর অবস্থাগুলো দেখেন নি বা সে সময় সতর্ক ছিলেন না। কেননা তিনি কিছু কিছু স্থানের বর্ণনা দেয়ার পর বলেছেন-এরূপ তিনি সিজদর সময় করতেন না। এদ্বারা বুঝা যায় তিনি নিশ্চিত হয়েই এ কথা বলেছেন-সন্দেহ বা সংশয়ের উপর ভিত্তি করে নয়। আর জানাযা ও দু'ঈদের প্রত্যেক তাকবীরে রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্নঃ (২৩৬) ইমামকে নামাযেরুকূ অবস্থায় পেলে কয়টি তাকবীর দিতে হবে ?

উত্তরঃ ইমামের রুকূ অবস্থায় কোন মানুষ যদি নামাযে শামিল হয় তবে তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে সরাসরি রুকূ করবে। এঅবস্থায় রুকূর জন্য তাকবীর প্রদান করা সুন্নাত-ওয়াজিব নয়। তবে রুকূর জন্য আলাদা তাকবীর প্রদান করা উত্তম। তাকবীর না দিলেও কোন অসুবিধা নেই। এখানে কয়েকটি অবস্থা লক্ষণীয়ঃ

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ প্রথম তাকবীর বলার সময় হাত উত্তোলন করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব...।

প্রথম অবস্থাঃ ইমাম রুকূ থেকে উঠার আগে মুক্তাদী[1] রুকূ করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। তাহলেই এটা রাক্আত বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ রুকূতে যাওয়ার আগেই ইমাম রুকূ হতে উঠে গেছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। এ অবস্থায় তার ঐ রাকাআত ছুটে গেল। তাকে তা সালামের পর আদায় করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থাঃ মুক্তাদি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেয়েছে কি না বা সে রুকূতে যাওয়ার আগেই ইমাম উঠে গিয়েছেন কি না এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ বা সন্দেহে থাকবে। তার ধারণা যদি প্রবল হয় যে সে রুকূ অবস্থাতেই ইমামকে পেয়েছে, তবে সে রাকাআত পেয়ে গেল। আর ধারণা যদি প্রবল হয় যে, ইমামকে রুকূ অবস্থায় পায়নি, তবে তার রাকাআত ছুটে গেল। এ অবস্থায় যদি তার নামাযের কোন কিছু ছুটে যায় তবে সালামের পর সে সাহু সিজদা করবে। আর যদি কোন কিছু না ছুটে থাকে-অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত রাকাআতটি প্রথম রাকাআত হয়, কিন্তু তার প্রবল ধারণা যে, সে রুকূ পেয়েছে। এ অবস্থায় সাহু সিজদা রহিত হয়ে যাবে। কেননা তার নামায ইমামের নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট। তার নামাযের কোন অংশ যদি ছুটে না যায় তবে ইমাম তার সাহু সিজদার ভার গ্রহণ করবে।

সন্দেহের আরেকটি অবস্থা রয়েছে। তা হচ্ছে, রুকূ পেল কি না সে ব্যাপারে মুক্তাদী সন্দেহে থাকবে-কোনো দিক তার কাছে প্রাধান্য পাবে না। সে অবস্থায় নিশ্চিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করবে। অর্থাৎ-রুকূ পায়নি। অতঃপর শেষে এই ছুটে যাওয়া রাকাআত আদায় করে সালাম ফেরানোর পূর্বে সাহু সিজদা করবে।

এখানে আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করা জরূরী মনে করছি। ইমাম রুকূতে গেলে অনেক লোক (যারা পরে নামাযে শামিল হচ্ছে) জোরে জোরে গলা খোকরানী দেয়, কেউ কেউ বলে (ইন্নাল্লাহা মা'আছ্ ছাবেরীন), কখনো জোরে জোরে পা ফেলে। যাতে করে ইমাম একটু দেরী করে রুকূ থেকে উঠেন। এ সমস্ত কাজ সুন্নাতের খেলাফ। এতে ইমাম এবং মুক্তাদীদের নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হয়। আবার ইমাম রুকূ অবস্থায় থাকলে অনেকে দ্রুত বরং খুব জোরে দৌড়িয়ে নামাযে আসে। অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

[1] . ইমামের পিছনে নামায আদায়কারী সকল মুছল্লীকে মুক্তাদী বলা হয়। আর নামাযের কিছু অংশ চলে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি নামাযে শামিল হয় তাকে বলা হয় মাসবূক।- অনুবাদক

"যখন নামাযের ইকামত প্রদান করা হয় তখন তাড়াহুড়া করে নামাযের দিকে আসবে না। বরং হেঁটে হেঁটে ধীর-স্থীরতা এবং প্রশান্তির সাথে আগমণ করবে। অতঃপর নামাযের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।"[1]

নামাযে হাত বাঁধা

প্রশ্নঃ (২৩৭) ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তা কি বুকের উপর বা অন্তরের (heart) উপর রাখবে নাকি নাভীর নীচে রাখবে ? হাত বাঁধার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি ?

উত্তরঃ নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। সাহাল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)

"লোকেরা নির্দেশিত হত যে, নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করবে।"[2] কিন্তু হাত দু'টিকে কোন স্থানে রাখবে? বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, হাত দু'টি বুকের উপর রাখবে। ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ)

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করতেন।"[3] হাদীছটিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এক্ষেত্রে বর্ণিত অন্যান্য হাদীছের তুলনায় এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী। আর বুকের বাম সাইডে অন্তরের উপর হাত বাঁধা একটি ভিত্তিহীন বিদআত। নাভীর নীচে হাত বাঁধার ব্যাপারে আলী (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তা দুর্বল।[4] ওয়ায়েল বিন হুজুর বর্ণিত হাদীছটি অধিক শক্তিশালী।

নামাযের নিয়ম-পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সমস্ত বিধানে নারী-পুরুষ বরাবর। দলীল ছাড়া উভয়ের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা বৈধ

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ ধীরস্থীরভাবে মসজিদে আগমণ করা।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।

[3] . আবু দাউদ, ইবনু খুযায়মা, আহমাদ। ছহীহ্ বুখারীতে উল্লেখিত হাদীছটি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুকের উপর হাত বাঁধাই প্রমাণিত করে। ইমাম আলবানী ইবনু খুযায়মা বর্ণিত হাদীছকে ছহীহ্ বলেছেন। (দেখুনঃ রাসূলুল্লাহ্ [ﷺ] এর নামাযের পদ্ধতী পৃঃ ৮৮)তিনি আ রো বলেন, এর বিপরীত হাদীছগুলো হয় দুর্বল, না হয় ভিত্তিহীন।- অনুবাদক

[4] . হাদীছটি এরূপঃ "সুন্নাত হচ্ছে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে স্থাপন করা।" (আহমাদ, আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।) ইমাম নববী বলেন, এর সনদে আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল ওয়াসেত্বী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। মুহাদ্দেছীনদের ঐকমত্যে সে দুর্বল। সুতরাং এ হাদীছ আমলযোগ্য নয়।- অনুবাদক

নয়। এই সুন্নাতের ক্ষেত্রে নারী বুকের উপর হাত বাঁধবে বা তার বিপরীত কোন কাজ ছহীহ্ সুন্নাত বা হাদীছ থেকে আমার জানা নেই।[1]

প্রশ্নঃ (২৩৮) স্বশব্দে 'বিসমিল্লাহ্…" পাঠ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ সঠিক কথা হচ্ছে, স্বশব্দে 'বিসমিল্লাহ্..'পাঠ করা উচিত নয়। সুন্নাত হচ্ছে নীরবে পাঠ করা। কেননা 'বিসমিল্লাহ্.'সূরা ফাতিহার অংশ নয়। কিন্তু কখনো যদি স্বশব্দে তা পাঠ করে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বরং কখনো স্বশব্দে 'বিসমিল্লাহ্.'পাঠ করা উচিত। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "তিনি কখনো স্বশব্দে 'বিসমিল্লাহ্.'পাঠ করতেন।"[2] কিন্তু বিশুদ্ধভাবে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে, "তিনি উহা স্বশব্দে পাঠ করতেন না।"[3] আর এটাই উত্তম। তবে যদি কখনো বিসমিল্লাহ্ স্বশব্দে পাঠ করে এতে কোন অসুবিধা হবে না।

প্রশ্নঃ (২৩৯) দু'আ ইস্তেফ্তাহ্ বা নামায শুরুর দু'আ (ছানা) পাঠ করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ নামায শুরুর দু'আ (ছানা) ফরয-সুন্নাত সকল নামাযে পাঠ করা সুন্নাত-ওয়াজিব নয়। উচিত হচ্ছে মুছল্লী নামায শুরুর দু'আ সমূহ থেকে একবার এটা একবার ওটা পাঠ করবে। যাতে করে সকল সুন্নাতের উপর আমল করা সম্ভব হয়। একটি দু'আ ছাড়া আর কিছু জানা না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের দু'আ পাঠ করেছেন। যেমন, নামাযের শুরুতে, তাশাহুদে, নামাযের পরের যিকির। এ ধরণের বিভিন্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতের জন্য সহজ করা। এর দু'টি উপকারিতা আছেঃ

প্রথম উপকারিতাঃ মানুষ সর্বদা এক ধরণের দু'আ পাঠ করবে না। কেননা একটা বিষয় সর্বদা করতে থাকলে সেটা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় উদাসীনতা বা অলসতা থাকলেও অভ্যাস বশতঃ তা হয়ে যায়। তখন অন্তরের উপস্থিতি সেখানে দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু দু'আগুলো থেকে যদি কখনো এটা কখনো ওটা পাঠ করে তবে অন্তর উপস্থিত থাকে। যা বলে তা বুঝার দরকার পড়ে।

---

[1] . অনুরূপভাবে রুকূ করা, সিজদা করা, তাশাহুদে বসা প্রভৃতি পদ্ধতিতে নারী পুরুষের মত করেই নামায আদায় করবে। বিপরীত কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা প্রচলিত নিয়মে রুকূ সিজদা করে থাকে- রুকূর সময় সামান্য একটু মাথা নত করে, সিজদার সময় অনেকটা শুয়ে পড়ে ইত্যাদি নিয়ম সুস্পষ্টভাবে নবী মুহাম্মাদ[ﷺ]এর সুন্নাত বিরোধী।- অনুবাদক

[2] . নাসাঈ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ বিসমিল্লাহির… পাঠ করা। ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযায়মা, দারাকুতনী ও বায়হাক্বী।

[3] . আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নামায আদায় করেছি- রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পিছনে, আবু বকর ও ওমরের (রাঃ) পিছনে। তাদের কারো থেকে বিসমিল্লাহ্ পাঠের আওয়াজ শুনিনি।" মুসলিম অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ যারা বলেন বিসমিল্লাহ্ স্বশব্দে পড়া যাবে না তাদের দলীল।

দ্বিতীয় উপকারিতাঃ উম্মতের জন্য সহজ করা। যার জন্য যেটা সহজ হবে সেটাই পাঠ করবে। সময় ও প্রয়োজন মোতাবেক কখনো এটা কখনো ওটা পাঠ করবে।

প্রশ্নঃ (২৪০) 'আমীন' বলা কি সুন্নাত ?

উত্তরঃ হ্যাঁ। আমীন বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। বিশেষ করে ইমাম যখন আমীন বলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

"ইমাম যখন আমীন বলেন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেস্তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে।"[1] ইমাম ও মুক্তাদীর আমীন বলা একই সময়ে হতে হবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ইমাম যখন আমীন বলেন তোমরাও আমীন বলবে।"

প্রশ্নঃ (২৪১) (ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন) পাঠ করার সময় 'আমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাই'। এরূপ কথা বলার বিধান কি ?

উত্তরঃ মুক্তাদীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে ইমামের পড়া চুপ করে শোনা। ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলবেন সেও আমীন বলবে। এই আমীন বলা ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় কোন দু'আ ইত্যাদি বলা থেকে যথেষ্ট হবে।

প্রশ্নঃ (২৪২) নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে বিদ্বানদের থেকে নিম্নরূপ মত পাওয়া যায়।

প্রথম মতঃ নামাযে কখনই সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়। স্বরব, নীরব কোন নামাযেই ইমাম, মুক্তাদী, একাকী-কারো জন্য পাঠ করা ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব হচ্ছে কুরআন থেকে সহজ যে কোন কিছু পাঠ করা। তাদের দলীল হচ্ছেঃ আল্লাহ্ বলেন, (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ) "অতএব তোমরা কুরআন থেকে সহজ কোন কিছু পাঠ কর।" (সূরা মুযাম্মিল-২০) তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায শেখাতে গিয়ে গ্রাম্য লোকটিকে বলেছিলেন, "কুরআন থেকে তোমার জন্য সহজ হয় এমন কিছু পাঠ করবে।"[2]

দ্বিতীয় মতঃ স্বরব, নীরব সকল নামাযে ইমাম, মুক্তাদী, একাকী-সবার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন বা অবশ্য কর্তব্য। অনুরূপভাবে মাসবূক এবং নামাযের প্রথম থেকে জামাআতে শামিল ব্যক্তির জন্যও রুকন।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমামের জোরে আমীন বলা। হা/ ৭৩৮ মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ তাসমী, তাহমীদ ও আমীন।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম ও মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

তৃতীয় মতঃ ইমাম ও একাকী ব্যক্তির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন। কিন্তু স্বরব বা নীরব কোন নামাযেই মুক্তাদীর জন্য ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ মতঃ ইমাম ও একাকী ব্যক্তির জন্য স্বরব বা নীরব নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন। কিন্তু মুক্তাদীর জন্য নীরবের নামাযে রুকন স্বরব নামাযে নয়।

আমার মতে প্রাধান্যযোগ্য মতটি হচ্ছেঃ স্বরব, নীরব সকল নামাযে ইমাম, মুক্তাদী, একাকী-সবার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন বা ফরয। তবে মাসবূক যদি ইমামের রুকূর সময় নামাযে শামিল হয়, তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে। এ কথার দলীল হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাধারণ বাণীঃ তিনি বলেন,

(**لاصَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَـــةِ الْكِتَـــابِ**) "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার নামায হবে না।"[1] তিনি আরো বলেন,

(**مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ**)

"যে ব্যক্তি নামায আদায় করবে অথচ তাতে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার ছালাত অসম্পূর্ণ-রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কথাটি তিনবার বলেছেন।"[2] অর্থাৎ- তার নামায বাতিল। উবাদা বিন ছামেত বর্ণিত হাদীছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ফজরের নামায শেষ করে ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেনঃ

(لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)

"তোমরা কি ইমামের পিছনে কোন কিছু পাঠ কর ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্রুত পাঠ করে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করো না। তবে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি উহা পাঠ করবে না তার নামায হবে না।"[3] স্বশব্দের নামাযের ক্ষেত্রে এটি সুস্পষ্ট দলীল যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না।

কিন্তু মাসবূকের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে। এ কথার দলীল হচ্ছেঃ আবু বাকরা (রাঃ) এর হাদীছ। তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রুকূ অবস্থায় পেলেন। তখন দ্রুতগতিতে কাতারে পৌঁছার আগেই তিনি রুকূ করলেন। এরপর ঐ অবস্থায় হেঁটে হেঁটে কাতারে প্রবেশ করলেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ করেছে ? আবু বাকরা বললেন,

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ক্বিরআত পাঠ করা ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ সূরা ফতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ সূরা ফতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

[3] . আহমাদ, আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ নামাযে যে ব্যক্তি ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিল। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করার বর্ণনা।

আমি হে আল্লাহ্র রাসূল! নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ زَادَكَ اللَّـهُ حِرْصًا وَلَـا تَعُـدْ "আল্লাহ্ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে এরূপ আর কখনো করিও না।"[1] এহাদীছে দেখা যায় আবু বাকরা যে রাকাআতটি ছুটে যাওয়ার ভয়ে তাড়াহুড়া করলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ঐ রাকাআতটি পুনরায় আদায় করার আদেশ করলেন না। এটা ওয়াজিব হলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে আদেশ করতেন। যেমনটি আদেশ করেছিলেন ঐ ব্যক্তিকে যে কিনা তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করেছিল, আর নামাযের রুকন-ওয়াজিব যথাযথভাবে আদায় করছিল না। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নামায ফিরিয়ে পড়ার আদেশ করেছিলেন।

মাসবূকের সূরা ফাতিহা পাঠ রহিত হওয়ার যুক্তিগত দলীল হচ্ছেঃ এই মাসবূক তো কিরআত পাঠ করার জন্য দাঁড়ানোর সুযোগই পায়নি। অতএব সুযোগ না পেলে তার আবশ্যকতাও রহিত হয়ে যাবে। যেমন-হাত কাটা ব্যক্তি ওযু করার সময় তার হাতের কাটা অংশের পরিবর্তে বাহু ধৌত করবে না। বরং ধৌত করার স্থান উপস্থিত না থাকার কারণে এ ফরয রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেল তার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা রহিত হয়ে যাবে। কেননা ক্বিরআত পাঠ করার জন্য দন্ডায়মান হওয়ার সুযোগই সে পায়নি। আর ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে এখানে দন্ডায়মান হওয়াও রহিত হয়ে যাবে।

আমার দৃষ্টিতে এমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। পূর্বোল্লেখিত উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) এর হাদীছটি-(ফজরের নামাযে ক্বিরআত পাঠ সংক্রান্ত হাদীছটি) যদি না থাকতো, তবে স্বরবে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক হতো না। আর সেটাই হতো প্রাধান্যযোগ্য মত। কেননা নীরবে শ্রবণকারী পাঠকের মতই ছাওয়াবের অধিকারী হয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ) কে বলেনঃ قَدْ أُجِيبَـتْ دَعْوَتُكُمَـا "তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হয়েছে।" (সূরা ইউনূসঃ ৮৯) অথচ সে সময় দু'আ শুধু মাত্র মূসা (আঃ) এককভাবে করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَـبِيلِكَ رَبَّنَـا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾

"আর মূসা বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি ফেরাউন ও তার সভাসদদের প্রদান করেছো দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য, সৌন্দর্য ও সম্পদ। হে আমাদের পালনকর্তা! ওরা আপনার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ কাতারের বাইরে রুকু করা।

সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, তাদের হৃদয় কঠোর করে দিন, যাতে তারা ঈমান না আনে। যাতে করে তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে।" (সূরা ইউনূসঃ ৮৮) এখানে কি আল্লাহ্ হারূনের দু'আর কথা উল্লেখ করলেন ? উত্তরঃ না। তারপরও আল্লাহ্ বললেনঃ "তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হয়েছে।" বিদ্বানগণ বলেনঃ এক ব্যক্তি দু'আ করা সত্ত্বেও দ্বিবচন শব্দ এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, মূসা (আঃ) দু'আ করছিলেন আর হারূন (আঃ) আমীন বলছিলেন।

আর আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ: (من كان له إمام، فقراءة الإمام له قـــراءة) "যার ইমাম রয়েছে, তার ইমামের ক্বিরাতই তার ক্বিরাত (হিসেবে যথেষ্ট)।"[1] কিন্তু হাদীছের সনদ যঈফ (দুর্বল)। কেননা তা মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাফেয ইবনু কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন। আরো কয়েকটি সূত্রে হাদীছটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই ছহীহ্ নয়। তারপরও হাদীছটি দ্বারা যারা দলীল নিয়ে থাকে তারা সাধারণভাবে বলেন না যে, কোন অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকে বলেনঃ নীরবের নামাযে মুক্তাদীকে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ ইমাম যদি না থামেন (অর্থাৎ- ফাতিহা শেষ করার পর মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ করার সুযোগ দেয়ার জন্য কিছু সময় নিরব না থাকেন।) তবে মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ? উত্তর হচ্ছেঃ ইমামের পড়ার সময়ই মুক্তাদী পড়বে। কেননা ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পড়ার সাথে সাথেই পড়তেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ (لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا) "তোমরা উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে না তার নামায হবে না।"

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময়

প্রশ্নঃ (২৪৩) মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে? ইমামের ফাতিহা পাঠ করার সময়? নাকি ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করে অন্য সূরা পাঠ শুরু করলে ?

উত্তরঃ উত্তম হচ্ছে ইমামের ফাতিহা পাঠ শেষ হওয়ার পর মুক্তাদী ফাতিহা পাঠ করবে। কেননা ফরয ক্বিরআত পাঠ করার সময় নীরব থাকা রুকন। ইমামের পড়ার সময় যদি মুক্তাদীও পাঠ করে তবে রুকন আদায় করার সময় নীরব থাকা হল না। আর ফাতিহা পাঠ করার পর যখন ইমাম অন্য ক্বিরআত শুরু করবে, সে সময় তা শোনার জন্য নীরব

[1] . আহমাদ ৩/৩৩৯ ইবনু মাজাহ্ অধ্যায়ঃ নামায প্রতিষ্ঠা করা, অনুচ্ছেদঃ যখন ইমাম ক্বিরআত পড়বেন।

থাকা মুস্তাহাব। অতএব উত্তম হল, ফাতিহা পাঠ করার সময় নীরব থাকবে। নামাযের সুন্নাত ক্বিরআত পাঠের সময় নীরব থাকার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অন্যতম রুকন সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা। তাছাড়া ইমামের 'ওয়ালায্ যওয়াল্লীন' বলার সময় মুক্তাদীও ('ওয়ালায্ যওয়াল্লীন') পাঠ করলে তাঁর সাথে 'আমীন' বলা সম্ভব হবে না।

প্রশ্নঃ (২৪৪) নামায বা কুরআন তেলাওয়াতের সময় কিভাবে অন্তর নরম করা যায় ?

উত্তরঃ বিনয়-নম্রতা নামাযের অন্তঃসার ও আসল প্রাণ। এর অর্থ হচ্ছে, অন্তরের উপস্থিতি। ডানে-বামে অন্তরকে নিয়ে ঘুরাফেরা না করা। বিনয়-নম্রতা বিরোধী কোন কিছু যদি মানুষের অন্তরে আসে তবে সে পাঠ করবে 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।' যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ করেছিলেন। এ কথায় সন্দেহ নেই যে, শয়তান মানুষের সমস্ত ইবাদত বিশেষ করে সর্বোত্তম ইবাদত নামায বিনষ্ট করার জন্য সর্বাধিক আগ্রহী। নামাযরত ব্যক্তির কাছে শয়তান আগমণ করে বলে, উমুক কথা স্মরণ কর, উমুক কথা স্মরণ কর। তাকে এমন কিছুর খেয়ালে নিয়ে যায় যাতে কোন উপকার নেই। আবার নামায শেষ হলে এ সমস্ত খেয়াল শেষ হয়ে যায়।

অতএব মানুষের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত আদায় করার জন্য সবচেয়ে বেশী মনযোগী ও বিনয়ী হওয়া। কেননা সে তো মহান আল্লাহ্র সামনে দন্ডায়মান। তাঁর সাথে গোপনে কথা বলছে। মনে করবে সে যেন মহান আল্লাহকে দেখছে বা এতটুকু মনে করবে যে, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। আর যখনই শয়তানের কুমন্ত্রণা ও বদখেয়াল মনের দুয়ারে উঁকি দিতে চাইবে তখনই আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইবে। পাঠ করবেঃ 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।'

প্রশ্নঃ (২৪৫) সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর কিছুক্ষণ চুপ থাকার বিধান কি ?

উত্তরঃ ফিক্বাহবিদদের মধ্য থেকে কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা শুরু করার পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকবেন, যাতে করে মুক্তাদী ফাতিহা পাঠ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে তা হচ্ছে সামান্য বিরতী নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য এবং এই ফাঁকে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পাঠ করা আরম্ভ করে দিবে। এরপর ইমাম অন্য ক্বিরাত শুরু করে দিলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা সূরা ফাতিহা পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য রুকন। কিন্তু ইমামের ক্বিরআত শ্রবণ করা তার জন্য মুস্তাহাব। মোটকথা নীরব থাকার মুহূর্তটি অতি সামান্য দীর্ঘ নয়।

প্রশ্নঃ (২৪৬) ফজরের এক রাকাআত নামায ছুটে গেলে বাকী রাকাআতটি কি স্বশব্দে না নীরবে পাঠ করবে ?

উত্তরঃ বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু উত্তম হচ্ছে নীরব কণ্ঠে পাঠ করা। কেননা জোর কণ্ঠে পাঠ করলে হয়তো অন্য মুছল্লীদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

রুকূ থেকে উঠার পর আবার হাত (বুকের উপর) বাঁধার মাসআলা

প্রশ্নঃ (২৪৭) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাযের পদ্ধতির উপর লিখিত একটি পুস্তকে পড়লাম, রুকূ থেকে উঠার পর আবার হাত বাঁধা একটি বিভ্রান্তকর বিদআত। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা কি? আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

উত্তরঃ যে বিষয়ে ইজতেহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে সে বিষয়ে কাউকে সুন্নাতের পরিপন্থী বিদআতী বলতে আমি সংকোচ বোধ করি। এটা উচিত নয়। যারা রুকূ থেকে উঠে আবার হাত বাঁধেন, তারা নিজেদের মতের পক্ষে সুন্নাত থেকে দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। এ বিষয়টি কারো গবেষণার বিরোধী হলে তাকে সরাসরি বিদআতী বলা খুবই কঠিন বিষয়। এ ধরণের বিষয়ে বিদআত শব্দ উচ্চারণ করা করো জন্য উচিত নয়। কেননা যে সকল বিষয়ে গবেষণার অবকাশ থাকে এবং হতে পারে একথা সত্য অথবা ঐ কথা সত্য, তাতে পরস্পরে বিদআতের অপবাদ দিতে শুরু করলে মুসলিম সমাজে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে, একে অপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সূচনা হবে। ইসলামের শত্রুরা তা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ রুকূ থেকে উঠার পর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকে স্থাপন করা একটি সুন্নাত। **দলীলঃ** সাহাল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "লোকেরা নির্দেশিত হত যে, নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করবে।"[1] গভীরভাবে লক্ষ্য করে ও অনুসন্ধান করে হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করার যুক্তি সমূহ হচ্ছেঃ

*** যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ সিজদার সময় হাত দু'টি কোথায় থাকবে ?**

উত্তরঃ যমীনের উপর।

প্রশ্নঃ রুকূ অবস্থায় হাত কোথায় থাকবে?

উত্তরঃ হাঁটুদ্বয়ের উপর।

প্রশ্নঃ বসাবস্থায় হাত দু'টি কোথায়?

উত্তরঃ রানের উপর।

এখন থাকল দাঁড়ানো অবস্থার কথা। রুকূর আগে ও পরে উভয় অবস্থা হচ্ছে দাঁড়ানো। আর তা এই বাণীর অন্তর্ভূক্ত হবেঃ "লোকেরা নির্দেশিত হত যে, নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করবে।" অর্থাৎ-রুকূর আগে বা পরে যে কোন অবস্থার দাঁড়ানোতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে। এটাই হচ্ছে সত্য,

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।

সুন্নাতে নববী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার প্রমাণ বহণ করে। মোটকথা উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দু'টি পয়েন্টে বিভক্তঃ

প্রথমঃ কারো পক্ষে উচিত নয় বিদআত শব্দটি এমন কাজে ব্যবহার করা যেখানে ইজতেহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে রুকূ থেকে উঠে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখাটা সুন্নাত, বিদআত নয়। উল্লেখিত সাহাল বিন সা'দের হাদীছ হচ্ছে এর দলীল। কিন্তু এ অবস্থার ব্যতিক্রম হচ্ছে রুকূ, সিজদা ও বসাবস্থা। কেননা এসকল স্থানে কিভাবে হাত রাখতে হবে হাদীছে তার বিশদ বিবরণ এসেছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্নঃ (২৪৮) 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু' বলার পর 'ওয়াশ্ শুক্‌রু' শব্দ বৃদ্ধি করে বলার বিধান কি ?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র প্রমাণিত দু'আ ও যিকির সমূহ পাঠ করাই উত্তম। নিজের পক্ষ থেকে কোন শব্দ বৃদ্ধি না করা। রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর (সামিআল্লাহুলিমান হামীদাহ্ বলে) পাঠ করবেঃ 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু'। 'ওয়াশ্ শুক্‌রু' শব্দ বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। কেননা এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

উল্লেখ্য যে, এ সময় চার ধরণের শব্দ প্রমাণিত হয়েছেঃ

১) 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু'
২) 'রাব্বানা লাকাল হামদু'
৩) 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু'
৪) 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু'

এগুলো সবটাই এক সাথে বলবে না; বরং কোন নামাযে এটা আবার কোন নামাযে ওটা পাঠ করবে।[1]

প্রশ্নঃ (২৪৯) সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি কি ?

---

[1] . অবশ্য রাব্বানা... বলার পর আরো কিছু দু'আ পাঠ করার কথা ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমনঃ

مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ মিল্‌আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্‌আল আরযি ওয়া মিল্‌আ মা শি'তা মিন শাইয়িন বাদু। আহলাস্ সানায়ি ওয়াল মাজ্‌দি আহাক্কু মা ক্বালাল আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন্। আল্লাহুম্মা লা মানেআ লিমা আত্বায়তা ওয়ালা মুত্বিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ান্‌ফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য। হে প্রশংসা, স্তুতি এবং মহত্ব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ! তোমার প্রশংসায় কোন বন্দা যা বলে তুমি তার চেয়ে ও অধিক প্রশংসার হকদার। আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তুমি যা বন্ধ কর তাও দেয়ার মত কেউ নেই। আর তোমার (শাস্তি) হতে কোন বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। (মুসলিম)- অনুবাদক

উত্তরঃ সিজদায় যাওয়ার জন্য প্রথমে হাঁটু রাখবে তারপর হাত রাখবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন প্রথমে হাত রেখে সিজদায় যেতে। তিনি এরশাদ করেনঃ (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) "তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সিজদা করবে, সে যেন উটের মত করে না বসে। সে যেন হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখে।" [1] হাদীছের বাক্য এরূপ। কিন্তু হাদীছটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। হাদীছের প্রথম বাক্যঃ 'উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে।' নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সিজদার পদ্ধতিতে। কেননা (الكاف) তাশবীহ্ বা তুলনা বুঝানোর জন্য নেয়া হয়েছে। যে অঙ্গের উপর সিজদা করতে হবে তার নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য করা হয়নি। এখানে যদি অঙ্গ উদ্দেশ্য হতো তবে এরূপ বলতে হতো, (উট যে অঙ্গের উপর বসে সেরূপ যেন না বসে।) তখন আমরা বলতে পারি, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসবে না। কেননা উট হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে থাকে। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা বলেননিঃ (উট যে অঙ্গের উপর বসে সেরূপ যেন না বসে।) কিন্তু তিনি বলেছেনঃ 'উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে।' অতএব এখানে বসার পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, অঙ্গের উপর নয়।

একারণে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীছের শেষাংশ বর্ণনাকারীর নিকট উল্টা হয়ে গেছে। শেষাংশটা এরূপ বলা হয়েছেঃ (وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْـلَ رُكْبَتَيْـه) 'হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে।' কিন্তু সঠিক বাক্য এরূপ হবেঃ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْـه 'হাত রাখার আগে হাঁটু রাখবে।' কেননা হাঁটুর আগে হাত রাখলেই উটের মত বসা হল। উট বসার সময় প্রথমে তার হাত দু'টো রাখে। উটের বসা প্রত্যক্ষ করলে এটাই প্রমাণিত হবে। অতএব হাদীছের প্রথমাংশের সাথে শেষাংশের সামঞ্জস্য করতে চাইলে বলতে হবেঃ 'হাত রাখার আগে হাঁটু রাখবে।'

জনৈক বিদ্বান এব্যাপারে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নাম দিয়েছেনঃ (فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليـدين في السـجود) এতে তিনি খুব সুন্দরভাবে উপকারী কথা লিখেছেন। সুতরাং সিজদায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশিত সুন্নাত হচ্ছেঃ দু'হাত রাখার আগে হাঁটু রাখবে।[2]

---

[1]. আহমাদ ২/৩৮১। আবু দাউদঃ অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ হাত রাখার আগে হাঁটু রাখার পদ্ধতি। নাসাঈ, অধ্যায়ঃনামায , অনুচ্ছেদঃ সিজদার সময় সর্ব প্রথম মাটিতে যা রাখতে হয়।

[2]. কিন্তু ইমামদের মধ্যে অনেকেই উল্লেখিত ব্যাখ্যার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী লিখেছেনঃ হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে। এটাই সুন্নাত সম্মত। কেননা অন্য একটি ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি [ﷺ] মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। (ইবনু খুযায়মা, দারাকুতনী। হাকিম হাদীছটি বর্ণনা করে তা ছহীহ্ বলেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেন।) হাঁটুর আগে হাত রাখার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, ইমাম

প্রশ্নঃ (২৫০) সামনের দিকে অতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে সিজদা করার বিধান কি ?

উত্তরঃ সিজদার সময় সামনের দিকে অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া সুন্নাতের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাযের বর্ণনা যারা করেছেন, তাদের কেউ একথা বলেননি যে, তিনি সিজদার সময় পৃষ্ঠদেশ অতিরিক্ত লম্বা করতেন। যেমনটি তিনি রুকূর সময় পিঠ অতিরিক্ত চওড়া করতেন।[1] শরীয়ত সম্মত সুন্নাত হচ্ছে, সিজদার সময় দু'রান থেকে পেট আলাদা রাখবে এবং উঁচু করবে। কিন্তু সামনের দিকে অতিরিক্ত বেড়ে যাবে না। যেমনটি অনেকে করে থাকে।

প্রশ্নঃ (২৫১) সিজদার কারণে কপালে দাগ পড়া কি নেক লোকের পরিচয় ?

উত্তরঃ সিজদার কারণে কপালে দাগ পড়া নেক লোকের আলামত নয়। বরং তা হচ্ছে মুখমন্ডলের নূর, হৃদয়ের উন্মুক্ততা ও প্রশস্থতা, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি। সিজদার কারণে কপালে যে দাগ পড়ে তা অনেক সময় চামড়া নরম হওয়ার কারণে-যারা শুধু মাত্র ফরয নামায আদায় করে- তাদেরও হয়ে থাকে। অথচ অনেক লোক অধিকহারে এবং দীর্ঘ সিজদা করেও তাদের কপালে এ চিহ্ন দেখা যায় না।

প্রশ্নঃ (২৫২) দু'সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে (ডান হতের) তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানোর বিধান কি ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ছহীহ্ মুসলিমে একটি হাদীছ রয়েছে। ইবনু ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামাযে বসতেন... তিনি বলেন, তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।"[2] অন্য শব্দে বলা হয়েছেঃ "যখন তিনি তাশাহুদে বসতেন।" প্রথম বাক্যটি আ'ম বা ব্যাপক অর্থবোধক। আর দ্বিতীয় বাক্যটি খাছ বা বিশেষ অর্থবোধক। কায়েদা বা মূলনীতি হচ্ছে খাছ বিষয়কে যদি এমন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যা আ'মের অর্থ বহন করে, তখন আ'ম বিষয়কে আর খাছ করা হবে না। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আপনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, ছাত্রদের সম্মানিত করুন। এবং তাকে বললেন, মুহাম্মাদকে সম্মানিত করুন। মুহাম্মাদ ছাত্রদেরই অন্তর্ভূক্ত। এখানে একথা প্রমাণ হয় না যে, অন্যান্য ছাত্রদেরকে সম্মানিত করা হবে না।

মালেক। ইমাম আহমাদও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। মারওয়াযী (মাসায়েল গ্রন্থে) ছহীহ্ সনদে ইমাম আওয়াযাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি লোকদেরকে পেয়েছি তারা হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।'- অনুবাদক।

[1] . ছহীহ্ বুখারী। আবু হুমায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী [ﷺ] রুকূ করলেন। অতঃপর পৃষ্ঠদেশ নীচু করে সোজা রেখে দীর্ঘ করলেন।' অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ রুকূতে পিঠ সোজা করা। ছহীহ্ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তিনি [ﷺ] রুকূ করলে মাথা নীচু করতেন না এবং খাড়াও রাখতেন না; মাঝামাঝি পিঠ বরাবর রাখতেন। অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ রুকূর পদ্ধতি ও তাতে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা।

[2] . মুসলিম। অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান। অনুচ্ছেদঃ নামাযে বসার পদ্ধতি।

উছুলবিদ বিদ্বানগণ একথা বলেছেন। শায়খ শানক্বীতী (আযওয়াউল বায়ান) গ্রন্থে এ মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যদি বলে থাকে ছাত্রদেরকে সম্মানিত কর। তারপর বলল, ক্লাস রূমে যারা ঘুমায় তাদের সম্মানিত করো না। এখানে খাছ বা বিশেষ করে দেয়া হল। কেননা আ'ম বা ব্যাপকের বিধানের বিপরীত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া মাসআলাটির ব্যাপারে আলাদা হাদীছও পাওয়া যায়। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, 'ফতহুর্ রাব্বানী' গ্রন্থের (১/১৪৭) লিখক তার সনদকে হাসান বলেন। যাদুল মা'আদের টিকা লিখকদের কেউ কেউ তার সনদ ছহীহ্ বলেও মন্তব্য করেছেন। "রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'সিজদার মধ্যে বসলে আঙ্গুলসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।" [1]

আঙ্গুল নড়াতে হবে না এ ব্যাপারে যারা কথা বলেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, তবে ডান হাত কি অবস্থায় থাকবে? যদি জবাবে বলা হয়, রানের উপর ছড়িয়ে রাখতে হবে। প্রশ্ন হবে, একথার দলীল কি? কোন হাদীছে তো একথা বলা হয়নি যে, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান হাতকে উরুর উপর ছড়িয়ে রাখতেন। এরূপ কোন হাদীছ থাকলে ছাহাবীগণ তার বর্ণনা দিতেন-যেমনটি বর্ণনা পাওয়া যায় বাম হাতকে উরুর উপর ছড়িয়ে রাখার ব্যাপারে।

প্রশ্নঃ (২৫৩) (দু'সিজদার মাঝে) জালসা ইস্তেরাহা[2] করার বিধান কি ?

উত্তরঃ এ মাসআলাটিতে বিদ্বানদের তিন ধরণের মতামত পাওয়া যায়।

প্রথমঃ জালসা ইস্তেরাহা করা সবসময় মুস্তাহাব।

দ্বিতীয়ঃ জালসা ইস্তেরাহা করা কখনই মুস্তাহাব নয়।

তৃতীয়ঃ উল্লেখিত দু'টি মতের মধ্যপন্থী মত। সরাসরি দাঁড়াতে যাদের কষ্ট হয় তারা জালসা ইস্তেরাহা করবে। আর যাদের কষ্ট হয় না তারা জালসা ইস্তেরাহা করবে না।

মুগনী গ্রন্থে (১/৫২৯ দারুল মানার প্রকাশনী) বলা হয়েছেঃ "এই তৃতীয় মতটি দ্বারা হাদীছ সমূহের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে দু'টি মতের মধ্যপন্থী মত।" অত:পর পরবর্তী পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরয নামাযে সুন্নাত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যখন প্রথম দু'রাকাআত শেষ করে উঠবে, তখন দু'হাত দিয়ে মাটিতে ভর করে যেন না উঠে। তবে যদি অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি অনুরূপ করতে সক্ষম না হয়, তবে সে হাত দ্বারা মাটিতে ভর করে উঠতে পারে। (হাদীছটি আছরাম

---

[1]. কিন্তু হাদীছটি মুসনাদে আহমাদের কোথায় আছে আমি তা খুঁজে পাইনি।- অনুবাদক

[2]. প্রথম বা তৃতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে সরাসরি না দাঁড়িয়ে একটু বসে তারপর দাঁড়ানোকে জালসা ইস্তেরাহা বলা হয়।

বর্ণনা করেন।)[1] এরপর মুগনী গ্রন্থকার বলেন, মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে,(إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ) "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, সোজা হয়ে বসতেন, তারপর যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।"[2]

এ হাদীছটি হচ্ছে সেই সময়ের কথা যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সরাসরি দাঁড়াতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কেননা তিনি বলেন, "আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে। তাই তোমরা রুকূ সিজদায় আমার আগ বেড়ে কিছু করো না।"

এই তৃতীয় মতকে আমি সমর্থন করি। কেননা মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) এমন সময় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমণ করেন যখন তিনি তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আর সে সময় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর দুর্বলতা সুস্পষ্ট হচ্ছিল। ছহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا) 'নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীর মোবারক যখন মোটা ও ভারী হয়ে গিয়েছিল, তখন অধিকাংশ নামায তিনি বসে বসে আদায় করতেন।'[3] আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীক্ব (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বসে বসে নামায আদায় করতেন? তিনি বললেন, (نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ) 'হ্যাঁ, যখন তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।'[4] হাফছা (রাঃ) বলেন,

(مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا)

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কখনো বসে নফল নামায আদায় করতে দেখিনি। তবে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে থেকে তিনি বসে নফল নামায আদায় করেছেন।"[5] অপর বর্ণনায় 'একবছর বা দু'বছর পূর্বে থেকে।' এ বর্ণনাগুলো সবই ছহীহ্ মুসলিমে রয়েছে। একথার সমর্থন পাওয়া যায় মালিক বিন হুওয়াইরিছ বর্ণিত হাদীছে, যাতে মাটিতে ভর করে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। আর সাধারণতঃ প্রয়োজন ছাড়া কোন বস্তুর উপর নির্ভর করার প্রশ্নই উঠে না।

---

[1]. বায়হাক্বী ২/১৩৬। দ্রঃ মুগনী ২/২১৪।
[2]. বুখারী। অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ প্রথম রাকাত থেকে উঠার সময় কিভাবে যমীনে ভর দিবে।
[3]. ছহীহ্ মুসলিম। অধ্যায়ঃ মুসাফিরদের নামায। অনুচ্ছেদঃ নফল নামায দাঁড়িয়ে ও বসে পড়া জায়েয।
[4]. দ্রঃ পূর্বোক্ত উৎস।
[5]. দ্রঃ পূর্বোক্ত উৎস।

সম্ভবতঃ আমাদের সমর্থনে আবদুল্লাহ্ বিন বুহায়না (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি পেশ করা যায়। তিনি বলেন, 'নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা তাদেরকে নিয়ে যোহর নামায আদায় করলেন। কিন্তু তিনি দু'রাকাআত পড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বসলেন না।'[1] এখানে 'বসলেন না' শব্দটি দ্বারা সবধরণের বসা বুঝা যায়। অর্থাৎ-জালাসা ইস্তেরাহাতেও বসলেন না। কিন্তু এর জবাবে বলা যায়, এখানে 'বসলেন না' বলতে তাশাহুদের জন্য বসা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত)

প্রশ্নঃ (২৫৪) তাশাহুদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তর্জনী আঙ্গুল নড়ানোর বিধান কি ?

উত্তরঃ তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানো শুধুমাত্র দু'আর সময় হবে। পূরা তাশাহুদে নয়। যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ "তিনি উহা নাড়াতেন ও দু'আ করতেন।"[2] এর কারণ হচ্ছেঃ দু'আ আল্লাহ্র কাছেই করা হয়। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমানে আছেন। তাই তাঁকে আহবান করার সময় উপরে আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

"তোমরা কি নিরাপদে আছ সেই সত্বা থেকে যিনি আসমানে আছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না? তখন আকস্মিকভাবে যমীন থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা নাকি তোমরা নিরাপদ আছ সেই সত্বার ব্যাপারে যিনি আসমানের অধিপতি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে, আমার সকর্ত করণ কিরূপ ছিল।" (সূরা মুলকঃ ১৬-১৭) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ) "তোমারা কি আমাকে আমানতদার মনে করো না? অথচ আমি যিনি আসমানে আছেন তার আমানতদার।"[3] সুতরাং আল্লাহ্ আসমানে তথা সবকিছুর উপরে আছেন। যখন আপনি দু'আ করবেন উপরের দিকে ইঙ্গিত করবেন। একারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে খুতবা প্রদান করে বললেন, "আমি কি পৌঁছিয়েছি?" তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠালেন এবং লোকদের দিকে আঙ্গুলটিকে ঘুরাতে থাকলেন বললেন, "হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ্ তুমি

---

[1] . বুখারী। অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ যারা প্রথম তাশাহুদ ওয়াজিব মনে করে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে ভুল করা।

[2] . ফাতহুর রব্বানী ৩/১৪৭। সনদ হাসান।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ আলী ও খালেদ (রাঃ) কে ইয়ামানে প্রেরণ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ খারেজীদের আলোচনা ও তাদের বিবরণ।

সাক্ষী থেকো।" এদ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপরে অবস্থান করেন। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত ফিতরাতী ভাবে, বিবেক যুক্তি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে। এই ভিত্তিতে যখনই আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকবেন তাঁর কাছে দু'আ করবেন, তখনই আসমানের দিকে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করবেন এবং তা নাড়াবেন। আর অন্য অবস্থায় তা স্থীর রাখবেন।

এখন আমরা অনুসন্ধান করি তাশাহুদে দু'আর স্থানগুলোঃ (১) আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (২) আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ ছালিহীন। (৩) আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ (৪) আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ (৫) আঊযুবিল্লাহি মিন আযাবি জাহান্নাম (৬) ওয়া মিন আযাবিল ক্বাবরি। (৭) ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত। (৮) ওয়ামিন ফিতনাতল মাসীহিদ্দাজ্জাল। এই আটটি স্থানে আঙ্গুল নাড়াবে এবং তা আকশের দিকে উঠাবে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন দু'আ পাঠ করলেও আঙ্গুল উপরে উঠাবে। কেননা দু'আ করলেই আঙ্গুল উপরে উঠাবে।

প্রশ্নঃ (২৫৫) প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহুদের শব্দগুলো পাঠ করবে? না কি দরূদও পাঠ করবে ?

উত্তরঃ তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম তাশাহুদে শুধুমাত্র পাঠ করবেঃ

(التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبركاته، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.)

এটাই উত্তম। যদি এরপর দরূদ পাঠ করে তাতেও কোন বাধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু আমার মতে সুন্নাতের নিকটবর্তী কথা হচ্ছে দরূদের পূর্বের বাক্যটি পাঠ করা-দরূদ না পড়া। তবে ইমাম তাশাহুদ দীর্ঘ করলে দরূদ পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (২৫৬) নামাযে তাওয়ার্‌রুক[1] করার বিধান কি? এ বিধান কি নারী-পুরুষ সবার জন্যই ?

উত্তরঃ যে সকল নামাযে দু'টি তাশাহুদ আছে তার শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্‌রুক করা সুন্নাত। যেমন, মাগরিব, এশা, যোহর ও আছর নামাযে। কিন্তু যে নামাযে শুধু একটিই তাশাহুদ-যেমন ফজর নামায-তাতে তাওয়াররুক করা সুন্নাত নয়।

আর এই সুন্নাত নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। কেননা ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে বরাবর। তবে দলীলের ভিত্তিতে যে পার্থক্য

[1] . তাওয়ার্‌রুক হচ্ছেঃ তাশাহুদের শেষ বৈঠকে বসার সময় ডান পাকে বাম পায়ের নীচে বের করে দিয়ে নিতম্ব যমীনে রেখে তার উপর বসা এবং ডান পাকে খাড়া রাখা।

পাওয়া যায় তার কথা ভিন্ন। কিন্তু এমন কোন ছহীহ্ দলীল নেই যা দ্বারা নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য প্রমাণিত হয়। নামাযের পদ্ধতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলেই সমান।

প্রশ্নঃ (২৫৭) ইমাম যদি শুধুমাত্র ডান দিকে একবার সালাম ফেরায় তাহলে কি যথেষ্ট হবে ?

উত্তরঃ বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ একদিকে সালাম ফেরানো যথেষ্ট মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, অবশ্যই দু'দিকে সালাম দিতে হবে। আবার কেউ বলেন, এক সালাম নফল নামাযের ক্ষেত্রে জায়েয, ফরযে নয়।

কিন্তু সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, দু'দিকে সালাম ফেরানো। কেননা এটাই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম যদি একদিকে সালাম ফেরায় আর মুক্তাদী মনে করে একদিকে সালাম ফেরানো যথেষ্ট নয়, তবে সে দু'দিকেই সালাম ফেরাবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ইমাম যদি দু'দিকে সালাম দেয়, আর মুক্তাদী মনে করে একদিকে সালাম ফেরানো যথেষ্ট, তবে সে ইমামের অনুসরণ করার স্বার্থে উভয় দিকে সালাম ফেরাবে।

প্রশ্নঃ (২৫৮) নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কি ইমাম উঠে চলে যেতে পারেন ? নাকি কিছুটা অপেক্ষা করবেন ?

উত্তরঃ ইমামের জন্য উত্তম হচ্ছে সালাম ফেরানোর পর সামান্য কিছু সময় ক্বিবলামুখী হয়ে বসে থাকবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনবার **أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ** 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' ও একবার اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ 'আল্লাহুম্মা আন্তাস্‌সালাম ওয়া মিনকাস্‌সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' পাঠ করবেন। তারপর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরে বসবেন। ইমাম উঠে চলে যেতে চাইলে যদি মুক্তাদীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় তবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে কিছুক্ষণ বসে থেকে অপেক্ষা করবে। ভীড় কম থাকলে ফিরে যেতে কোন বাধা নেই। মুক্তাদীর জন্যে উত্তম হচ্ছে ইমামের আগে ফিরে না যাওয়া। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার আগেই তোমরা ফিরে যেও না।" কিন্তু ইমাম যদি ক্বিবলামুখী হয়ে সুন্নাতী সময়ের চাইতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে। তবে মুক্তাদীদের ফিরে যেতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (২৫৯) নামায শেষ করেই পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর সাথে মুছাফাহা করা ও 'তাক্বাব্বালাল্লাহু' (আল্লাহ্ কবূল করুন) বলা সম্পর্কে আপনার মত কি ?

উত্তরঃ নামায শেষ করেই পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর সাথে মুছাফাহা করা ও 'তাক্বাব্বালাল্লাহু' (আল্লাহ্ কবূল করুন) বলার কোন ভিত্তি নেই। এ সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবীদের থেকে কোন কিছু প্রমাণিত নেই।

প্রশ্নঃ (২৬০) তাসবীহ্ দানা দ্বারা তাসবীহ্ পড়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ তাসবীহ্ দানা ব্যবহার করা জায়েয। তবে উত্তম হচ্ছে, হাতের আঙ্গুল ও আঙ্গুলের কর ব্যবহার করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْـــئُولَاتٌ مُسْـــتَنْطَقَاتٌ) "আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ্ গণনা কর। কেননা (ক্বিয়ামত দিবসে) এগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং এগুলোকে কথা বলানো হবে।"[1]

তাছাড়া তাসবীহ্র ছড়া হাতে নিয়ে থাকলে রিয়া বা লোক দেখানো ভাবের উদ্রেক হতে পারে। আর যারা তাসবীহ্ ছড়া ব্যবহার করে সাধারণতঃ তাদের অন্তর উপস্থিত থাকে না। এদিক ওদিকে তাকায়। সুতরাং আঙ্গুল ব্যবহার করাই উত্তম ও সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (২৬১) নামাযের পর সুন্নাত সম্মত যিকির সমূহ কি কি ?

উত্তরঃ নামাযের পর আল্লাহ্র যিকির করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾

"যখন তোমরা নামায সমাধা করবে, তখন আল্লাহ্র যিকির করবে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায়।"(সূরা নিসা-১০৩) আল্লাহ্র এই নির্দেশের বর্ণনা দিয়েছেন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কর্ম ও বাণীর মাধ্যমে। অতএব সালাম ফেরানোর পর নিম্ন লিখিত দু'আ সমূহ পাঠ করবেঃ

* তিনবার ইস্তেগফার করবে। অর্থাৎ-আস্তাগফিরুল্লাহ্ পাঠ করবে

* এবং বলবেঃ (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ)

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্তস্সালাম ওয়ামিন কাস্সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।[2]

* অতঃপর বলবেঃ

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা-মা-নেআ লিমা আত্বাইতা ওয়াল মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ এক আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। মালিকানা তাঁরই, সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য।

---

[1]. আহমাদ। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ তাসবীহ্ পাঠ করার ফযীলত।

[2]. মুসলিম অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামাযের পর যে সকল যিকির পাঠ করা মুস্তাহাব।

হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না।[1]

*

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা ধর্ম পালন করি একনিষ্ঠ ভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে।[2]

*তাসবীহ পাঠ করবে অর্থ্যাৎ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে ৩৩ বার।[3] এবং একশ এর পূর্ণতা স্বরূপ এই দু'আটি বলবে। (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। মালিকানা তাঁরই সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য।

যে ব্যক্তি অত্র তাসবীহ্ ও দু'আটি বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশী পরিমাণ হয় না কেন।[4]

পূর্বোল্লিখিত তাসবীহ্গুলো যে কোনটা দ্বারা শুরু করতে পারবে। আর সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার একসাথে ৩৩ বার বলবে অথবা প্রত্যে কটা আলাদা

---

[1] . মুগিরা বিন শো'বা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। বুখারী অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযের পর যিকির। মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

[2] . আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর বর্ণিত হাদীছ। মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

[3] . আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। বুখারী অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযের পর যিকির। মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

[4] . মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

আলাদা ৩৩ বার করে বলবে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে উক্ত তাসবীহ্ সমূহ ৩৩ বারের পরিবর্তে ১০ বার করে বলতে পারবে।[1]

* সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার- এই চারটি তাসবীহ্ ২৫ বার পাঠ করবে। সর্বমোট ১০০ বার।[2]

উল্লেখিত তাসবীহ্গুলোর যে কোন একটি প্রকার পাঠ করলেই হবে। কেননা ইসলামী মূলনীতি হচ্ছে, (কোন ইবাদত যদি কয়েকভাবে প্রমাণিত হয়, তবে তার প্রত্যেক প্রকার থেকে কখনো এটা কখনো ওটা বাস্তবায়ন করা সুন্নাত।) এই তাসবীহ সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা। তবে ফজর ও মাগরিব নামায বাদ নিম্নলিখিত দু'আটি ১০ বার পাঠ করবেঃ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।' অনুরূপভাবে উক্ত দু'নামাযের পর সাত বার পাঠ করবে এই দু'আঃ (رَبِّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّـــارِ) 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।'

* অতঃপর আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারার ২৫৫নং আয়াত) পাঠ করবে। যে ব্যক্তি প্রতেক ফরয নামাযান্তে অত্র আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বাধা দানকারী একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।[3]

* তারপর একবার করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করবে। তবে ফজর বা মাগরীব নামায এর ব্যতিক্রম-এই দুই নামাযের পর অত্র তিনটি সূরা তিনবার করে পাঠ করবে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

প্রশ্নঃ (২৬২) নামাযের পর হাত উত্তোলন করে দু'আ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নামায শেষে হাত তুলে দু'আ করা শরীয়ত সম্মত নয়। দু'আ করতে চাইলে নামাযের মধ্যে দু'আ করা উত্তম। একারণে ইবনে মাসঊদ বর্ণিত তাশাহুদ শিক্ষার হাদীছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেনঃ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ "তারপর ইচ্ছামত যে কোন দু'আ পাঠ করবে।"[4]

---

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় তাসবীহ্ পাঠ করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদ নং ২৫। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ সাহু বা ভুল করা, অনুচ্ছেদঃ সালামের পর তাসবীহ্র সংখ্যা। ইবনু মাজাহ্ অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা, অনুচ্ছেদঃ সালামের পর যা বলতে হয়।

[2] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদ নং ২৫।

[3]. নাসাঈ।

[4] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ তাশাহুদের পর ইচ্ছা-স্বাধীন দু'আ করা।

সাধারণ মানুষ অনেকেই ফরয বা সুন্নাত যে কোন নামায শেষ হলেই হাত তুলে দু'আ আরম্ভ করে। এমনকি এদের অধিকাংশ এ কাজ কখনই পরিত্যাগ করে না।*

অনেক লোক এমন দেখবেন ফরয নামায শুরু হয়ে যাচ্ছে আর সে সুন্নাত নামাযের তাশাহুদে বসে আছে। সালাম ফেরানো হলেই হাত উঠাবে কিছু বলল কি না আল্লাহই জানেন আবার হাত মুখে মুছে ফেলবে। মনে করে নামায শেষ করে হাত দু'টো না উঠালে যেন নামাযটাই সুন্দর হল না।

প্রশ্নঃ (২৬৯) ফরয নামাযান্তে সমস্বরে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি পাঠ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নামাযান্তে সকলে মিলে সমস্বরে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী বা অন্যান্য যিকর করা বিদআত। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ছাহাবীদের (রাঃ) থেকে যেটা প্রমাণিত রয়েছে, তাঁরা ফরয নামায শেষ করে কিছুটা উঁচু আওয়াযে যিকির পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে পাঠ করতেন। সমস্বরে নয়। অতএব ফরয নামাযান্তে উঁচু কণ্ঠে যিকির করা ছহীহ্ সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ)

“নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে লোকেরা ফরয নামায শেষ করলে উঁচু কণ্ঠে যিকির পাঠ করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উঁচু কণ্ঠের যিকির শুনলে আমি বুঝতাম লোকেরা নামায শেষ করেছেন।”[1] কিন্তু নামাযের পর উঁচু কণ্ঠে বা নীচু কণ্ঠে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে কোন

---

*. অথচ নবী করীম [ﷺ]থেকে এ ব্যাপারে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। ছাহাবী তাবেঈদের যুগেও এর ছহীহ্ সনদ ভিত্তিক কোন প্রমাণ মিলেনা। এমনকি নবীজি থেকে ছহীহ্ তো দূরের কথা কোন যঈফ বর্ণনাও পাওয়া যায় না। তাই একাজ সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী বা বিদআত। যা পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে মুসলামানগণ এই বিদআতটিকে একটি সুন্নাত তো বটেই বরং ফরযের মতই মনে করে। যার কারণে দেখবেন, যদি আপনি ফরয ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ [ﷺ] এর পঠিতব্য ছহীহ্ হাদীছে প্রমাণিত দু'আ যিকিরে মাশগুল হন, ওদের সাথে বিদআতী মুনাজাতে শরীক না হন, তবে অন্যান্য মুছল্লীরা আপনার প্রতি বাঁকা নজরে দেখবে, যেন আপনি মস্তবড় একটি অপরাধ করছেন! আর ইমাম সাহেব যদি কখনো এই মুনাজাত ছেড়ে দেয় তবে অনেক ক্ষেত্রে তার চাকুরী নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে।- অনুবাদক।

[1] . বুখারী অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযের পর যিক্র। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামাযের পর যে সকল যিকর মুস্তাহাব।

হাদীছ আমি জানি না। তবে ছহীহ্ হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে, আয়াতুল কুরসী ও মুআব্বেযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) পাঠ করা।[1]

প্রশ্নঃ (২৬৪) টয়লেট সারতে গেলে জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে কি করবে ?

উত্তরঃ প্রথমে টয়লেটের কাজ সম্পন্ন করবে। তারপর ওযু করে নামাযের দিকে অগ্রসর হবে। যদিও তার জামাআত ছুটে যায়। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটা তার ওযর। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ "খাদ্য উপস্থিত হলে এবং দু'টি নাপাক বস্তুর চাপ থাকলে নামায নেই।"[2]

প্রশ্নঃ (২৬৫) নামায পড়ার সময় চোখ বন্ধ রাখার বিধান কি ?

উত্তরঃ নামায অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ। কেননা এটা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত খেলাফ। তবে যদি কোন কারণ থাকে যেমন, সম্মুখের দেয়াল বা কার্পেট বা জায়নামাযে এমন কোন নকশা থাকে যার কারণে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয় বা সম্মুখে শক্তিশালী আলো থাকে যাতে চোখের ক্ষতির আশংকা হয়, তবে চোখ বন্ধ রাখতে কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ কারণ বশতঃ হলে কোন অসুবিধা নেই। অন্যথা তা মাকরূহ। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের যাদুল মা'আদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৬৬) নামাযরত অবস্থায় ভুলক্রমে আঙ্গুল ফুটালে কি নামায বাতিল হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ আঙ্গুল ফুটালে নামায বাতিল হয় না। কিন্তু এটি একটি অনর্থক কাজ। যা থেকে বিরত থাকা উচিত। জামাআতের সাথে থাকলে নিঃসন্দেহে এতে অন্যান্য মুছল্লীর নামাযে ব্যাঘাত ঘটবে। তখন তা আরো ক্ষতিকর।

এ উপলক্ষ্যে আমি বলতে চাইঃ নামায অবস্থায় নড়াচড়া করা পাঁচভাগে বিভক্তঃ

(১) ওয়াজিব (২) সুন্নাত (৩) মাকরূহ (৪) হারাম (৫) জায়েয।

ওয়াজিব নড়াচড়াঃ যেমনঃ নামায শুরু করেছে এমন সময় স্মরণ হল, তার টুপিতে নাপাকি রয়েছে। তখন টুপি খুলে ফেলার জন্য নড়াচড়া করা ওয়াজিব। একথার দলীল হচ্ছেঃ একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুতা পরে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় জিবরীল (আঃ) এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন, তাঁর জুতায় নাপাকী রয়েছে। তিনি নামাযরত অবস্থাতেই জুতা খুলে ফেললেন এবং নামায চালিয়ে গেলেন।[3]

---

[1] . আবু উমামা খাযরাযী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ [ﷺ] বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বাধা দানকারী একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা।' (নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লায়ল ১৮৫পৃঃ) অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, 'নবী [ﷺ] প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে মুআব্বাযাত (সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস) পাঠ করতেন।' (আবু দাউদ, নাসাঈ)

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ খাদ্যের উপস্থিতিতে নামায পড়া মাকরূহ।

[3] . আবু দাউদ অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ জুতা পরে নামায আদায় করা। ছহীহ্ ইবনু খুযায়মা (হা/৭৮৬)

সুন্নাত নড়াচড়াঃ নামায পরিপূর্ণ করার জন্য নড়াচড়া করা। যেমনঃ কাতারের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করার জন্য নামায অবস্থায় সামনের কাতারে চলে যাওয়া বা ডানে-বামে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর কাছে সরে যাওয়া। এসবগুলো করা সুন্নাত।

মাকরূহ নড়াচড়াঃ অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া। যার সাথে নামাযের কোনই সম্পর্ক নেই।

হারাম নড়াচড়াঃ লাগাতার অধিকহারে নড়াচড়া করা। যেমনঃ দাঁড়ানো অবস্থায় অনর্থক কাজ করা, রুকূ অবস্থায় অধিকহারে নড়াচড়া করা, সিজদা বা বসা অবস্থায় অনর্থক নড়াচড়া করতে থাকা এমনকি এভাবে নামায শেষ করা। এধরণের নড়াচড়া করা হারাম। এর মাধ্যমে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

জায়েয নড়াচড়াঃ যেমন শরীরের কোন স্থান চুলকানোর প্রয়োজন অনুভব করল। বা শরীর থেকে মশা-মাছি তাড়ানোর দরকার পড়ল.. ইত্যাদি ছোট-খাট বিষয় যা পরস্পর নয় এবং অধিকহারে নয় তা বৈধ।

প্রশ্নঃ (২৬৭) নামাযেসুতরার বিধান কি ? এবং এর সীমা কতটুকু ?

উত্তরঃ সুতরা গ্রহণ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। তবে জামাতের সাথে নামায পড়লে মুক্তাদীর জন্য সুতরার দরকার নেই। ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। এর সীমা সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ(مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ) "উটের উপর হেলান দিয়ে বসার জন্য তার পিঠে যে কাঠ রাখা হয় তার উচ্চতার বরাবর।"[1] এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা। এর চেয়ে কমও বৈধ আছে। কেননা হাদীছে এসেছেঃ(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ) "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন ছালাত আদায় করে, সে যেন একটি তীর দিয়ে হলেও সুতরা করে নেয়।"[2] হাসান সনদে আবু দাউদে বর্ণিত অন্য হাদীছে বলা হয়েছেঃ "কোন কিছু না পেলে যেন একটি দাগ টেনে নেয়।" হাফেয ইবনু হাজার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে বলেনঃ যারা হাদীছটি মুযতারাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা সঠিক কথা বলেন নি। সুতরাং হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার তেমন কোন কারণ নেই।

প্রশ্নঃ (২৬৮) মসজিদে হারামে মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার বিধান কি ? নামায ফরয হোক বা নফল। মুছল্লী মুক্তাদী হোক বা একাকী হোক।

উত্তরঃ মসজিদুল হারাম বা অন্য কোন স্থানে মুক্তাদী মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) মিনায় আগমণ করলেন। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের নিয়ে একটি দেয়াল সামনে রেখে নামায আদায় করছিলেন। ইবনু আব্বাস কাতারের সম্মুখ দিয়ে একটি গাধার পিঠে চড়ে

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ মুছল্লীর সুতরার বিবরণ।

[2] . ইবনু খুযায়মা, অনুচ্ছেদঃ মুছল্লীর সুতরা। আহমাদ (হা/১৪৭৯৯)

অতিক্রম করলেন। কেউ তার প্রতিবাদ করেনি।[1] মুছল্লী যদি ইমাম বা একক হয়, তবে তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জয়েয নেই। চাই তা মসজিদুল হারামে হোক বা অন্য কোন স্থানে। কেননা সাধারণভাবে হাদীছগুলো এ কথাই প্রমাণ করে। এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যে, মক্কা বা মসজিদে হারামে বা মদীনার মসজিদে মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা যাবে কোন গুনাহ্ হবে না।

প্রশ্নঃ (২৬৯) নামাযের সময় মুছল্লীদের সম্মুখে বৈদ্যুতিক হিটার (শীতকালে ঠান্ডা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হিটার) রাখার বিধান কি ? এক্ষেত্রে কি কোন শরঈ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ?

উত্তরঃ মুছল্লীদের সম্মুখভাগে ক্বিবলার দিকে হিটার রাখতে কোন অসুবিধা নেই। শরীয়তে এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আমার কোন কিছু জানা নেই।

প্রশ্নঃ (২৭০) নামাযের ক্বিরাতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা আসলে জান্নাতের প্রার্থনা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, এটা জায়েয। এক্ষেত্রে ইমাম, মুক্তাদী বা একক ব্যক্তির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে মুক্তাদীর যেন ইমামের ক্বিরআত নীরব থেকে শোনার ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত না ঘাটে।

প্রশ্নঃ (২৭১) সাহু সিজদা করার কারণ সমূহ কি কি ?

উত্তরঃ সাহু সিজদা সংবিধিবদ্ধ করার পিছনে রহস্য হল এই যে, এটা নামাযের মধ্যে যে ত্রুটি হয় তার পূর্ণতা দান করে।

তিনটি কারণে নামাযে সাহু সিজদা দিতে হয়ঃ

১) নামায বৃদ্ধি হওয়া। যেমন, কোন রুকূ বা সিজদা বা বসা ইত্যাদি বৃদ্ধি হওয়া।

২) হ্রাস হওয়া। কোন রুকন বা ওয়াজিব কম হওয়া।

৩) সন্দেহ হওয়া। কত রাকাত পড়েছে তিন না চার এব্যাপারে সংশয় হওয়া।

*** প্রথমতঃ নামাযে বৃদ্ধি হওয়াঃ**

মুছল্লী যদি নামাযের অন্তর্ভূক্ত এমন কিছু কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করে যেমনঃ দাঁড়ানো, বসা, রুকূ', সিজদা ইত্যাদি-যেমন দু'বার করে রুকূ করা, তিন বার সিজদা করা, অথবা যোহর পাঁচ রাকাত আদায় করা। তবে তার ছালাত বাতিল বা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত আমল করেছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে উহা প্রত্যাখ্যাত।"[2]

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ইলম বা বিদ্যা, অনুচ্ছেদঃ কখন কম বয়সের বালকের নিকট থেকে হাদীছ শোনা বিশুদ্ধ। মুসলিম অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ মুছল্লীর সুতরা।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ আকযিয়া, অনুচ্ছেদ, বাতিল ফায়সালা সমূহ প্রত্যাখ্যান করা।

কিন্তু যদি ভুলবশতঃ তা করে এবং ঐভাবেই ছালাত শেষ করে দেয়ার পর স্মরণ হয় যে, ছালাতে বৃদ্ধি হয়ে গেছে, তবে শুধুমাত্র সাহু সিজদা করবে। তার ছালাতও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু নামাযরত অবস্থায় যদি উক্ত বৃদ্ধি স্মরণ হয়-যেমন চার রাকাআত শেষ করে পাঁচ রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে-তবে সে ফিরে আসবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে।

উদাহরণ: জনৈক ব্যক্তি যোহরের নামায পাঁচ রাকাআত আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু শেষ তাশাহুদে বসার সময় এ বৃদ্ধির কথা তার স্মরণ হল, তাহলে সে তাশাহুদ পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরাবে। তারপর সাহু সিজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি সালাম ফেরানোর পর তা স্মরণ হয়, তবে সাহু সিজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি পঞ্চম রাকাআত চলা অবস্থায় স্মরণ হয় তবে তখনই বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। তারপর সিজদায়ে সাহু করে আবার সালাম ফেরাবে।

দলীল:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم. وفي رواية: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثم سلم

"আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা:) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের নামায পাঁচ রাক্আত পড়লেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, কিভাবে ? তাঁরা বললেন, আপনি আজ পাঁচ রাকাআত পড়েছেন। তখন তিনি দু'টি সিজদা করলেন। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে, তখন তিনি পা গুটিয়ে ক্বিবলামুখি হলেন, দু'টি সিজদা করলেন অত:পর সালাম ফেরালেন।[1]

*** নামায পূর্ণ হওয়ার আগেই সালাম ফেরানো:**

নামায পূর্ণ হওয়ার আগেই সালাম ফেরানো নামাযে বৃদ্ধি করার অন্তর্গত। কেননা নামাযরত অবস্থায় সে সালামকে বৃদ্ধি করেছে। একাজ যদি ইচ্ছাকৃত করে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলক্রমে হয়, কিন্তু অনেক পরে তার এ ভুলের কথা মনে পড়ল তবে নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়বে। আর যদি একটু পরেই (যেমন দু/এক মিনিট) তবে সে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরাবে। অতঃপর সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবে।

দলীল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْه أَنّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِم الظُّهْرَ أو العصر فسَلَّمَ من رَكْعَتَيْنِ فَخَرَجَ سَرَعَانُ من أبواب الْمَسْجِدِ يقولون: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَشَبَةٍ الْمَسْجِدِ فاتكأَ عَلَيْهَا كأنه

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ ক্বিবলার বিবরণ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে সাহু বা ভুল করা।

غضبانَ، فقام رجل فَقَالَ يَا رسول الله: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ، فقال الرجل: بَلي نَسِيتَ فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصحابة: أَحقٌّ ما يقول؟ قَالُوا: نعم، فتقدم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ما بقي من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم

আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নিয়ে যোহর অথবা আছরের নামায আদায় করলেন। কিন্তু দু'রাকাআত আদায় করেই সালাম ফিরিয়ে দিলেন। কিছু লোক দ্রুত মসিজদ থেকে একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেল যে, নামায সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। নবীজিও (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদের এক খুঁটির কাছে গিয়ে তাতে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন রাগন্বিত। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি নামায সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে ? নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তো ভুলিনি, আর নামাযও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। লোকটি বলল, বরং আপনি ভুলেই গিয়েছেন। (কারণ আপনি দু'রাকাআত নামায আদায় করেছেন।) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, একি সত্য বলছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অবশিষ্ট দু'রাকাআত আদায় করে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরলেন। তারপর দু'টি সিজদা করলেন অতঃপর সালাম ফেরালেন।[1]

দ্বিতীয়তঃ ছালাতেহ্রাস হওয়াঃ

ক) রুকনহ্রাস হওয়াঃ

মুছল্লী যদি কোন রুকন কম করে ফেলে-উক্ত রুকন যদি তাকবীরে তাহরিমা (নামায শুরু করার তাকবীর) হয়, তবে তার ছালাতই হবে না। চাই উহা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিক বা ভুলক্রমে ছেড়ে দিক। কেননা তার ছালাতই তো শুরু হয়নি। আর উক্ত রুকন যদি তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য কিছু হয় আর তা ইচ্ছাকৃত হয় তবে তার নামায বাতিল বা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে কোন রুকন ছুটে যায়-যেমন প্রথম রাকাআতে কোন রুকন ছুটে গেল, এখন যদি দ্বিতীয় রাকাআতে সেই ছুটে যাওয়া রুকনের নিকট পৌঁছে যায়-তবে এ অবস্থায় আগের রাকাআত বাতিল হয়ে যাবে এবং এটাকে প্রথম রাকাআত গণ্য করবে এবং বাকী অংশ পূরা করে সাহু সিজদা দিবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকাআতে ছুটে যাওয়া সেই রুকনে না পৌঁছে, তবে ছুটে যাওয়া রুকনটি আগে আদায় করবে তারপর বাকী অংশগুলো আদায় করবে এবং সাহু সিজদা দিবে।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে বসে আঙ্গুল সমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করানো। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে সাহু বা ভুল করা।

উদাহরণঃ জনৈক মুছল্লী প্রথম রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদাটি ভুলে গেল। যখন সেকথা স্মরণ হল, তখন সে দ্বিতীয় রাকাআতের দু'সিজদার মধ্যবর্তি স্থানে বসেছে। এ অবস্থায় আগের রাকাতটি বাতিল হয়ে যাবে এবং এটাকে প্রথম রাকাত গণ্য করে অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে নামায শেষে সাহু সিজদা করবে।

আর একটি উদাহরণঃ জনৈক ব্যক্তি প্রথম রাকাআতে একটি মাত্র সিজদা করেছে। তারপর দ্বিতীয় সিজদা না করেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে রুকূ করার পর সেই ভুলের কথা স্মরণ হয়েছে, তবে সে বসে পড়বে এবং সেই ছুটে যাওয়া সিজদা দিবে এবং সেখান থেকে নামাযের বাকী অংশ পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তারপর সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবে।

খ) কোন ওয়াজিব হ্রাস হওয়াঃ

মুছল্লী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করে তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলক্রমে হয় আর উক্ত স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগেই যদি স্মরণ হয়ে যায় তবে তা আদায় করবে এতে কোন দোষ নেই-সাহু সিজদা দিতে হবে না। কিন্তু যদি উক্ত ওয়াজিব ছেড়ে পরবর্তী রুকন শুরু করার আগেই স্মরণ হয়ে যায় তবে ফিরে গিয়ে সেই ওয়াজিব আদায় করবে এবং শেষে সাহু সিজদা করবে। কিন্তু পরবর্তী রুকন শুরু করার পর যদি স্মরণ হয় তবে উক্ত ছুটে যাওয়া ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট নামায আদায় করে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করলেই নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

উদাহরণঃ একজন মুছল্লী দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে না বসে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে যাচ্ছে। এমন সময় স্মরণ হল নিজ ভুলের কথা। তখন সে বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পড়ে নামায পূর্ণ করবে। কোন সাহু সিজদা লাগবে না। আর যদি কিছুটা দাঁড়ায় কিন্তু পরিপূর্ণরূপে দাঁড়ায়নি তবে সে বসে যাবে এবং তাশাহুদ পড়বে ও নামায শেষে সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবে। কিন্তু যদি পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে পড়ে তবে আর বসবে না। তাশাহুদ রহিত হয়ে যাবে। ঐভাবেই নামায পূর্ণ করবে এবং সলাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদা করবে।

দলীলঃ

عَنْ عَبْدِاللَّه ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلَاته فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ

আবদুল্লাহ্ বিন বুহাইনাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে (যোহর) নামায আদায় করলেন। কিন্তু দু'রাকাত শেষে (তাশাহুদ না পড়েই) দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি নামায চালিয়ে যেতে থাকলেন। নামায শেষে মানুষ সালামের

অপেক্ষা করছে এমন সময় সালামের পূর্বে তিনি তাকবীর দিয়ে সিজদা করলেন, মাথা উঠিয়ে আবার তাকবীর দিয়ে সিজদা করলেন, তারপর মাথা উঠিয়ে সালাম ফেরালেন।[1]

তৃতীয়তঃ সন্দেহ হওয়াঃ

ইমামের মধ্যে সন্দেহের দু'টি অবস্থাঃ

প্রথম অবস্থাঃ সন্দেহযুক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে যেটির প্রাধান্য পাবে সে অনুযায়ী কাজ করবে এবং নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তারপর সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ একজন লোক যোহরের নামায আদায় করছে। কিন্তু সন্দেহ হল এখন সে কি দ্বিতীয় রাকাতে না তৃতীয় রাকাতে? এ সময় সে অনুমান করে স্থির করবে কোনটা ঠিক। যদি অনুমান প্রাধান্য পায় যে এটা তৃতীয় রাকাত, তবে তা তৃতীয় রাকাত গণ্য করে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরানোর পর সাহু সিজদা করবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)
"তোমাদের কারো নামাযে যদি সন্দেহ হয় তবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবে এবং সে ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করবে। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা করবে।"[2]

দ্বিতীয় অবস্থাঃ সন্দেহযুক্ত দু'টি দিকের কোনটাই প্রাধান্য পায় না। এ অবস্থায় নিশ্চিত দিকটির উপর ভিত্তি করবে। অর্থাৎ কম সংখ্যাটি নির্ধারণ করে বাকী নামায পূর্ণ করবে। তারপর সালামের আগে সাহু সিজদা করে শেষে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ জনৈক ব্যক্তি আছরের নামাযে সন্দেহ করল-তিন রাকাত পড়েছে না দু'রাকাত। কিন্তু অনুমান করে কোনটাই তার নিকট প্রাধান্য পেল না। এমতাবস্থায় সে তা দ্বিতীয় রাকাত ধরে প্রথম তাশাহুদ পাঠ করবে। তারপর বাকী দু'রাকাত নামায পূর্ণ করবে এবং শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদা করবে।

দলীলঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
(إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)
"তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি নামাযে সন্দেহ করে যে, তিন রাকাত পড়েছে না চার

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ তাশাহুদ পড়া যারা ওয়াজিব মনে করেন না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে সাহু বা ভুল করা।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ ক্বিবলামুখী হওয়া। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে সাহু বা ভুল করা।

রাকাত ? তবে সে সন্দেহকে বর্জন করবে এবং নিশ্চিতের উপর ভিত্তি করবে। তারপর সালাম ফেরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি পাঁচ রাকাত পড়ে থাকে তবে নামায বেজোড় থেকে জোড় হয়ে যাবে। আর যদি চার রাকাতই পড়ে থাকে, তবে এসিজদা দু'টি শয়তানকে অপমানের জন্য হবে।"[1]

সারকথাঃ

পূর্বেল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, সিজদায়ে সাহু কখনো সালামের আগে আবার কখনো সালামের পর করতে হয়।

সালামের পূর্বে সাহু সিজদা দু'ক্ষেত্রে করতে হয়ঃ

প্রথমঃ নামাযে যদি কোন ওয়াজিব হ্রাস হয়। **দ্বিতীয়ঃ** নামাযে যদি সন্দেহ হয় এবং দু'টি দিকের কোনটিই প্রাধান্য না পায়, তবে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করবে।

সালামের পর দু'ক্ষেত্রে সাহু সিজদা করতে হয়ঃ

প্রথমঃ যদি নামাযে বৃদ্ধি হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ঃ যদি সন্দেহ হয় এবং যে কোন একটি দিক অনুমানের ভিত্তিতে প্রাধান্য লাভ করে, তবে সালামের পর সাহু সিজদা করবে।

প্রশ্নঃ (২৭২) ইমাম ভুলক্রমে এক রাকাআত নামায বৃদ্ধি করেছেন। আমি মাসবূক হিসেবে ইমামের অতিরিক্ত নামায আমার নামাযের সাথে মিলিয়ে নিয়েছি। আমার নামায কি বিশুদ্ধ হয়েছে ? আর যদি ঐ রাকাতের হিসাব না ধরি তবে তার বিধান কি ?

উত্তরঃ সঠিক মত হচ্ছে আপনার নামায বিশুদ্ধ হয়েছে। কেননা আপনি নামায পূর্ণভাবে আদায় করেছেন। ইমাম যে ভুল করেছেন সে তার উপর বর্তাবে। ভুল হওয়ার কারণে তিনি মা'যুর। কিন্তু আপনি যদি ঐ রাকাআতের হিসাব না ধরেন এবং অতিরিক্ত রাকাআত আদায় করেন, তবে কোন ওযর ছাড়াই এক রাকাত বৃদ্ধি করলেন। যার কারণে আপনার নামায বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (২৭৩) তাহাজ্জুদ নামাযে ভুলক্রমে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লে করণীয় কি ?

উত্তরঃ স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বসে পড়বে। অন্যথায় তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে তার নামায বৃদ্ধি হয়ে গেল। ইমাম আহমাদ বলেছেন, কোন লোক যদি রাতের নফল নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দন্ডায়মান হয়, তবে সে যেন ফজর নামাযে তৃতীয় রাকাতের জন্য দন্ডায়মান হওয়া বৈধ করে নিল। এ অবস্থায় সে যদি না বসে যায় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। তবে বিতর নামায এর বিপরীত। যদি নিয়ত করে (দু'সালামে) তিন রাকাত বিতর পড়বে। (অর্থাৎ-দু'রাকাত পড়ে সালাম

[1] . মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ।

ফিরিয়ে এক রাকাআত পড়বে) কিন্তু দু'রাকাত পড়ে না বসে ভুলক্রমে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় না বসে যদি নামায চালিয়ে যায় এবং তিন রাকাত পূরা করে তবে তা বিতর হিসেবে যথেষ্ট হবে। কেননা একাধারে তিন রাকাত বিতর নামায আদায় করা বৈধ।

প্রশ্নঃ (২৭৪) প্রথম তাশাহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে পড়লে করণীয় কি ? এক্ষেত্রে কখন সাহু সিজদা করতে হবে ?

উত্তরঃ এ অবস্থায় ফিরে আসবেন না তথা বসে পড়বেন না; বরং নামায চালিয়েই যাবেন। কেননা আপনি তাশাহুদ থেকে পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং পরবর্তী রুকনে চলে গিয়েছেন। এ অবস্থায় ফিরে আসা মাকরূহ, তবে যদি ফিরে এসে বসে পড়েন, তবে নামায বাতিল হবে না। কেননা আপনি হারাম কিছু করেননি। তবে এ অবস্থায় সাহু সিজদা করতে হবে। আর তা সালামের পূর্বে। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, নামায চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব, আর ফিরে আসবেন না। আর ওয়াজিব তাশাহুদ ছুটে যাওয়ার কারণে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করবেন।

প্রশ্নঃ (২৭৫) বিতর নামাযের বিধান কি ? উহা কি শুধু রামাযান মাসের জন্যই ?

উত্তরঃ বিতর নামায রামাযান মাসে ও সকল মাসে সুন্নাতে মুআক্কাদা। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেনঃ 'যে বিতর নামায পরিত্যাগ করে সে খারাপ লোক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।' সুন্নাতে মুআক্কাদা এ ইবাদতটি রামাযান বা যে কোন সময় পরিত্যাগ করা কোন মুমিনের জন্য উচিত নয়। বিতর হচ্ছে সর্বনিম্ন এক রাকাতের মাধ্যমে রাতের নামাযের সমাপ্তি করা। **অনেকে মনে করে বিতর মানেই কুনূত। কিন্তু তা ঠিক নয়। কুনূত এক বিষয় বিতর অন্য বিষয়।** তবে বিতর নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করা যায়। কিন্তু তা পাঠ করা আবশ্যক নয়। রাতের নফল নামায শেষ করতে হয় এক রাকাত বা একাধারে তিন রাকাত বিতর নামায আদায় করার মাধ্যমে।

মোটকথা বিতর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা তা রামাযান মাসে হোক বা অন্য সময়। আর উহা পরিত্যাগ করা কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (২৭৬) দু'আ কুনূতের জন্য কি বিশেষ কোন দু'আ আছে ? এ সময় দু'আ কি দীর্ঘ করা যায় ?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান বিন আলী (রাঃ) কে যে দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাকেই দু'আ কুনূত বলা হয়। দু'আটি নিম্নরূপঃ

(اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)

"হে আল্লাহ্! তুমি যাদেরকে হেদায়াত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো। তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি যাদের

অভিভাকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করো, তোমার উপর তো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোনদিন অপমানিত হবে না। এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।"[1]

ইমাম এই দু'আ পাঠ করলে তিনি একবচনের স্থলে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করবেন। কেননা তিনি নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্যও দু'আ করবেন। তিনি যদি উপযুক্ত অন্য কোন দু'আ নির্বাচন করেন তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মুছল্লীদের কষ্ট হয় এমন দীর্ঘ সময় ধরে দু'আ করবেন না। কেননা মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) যখন নামাযে দীর্ঘ সময় নিয়ে ইমামতি করেছেন, তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগম্বিত হয়ে তাকে বলেছিলেন,"হে মুআ'য তুমি ফিতনাবাজ হতে চাও ? "[2]

প্রশ্নঃ (২৭৭) দু'আ কুনূত পাঠ করার সময় হাত উত্তোলন করা কি সুন্নাত ? দলীলসহ জবাব চাই।

উত্তরঃ হ্যাঁ, সুন্নাত হচ্ছে দু'আ কুনূত পাঠ করার সময় হাত উত্তোলন করা। কেননা মুসলমানদের উপর কোন বিপদ এলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয নামাযে কুনূত পাঠ করার সময় এরূপ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ছহীহ্ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে আমীরুল মু'মেনীন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বিতরের কুনূতে হাত উত্তোলন করেছেন। তিনি খোলাফা রাশেদার মধ্যে অন্যতম। যাদের অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। অতএব বিতর নামাযে কুনূতের সময় হাত উত্তোলন করা সুন্নাত। চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদী বা একাকী। যখনই কুনূত পড়বে হাত উত্তোলন করবে।

প্রশ্নঃ (২৭৮) ফরয নামাযে কুনূত পড়ার বিধান কি ? যদি মুসলমানদের কোন বিপদ আসে তখন করণীয় কি ?

উত্তরঃ ফরয নামাযে কুনূত পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। তা উচিতও নয়। কিন্তু ইমাম যদি কুনূত পড়েন তার অনুসরণ করতে হবে। কেননা ইমামের বিরোধীতায় অকল্যাণ রয়েছে। আর মুসলমানদের উপর যদি কোন বড় ধরণের বিপদ নেমে আসে তখন আল্লাহ্‌র কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করার জন্য ফরয নামাযে কুনূত পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (২৭৯) তারাবীহ্ নামাযের বিধান কি ? এর রাকাত সংখ্যা কত ?

---

[1] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ বিতরের কুনূতে যা পড়তে হয়।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম দীর্ঘ নামায আদায় করলে অভিযোগ করার বিধান।

উত্তরঃ তারাবীহ্ নামায রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত। বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযানের এক রাতে (তারাবীহ) নামায আদায় করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করল। পরবর্তী রাতেও ছালাত আদায় করলেন। এরাতে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী হল। অতঃপর তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতেও তারা সমবেত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর বের হলেন না। প্রভাত হলে তিনি বললেন,

﴿قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ﴾

"তোমরা যা করেছো আমি দেখেছি। কিন্তু তোমাদের কাছে আসতে আমাকে কোন কিছুই বাধা দেয়নি। তবে আমি আশংকা করেছি যে, এ নামায তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে।" আর এটি ছিল রামাযান মাসের ঘটনা। [1]

তারাবীহ্‌র রাকাত সংখ্যাঃ ১১ রাকাআত। বুখারী মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। মাহে রামাযানে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) "তিনি রামাযান মাসে এবং অন্য সময় এগার রাকাতের বেশী নামায পড়তেন না।"[2] তারাবীহ্ ছালাত যদি ১৩ (তের) রাকাআত আদায় করে, কোন অসুবিধা নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায ছিল ১৩ রাকাত।" অর্থাৎ রাতের নামায। বুখারী।[3]

ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে ১১ এগার রাকাতেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনটি মুআত্বা মালেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।[4] যদি এর চাইতে বেশী সংখ্যক রাকাআত আদায় করে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى "রাতের নামায দু' দু' রাকাত করে।"[5] এখানে তিনি কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদ নামায, অনুচ্ছেদঃ নবী [ﷺ] কে রাতের নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ ক্বিয়ামুল্লায়ল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদ নামায, অনুচ্ছেদঃ রাতে নবী [ﷺ] এর ক্বিয়ামুল্লায়ল। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ রাতের নামায।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদ নামায, অনুচ্ছেদঃ নবী [ﷺ] এর রাতের নামায কিরূপ ছিল। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ রাতের নামাযে দু'আ পাঠ।

[4] . মুআত্বা মালেক, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল্লায়ল করার বর্ণনা।

[5] . বুখারী, অধ্যায়ঃ বিতর নামায, অনুচ্ছেদঃ বিতর নামাযের বিবরণ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ রাতের নামায দু'দু রাকাত করে।

দেননি। সালাফে সালেহীন থেকে এ নামাযের বিভিন্ন ধরণের রাকাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত সংখ্যার উপর আমল করা উত্তম। আর তা হচ্ছে এগার বা তের রাকাআত।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা তাঁর খলীফাদের (রাঃ) থেকে কোন হাদীছ বা বর্ণনা প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁদের কেউ ২৩ রাকাত তারাবীহ্ আদায় করেছেন। বরং ওমর (রাঃ) থেকে এগার রাকাতের কথাই প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তিনি উবাই বিন কা'ব এবং তামীম আদ্দারী (রাঃ) কে ১১ রাকাতের দ্বারা লোকদেরকে নিয়ে ক্বিয়ামুল্লায়াল করার আদেশ করেছিলেন।[1] ওমরের (রাঃ) মত ব্যক্তিত্বের জন্য এটাই শোভনীয় যে, তাঁর জীবন চরিত ও ইবাদত বন্দেগী হবে ঠিক তেমনই, যেমনটি ছিল নবীকুল শিরমনী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন চরিত ও ইবাদত বন্দেগী।

আমাদের জানা নেই যে, ছাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে কেউ তেইশ রাকাত তারাবীহ্ নামায পড়েছিলেন। বরং বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। পূর্বে আয়েশা (রাঃ) এর বাণী উল্লেখ করা হয়েছেঃ "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান বা অন্য সময় এগার রাকাতের বেশী রাকাত নামায আদায় করতেন না।"

নিঃসন্দেহে ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) এজমা বা ঐকমত্য হচ্ছে একটি হুজ্জত বা বড় দলীল। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদা। যাঁদের অনুসরণ করতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

জেনে রাখুন! তারাবীহ্ নামাযের রাকাত সংখ্যায় বিভিন্নতা বিষয়টি এমন, যাতে ইজতেহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে। বিষয়টি পারস্পরিক মতবিরোধ বা মুসলমানদের মধ্যে ফাটলের কারণ হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যখন কিনা এতে সালাফে ছালেহীন থেকেই মতবিরোধ পাওয়া যায়। এ মাসআলায় এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যে, এতে ইজতেহাদ বা গবেষণার কোন সুযোগ নেই। কোন একটি ইজতেহাদী বিষয়ে বিরোধীতাকারীকে জনৈক বিদ্বান বলেছিলেন, আমার বিরোধীতা করে আপনি আমার মতটিই প্রকাশ করেছেন। কেননা ইজতেহাদী বিষয়ে প্রত্যেকে সেটারই অনুসরণ করবে যা সে সত্য মনে করে। আমরা সবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর পসন্দনীয় ও সন্তুষ্টি মুলক কাজ কামনা করছি।

প্রশ্নঃ (২৮০) তারাবীহ্ নামাযে কুরআন খতম করার দু'আ পাঠ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ রামাযান মাসে তারাবীহ্ নামাযে কুরআন খতম করার দু'আ পাঠ করার ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন হাদীছ আমি জানিনা। খুব বেশী যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, আনাস বিন মালেক (রাঃ)

---

1 . মুআত্ত্বা মালেক, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল্লায়ল করার বর্ণনা।

বর্ণিত হাদীছ। 'তিনি (আনাস) কুরআন খতম করলে পরিবারের লোকদের একত্রিত করে দু'আ করতেন।' তবে এটা নামাযের বাইরের কথা।

কুরআন খতমের দু'আ সুন্নাত থেকে তো প্রমাণিত নয়ই তারপরও এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু মসজিদে অতিরিক্ত ভীড় লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ ব্যাপক আকারে দেখা যায়। কিন্তু বিদ্বানদের কেউ বলেছেন কুরআন খতম করার পর এই দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব।

ইমাম যদি শেষ রাতের নামায সমাপ্ত করে বিতর নামাযে এই খতমে কুরআনের দু'আ পাঠ করে এবং কুনূত পাঠ করে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা বিতর নামাযে কুনূত শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্নঃ (২৮১) প্রতি বছর কি লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট এক রাতেরই হয়ে থাকে ? না কি তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাতে হয়ে থাকে ?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে লাইলাতুল কদর রামাযান মাসে হয়ে থাকে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"নিশ্চয় আমি উহা (কুরআন) অবতীর্ণকরেছি কদ্বর রাত্রিতে।" (সূরা কদরঃ ১) অন্যআয়াতে পবিত্র কুরআন রামাযান মাসে নাযিল হয় একথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

"রামাযান সেই মাস যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্য রামাযানের প্রথম দশকে ই'তেকাফ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় দশকে এ'তেকাফ করেছেন। অতঃপর তা দেখেছেন রামাযানের শেষ দশকে।[1] এরপর ছাহাবীদের (রাঃ) একটি দল স্বপ্নে দেখেছেন লাইলাতুল কদর রামাযানের শেষ সাত দিনে। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ)

"আমি দেখছি তোমাদের সবার স্বপ্ন একরকম হয়েছে শেষ সাত দিনে। অতএব কেউ যদি লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন শেষ সাত রাতে অনুসন্ধান করে।"[2] লায়লাতুল কদরের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বনিম্ন যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই।

লায়লাতুল কদরের ব্যাপারে প্রমাণিত দলীল সমূহ যদি আমরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করি, তবে দেখা যাবে যে, তা বিভিন্ন রাতে হয়ে থাকে। প্রতি বছর নির্দিষ্টভাবে এক রাতে নয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা রাত্রে লায়লাতুল কদর স্বপ্নে

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত।

[2] . বুখারী ও মুসলিম পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ।

দেখলেনঃ পানি ও ভিজা মাটিতে সিজদা করলেন। সে রাতটি ছিল একুশে রাত।[1] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)

"তোমরা রামাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান কর।"[2] এদ্বারা বুঝা যায় উহা নির্দিষ্ট একটি রাতে নয়। এজন্য মু'মিন শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই অনুসন্ধান করবে ও যে কোন রাতে তা পেয়ে যাওয়ার জন্য আশার াখবে।

যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরে ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের আশায় ক্বিয়ামুল্লাইল করবে, সে নিশ্চিতভাবে তার প্রতিদান লাভ করবে। চাই সে জানতে পারুক বা না পারুক। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদরে ক্বিয়াম করে, তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করা হবে।"[3] এরূপ বলা হয়নি যে, কখন লায়লাতুল কদর হবে জানতে পারলে এই ছওয়াব হাসিল হবে। অতএব ছাওয়াব পাওয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে কখন লায়লাতুল কদর হচ্ছে তা জানা শর্ত নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি রামাযানের শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই কিয়াম করবে, সে নিশ্চিতভাবে লায়লাতুল কদর পাবে। চাই তা শেষ দশকের প্রথম দিকে হোক বা মধ্যখানে বা শেষের দিকে হোক।

প্রশ্নঃ (২৮২) তারাবীহ্ নামাযে কুরআন হাতে নিয়ে ইমামের পড়ার অনুসরণ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ইমামের পড়ার অনুসরণ করবে এই উদ্দেশ্যে হাতে কুরআন নিয়ে তারাবীহ্ নামায আদায় করা কয়েকটি কারণে সুন্নাতের পরিপন্থীঃ

১) একাজ করলে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার সুন্নাতের উপর আমল করা যায় না।

২) এতে বিনা প্রয়োজনে অধিক নড়াচড়ার দরকার হয়ে পড়ে। যেমন, কুরআন খোলা, বন্ধ করা, বগলের নীচে বা পকেটে রাখা প্রভৃতি।

৩) নিঃসন্দেহে এই নড়াচড়ার কারণে নামাযে অন্যমনস্ক হবে।

---

[1] . বুখারী ও মুসলিম পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ছালাতুত্ তারাবীহ্, অনুচ্ছেদঃ শেষ দশকের বেজোড় রাতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করা। মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ঈমান,অনুচ্ছেদঃ রামাযান মাসে নফল নামায পড়া ঈমানের অন্তর্গত। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ রামাযান মাসে কিয়ামুল্লায়ল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ।

৪) সিজদার স্থানে দৃষ্টিপাত করায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। কেননা সুন্নাত ও উত্তম হচ্ছে, সিজদার স্থানে দৃষ্টিপাত করা।

৫) এ কারণে হতে পারে নামাযে অন্তর উপস্থিত থাকবে না। ফলে মুছল্লী ভুলেই যাবে সেকি নামাযে আছে না শুধু কুরআন তেলাওয়াত করছে। কিন্তু যদি বিনয়-নম্রতার সাথে দন্ডায়মান হয়ে ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপন করে এবং মাথা ও দৃষ্টি অবনত রেখে নামায আদায় করে, তবে অন্তরের উপস্থিতি অনেক বেশী অনুভব করবে এবং মনে থাকবে সে ইমামের পিছনে রয়েছে।

তারাবীহ্‌র নামাযে কণ্ঠস্বর সুন্দর করে কুরআন পাঠ

প্রশ্নঃ (২৮৩) কোন কোন ইমাম তারাবীহ্ নামাযে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে মানুষের অন্তর নরম ও তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে। কোন কোন মানুষ এটাকে অপছন্দ করে। আল্লাহ্ আপনাকে হেফাযত করুন-এক্ষেত্রে আপনার মত কি ?

উত্তরঃ আমি মনে করি, একাজ যদি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়াই শরীয়তের গন্ডির মধ্যে হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। এ জন্যই আবু মূসা আল আশআরী (রাঃ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেছিলেন, "যদি জানতাম আপনি আমার ক্বেরাত শুনছেন তবে আমি আপনার জন্য কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর করার চেষ্টা করতাম।"[1] অর্থাৎ- সুন্দর, সুললিত ও উৎকৃষ্ট করার চেষ্টা করতাম। অতএব কেউ যদি কণ্ঠস্বর সুন্দর করার চেষ্টা করে এবং এমনভাবে পাঠ করে যা দ্বারা মানুষের অন্তর নরম করা সম্ভব হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা আমি মনে করি না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি করে, যেমন সাধ্যাতিরিক্ত টানে বা গানের সূরের সাথে মিলায় বা প্রতিটি শব্দকেই গানের মত করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে, তবে তা উচিত নয়।

ফরয নামাযের পূর্বাপর সুন্নাত নামাযের সময়

প্রশ্নঃ (২৮৪) কোন কোন বিদ্বান বলেন, ফরয নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত সমূহের সময় হচ্ছে ফরয নামাযের সময় হওয়ার পর। ফরযের সময় শেষ হলে সুন্নাতের সময়ও শেষ। আবার কেউ বলেন, পূর্বের সুন্নাতগুলো ফরয শেষ হলেই শেষ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা কি ?

উত্তরঃ সঠিক কথা হচ্ছে, ফরযের পূর্বের সুন্নাত নামাযের সময় হল ফরয নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে ঐ নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। যেমন, যোহরের ফরযের পূর্বের সুন্নাতের সময় শুরু হবে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর যোহরের আযান হলে। আর শেষ হবে যোহর নামায শেষ হলে। আর ফরযের পরের সুন্নাতের সময় হচ্ছে, ফরয

---

[1] . বায়হাক্বী, অধ্যায়ঃ শাহাদাত। অনুচ্ছেদঃ সুন্দর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা। ১০/২৩১। মুসনাদ আবু ইয়ালা ১৩/২৬৬ হা / ৭২৭৯)

নামায শেষ হওয়ার পর থেকে নামাযের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো যদি পূর্বের সুন্নাত ছুটে যায়, তবে ফরয নামায আদায়ের পর তা কাযা আদায় করতে পারে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ওযরে হলে পরে কাযা আদায় করাতে কোন ফায়দা নেই। কেননা বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত সমূহ যদি বিনা ওযরে তার সময় পার করে দেয়; তবে পরে আদায় করলে তা বিশুদ্ধও হবে না এবং কবূলও হবে না।

প্রশ্নঃ (২৮৫) ফজরের পূর্বের সুন্নাত ফরযের পর আদায় করা যাবে কি ?

উত্তরঃ বিশুদ্ধমতে ফজর নামায শেষ করে সুন্নাত নামাযের কাযা আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই। এটা ফজরের পর নামায আদায় করার নিষিদ্ধতার অন্তর্ভূক্ত হবে না। কেননা কারণ বিহীন কোন নামায উক্ত সময়ে আদায় করা নিষেধ। কিন্তু যদি ভুলে যাওয়ার আশংকা না থাকে তবে উহা কাযা আদায় করার জন্য সূর্য উঠার পর পর্যন্ত দেরী করা উত্তম।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করার পর কি পুনরায় কোন নফল আদায় করা যায় ?

প্রশ্নঃ (২৮৬) আযানের পূর্বে যদি মসজিদে প্রবেশ ক রে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করে। তবে আযানের পর কি পুনরায় কোন নফল নামায আদায় করতে পারবে ?

উত্তরঃ আযান যদি ফজর বা যোহর নামাযের হয়। তবে আযানের পর ফজরের দু'রাকাত ও যোহরের চার রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করবে। আর যদি অন্য নামাযের আযান হয় তবুও নফল আদায় করা শরীয়ত সম্মত। কেননা নবী [ﷺ] বলেছেনঃ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ "প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে।"[1]

প্রশ্নঃ (২৮৭) সুন্নাত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তা কি কাযা আদায় করা যায় ?

উত্তরঃ হ্যাঁ। নিদ্রা বা ভুলে যাওয়ার কারণে যদি সুন্নাত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার কাযা আদায় করা যায়। কেননা তা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আ'ম বা ব্যাপক হাদীছের অন্তর্ভূক্ত। তিনি বলেন,

(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)

"যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে স্মরণ হলেই তা আদায় করে নিবে।"[2] উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী (ছাল্লাল্লাহু

---

[1] .বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ নামায কাযা আদায় করা।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের ফরযের পর ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করতে না পারলে, আছরের পর তার কাযা আদায় করতেন।'[1] কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে না পড়ে সময় অতিবাহিত করে দিলে, তার কাযা আদায় করবে না। কেননা সুন্নাত নামায সময় সাপেক্ষ ইবাদত। আর সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে তার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করলে তা কবূল করা হবে না।

প্রশ্নঃ (২৮৮) ফরয নামায আদায় শেষে সুন্নাত আদায় করার জন্য স্থান পরিবর্তন করার কোন দলীল আছে কি ?

উত্তরঃ হ্যাঁ। মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاة حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন এক নামাযের সাথে অন্য নামাযকে মিলিয়ে না দেই যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলি বা বের না হয়ে যাই।"[2] এথেকে বিদ্বানগণ বলেন, ফরয এবং সুন্নাতের মধ্যবর্তী সময়ে কথা বলে বা স্থানান্তর হয়ে পার্থক্য করা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৮৯) চাশতের নামায ছুটে গেলে তার কি কাযা আদায় করা যায় ?

উত্তরঃ চাশতের সময় পার হয়ে গেলে তা আদায় করার স্থান ও সময় ছুটে গেল। তাই তা কাযা আদায় করার দরকার নেই। কেননা উহা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার সাথে শর্তযুক্ত। কিন্তু সুন্নাত নামায সমূহ ফরয নামায সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তা কাযা আদায় করা যাবে। অনুরূপভাবে বিতর নামাযও কাযা আদায় করা যাবে। ছহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছেঃ (كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমিয়ে পড়ার কারণে বা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে অক্ষম হলে, দিনের বেলায় ১২ (বার) রাকাআত নামায আদায় করে নিতেন।"[3] অতএব তিনি বিতরও কাযা আদায় করতেন।

প্রশ্নঃ (২৯০) তিলাওয়াতের সিজদা দেয়ার জন্য তাহারাত বা পবিত্রতা কি আবশ্যক ? এই সিজদায় কি দু'আ পাঠ করতে হবে ?

উত্তরঃ কুরআনুল কারীমে নির্দিষ্টভাবে যে সমস্ত সিজদার আয়াত রয়েছে তা পাঠ করার সময় সিজদা প্রদান করা শরীয়ত সম্মত। সিজদার সময় হলে, তাকবীর দিয়ে আল্লাহু

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযে সাহু বা ভুল করা, অনুচ্ছেদঃ নামায অবস্থায় কেউ কথা বলতে চাইলে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ নবী [ﷺ] যে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন তা জানা।

[2]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ জুমআর নামায। অনুচ্ছেদঃ জুমআর পর নামায আদায় করা।

[3]. ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু ছালাতুল মুসাফিরীন।

আকবার বলে সিজদা প্রদান করবে। পাঠ করবেঃ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) সুবহানা রাব্বীয়্যাল আ'লা) (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবি হামদিকা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী) (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু, ফাছাউওয়ারাহু, ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাছারাহু ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালেক্বীন।)[1] (اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ) আল্লাহুম্মাক্‌তুব লী বিহা আজরা, ওয়া যা' আন্নী বিহা ভিযরা, ওয়াজ্ আলহা লী ইনদাকা যুখরা, ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন আ'বদিকা দাউদ) অর্থঃ হে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে আমার জন্য প্রতিদান লিখে দাও। আমার গুনাহ্ মোচন কর। আমার জন্য আপনার কাছে তাকে সঞ্চিত করে রাখ। আমার নিকট থেকে তা কবূল করে নাও যেমনটি কবূল করেছো তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে।[2] তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। তাকবির দিবে না সালামও ফেরাবে না। কিন্তু ছালাত অবস্থায় যদি সিজদার আয়াত পড়ে তবে আবশ্যক হচ্ছে সিজদা দেয়া এবং সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর দেয়া। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামাযের বর্ণনা যারা দিয়েছেন, তারা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রত্যেকবার মাথা নীচু করা ও মাথা উঠানোর সময় তাকবীর দিতেন।[3]

কিন্তু কিছু লোক নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে, সিজদার সময় শুধু তাকবীর দেয় উঠার সময় দেয় না। তাদের এ কাজের পক্ষে আমি সুন্নাহ্ থেকে বা বিদ্বানদের উক্তি থেকে কোন দলীল খুঁজে পাইনি।

তিলাওয়াতের সিজদার জন্য তাহারাত বা ওযু আবশ্যক কি না ? এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেনঃ পবিত্রতা আবশ্যক। কেউ বলেছেনঃ এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইবনু ওমার (রাঃ) বিনা পবিত্রতায় সিজদা করতেন। কিন্তু আমি যেটা মনে করি, তা হচ্ছে বিনা ওযুতে এই সিজদা না দেয়া।

প্রশ্নঃ (২৯১) কখন আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা শুক্‌র দিতে হয়? এর পদ্ধতি কি? এর জন্য ওযু করা কি আবশ্যক ?

---

[1]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুছ্ ছালাত (১৪১৪)তিরমিযী, কিতাবুছ্ ছালাত (৫৮০)

[2]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্ অধ্যায়ঃ আযান।

[3]. বুখারী, কিতাবু তাহাজ্জুদ, হা/ ১১৬৬।

উত্তরঃ সিজদায়ে শুক্র দিতে হয়-মানুষ যখন কোন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করে বা কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হয় বা আনন্দময় কোন কিছু লাভ করে। এ সিজদার নিয়ম নামাযের বাইরে তেলাওয়াতের সিজদার মত। বিদ্বানদের কেউ কেউ এ সিজদার জন্য ওযু এবং তাকবীর আবশ্যক মনে করেন। কেউ শুধু প্রথম তাকবীর দেয়ার কথা বলেন। অর্থাৎ- তাকবীর দিয়ে সিজদাবনত হবে, তারপর (সুবহানা রাব্বীয়্যাল আ'লা) বলার পর কিছু দু'আ করবে। এরপর তাকবীর না দিয়েই উঠে যাবে।

প্রশ্নঃ (২৯২) নামাযে ইস্তেখারার বিধান কি ? তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা সুন্নাত নামায পড়ে কি ইস্তেখারার দু'আ পড়া যায় ?

উত্তরঃ মানুষ যখন কোন কাজ বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা করে; কিন্তু স্থির করতে পারে না কাজটি বাস্তবায়ন করবে না ছেড়ে দিবে ? তখন ইস্তেখারার নামায আদায় করা সুন্নাত। তবে করা বা না করার কোন একটি দিক যদি তার কাছে প্রাধান্য পায় এবং স্থির হয়ে যায় তবে সে সময় ইস্তেখারা করা সুন্নাত নয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক কাজই করতেন। কিন্তু দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার পরেই তা করে ফেলতেন। তিনি এসব প্রত্যেকটা কাজের জন্য ইস্তেখারা করেছেন এরকম বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন মানুষ যদি ইচ্ছা করে-নামায আদায় করবে বা যাকাত প্রদান করবে বা কোন হারাম গর্হিত বিষয় পরিত্যাগ করবে বা খানা-পিনা করবে বা ঘুমাবে তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইস্তেখারা শরীয়ত সম্মত নয়।[1] কিন্তু যদি তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা সুন্নাত নামায আদায় করার সময় ইস্তেখারার নিয়ত করে তারপর ইস্তেখারার দু'আ পাঠ করে, তবে হাদীছের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী তা যথেষ্ট হবে। হাদীছে বলা হয়েছেঃ "তখন ফরয নয় এমন দু'রাকাআত নামায যেন সে আদায় করে।" এখানে শুধু ফরযকেই বাদ দেয়া হয়েছে। তবে যথেষ্ট না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা হাদীছে বলা হয়েছেঃ "যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন..।" এদ্বারা উক্ত দু'রাকাআতের উদ্দেশ্য ইস্তেখারা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমার মতে উত্তম হচ্ছে, এ দু'রাকাআত নামায আলাদাভাবে শুধুমাত্র ইস্তে খারার নিয়তেই আদায় করা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৯৩) ছালাতু তাছবীহ্‌র নামায কি ?

উত্তরঃ ছালাতুত্ তাছবীহ্‌র নামায নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, এ সম্পর্কিত হাদীছ ছহীহ্ নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, 'এ সম্পর্কিত হাদীছ মিথ্যা। ইমাম আহমাদ এবং তাঁর অনুসারী ইমামগণ এ নামাযকে মাকরূহ মনে করতেন। কোন ইমামই এ নামাযকে মুস্তাহাব বলেন নি। আর অন্যান্য ইমামগণ আবু হানীফা,

[1] . বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বানিজ্য, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি বৈধ বিষয়ে ইস্তেখারা করা সুন্নাত।

মালেক ও শাফেঈ এ সম্পর্কে কোন কিছু শোনেন নি তাই কোন মন্তব্যও করেন নি।" শায়খুল ইসলামের এ কথা খুবই সত্য। কেননা এ নামায বিশুদ্ধ হলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে উম্মতের কাছে সন্দেহাতীতভাবে ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করা হত। কেননা তাতে রয়েছে বিরাট প্রতিদান ও উপকার। তাছাড়া সাধারণ নামাযের পদ্ধতি থেকেও তা সম্পূর্ণ আলাদা। বরং সমস্ত ইবাদত থেকে এটি মূলতঃ আলাদা ধরণের। কেননা এমন কোন ইবাদত আমরা দেখিনা, যা আদায় করার জন্য এধরণের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে- প্রতিদিন আদায় করবে অথবা সপ্তাহে একবার অথবা মাসে একবার অথবা বছরে একবার অথবা সারা জীবনে হলেও একবার। তাছাড়া কোন বিষয় মৌলিকতা থেকে আলাদা হলে মানুষ তার প্রতি গুরুত্বারোপ করতো, বিষয়টি অন্যরকম হওয়ার কারণে মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত থকাতো। এর কোনটিই না হওয়ার কারণে বুঝা যায়, এ নামায শরীয়ত সম্মত নয়। আর এ কারণেই কোন ইমাম একে মুস্তাহাব বলেননি।[1] (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্নঃ (২৯৪) বিবাহের সময় দু'রাকাআত নামায পড়ার বিধান কি ? বিশেষ করে বাসর রাতে এদু'রাকাআতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় ?

উত্তরঃ বিবাহের সময় দু'রাকাআত নামায পড়া সম্পর্কে কোন হাদীছ নেই। তবে কোন কোন ছাহাবী বাসর রাতে দু'রাকাআত নামায আদায় করেছেন, এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়।[2] তবে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন ছহীহ্ হাদীছ জানা যায় না। অবশ্য বাসর রাতে শরীয়ত সম্মত কাজ হচ্ছে, নববধুর কপাল ধরে এই দু'আ পাঠ করবেঃ

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)

"হে আল্লাহ্! আপনার কাছে এর কল্যাণ এবং একে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় কামনা করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং একে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে।"[3]

এরকম করলে স্ত্রী ভীত হবে বা অপছন্দ করবে এমন আশংকা থাকলে-তার নিকটবর্তী হওয়ার ভান করে আলতো করে কপালে হাত রাখবে এবং তাকে না শুনিয়েই চুপে চুপে উক্ত দু'আটি পাঠ করবে। কেননা ইসলামী জ্ঞানে অজ্ঞ থাকার কারণে কোন কোন নারী এরকম খেয়াল করতে পারে যে, আমার মধ্যে কি অকল্যাণ আছে ? এতে সে বিষয়টিকে

---

[1]. কিন্তু এ বিষয়ের হাদীছ ছহীহ্ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম আলবানী ছহীহ্ তারগীব ও তারহীব গ্রন্থের মধ্যে হাদীছটির ছহীহ্ হওয়া প্রমাণিত করেছেন। তাঁর পূর্বে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদও হাদীছটির ছহীহ্ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ ছহীহ তারগীব ও তারহীব হা/ ৬৭৭ ও ৬৭৮)

[2]. মুছান্নাফ আবদুর রাজ্জাক ৬/১৯১। হায়ছামী মাজমা' যাওয়ায়েদ গ্রন্থে ৪/২৯১

[3]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদঃ বিবাহের বর্ণনা। হা/ ১৮৪৫।

অন্য খাতে নিতে পারে। সুতরাং ঝামেলা এড়ানোর জন্য নীরবে ও না জানিয়ে দু'আ পাঠ করাই ভাল।

প্রশ্নঃ (২৯৫) নামাযের নিষিদ্ধ সময় সমূহ কি কি ? মাগরিবের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আযানের পূর্বে না আযানের পর আদায় করবে ?

উত্তরঃ নিষিদ্ধ সময় সমূহ হচ্ছেঃ

১) ফজর নামাযের পর থেকে তীর বরাবর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর ১৫/২০ মিনিটি পর্যন্ত।

২) ঠিক দুপুরের সময়। অর্থাৎ যোহরের সময় হওয়ার ১০ মিঃ আগে থেকে যোহরের সময় হওয়া পর্যন্ত।

৩) আছর নামাযের পর থেকে পরিপূর্ণরূপে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায যে কোন সময় আদায় করা শরীয়ত সম্মত। যখনই মসজিদে প্রবেশ করে বসতে যাবে তখনই দু'রাকাআত নামায আদায় করবে। যদিও তা নিষিদ্ধ সময়ে হয়ে থাকে।

জানা উচিত, বিদ্বানদের মতামতের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, কারণ বিশিষ্ট নফল নামায সমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সময় বলতে কোন কিছু নেই। নিষিদ্ধ সময়েও তা আদায় করতে কোন বাধা নেই। সুতরাং ফজর নামায বাদ বা আছর নামায বাদ বা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার সামান্য পূর্বে বা রাতে দিনে যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার আগে দু'রাকাআত নামায আদায় করবেন। অনুরূপভাবে তাহিয়্যাতুল ওযু নামাযও যে কোন সময় আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (২৯৬) জামাআতে নামায আদায় করার বিধান কি ?

উত্তরঃ উলামাগণ একথার উপর একমত হয়েছেন যে, জামাআতে নামায আদায় করা শ্রেষ্ঠতম, গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং এমনকি ভীতির সময় জামাআতবদ্ধভাবে নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾

"আর যখন আপনি তাদের সাথে থাকেন আর তাদেরকে (জামাআতের সাথে) নামায পড়ান, তবে তা এইভাবে হবে যে, তাদের মধ্যে থেকে একদল আপনার সাথে নামাযে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখবে। অনন্তর যখন তারা সিজদা করবে (এক রাকাআত পূর্ণ

করবে), তখন তারা আপনাদের পিছনে চলে যাবে এবং অন্য দল যারা এখনও নামায পড়েনি তারা আসবে এবং আপনার সাথে নামায (অবশিষ্ট এক রাকাআত) পড়ে নিবে। আর এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখবে। কাফেরগণ এটাই চায় যে, আপনারা যদি নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্যসম্ভার থেকে একটু অসতর্ক হন, তবে অমনি তারা একযোগে আপনাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আর যদি বৃষ্টির দরুণ আপনাদের কষ্ট হয় অথবা আপনারা পীড়িত হন, তবে নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখতে কোন পাপ হবে না। আর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে রাখবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসাঃ ১০২)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতেও অসংখ্য হাদীছ রয়েছে, যা জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত করে। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)

"নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করছি, নামাযের আদেশ দিব, নামায কায়েম করা হবে। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ দিব সে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করবে। অতঃপর কাঠের বোঝা বহনকারী কিছু লোক নিয়ে আমি বের হব এমন লোকদের উদ্দেশ্যে যারা নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়নি। তারপর তাদেরকেসহ তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিব।"[1] নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ)

"যে ব্যক্তি আযান শুনে তার জবাবে সাড়া দিয়ে আসবে না, ওযর ব্যতীত তার নামায হবে না।"[2] জনৈক অন্ধ ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর দরবারে এসে জামাআতে না যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বললেন, (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ) "তুমি কি আযানের ধ্বনি শুনে থাক?" সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَأَجِبْ "তবে অবশ্যই নামাযে হাজির হবে।"[3] আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন,

(لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ أو مريض، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ)

---

[1] . ছহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায় ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায় করার ফযীলত

[2] . ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ মসজিদ, অনুচ্ছেদঃ জামাআতে না আসার প্রতি কঠোরতা।

[3] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ যে আযান শুনেছে তার মসজিদে আসা ওয়াজিব।

'আমরা দেখেছি সুস্পষ্ট মুনাফিক ও অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাহাবীগণ জামাআতের নামায থেকে পশ্চাতে থাকতেন না। আর অসুস্থ ব্যক্তিকে দু'জন ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।'[1]

সুস্থ দৃষ্টি ভঙ্গিও জামাআতের সাথে নামাযকে ওয়াজিব প্রমাণ করে। ইসলামী উম্মত এক দলভুক্ত জাতি। ইবাদতের একাত্মতা ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আর ইবাদত সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম ইবাদত হচ্ছে ছালাত। তাই মুসলিম জাতির উপর আবশ্যক হচ্ছে, এই ইবাদত আদায় করার সময় তারা একতাবদ্ধ হবে।

বিদ্বানগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, জামাআতবদ্ধ নামায শ্রেষ্ঠ, গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। কিন্তু তারা মতবিরোধ করেছেন-নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাআতবদ্ধ হওয়া কি শর্ত ? নাকি একাকী নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু জামাআতের সাথে না পড়ার কারণে সে গুনাহগার হবে ?

সঠিক কথা হচ্ছে- জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব। নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। তাই শরীয়ত সম্মত কোন কারণ বা ওযর ব্যতিরেকে জামাআত পরিত্যাগ করলে গুনাহগার হবে। একথার দলীল হচ্ছে-রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাকী নামায পড়ার চাইতে জামাআতবদ্ধ নামাযকে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন।[2] একথার অর্থ হচ্ছে একাকী নামায আদায় করলে যদি বিশুদ্ধ না হতো, তবে তার চেয়ে জামাআতবদ্ধ নামাযকে প্রাধান্য দেয়া হতো না।

মোটকথা প্রত্যেক মুসলিম, বিবেকবান প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব হচ্ছে জামাআতের সাথে নামাযে হাজির হওয়া। চাই সে বাড়িতে অবস্থান করুক বা সফরে থাকুক।

বাসস্থানের মধ্যে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা

প্রশ্নঃ (২৯৭) একদল লোক কোন স্থানে বসবাস করে। ঐ বাসস্থানে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা কি তাদের জন্য জায়েয হবে ? নাকি মসজিদে গমণ করা আবশ্যক ?

উত্তরঃ বাসস্থানে বসবাসকারী লোকদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা। যাদের আশে পাশেই মসজিদ পাওয়া যায়। মসজিদ নিকটে থাকা সত্বেও কোন ব্যক্তি বা দলের জন্য নিজ গৃহে নামায আদায় করা জায়েয নেই। তবে মসজিদ যদি দূরে হয়, ফলে আযান শুনতে না পায়, তবে বাড়িতে জামাআত করে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। কিছু আলেমের কথার উপর ভিত্তি

---

[1] . মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

[2] . মুসলিম, পূর্ববর্তী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে।

করে অনেক লোক এই মাসআলাটিতে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। তারা বলে থাকেঃ জামাআতে নামায পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নামাযের জন্য একদল লোকের একস্থানে সমবেত হওয়া। চাই তা মসজিদে হোক বা অন্য কোথাও। অতএব একদল লোক যদি নিজ বাড়িতেও জামাআতের সাথে নামায আদায় করে, তবে তো উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলওয়াজিব আদায় হয়ে গেল। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা মসজিদে জামাআত প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। দলীলঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ))

"নিশ্চয় আমার ইচ্ছা হয়, নামাযের আদেশ দেই, নামায কায়েম করা হোক। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ দেই সে লোকদের নিয়ে নামায কায়েম করবে। অতঃপর কাঠের বোঝা বহনকারী কিছু লোক নিয়ে আমি বের হই, এমন লোকদের উদ্দেশ্যে, যারা নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়নি। তারপর তাদেরকেসহ তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিব।"[1] অথচ হতে পারে এই লোকেরা নিজ গৃহে নামায আদায় করেছে।

তাছাড়া গুটিকতক লোক একস্থানে সমবেত হয়ে নামায আদায় করলেই যদি জামাআতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়-মসজিদে যাওয়ার আবশ্যকতা না থাকে, তবে মসজিদ প্রতিষ্ঠারই বা দরকার কি!? অতএব ঐ লোকদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা। তবে যদি মসজিদ বেশী দূরে হয়, সেখানে যেতে কষ্ট হয়, তবে গৃহে নামায আদায় করতে কোন দোষ নেই।

কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীর আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়

প্রশ্নঃ (২৯৮) কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীর জন্য কোনটি উত্তম-আযান শোনার সাথে সাথে নামাযে যাওয়া ? নাকি কিছুটা অপেক্ষা করে কিছু কাজ সম্পাদন করে নামায আদায় করা। আর সুন্নাতে মুআক্কাদা ছাড়া অন্যান্য নফল নামায পড়ার ক্ষেত্রে তার বিধান কি ?

উত্তরঃ সমস্ত মুসলমানের জন্য উত্তম হচ্ছে, আযান শোনার সাথে সাথে নামাযে যাওয়া। কেননা মুআয্যিন আহবান করেন, 'হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ' এসো নামাযের দিকে। কোন ধরণের গড়িমসি বা দেরী করলে হয়তো নামাযটাই ছুটে যাবে। তাই যত দ্রুত সম্ভব আযান শোনার সাথে সাথে মসজিদের পানে ছুটে যাওয়া।

কিন্তু সুন্নাতে মুআক্কাদা ছাড়া অন্যান্য নফল নামায পড়া উক্ত কর্মচারীর জন্য উচিত হবে না। কেননা চাকরীর চুক্তির ভিত্তিতে এই সময়টুকুর পাওনাদার হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। তবে

---

[1]. (ছহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায় ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায় করার ফযীলত)

সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে সাধারণতঃ এর অনুমতি থেকেই থাকে।

ছুটে যাওয়া রাকাআতের কাযা আদায় করতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো

প্রশ্নঃ (২৯৯) করো যদি প্রথম এক রাকাআত বা দু'রাকাআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালামের পর সে কি ছুটে যাওয়া রাকাআতের কাযা আদায় করার জন্য সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে? নাকি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করেই ক্ষ্যান্ত হবে ?

উত্তরঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ইমামের সালামের পর মুক্তাদী যে ছালাতটুকু পূরা করে থাকে, তা হচ্ছে তার নিজস্ব নামাযের শেষ অংশ। তাই সে শুধু সূরা ফাতিহাই পাঠ করবে। এটা হচ্ছে-যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের ছুটে যাওয়া রাকাআতের সংখ্যা এক বা দুই হয় বা মাগরিবের এক রাকাআত ছুটে থাকে। আর ফজরের কোন রাকাআত ছুটে গেলে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩০০) মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে শেষ তাশাহুদে পেলে কি নামাযে শামিল হবে ? নাকি দ্বিতীয় জামাআত কায়েম করার জন্য অপেক্ষা করবে ?

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে যে, ইমাম শেষ তাশাহুদে বসে আছেন, তখন যদি দ্বিতীয় জামাআত অনুষ্ঠিত হওয়ার আশা থাকে, তবে নামাযে শরীক হবে না; বরং অপেক্ষা করবে। কিন্তু দ্বিতীয় জামাআত অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তাশাহুদে বসে পড়বে। কেননা বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এক রাকাআত নামায না পেলে জামাআত পাওয়া হল না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)

"যে ব্যক্তি এক রাকাআত নামায পেল, সে পূর্ণ নামায পেয়ে গেল।"[1] যেমনটি এক রাকাআত নামায না পেলে জুমআর নামায পাওয়া হল না, তেমনি জামাআতের নামায। সুতরাং ইমামের শেষ তাশাহুদে নামাযে শরীক হলে জামাআত পাওয়া হল না। অতএব দ্বিতীয় জামাআতের সম্ভাবনা থাকলে অপেক্ষা করাই ভাল। আর সম্ভাবনা না থাকলে ফিরে যাওয়ার চাইতে শেষ নামাযের তাশাহুদে শামিল হওয়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৩০১) নফল বা সুন্নাত নামায শুরু করে দিয়েছি। এমন সময় ফরয নামাযের ইক্বামত হয়ে গেল। এখন কি করব ?

---

[1] . ছহীহ্ বুখারী অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাআত পায়। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাআত পেয়ে গেল সে পূর্ণ নামায পেয়ে গেল ।

উত্তরঃ সুন্নাত বা নফল নামায শুরু করার পর যদি ফরয নামাযের ইক্বামত হয়ে যায়, তবে একদল বিদ্বান বলেন, তখনই নামায ছেড়ে দিতে হবে। যদিও শেষ তাশাহুদে বসে থাকে না কেন। আরেক দল বিদ্বান বলেন, ইমামের সালাম ফেরানোর আগেই নিজে তাকবীরে তাহরিমা দিতে পারার সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত নামায ছাড়বে না।

মত দু'টি পরস্পর বিরোধী। প্রথমটি হচ্ছেঃ শেষ তাশাহুদে বসে থাকলেও নামায ছেড়ে দিতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ আপনি নামায চালাতে থাকেন। কিন্তু যদি আশংকা করেন যে, নামায শেষ করে আপনি তাকবিরে তাহরিমা দেয়ার আগেই ইমাম সালাম ফিরিয়ে দিবেন, তবে নামায ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে শামিল হবেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ ও মধ্যপন্থী মত হচ্ছেঃ ইক্বামত দেয়ার সময় আপনি যদি শেষ রাকাআতে থাকেন তবে হালকা করে সেই রাকাআত পূর্ণ করে নিন। আর যদি প্রথম রাকাআতেই থাকেন তবে নামায ছেড়ে দিন। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাকাআত নামায পেল, সে নামায পেয়ে গেল।" (বুখারী ও মুসলিম) যখন আপনি ইক্বামতের পূর্বে এক রাকাত ছালাত পড়েছেন, তখন নিষিদ্ধ সময়ের আগেই এক রাকাত পড়ে নিয়েছেন। আর যে এক রাকাত নামায পড়ে নিয়েছে সে পূর্ণ নামাযই পেয়েছে। কিন্তু সে অবশিষ্ট রাকাত হালকাভাবে আদায় করবে। কেননা নফল নামাযের এক অংশ পাওয়ার চাইতে ফরয নামাযের এক অংশ পাওয়া অনেক উত্তম। কিন্তু আপনি যদি প্রথম রাকাতেই থাকেন তবে তো পূর্ণ নামায পাওয়ার সময়ই পেলেন না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক রাকাআত নামায পেল, সে নামায পেয়ে গেল।" অতএব এ অবস্থায় আপনি নামায ছেড়ে দিবেন। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) "যখন কোন নামাযের ইক্বামত দেয়া হয়; তখন উক্ত ফরয নামায ছাড়া আর কোন নামায নেই।"[1]

প্রশ্নঃ (৩০২) মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার পূর্বে ইমাম রুকূতে চলে গেলে মুক্তাদীর করণীয় কি ?

উত্তরঃ মুক্তাদী যদি এমন সময় নামাযে শরীক হয় যখন ইমাম রুকূর ইচ্ছা করছেন। আর মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পূর্ণ করতে পারেনি-যদি দু'এক আয়াত বা অনুরূপ বাকী থাকে তবে তা পড়ে নিয়েই ইমামের সাথে রুকূতে শামিল হবে। আর এটাই উত্তম। কিন্তু যদি সূরা ফাতিহা পূর্ণ করতে অনেকাংশ অবশিষ্ট রয়ে যায়, আর তা পূর্ণ করতে গেলে ইমামের সাথে রুকূতে শামিল হতে পারবে না আশংকা হয়, তবে ফাতিহা ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে রুকূতে চলে যাবে।

সর্বাবস্থায় ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীর উপর আবশ্যক

প্রশ্নঃ (৩০৩) মুক্তাদী যদি ইমামকে সিজদা অবস্থায় পায়, তবে কি ইমামের সিজদা

[1] .মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ মুআয্যিন একামত শুরু করলে নফল শুরু করা মাকরূহ|

থেকে উঠার অপেক্ষা করবে ? নাকি সিজদা অবস্থাতেই নামাযে শামিল হবে ?

উত্তরঃ উত্তম হচ্ছে ইমামকে যে অবস্থাতেই মুক্তাদী পাবে নামাযে শামিল হবে, কোনরূপ অপেক্ষা করবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا "তোমরা (ইমামের সাথে) যা পাবে তা আদায় করবে।"[1]

প্রশ্নঃ (৩০৪) যে সমস্ত নামাযে নীরবে কিরাআত পাঠ করা হয় সে সমস্ত নামাযে মুক্তাদীর ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ইমামের রুকূ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তাদী পড়তেই থাকবে। যদিও সে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে থাকে। চুপ থাকবে না। এমনকি প্রথম তাশাহুদের পর শেষের দু'রাকাতেও সূরা ফাতিহা পড়ার পর যদি দেখে ইমাম রুকূ করেননি, তবে অন্য সূরা পড়া শুরু করবে। কেননা নামাযে শরীয়ত অনুমদিত এমন কোন স্থান নেই যেখানে নামাযী চুপ করে থাকবে। তবে শুধু মাত্র ইমামের উচ্চ কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের সময় মুক্তাদী নীরব থাকবে ও শুনবে।

প্রশ্নঃ (৩০৫) ইমামের আগে আগে কোন কাজ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ইমামের আগে বেড়ে কোন কাজ করা হারাম। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,(أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ) "যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তার মাথাটি গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন না ? অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দিবেন না?"[2] আরো প্রমাণিত হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ)

"অনুসরণ করার জন্য ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি তাকবীর দেয়ার পর তোমরা তাকবীর দিবে, তিনি তাকবীর দিয়ে শেষ না করলে তোমরা তাকবীর দিবে না। তিনি রুকূ করলে তোমরা রুকূ করবে। তিনি রুকূতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা রুকূ করবে না।"[3]

উল্লেখ্য যে, ইমামের সাথে মুক্তাদীর চারটি অবস্থা রয়েছেঃ

১) ইমামের আগে বেড়ে কোন কিছু করা।

২) ইমামের সাথে সাথে করা।

৩) ইমামের অনুসরণ করা।

---

[1] . বুখারী ও মুসলিম

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোর পাপ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ ইমামের পূর্বে কোন কিছু করা হারাম।

[3] . আবু দাউদ অধ্যায়ঃ নামায, হা/৫১১।

৪) ইমামের পিছনে পিছনে করা।

ইমামের আগ বেড়ে কোন কিছু করাঃ অর্থাৎ ইমাম শুরু করার আগেই তা করে নেয়া। এরূপ করা হারাম। একাজ যদি তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে হয় তবে তার নামাযই হবে না। নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়া ওয়াজিব।

ইমামের সাথে সাথে করাঃ অর্থাৎ ইমামের রুকূর সাথে রুকূ করা, সিজদা করার সাথে সাথে সিজদা করা, উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে উঠে দাঁড়ানো। প্রকাশ্য দলীর সমূহ অনুযায়ী এরূপ করাও হারাম। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তিনি রুকূতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা রুকূ করবে না।”কোন কোন বিদ্বান বলেছেন এটা হারাম নয়; বরং মাকরূহ। তবে এটা যদি তাকবীরে তাহরীমার সময় হয়, তবে তার নামাযই হবে না। পুনরায় নামায পড়া তার উপর ওয়াজিব।

ইমামের অনুসরণ করাঃ অর্থাৎ ইমামের পর পর দেরী না করে তার অনুসরণ করা। এটাই হচ্ছে সুন্নাতী পদ্ধতি।

ইমামের পিছনে পিছনে করাঃ অর্থাৎ অতিরিক্ত দেরী করে ইমামের অনুসরণ করা। ইহা সুন্নাত বহির্ভূত।

প্রশ্নঃ (৩০৬) গুনাহ্গার (ফাসেক) লোকের পিছনে নামায পড়া কি জায়েয ?

উত্তরঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি-যদিও সে কিছু কিছু গুনাহ্র কাজে লিপ্ত থাকে-তার পিছনে নামায আদায় করা জায়েয ও নামায বিশুদ্ধ। এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু নিঃসন্দেহে পরহেজগার ও বাহ্যিকভাবে পরিশুদ্ধ লোকের পিছনে নামায আদায় করা উত্তম। ঐ গুনাহ্গার ব্যক্তির পাপ সমূহ যদি এমন পর্যায়ের হয় যা ইসলাম ভঙ্গকারী, তাহলে তার পিছে নামায আদায় করা বৈধ হবে না। কেননা তার নিজের নামাযই তো বিশুদ্ধ নয়। কেননা উক্ত পাপের কারণে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে। অতএব ইমামের নামায যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে তার কি অনুসরণ করা যায় ? তখন তো ইমাম ছাড়াই ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা হল।

নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায় করা যায়

প্রশ্নঃ (৩০৭) নফল আদায়কারীর পিছনে কি ফরয আদায় করা জায়েয হবে ? অথবা ফরয আদায় কারীর পিছনে কি নফল আদায় করা চলবে ?

উত্তরঃ উভয়টিই বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে আছর নামায আদায়কারীর পিছনে যোহর আদায় করা জায়েয হবে এবং যোহর আদায়কারী ইমামের পিছনে আছর আদায় করা যাবে। কেননা প্রত্যেকে নিয়ত অনুযায়ী আমল করবে। তার ফল পাবে। এ কারণে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, আপনি যদি মসজিদে গিয়ে দেখেন ইমাম তারাবীহ্ ছালাত আদায় করছেন, আর আপনার এশা নামায বাকী আছে, তবে তার সাথেই এশা নামায আদায় করে নিন। উহা আপনার জন্য ফরয আদায় হবে আর ইমামের হবে নফল।

সামনের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিয়ে পিছনে কাতার বানানোর বিধান

প্রশ্নঃ (৩০৮) একটি বিষয় নিয়ে মুছল্লীদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, জনৈক লোক নামায কায়েম হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করে দেখে কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কাতারে কোন জায়গা নেই। সে কি আগের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিয়ে তাকে নিয়ে নতুন কাতার করবে? না একাকী কাতারে দাঁড়াবে ? না অন্য কিছু করবে?

উত্তরঃ নামাযে এসে যদি দেখে যে, কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তবে তার তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ

১) কাতারের পিছনে একাকী নামায আদায় করবে।

২) অথবা সামনের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিবে এবং তাকে নিয়ে নতুন কাতার বানাবে।

৩) অথবা কাতার সমূহের আগে চলে গিয়ে ইমামের ডান দিকে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে।

এ তিনটি অবস্থা হচ্ছে যদি সে নামাযে প্রবেশ করতে চায়। চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে, এর কোনটিই করবে না। অর্থাৎ-

৪) এ জামাআতে শামিল হবে না, অপেক্ষা কর্ব ব।

এ চারটি অবস্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা বিশুদ্ধ ?

আমরা বলব, এচারটি অবস্থার মধ্যে বিশুদ্ধতম অবস্থাটি হচ্ছে, কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়াবে এবং ইমামের সাথে নামায আদায় করবে। কেননা ওয়াজিব হচ্ছে জামাআতের সাথে এবং কাতারে শামিল হয়ে নামায আদায় করা। এই দু'টি ওয়াজিবের মধ্যে একটি বাস্তবায়ন করতে অপারগ হলে অন্যটি বাস্তবায়ন করবে। অতএব আমরা বলব, কাতারের পিছনে একাকী হলেও জামাআতের সাথে নামায আদায় করবেন। যাতে তার ফযীলত লাভ করতে পারেন। এ অবস্থায় কাতারে শামিল হওয়ার ওয়াজিব আপনার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা আপনি তাতে অপারগ। আর আল্লাহ্ সাধ্যের বাইরে কোন কাজ বান্দার উপর চাপিয়ে দেননি। তিনি বলেন,(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) "আল্লাহ্ মানুষের সাধ্যাতিত কোন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেননি।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬) তিনি আরো বলেন, (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর।" (সূরা তাগাবুনঃ ১৬) এমতের প্রমাণে বলা যায়, কোন নারী যদি কাউকে সাথী হিসেবে না পায় তবুও সে একাকী কাতারের পিছনে দাঁড়াবে। কেননা পুরুষের কাতারে

দাঁড়ানো তার অনুমতি নেই। যখন কিনা শরঈ নির্দেশের কারণে পুরুষের কাতারে দাঁড়াতে সে অপারগ, তখন একাকী কাতারে দাঁড়াবে এবং নামায আদায় করবে।

অতএব যে ব্যক্তি কাতার পূর্ণ হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করবে এবং সে প্রকৃতপক্ষে কাতারে দাঁড়ানোর জন্য স্থান পাবে না, তখন তার এই ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। বাকী থাকবে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা। তাই সে কাতারের পিছনে একাকীই দাঁড়াবে ও নামায আদায় করবে। কিন্তু সম্মুখের কাতার থেকে কোন লোককে টেনে নিয়ে আসলে তিনটি নিষিদ্ধ কাজ করা হয়ঃ

ক) আগের কাতারে একটি স্থান ফাঁকা করা হল, ফলে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশের বিরোধী। তিনি কাতারকে বরাবর ও ফাঁকা স্থান পূর্ণ করতে আদেশ করেছেন।

খ) টেনে নিয়ে আসা লোকটিকে তার উত্তম স্থান থেকে কম ছাওয়াবের স্থানে সরিয়ে দেয়া হল। যা রীতিমত একটি অপরাধ।

গ) লোকটির নামাযে ব্যাঘাত ঘটানো হল। কেননা তাকে টানাটানি করলে তার অন্তরে একাগ্রতা কমে যাবে। এটিও একটি অপরাধ।

তৃতীয় অবস্থায় ইমামের ডান দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বলা হয়েছেঃ কিন্তু ইহা উচিত নয়। কেননা ইমামের স্থান অবশ্যই মুক্তাদীদের থেকে আলাদা থাকতে হবে। যেমন করে ইমাম কথায় ও কাজে মুক্তাদীদের থেকে বিশেষ ও আলাদা থাকেন। এটাই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াত। ইমাম মুক্তাদীদের থেকে আলাদা স্থানে তাদের সম্মুখে এককভাবে অবস্থান করবেন। এটাই ইমামের বিশেষত্ব। এখন মুক্তাদীগণও যদি তাঁর সাথে দন্ডায়মান হয়, তবে তো তার উক্ত বিশেষত্ব শেষ হয়ে গেল। আর চতুর্থ অবস্থায় জামাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলা হয়েছেঃ এটা অযৌক্তিক বিষয়। কেননা জামাআতে শামিল হওয়া ওয়াজিব এবং কাতারে শামিল হওয়াও ওয়াজিব। দু'ওয়াজিবের একটিতে অপারগ হলে তার কারণে অপরটিকে পরিত্যাগ করা জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ (৩০৯) মসজিদের উপর তলার লোকেরা নীচের তলার লোকদের দেখতে না পেলে নামায বিশুদ্ধ হবে কি ?

উত্তরঃ যখন মসজিদ একটিই, উপর তলার লোকেরা যদি ইমামের তাকবীর ধ্বনী শুনতে পায় তবে একে অপরকে দেখার কোন শর্ত নেই। তাদের সকলের নামায বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্নঃ (৩১০) রেডিও-টিভিতে প্রচারিত নামাযের অনুসরণ করা জায়েয আছে কি ?

উত্তরঃ টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত নামাযে ইমামের অনুসরণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। কেননা নামাযের জন্য জামাআতের অর্থ হচ্ছে একস্থানে সমবেত হওয়া। অতএব তাদেরকে একস্থানে একত্রিত হওয়া জরূরী। কাতার সমূহ মিলিত করা আবশ্যক। ঐ দু'টি কারণে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারিত নামায জায়েয হবে না। কেননা তা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। যদি এটা জায়েয হয়, তবে আর

মসজিদের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমআর নামায আদায় করে নিবে। নিঃসন্দেহে এটা জামাআত ও জুমআ প্রতিষ্ঠিত করার শরীয়ত নির্দেশিত হিকমতের পরিপন্থী। অতএব নারী-পুরুষ কারো জন্য রেডিও বা টেলিভিশনের অনুসরণ করে নামায আদায় করা বৈধ নয়। (আল্লাহ্ সবাইকে তাওফীক দিন)

অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে ?

১) অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হলো-ফরয নামায দাঁড়িয়েই আদায় করা। যদিও কিছুটা বাকা হয়ে দাঁড়াক বা কোন দেয়ালে হেলান দিয়ে কিংবা লাঠিতে ভর করে দাঁড়াক না কেন।

২) যদি কোন ভাবেই দাঁড়াতে সক্ষম না হয় তবে বসে নামায আদায় করবে। উত্তম হলো দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থার ক্ষেত্রে চার জানু হয়ে বসবে।

৩) যদি বসেও নামায আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে কিবলা মুখি হয়ে কাত হয়ে নামায আদায় করবে। এক্ষেত্রে উত্তম হলো ডান কাত হয়ে শোয়া। যদি কিবলামুখি হতে সক্ষম না হয় তবে যে দিকে ইচ্ছা মুখ করে নামায আদায় করবে। তার নামায শুদ্ধ হবে এবং তা ফিরিয়ে পড়ার দরকার হবে না।

৪) যদি ডান কাত হয়ে শুতে অক্ষম হয় তবে চিৎ হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে। সে সময় পা'দুটি থাকবে বিকলার দিকে। উত্তম হলো (বালিশ ইত্যাদি দিয়ে) মাথা উপরের দিকে কিছুটা উঠাবে যাতে করে কিবলামুখি হতে পারে। যদি পা দুটিকে কিবলামুখি করতে সক্ষম না হয়, তবে পা যে দিকেই থাক ঐভাবেই নামায আদায় করবে। নামায বিশুদ্ধ হবে এবং পরে তা ফিরিয়ে পড়তে হবে না।

রুগীর প্রতি ওয়াজিব হলো নামাযে রুকু ও সিজদা করা। যদি তা করতে সামর্থ না হয় তবে মাথা দিয়ে ইশারাহ করবে। এ সময় রুকুর চাইতে সিজদার জন্য মাথাকে একটু বেশি নীচু করবে। যদি শুধু রুকু করতে সক্ষম হয় তবে নিজদার জন্য রুকুর চাইতে মাথাকে একটু বেশি ঝুকাবে। আর যদি সিজদা করতে সক্ষম হয়, রুকু না করতে পারে তবে নিজদার সময় সিজদা করবে আর রুকুর জন্য মাথা দিয়ে ইশারাহ করবে।

৫) রুকু ও সিজদার সময় মাথা নীচু করে যদি ইশারাহ করতে সক্ষম না হয়, তবে চোখ দিয়ে ইশারাহ করবে। রুকুর সময় চোখ দুটোকে সামান্য বন্ধ করবে আর সিজদার জন্য বেশি বন্ধ করবে।ীখণ।ীখণ। কিন্তু রুকু ও সিজদার জন্য আঙ্গুল দিয়ে ইশারাহ করা যেমন কোন কোন রুগী করে থাকে তা সঠিক নয়। এ ব্যপারে কুরআন- সুন্নাহ বা বিদ্যানদের থেকে কোন দলীল আমি পাই নি।

৬) যদি মাথা বা চোখের মাধ্যমে ইশারাহ করতেও সক্ষম না হয়, তবে মনে মনে নামায আদায় করবে। মুখে তাকবীর বলবে, কিরআত পাঠ করবে এবং দাঁড়ানো, রুকু করা,

সিজদা করা, তাশাহুদে বসা ইত্যাদি মনে মনে নিয়ত করবে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যার সে নিয়ত করে থাকে।

৭) রুগীর উপর ওয়াজিব হলো প্রত্যেক নামায সঠিক সময়ে আদায় করা এবং সে সময়ে তার উপর যা যা ওয়াজিব তার সবই সাধ্যনুযায়ী আদায় করা। যদি প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা তার জন্য কষ্টকর হয় তবে দু নামাযকে একত্রিত আদায় করা জায়েয রয়েছে। যোহর আসর দু'নামায একত্রে যোহরের ওয়াক্তে বা দেরী করে আসরে ওয়াক্তে আদায় করবে। এমনিভাবে মাগরীব ও এশা দু'নামাযকে মাগরীবের ওয়াক্তে একত্রে বা দেরী করে এশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করবে। মোটকথা যেভাবে তার জন্য সহজ হয় সেভাবেই আদায় করবে।

৮) অসুস্থ ব্যক্তি যদি অন্য কোন শহরে চিকিৎসার জন্য সফর করে তবে সে (মুসাফির হিসেবে) চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযকে কসর করে করে দু'রাকআত আদায় করবে। অর্থাৎ যোহর, আসর ও এশা দু রাকআত করে আদায় করবে। যতদিন নিজ শহরে ফিরে না আসে এরূপেই করতে থাকবে। চাই সফরের সময় অল্প হোক বা দীর্ঘ।

প্রশ্নঃ (৩১১) উড়োজাহাজে নামায আদায় করার পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ সময় হলেই উড়োজাহাজের উপর নামায আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু নামাযের নির্দিষ্ট সময় বা দু'নামায একত্রিত করার সময় শেষ হওয়ার আগেই যদি বিমান অবতরণ করার সম্ভাবনা থাকে, আর যমীনে থাকাবস্থায় যেভাবে নামায আদায় করতে হয়, সেভাবে যদি বিমানের উপর সম্ভব না হয়, তবে সেখানে ফরয নামায আদায় করবে না। বরং অবতরণ করার পর যমীনে নামায আদায় করবে। যেমনঃ জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে বিমান উড্ডয়ন করল। এখন আকাশে থাকাবস্থায় মাগরিব নামায আদায় করবে না। পরবর্তী এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করার পর নামায পড়বে। কিন্তু যদি দেখে যে, মাগরিব নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে এশা নামাযের সাথে মাগরিবকে একত্রিত করার নিয়ত করে নিবে। অতঃপর অবতরণ করে মাগরিব নামাযকে পিছিয়ে দিয়ে এশার সাথে একত্রিত আদায় করবে। কিন্তু যদি বিমান চলতেই থাকে- অবতরণের সম্ভাবনা না থাকে এবং এশা নামাযেরও সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তখন বিমানের উপরেই সময় অতিক্রম হওয়ার আগেই মাগরিব ও এশা নামায একত্রিত আদায় করে নিবে।

বিমানের উপর ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি হচ্ছে, ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিবে। ছানা, সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকূ করবে। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদা করবে। নিয়ম মাফিক সিজদা করতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং বসাবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে সিজদা করবে। নামায শেষ করা পর্যন্ত এরূপই করবে। আর পূর্ণ সময় ক্বিবলামুখী হয়েই থাকবে। আর নফল নামাযের পদ্ধতি হচ্ছে,

বিমানের সিটে বসে বসেই নামায আদায় করবে। ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সিজদা করবে। সিজদার জন্য রুকূর চেয়ে একটু বেশী মাথা ঝুকাবে।

প্রশ্নঃ (৩১২) কতটুকু দূরত্বে গেলে মুসাফির নামায কসর করতে পারে ? কসর না করেই কি দু'নামাযকে একত্রিত করা যায় ?

উত্তরঃ কোন কোন বিদ্বানের মতে ৮৩ (তিরাশী) কিলোমিটার পরিমাণ দুরত্ব অতিক্রম করলে নামায কসর করবে। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিতে বা দেশীয় প্রথায় যাকে সফর বলা হয় তাতেই নামায কসর করবে। যদিও তা ৮০ কিলোমিটার না হয়। আর মানুষ যদি তাকে সফর না বলে, তবে তা সফর নয়; যদিও তা ১০০ কিঃ মিঃ হয়। এটাই শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) এর মত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্টভাবে সফরের কোন দুরত্ব নির্ধারণ করেননি। অনুরূপভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেও সফরের দুরত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন,

(إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তিন মাইল বা ফারসাখ পরিমাণ দুরত্ব অতিক্রম করতেন, তবে নামায কসর করতেন ও দু'রাকাত আদায় করতেন।"[1] এজন্য শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মতই অধিক সঠিক। প্রচলিত রীতিনীতিতে মতভেদ দেখা দিলে ইমামদের যে কোন একটি মত গ্রহণ করলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইমামগণ সবাই মুজতাহিদ বা গবেষক। এক্ষেত্রে কোন দোষ হবে না ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু বর্তমানে মানুষের প্রচলিত রীতিনীতি যেহেতু সুনির্দিষ্ট তাই ইহা গ্রহণ করাই অধিক সঠিক।

আর নামায কসর করা বৈধ হলেই কি জমা' (বা দু'নামায একত্রিত) করা বৈধ? জবাবে বলব, একত্রিত করণের বিষয়টি শুধু কসরের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং তা প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব সফর বা গৃহে অবস্থান যে কোন সময় যদি মানুষ একত্রিত করণের প্রয়োজন অনুভব করে, একত্রিত করবে। অতএব বৃষ্টির কারণে যদি মসজিদে যেতে কষ্ট হয়, তবে দু'নামাযকে একত্রিত করবে। শীতকালে যদি কঠিন ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সে কারণে মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয় তবে দু'নামাযকে একত্রিত করবে। নিজের মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তবে দু'নামাযকে একত্রিত করবে। এছাড়া এ ধরণের আরো কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হলে দু'নামাযকে একত্রিত করবে। ছহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায। অনুচ্ছেদঃ মুসাফিরের নামাযের বিবরণ।

(جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ)
"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় বৃষ্টি বা ভয়-ভীতির কারণ ছাড়াই যোহর ও আছর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা নামাযকে একত্রে আদায় করেছেন।" ইবনু আব্বাসকে প্রশ্ন করা হল, কেন তিনি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি উম্মতকে সংকটে ফেলতে চাননি।[1]

অর্থাৎ এধরণের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দু'নামাযকে একত্রিত না করলে যে সংকট হওয়ার কথা তিনি তা চাননি।

এটাই হচ্ছে মূলনীতি। মানুষ যখনই দু'নামাযকে একত্রিত না করলে সমস্যা বা সংকটের সম্মুখিন হবে তখনই একত্রিত করণ তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। আর সমস্যা না হলে একত্রিত করবে না। কিন্তু যেহেতু সফর মানেই সমস্যা ও সংকট তাই মুসাফিরের জন্য দু'নামাযকে একত্রিত করা জায়েয। চাই তার সফর চলমান হোক বা কোন স্থানে অবস্থান করুক। তবে সফর চলমান থাকলে একত্রিত করা উত্তম। আর সফরে গিয়ে কোন গৃহে বা হোটেলে অবস্থান করলে একত্রিত না করাই উত্তম।

কিন্তু মুসাফির যদি এমন শহরে অবস্থান করে যেখানে নামায জামাআতের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, তখন জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব। ঐ সময় নামায কসরও করবে না একত্রিতও করবে না। কিন্তু জামাআত ছুটে গেলে কসর করবে একত্রিত করবে না। অবশ্য একত্রিত করা জরূরী হয়ে পড়লে করতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩১৩) জনৈক ব্যক্তি লিখা-পড়ার জন্য জুমআর দিন সন্ধ্যায় রিয়াদ গমণ করে ও সোমবার দিন প্রত্যাবর্তন করে। সে কি মুসাফিরের মত নামায কসর করে আদায় করবে?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি মুসাফির। কেননা লিখা-পড়ার শহর তার স্থায়ী আবাসস্থল নয়। সেখানে থেকে যাওয়ার বা বসবাস করারও কোন নিয়ত সে করেনি। বরং নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্যে কয়েকদিন তথায় অবস্থান করছে। কিন্তু সে যদি এমন শহরে অবস্থান করে যেখানে জামাআতের সাথে নামায হয়, তবে নামাযের জামাআতে উপস্থিত হওয়া তার জন্য ওয়াজিব। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, মুসাফিরের জন্য জুমআ বা জামাআতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয়-একথার কোন ভিত্তি নেই, কোন দলীল নেই। মুসাফির যদি যুদ্ধের ময়দানে লড়াইয়ে থাকে তবুও তার জন্য জামাআতে নামায আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায। অনুচ্ছেদঃ গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় দু'নামাযকে একত্রিত করণ।

"আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকবেন, তাদের জন্য নামায কায়েম করবেন, তখন তাদের মধ্যে থেকে একদল আপনার সাথে নামাযে দন্ডায়মান হবে।" (সূরা নিসাঃ ১০২) আর যে ব্যক্তিই আযান শুনবে তার জুমআর নামাযে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন যখন আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা দ্রুত আল্লাহ্র যিকিরের (নামাযের) দিকে আস।" (সূরা জুমআঃ ৯)

প্রশ্নঃ (৩১৪) জুমআর সাথে আছরের নামায একত্রিত করার বিধান কি ? যারা শহরের বাইরে থাকে তাদের জন্য কি একত্রিত করা জায়েয ?

উত্তরঃ জুমআর সাথে আছর নামাযকে একত্রিত করা জায়েয নয়। কেননা এর পক্ষে হাদীছে কোন দলীল পাওয়া যায় না। একে যোহরের নামাযের সাথে ক্বিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা জুমআ ও যোহরের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তাছাড়া আসল হচ্ছে প্রত্যেক নামাযকে নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করা। তবে শুধুমাত্র দলীলের ভিত্তিতেই এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে একত্রিত করা যায়।

যারা শহরের বাইরে দু' বা তিনদিন অবস্থান করবে তাদের জন্য দু'নামাযকে একত্রিত করা জায়েয। কেননা তারা মুসাফির। কিন্তু তারা যদি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করে- সাধারণভাবে যাদেরকে মুসাফির বলা হয় না-তারা দু'নামায একত্রিত করবে না। দু'নামায একত্রিত করার অর্থ হচ্ছেঃ যোহর ও আছর দু'নামায এবং মাগরিব ও এশা দু'নামাযকে একত্রিত করা। কিন্তু জুমআ ও আছর কখনই একত্রিত করা জায়েয নয়।

দু'নামাযকে একত্রিত করার বিধান

প্রশ্নঃ বিগত দিনগুলোতে ব্যাপক আকারে দু'নামাযকে একত্রিত করা এবং এক্ষেত্রে মানুষের অতিরিক্ত শিথীলতা লক্ষ্য করা গেছে। অত্যধিক ঠান্ডাই কি এর কারণ ? আপনি কি মনে করেন? আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

উত্তরঃ অলসতা করে দু'নামাযকে একত্রিত করা কারো জন্য বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা নামায সমূহকে নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করা আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসাঃ ১০৩) তিনি আরো বলেন,

﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

"সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের নামায; ফজরের নামায পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ-৭৮) নামায যখন নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয, তখন প্রত্যে ক নামাযকে

তার বেঁধে দেয়া সময়-সীমার মধ্যেই আদায় করতে হবে। উল্লেখিত আয়াতে "সূর্য হেলে পড়বার পর হতে... নামায কায়েম করবে।" কথাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বিস্তারিতভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সময়-সীমা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

(وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِه مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ)

"সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর থেকে শুরু হয় যোহর নামাযের সময় এবং কোন ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হলে তথা আসরের নামাযের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত হচ্ছে আসর নামাযের সময়। সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময়। আর অর্ধরাত্রি পর্যন্ত হচ্ছে এশা নামাযের সময়। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি এ নামায আদায় করা সম্ভব হয় তবে তা উত্তম। ফজর নামাযের সময় হচ্ছে সুবহে সাদেক (পূর্বাকাশে সাদা রেখা) উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।"[1]

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামাযের সময় সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন, তখন কোন নামায নির্ধারিত সময়ের বাইরে আদায় করা আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘনের শামিল। আর আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই অত্যাচারী।" (সূরা বাক্বারাঃ ২২৯) অতএব জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি সময় হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করবে, সে গুনাহগার হবে এবং পুনরায় তাকে নামায পড়তে হবে। কিন্তু যদি অজ্ঞতা বশতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে থাকে, সে গুনাহগার হবে না তবে নামায তাকে পুনরায় পড়তে হবে। আর এটা হচ্ছে শরঈ কোন ওযর ছাড়াই বর্তমান নামাযের সাথে পরবর্তী নামাযকে অগ্রীম আদায় করার ক্ষেত্রে। কেননা নামায অগ্রীম আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। তাকে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর বিনা ওযরে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে নামায আদায় করবে, সে গুনাহগার হবে এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার নামায কবূল হবে না। আর এটা হচ্ছে শরঈ কোন ওযর ছাড়াই বর্তমান নামাযের সাথে পূর্ববর্তী নামাযকে দেরী করে একত্রিত আদায় করার ক্ষেত্রে। কেননা সময় পার করে দিয়ে নামায আদায় করলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার নামায কবূল হবে না।

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান। অনুচ্ছেদঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়। (হা/৯৬৬)

অতএব মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ভয় করা আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিরাট বিষয়টিতে কোন ধরণের শিথীলতা না করা। কিন্তু ছহীহ্‌ মুসলিমে আবদুল্লাহ্‌ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

(جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ)

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় বৃষ্টি বা ভয়-ভীতির কারণ ছাড়াই যোহর ও আছর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা নামাযকে একত্রে আদায় করেছেন।" এ হাদীছে দু'নামাযকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে শিথীলতার কোন অবকাশ নেই। কেননা ইবনু আব্বাসকে প্রশ্ন করা হল, কেন তিনি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সংকটে ফেলতে চাননি। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দু'নামাযকে একত্রিত না করলে যে সংকট হওয়ার কাথা তিনি তা চাননি।[1] সুতরাং দু'নামাযকে একত্রিত করে পড়া বৈধ হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক নামাযকে সময়মত আদায় করলে অসুবিধা হওয়া। কোন লোক যদি সময় মত নামায আদায় করলে অসুবিধায় পড়ে তবে তার জন্য দু'নামাযকে একত্রিত আদায় করা জায়েয বরং সুন্নাত। কোন অসুবিধা না থাকলে প্রত্যেক নামাযকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করাই ওয়াজিব। এই ভিত্তিতে শুধুমাত্র ঠান্ডার কারণে দু'নামাযকে একত্রিত করা বৈধ হবে না। কিন্তু ঠান্ডা যদি অতিরিক্ত হয় এবং সেই সাথে এমন বাতাস প্রবাহিত হয় বা বরফ পড়ে যে, মসজিদে গমণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে, তবে দু'নামাযকে একত্রিত করতে কোন বাধা নেই।

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার বিশেষ নসীহত বিশেষ করে ইমামদের প্রতি তারা যেন এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন এমনভাবে এই ফরয ইবাদতটি সম্পাদন করেন।

প্রশ্নঃ (৩১৫) সফর অবস্থায় কি কি বিষয়ে রুখসত বা অবকাশ রয়েছে ?

উত্তরঃ সফর অবস্থায় চারটি ক্ষেত্রে রুখসত বা অবকাশ রয়েছেঃ

১) চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাআত আদায় করা।

২) রামাযানে রোযা ভঙ্গ করা। এবং পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করা।

৩) তিন-দিন তিন-রাত মোজার উপর মাসেহ করা। প্রথমবার মাসেহ করার পর থেকে উক্ত সময়সীমা হিসাব করতে হবে।

৪) যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নাত আদায় করতে হবে না। তবে ফজরের সুন্নাত এবং অন্যান্য নফল নামায আদায় করা শরীয়ত সম্মত ও মুস্তাহাব।

অতএব মুসাফির সফর অবস্থায় নিম্নলিখিত নামাযগুলো আদায় করতে পারেঃ রাতের নফল (তাহাজ্জুদ), বিতর, ফজরের সুন্নাত, চাশত, তাহিয়্যাতুল ওযু, তাহিয়্যাতুল

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায। অনুচ্ছেদঃ গৃহে অবস্থানরত সময় দু'নামাযকে একত্রিত করণ।

মসজিদ, সফর থেকে ফেরত এসে দু'রাকাত নামায। সুন্নাত হচ্ছে সফর থেকে ফেরত এসে গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত ছালাত আদায় করা।[1]

প্রশ্নঃ (৩১৬) শুক্রবার দিবসের প্রথম ওয়াক্ত কখন থেকে শুরু হয় ?

উত্তরঃ জুমআর দিবসের প্রহর সমূহ হচ্ছে পাঁচটিঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)

"যে ব্যক্তি জুমআর দিবসে নাপাকী থেকে গোসল করার মত গোসল করবে, অতঃপর প্রথম প্রহরে মসজিদে গমণ করবে, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গমণ করবে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় প্রহরে গমণ করবে সে যেন একটি দুম্বা কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ প্রহরে গমণ করবে সে যেন একটি মুরগী উৎসর্গ করল। যে ব্যক্তি পঞ্চম প্রহরে গমণ করবে সে যেন একটি ডিম উৎসর্গ করল (আল্লাহ্‌র পথে দান করল)। অতঃপর ইমাম বের হয়ে এলে ফেরেস্তাগণ উপস্থিত হয়ে যিকির (খুতবা) শুনতে বসে পড়েন।"[2]

এ হাদীছে সূর্য উদয় থেকে খুতবার জন্য ইমামের মিম্বরে আরোহণ পর্যন্ত সময়কে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলোর প্রতিটিই বর্তমান সময়ের এক ঘন্টা বরাবর হতে পারে। এর কম বা বেশীও হতে পারে। কেননা দিন ছোট-বড় হয়। মোটকথা সূর্যোদয় থেকে ইমামের আগমণ পর্যন্ত প্রহর হচ্ছে পাঁচটি। কেউ কেউ বলেন, এই প্রহরের গণনা ফজর উদিত হওয়া থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু এটা ভুল। কেননা সূর্যদয়ের পূর্বের সময় তো ফজর নামাযেরই সময়। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞান রাখেন

প্রশ্নঃ (৩১৭) ইমামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে কি নিজ গৃহে থেকে জুমআর নামায আদায় করা জায়েয হবে ?

উত্তরঃ মসজিদে এসে মুসলমানদের জামাআতে শামিল না হলে জুমআর নামায আদায় করা জায়েয হবে না। কিন্তু মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে গেলে কাতার মিলিত হওয়ার শর্তে পার্শ্ববর্তী রাস্তায় নামায আদায় করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু বাড়ীতে বা দোকানে

---

[1] . কা'ব বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছেঃ "নবী [ﷺ] সফর থেকে আগমণ করে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন।" (বুখারী, অধ্যায়ঃ মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ কা'ব বিন মালিকের হাদীছ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ তওবা, অনুচ্ছেদঃ কা'বের তওবার হাদীছ।)

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ জুমআর নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআর ফযীলত। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জুমআর নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআর দিন মেসওয়াক করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।

নামায আদায় করা কোন মানুষের জন্য জায়েয বা বৈধ হবে না। কেননা জুমআ এবং জামাআত অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের একস্থানে সমবেত হওয়া। তারা এক ঐক্যবদ্ধ জাতি একথা প্রমাণ করা। যাতে করে তাদের পরস্পরের মাঝে মমতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা আলেমদের নিকট থেকে দ্বীন শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি এই অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা নিজ গৃহে থেকে রেডিওতে বা মাইক্রোফোনের আওয়াজ শুনে নামায আদায় করবে, তবে মসজিদ নির্মাণ ও মুছল্লীদের উপস্থিত হওয়ার কোন দরকার নেই। তাছাড়া এর মাধ্যমে জুমআ ও জামাআত পরিত্যাগ করার দরজা উম্মুক্ত করা হবে।

প্রশ্নঃ (৩১৮) জুমআর দিন মহিলারা কত রাকাআত নামায আদায় করবে ?

উত্তরঃ নারী যদি মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে জুমআ আদায় করে, তবে ইমামের অনুসরণ করে দু'রাকাতই আদায় করবে। কিন্তু সে যদি নিজ গৃহে নামায আদায় করে, তবে চার রাকাত যোহর আদায় করবে।

প্রশ্নঃ (৩১৯) যে ব্যক্তি জুমআর নামায আদায় করবে সে কি যোহরও আদায় করবে ?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি জুমআর নামায আদায় করল সে যোহরের সময়ের ফরযই আদায় করল। তাই সে আর যোহর আদায় করবে না। কিন্তু কিছু লোক জুমআর নামায আদায় করার পর যোহর নামায আদায় করে থাকে। সাধারণ পরিভাষায় এটাকে আখেরী যোহর বলা হয়। এটি একটি বিদআত। কেননা আল্লাহ্‌র কুরআন ও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতে এর কোন প্রমাণ নেই। অতএব তা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। এমনকি যদিও কয়েক স্থানে জুমআ অনুষ্ঠিত হয়, তবুও জুমআর নামায আদায় করার পর কোন মানুষের জন্য যোহর নামায আদায় করা শরীয়ত সম্মত নয়; বরং তা নিকৃষ্ট বিদআত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা একটি সময়ে একের অধিক ইবাদত ফরয করেননি। আর তা হচ্ছে জুমআর নামায। তা তো আদায় করা হয়েছে।

যারা জুমআ আদায় করার পর যোহর আদায় করতে বলেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে, "এক শহরে একাধিক জুমআ আদায় করা জায়েয নয়। একাধিক জুমআ হলে যে মসজিদে প্রথমে নামায অনুষ্ঠিত হবে সেটাই জুমআ হিসেবে গণ্য হবে। অন্যগুলো বাতিল হবে। কিন্তু যেহেতু কোন্ মসজিদে জুমআ প্রথমে হয় তা জানা নেই। তাই সমস্ত জুমআ বাতিল। ফলে তার বদলে পরবর্তীতে যোহর আদায় করতে হবে।"

তাদেরকে আমি বলবঃ এ দলীল ও যুক্তি আপনারা কোথায় পেলেন? এটার ভিত্তি কি কোন হাদীছে আছে? বা ইহা কি বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক যুক্তি সঙ্গত কথা? উত্তর অবশ্যই না। বরং আমরা বলি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যদি একাধিক জুমআ অনুষ্ঠিত হয় তবে সবগুলোই বিশুদ্ধ। কেননা আল্লাহ্ বলেন, (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় কর।" (সূরা তাগাবুনঃ-১৬) আর শহর প্রশস্থ হওয়ার কারণে

অথবা মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে এই শহরের অধিবাসীগণ প্রয়োজনের তাগিদেই বিভিন্ন স্থানে জুমআ অনুষ্ঠিত করেছে, এতে তারা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে। আর যে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে সে তার উপর নির্ধারিত ফরয বাস্তবায়ন করেছে। সুতরাং কিভাবে একথা বলা যায় যে তার আমল ফাসেদ বা বাতিল হয়ে গেছে, তাই জুমআর পরিবর্তে যোহর নামায আদায় করতে হবে ? তবে বিনা প্রয়োজনে এক শহরে একাধিক জুমআ অনুষ্ঠিত করা নিঃসন্দেহে সুন্নাহ্‌ বিরোধী কাজ। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদার নীতি বিরোধী কাজ। তাই অধিকাংশ বিদ্বানের মত এরূপ করা হারাম। তারপরও আমরা বলতে পারি না যে তাদের ইবাদতই বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কোন দায়দায়িত্ব নেই। এ দায়দায়িত্ব বহণ করবে প্রশাসন যাদের অনুমতিতে বিনা প্রয়োজনে একাধিক জুমআ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই প্রশাসনের মধ্যে যারা মসজিদ তত্ত্বধানের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের কাছে আমরা আবেদন করি, প্রয়োজন দেখা না দিলে তারা যেন একাধিক জুমআর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হতে অনুমতি না দেন। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুপ্রশস্থ ও সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, ইবাদতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে একস্থানে সমবেত করে পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করা, অজ্ঞদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দান করা। এছাড়া আরো অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। শরীয়ত সম্মত সমাবেশ সমূহ হচ্ছেঃ কোনটি সাপ্তাহিক, কোনটি বাৎসরিক, কোনটি দৈনিক। দৈনিক সমাবেশ সমূহ হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাম ও মহল্লার মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অনুষ্ঠিত করা। কেননা শরীয়ত প্রণেতা যদি মুসলমানদেরকে প্রতিদিন পাঁচবার শহরের একটি মাত্র স্থানে একত্রিত হওয়ার আদেশ করতেন তবে নিঃসন্দেহে তা কষ্টকর হত। এজন্য তাদের প্রতি সহজতা কল্পে এই সমাবেশকে প্রত্যেক মহল্লার প্রত্যেক মসজিদে বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

আর সপ্তাহিক সমাবেশ হচ্ছে জুমআর দিবসে। এলাকার সমস্ত লোক সপ্তাহে একবার একস্থানে সমবেত হবে। এজন্য সুন্নাত হচ্ছে তারা একটি মাত্র মসজিদেই একত্রিত হবে বিভিন্ন স্থানে নয়। কেননা সপ্তাহিক এই সমাবেশে আসা তাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হবে না বা বেশী কষ্টকর হবে না। তাছাড়া এতে রয়েছে বিশাল উপকারিতা। সমস্ত লোক একজন মাত্র ইমামের খুতবা শুনবে ও তার নেতৃত্বে ইবাদত আদায় করবে। তিনি তাদেরকে নসীহত করবেন নির্দেশনা প্রদান করবেন। তখন লোকেরা একদিকে নসীহত ও অন্যদিকে নামায নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। তাই বিনা প্রয়োজনে জুমআর নামায একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত করা জায়েয নয়। আর বাৎসরিক সমাবেশ হচ্ছে, দু'ঈদের নামায। সমস্ত শহরবাসীর জন্য বাৎসরিক দু'টি সমাবেশ। এজন্য একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে একাধিক ঈদগাহ্‌ কায়েম করা জায়েয নয়।

মুসাফিরের জন্য জুমআর নামাযের বিধান

প্রশ্নঃ (৩২০) আমরা সমুদ্রের মধ্যে (জাহাজে) কাজ করি। জুমআর নামাযের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু যোহরের আযানের সময় হওয়ার আধা ঘন্টা পর স্থলে এসে আযান দিয়ে জুমআর নামায আদায় করা কি আমাদের জন্য জায়েয হবে ?

উত্তরঃ শহর বা গ্রামের মসজিদ ছাড়া কোথাও জুমআর নামায অনুষ্ঠিত করা জায়েয হবে না। জলে বা স্থলে যারা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে তাদের জুমআর নামায বিশুদ্ধ হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াত এরূপ ছিল না যে, তিনি শহর বা গ্রাম ছাড়া কোথাও জুমআর নামায অনুষ্ঠিত করেছেন। তিনি কখনো কয়েকদিন ব্যাপি সফর করতেন, কিন্তু সফরে জুমআ অনুষ্ঠিত করতেন না।

অতএব আপনারা এখন সমুদ্রে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন। কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিনে স্থানান্তর হতে থাকেন। কখনো নিজ দেশে কখনো অন্য শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। অতএব আপনাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যোহরের নামায আদায় করা, জুমআ নয়। যদি আপনারা সফরের দূরত্বে থাকেন তবে নামায সমূহ কসর করে আদায় করবেন।

প্রশ্নঃ (৩২১) জুমআর নামাযের শেষে তাশাহুদে ইমামের সাথে নামাযে শামিল হলে কি করবে ?

উত্তরঃ কোন মানুষ যদি জুমআর দিন শেষ তাশাহুদে ইমামের সাথে নামাযে শামিল হয় তবে তার জুমআ ছুটে গেল। সে ইমামের সাথে নামাযে শামিল হবে ঠিকই কিন্তু চার রাকাআত যোহর আদায় করবে। কেননা নবী বলেন, (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) "যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাআত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ নামায পেয়ে গেল।"[1] এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে ব্যক্তি এক রাকআতের কম নামায পাবে সে নামায পেল না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের এক রাকাত পেল সে জুমআর নামায পেয়ে গেল।"[2] অর্থাৎ ইমামের সালাম ফেরানোর পর দ্বিতীয় রাকআত আদায় করলে সে জুমআর নামায পেয়ে গেল।

প্রশ্নঃ (৩২২) জুমআর খুতবার শেষ প্রান্তে ইমাম যখন দু'আ করেন, তখন 'আমীন' বলা কি বিদআত ?

উত্তরঃ না ইহা বিদআত নয়। ইমাম যদি খুতবায় মুসলমানদের জন্য দু'আ করেন, তবে তার দু'আয় আমীন বলা মুস্তাহাব। কিন্তু তা উঁচু আওয়াযে ও সমবেত কণ্ঠে যেন না হয়।

---

[1] . ছহীহ্ বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযের সময়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাআত পায়। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাআত পেয়ে গেল সে পূর্ণ ছালাতই পেয়ে গেল ।

[2] . নাসাঈ, অধ্যায়ঃ জুমআর নামায, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের এক রাকাআত পায়। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের এক রাকাআত পেল।

প্রত্যেকে আলাদাভাবে নীরবে নীচু কণ্ঠে 'আমীন' বলবে। যাতে করে সেখানে অন্যের অসুবিধা এবং চেঁচামেচী না হয়।

প্রশ্নঃ (৩২৩) জুমআর খুতবায় দু'আর সময় হাত উত্তোলন করার বিধান কি ?

উত্তরঃ জুমআর খুতবায় ইমামের দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত নয়। জুমআর খুতবায় দু'আ করার সময় খলীফা বিশ্‌র বিন মারওয়ান দু'হাত উত্তোলন করলে ছাহাবায়ে কেরাম তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে ইস্তেস্কার দু'আ। এদু'আ পাঠ করার সময় হাত উত্তোলন করবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি জুমআর খুতবায় বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আয় হাত উত্তোলন করেছেন। লোকেরাও তাঁর সাথে হাত উঠিয়েছেন। এছাড়া জুমআর খুতবায় অন্যান্য দু'আর ক্ষেত্রে হাত উত্তোলন করা উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (৩২৪) আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা প্রদানের বিধান কি ?

উত্তরঃ এই মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, উপস্থিত মুছল্লীগণ যে ভাষা বুঝে না সে ভাষায় জুমআর খুতবা প্রদান করা জায়েয নয়। যদি উপস্থিত মুছল্লীগণ আনারব হন-তারা আরবী না বুঝেন, তবে তাদের ভাষাতেই খুতবা প্রদান করবে। কেননা তাদেরকে বুঝানোর জন্য এ ভাষাই হচ্ছে বক্তৃতা করার মাধ্যম। আর জুমআর খুতবার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান বর্ণনা করা, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করা। তবে কুরআনের আয়াত সমূহ অবশ্যই আরবী ভাষায় পাঠ করতে হবে। অতঃপর মাতৃভাষায় তার তাফসীর করে দিবে। আর মাতৃভাষায় খুতবা প্রদানের দলীল হচ্ছে, আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে নিজ সম্প্রদায়ের ভাষা-ভাষী করে পাঠিয়েছি। যাতে তিনি তাদেরকে (আল্লাহ্‌র বিধান) বর্ণনা করে দেন।" (সূরা ইবরাহীমঃ-৪) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করে দিলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভাষা বুঝে সে ভাষাতেই তাদের সামনে বক্তৃতা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩২৫) জুমআর দিবসে গোসল করার বিধান কি নারী ও পুরুষের সকলের জন্য ? এ দিনের এক বা দু'দিন পূর্বে গোসল করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ জুমআর দিবসে গোসল ও সাজ-সজ্জার বিধান শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই। কেননা সেই জুমআর নামাযে উপস্থিত হবে। গোসল ও সৌন্দর্য গ্রহণ পুরুষকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। নারীদের জন্য এটা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে যে কোন মানুষ নিজের শরীরে বা অঙ্গে ময়লা-আবর্জনা দেখতে পেলেই তা পরিষ্কার করবে। কেননা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামে প্রশংসিত বিষয়, এতে উদাসীনতা কারো জন্য উচিত নয়।

কিন্তু জুমআর একদিন বা দু'দিন পূর্বে গোসল করলে কোন উপকার নেই। কেননা এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহ শুধুমাত্র জুমআর দিবসকে কেন্দ্র করেই বলা হয়েছে। আর এ

সময়টি হচ্ছে জুমআর দিবস ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে জুমআর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত। এটাই হচ্ছে গোসল করার সময়। কিন্তু একদিন বা দু'দিন পূর্বে গোসল করা জুমআর দিবসের জন্য যথেষ্ট হবে না।

প্রশ্নঃ (৩২৬) খুতবার জন্য দ্বিতীয় আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করলে করণীয় কি?

উত্তরঃ বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি জুমআর দিবসে মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে মুআয্যিন খুতবার জন্য দ্বিতীয় আযান প্রদান করছে। তখন সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ শুরু করবে, মুআয্যিনের আযানের জবাব দিতে ব্যস্ত হবে না। যাতে করে খুতবা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। কেননা খুতবা শোনা ওয়াজিব আর আযানের জবাব দেয়া সুন্নাত। অতএব সুন্নাতের উপর ওয়াজিবকে প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩২৭) জুমআর মসজিদে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ খুতবা চলা অবস্থায় যদি কেউ মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যেতে চায়, তবে কোন কথা না বলেই তাকে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। বসে যাওয়ার জন্য তাকে ইঙ্গিত করবে বা তার কাপড় টেনে ধরবে। তবে উত্তম হচ্ছে খতীব নিজেই একাজ করবে এবং তাকে বসিয়ে দিবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল, তিনি তাকে বললেন,(اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ) "বসে পড় তুমি মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছো।"[1]

প্রশ্নঃ (৩২৮) ইমামের খুতবার সময় মসজিদে প্রবেশ কালে সালাম প্রদান এবং সালামের জবাব দেয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ ইমামের খুতবা চলাবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে শুধুমাত্র দু'রাকাত নামায হালকা করে আদায় করবে। কাউকে সালাম দিবে না। কেননা এ অবস্থায় মানুষকে সালাম দেয়া হারাম। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ)

"তুমি যদি জুমআর দিন খুতবা চলাবস্থায় পার্শ্ববর্তী মুছল্লীকে বল 'চুপ কর', তবে অনর্থক কাজ করলে।"[2] তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কঙ্কর স্পর্শ করবে সে অনর্থক কাজ করবে।"[1]

---

[1] . নাসাঈ, অধ্যায়ঃ জুমআর নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআয় ইমাম মিম্বরে থাকাবস্থায় মানুষের ঘাড় ডিঙ্গানো নিষেধ। আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআর দিবসে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গানো। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ নামায প্রতিষ্ঠিত করা, অনুচ্ছেদঃ জুমআর দিবসে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গানো নিষেধ। মুসনাদে আহমাদ।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ জুমআ, অনুচ্ছেদঃ জুমআর দিবসে খুতবা চলাবস্থায় নীরব থাকা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জুমআ, অনুচ্ছেদঃ জুমআর দিবসে খুতবার সময় নীরব থাকা।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন অনর্থক কাজ করে, হতে পারে তার এই কাজ জুমআর ছাওয়াব বিনষ্ট করে দিবে। এ কারণে অন্য হাদীছে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করে তার জুমআ হবে না।"[2] অতএব কেউ যদি আপনাকে সালাম প্রদান করে তবে 'ওয়া আলাইকুম সালাম' শব্দে তার জবাব দিবে না। কিন্তু মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ না করে মুসাফাহা করতে কোন বাধা নেই। যদিও মুসাফাহা না করাই উত্তম।

অবশ্য বিদ্বানদের কেউ কেউ বলেন, সালামের জবাব দিতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, সে সালামের জবাব দিবে না। কেননা খুতবা শ্রবণের ওয়াজিবকে সালামের জবাব প্রদানের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। তাছাড়া এ অবস্থায় সালাম দেয়াও কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়। কেননা এতে মানুষের খুতবা শোনার ওয়াজিব কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। অতএব সঠিক কথা হচ্ছেঃ ইমামের খুতবার সময় সালামও নেই, জবাবও নেই।

প্রশ্নঃ (৩২৯) ঈদের দিন কি বলে একে অপরকে অভিনন্দন জানাবে ?

উত্তরঃ ঈদের জন্য অভিনন্দন জানানো জায়েয। তবে এর জন্য বিশেষ কোন বাক্য নেই। মানুষের সাধারণ সমাজে প্রচলিত যে কোন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা যেন কোন অশ্লীল শব্দ না হয় বা কাফেরদের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ না হয়।[3]

প্রশ্নঃ (৩৩০) ঈদের নামাযের বিধান কি ?

উত্তরঃ আমি মনে করি ঈদের নামায ফরযে আঈন তথা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। কোন পুরুষের জন্য এ নামায পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ প্রদান করেছেন। বরং কুমারী পর্দানশীন নারীদেরকেও এ নামাযে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; এমনকি ঋতুবতী নারীদেরকেও অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করেছেন। তবে ঋতুবতী নামায আদায় করবেনা। এ দ্বারা এ নামাযের অতিরিক্ত গুরুত্ব বুঝা যায়। এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত এবং শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াও (রহঃ) অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। এ নামাযটি জুমআর নামাযের মত। কিন্তু ছুটে গেল কাযা আদায় করা যাবে না। কেননা কাযা আদায় করার পক্ষে কোন দলীল নেই। এর পরিবর্তে অন্য কোন নামাযও আদায় করবে না। অবশ্য জুমআর নামায ছুটে গেলে তার পরিবর্তে যোহরের নামায আদায় করবে। কেননা সময়টি যোহরের নামাযের সময়। কিন্তু ঈদের নামায ছুটে গেলে তার কোন কাযা নেই।

---

[1] . আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআর ফযীলত। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআর দিবসে অযুর বর্ণনা।

[2] . আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআর ফযীলত।

[3] . অবশ্য ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত আছে তারা অভিনন্দন জানানোর জন্য বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ 'আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের থেকে নেক আমল কবূল করুন।'- অনুবাদক

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার নসীহত হচ্ছে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং এই নামাযটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। যাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও আল্লাহ্র কাছে দু'আ, লোকদের পরস্পর দেখা-সাক্ষ্যাৎ ও প্রীতি-ভালবাসার বিনিময়। দেখবেন মানুষকে যদি কোন খেলাধুলার আসরে আহবান জানানো হয়, তবে কত দ্রুত তারা সেখানে সমবেত হয়। তাদের জন্য কি উচিত নয় মুক্তি দূত বিশ্বনবীর আহবানে সাড়া দিয়ে এই নামাযের জন্য সুবিশাল সমাবেশের আয়োজন করা? যাতে রয়েছে আল্লাহ্র অফুরন্ত ছওয়াব এবং মাগফিরাত। কিন্তু নারীদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, এ নামাযে আসতে চাইলে তারা যেন পুরুষদের সাথে সংমিশ্রিত না হয়। তারা থাকবে মসজিদ বা ঈদগাহের একপ্রান্তে পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্থানে। নারীরা যেন আতর-সুগন্ধি মেখে নিজের সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে বেপর্দা হয়ে বের না হয়। এই কারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নারীদেরকে ঈদের নামাযের জন্য বের হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা প্রশ্ন করেছেন: (إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَــابٌ) হে আল্লাহ্র রাসূল আমাদের তো কারো কারো চাদর নেই ? তিনি বললেন, (لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِــنْ جِلْبَابِهَــا) "তার অন্য বোন যেন নিজের চাদর তাকে পরতে দেয়।" আর পর্দার উপযুক্ত চাদর হচ্ছে বর্তমানের বোরকা। এদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নারী অবশ্যই পূর্ণ পর্দা করে গৃহ থেকে বের হবে। কেননা নারীর চাদর না থাকলে সে কি করবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এপ্রশ্ন করলে তিনি এরূপ বলেন নি যে, সাধ্যানুযায়ী পর্দা করে বের হবে। বরং বলেছেন, "অন্য বোন বা নারী তার চাদর তাকে পরিয়ে দিবে।" আর ঈদের নামাযের ইমামের উচিত হচ্ছে, ঈদের খুতবার সময় পুরুষদেরকে নসীহত করার সময় বিশেষভাবে নারীদেরকেও নসীহত করবেন। তাদের সাথে বিশেষিত বিধি-বিধান সমূহ বর্ণনা করবেন। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। তিনি পুরুষদের নসীহত করার পর নারীদের দিকে আলাদাভাবে গিয়ে তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করেছেন।

প্রশ্নঃ (৩৩১) এক শহরে একাধিক ঈদের নামায অনুষ্ঠিত করার বিধান কি ?

উত্তরঃ যদি প্রয়োজন দেখা যায় তবে কোন অসুবিধা নেই। যেমন প্রয়োজন দেখা দিলে জুমআর নামায একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত করা যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) "দ্বীনের মাঝে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কোন অসুবিধা রাখেন নি।" (সূরা হাজ্জঃ ৭৮) একাধিক স্থানে নামায অনুষ্ঠিত জায়েয না হলে নিশ্চিতভাবে অনেক মানুষ জুমআ ও ঈদের নামায থেকে বঞ্চিত হবে। 'প্রয়োজন' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেমন শহর অনেক বড়। শহরের সকল প্রান্ত থেকে লোকদের একস্থানে সমবেত হওয়া কষ্টকর, অথবা ঈদগাহে জায়গার সংকুলান না হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এ

ধরণের কোন অসুবিধা না থাকলে একাধিক স্থানে জুমআ বা ঈদের নামায অনুষ্ঠিত করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৩২) দু'ঈদের নামাযের পদ্ধতি কিরূপ ?

উত্তরঃ দু'ঈদের নামাযের পদ্ধতি হচ্ছেঃ প্রথমে ইমাম উপস্থিত লোকদের নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরিমা দেয়ার পর অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর দিবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং সূরা 'ক্বাফ' পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং সূরা পাঠ শুরু করার পূর্বে অতিরিক্ত পাঁচটি তাকবীর প্রদান করবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে সূরা 'ক্বামার' পাঠ করবে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'ঈদের নামাযে এ দু'টি সূরা পাঠ করতেন।[1] অথবা ইচ্ছা করলে প্রথম রাকাতে 'সূরা আ'লা' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা গাশিয়া' পাঠ করবে।[2]

জেনে রাখুন, জুম্আ ও ঈদের নামায দু'টি সূরার ক্ষেত্রে একই, আর দু'টি সূরার ক্ষেত্রে পৃথক। যে দু'টি সূরা উভয় নামাযে পাঠ করতে হয় তা হচ্ছেঃ 'সূরা আল আ'লা' ও 'সূরা গাশিয়া'। আর যে দু'টি সূরার ক্ষেত্রে এ দু'নামায পৃথক তা হচ্ছেঃ ঈদের নামাযে পাঠ করতে হয়, সূরা 'ক্বাফ' ও সূরা 'ক্বামার'। আর জুমআর নামাযে পাঠ করতে হয় সূরা 'জুমআ' ও সূরা 'মুনাফিকূন'। প্রত্যেক ইমামের জন্য উচিত হচ্ছে, এ নামাযগুলোতে উক্ত সূরা সমূহ পাঠ করার সুন্নাতকে পূনর্জীবিত করা। যাতে করে মুসলমানগণ তা জানতে পারে এবং কেউ তা পাঠ করলে যেন প্রতিবাদ না করে। তারপর নামায শেষ করে ইমাম খুতবা দিবেন। উচিত হচ্ছে খুতবায় নারীদেরকে বিশেষভাবে নসীহত করবে। তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশনা দিবে অসৎ কাজের ভয়াবহতা বর্ণনা করবে ও তা থেকে নিষেধ করবে।

প্রশ্নঃ (৩৩৩) ঈদের নামাযের পূর্বে দলবদ্ধভাবে মাইক্রোফোনে তাকবীর প্রদান করার বিধান কি ?

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে তাকবীর পাঠ করা বৈধ নয়। কেননা এ ধরণের পদ্ধতি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। সুন্নাত হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে আলাদাভাবে তাকবীর পাঠ করবে।

প্রশ্নঃ (৩৩৪) ঈদের তাকবীর কখন থেকে পাঠ করতে হবে ? তাকবীর পড়ার পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ ঈদের তাকবীর শুরু হবে রামাযানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে। শেষ হবে ঈদের নামাযে ইমাম উপস্থিত হলেই। তাকবীরের পদ্ধতিঃ

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ দু'ঈদের নামায, অনুচ্ছেদঃ দু'ঈদের নামাযে কি পাঠ করতে হয়।

[2]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ জুমআর নামায, অনুচ্ছেদঃ জুমআর নামাযে কি পাঠ করতে হয়।

(الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد)

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। অথবা পাঠ করবেঃ

(الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد)

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অর্থাৎ তাকবীরগুলো দু'বার করে পাঠ করবে অথবা তিনবার করে পাঠ করবে। সবগুলোই জায়েয। পুরুষদের জন্য উচিত হচ্ছে এই তাকবীর সমূহ সর্বস্থানে উঁচু কণ্ঠে পাঠ করবে। হাটে-বাজারে, মসজিদে,গৃহে সবখানে। কিন্তু নারীদের জন্য উত্তম হচ্ছে নীচু কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করা।

প্রশ্নঃ (৩৩৫) সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায আদায় করার বিধান কি ?

উত্তরঃ অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা। ওয়াজিব নয়। নিঃসন্দেহে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নামাযের নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতি গুরুত্বসহকারে অন্যান্য নামায থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি এ নামায আদায় করেছেন।

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ এ নামাযকে ফরযে আঈন বা ফরযে কেফায়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের দলীল হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নামাযের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর নির্দেশ মানেই ফরয বা ওয়াজিব। তাছাড়া অন্যান্য নিদর্শন থেকেও এ নামাযের অতিরিক্ত গুরুত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া বান্দার ত্রুটির কারণেই এই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটি একটি সতর্কতা। তাই বান্দাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এই শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতী করা এবং নামায আদায় করা।

নিঃসন্দেহে এ মতের পক্ষের দলীল ও যুক্তি শক্তিশালী। সর্বনিম্ন বিষয়টি ফরযে কেফায়া। আমিও এটাই মনে করি। জমহুর (অধিকাংশ) বিদ্বান যে মত পোষণ করেন- অর্থাৎ সুন্নাতে মুআক্কাদা-তাদের মতের পক্ষে ওয়াজিবকে প্রত্যাখ্যান করার কোন দলীল নেই। তবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদীছটি তাদের পক্ষে দলীল হতে পারেঃ গ্রাম্য ব্যক্তিকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর নির্দেশ দিলেন-তখন সে ব্যক্তি প্রশ্ন করল, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া কি আমার উপর অন্য কিছু ফরয রয়েছে ? তিনি বললেন, "না, তবে তুমি নফল

আদায় করতে পার।”[1] এ হাদীছের মাধ্যমে অন্যান্য নামাযের আবশ্যকতা বা ফরয হওয়া অস্বীকার করা যাবে না-যদি তার যথাপযোক্ত কারণ থাকে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 'না' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নাত নামায সমূহ যা দিন-রাতে বার বার আদায় করতে হয় তা আবশ্যক নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট নামায সমূহের আবশ্যকতা এখানে নিষেধ করা হয়নি।

মোটকথা, আমরা যা মনে করি তা হচ্ছে, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায ফরযে আঈন বা ফরযে কেফায়া।[2]

প্রশ্নঃ (৩৩৬) সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের নামায ছুটে গেলে কিভাবে তা কাযা আদায় করবে ?

উত্তরঃ সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের নামায থেকে কারো যদি এক রাকাত ছুটে যায়, তবে সে সম্পর্কে হাদীছে এরশাদ হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

“তোমরা যখন নামাযের ইকামত শুনবে তখন হেঁটে হেঁটে ধীর-স্থীর এবং প্রশান্তির সাথে নামাযের দিকে আগমণ করবে। তাড়াহুড়া করবে না। অতঃপর নামাযের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।”[3] অতএব যার এক রাকাত নামায ছুটে যাবে সে উহা পূর্ণ করবে-ইমাম যেভাবে আদায় করেছিল সেভাবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী (পূর্ণ করে নিবে) সাধারণভাবে এ অর্থই বহণ করে। এই প্রশ্নটি থেকে আরেকটি শাখা প্রশ্ন আরো জটিল আকারে দেখা দিয়েছে। তা হচ্ছে, কারো যদি প্রথম রুকূ ছুটে যায় তবে সি কি করবে ? উত্তরঃ কারো প্রথম রুকূ ছুটে গেলে তার রাকাতটিই ছুটে গেল। ইমাম সালাম ফেরানোর পরিপূর্ণ রাকআতটি সে পুনরায় আদায় করবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাধারণ বাণী একথাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন, “আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ করে নিবে।”

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ নামায ইসলামের একটি রুকন।

[2] . এ নামায চারটি রুকূ ও চারটি সিজদার মাধ্যমে সর্বমোট দু'রাকআত আদায় করতে হয়। ইমাম প্রথমে সূরা ফাতিহা পাঠ করে দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবেন, এরপর রুকূ করবেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় না গিয়ে আবার দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবেন। তারপর দু'টি সিজদা করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দন্ডায়মান হবে এবং এরাকাতও প্রথম রাকাতের ন্যায় দু'টি রুকূ ও দু'টি সিজদার মাধ্যমে আদায় করবেন।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ ধীরস্থীরভাবে প্রশান্তির সাথে নামাযে আগমণ করা।

ইস্তেস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামাযে চাদর উল্টানোর বিধান।

প্রশ্নঃ (৩৩৭) ইস্তেস্কার নামাযে চাদর উল্টিয়ে নেয়ার কাজটি কখন করতে হবে? দু'আর সময় নাকি গৃহ থেকে বের হওয়ার সময়? আর এই চাদর উল্টানোর হিকমত কি?

উত্তরঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে চাদর উল্টিয়ে নেয়ার কাজটি নামায শেষ করে ইমামের খুতবার সময় করতে হবে। যেমনটি বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন। একাজের হিকমত তিনটি উপকারিতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়ঃ

প্রথমতঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র কাছে এই আশাবাদ পোষণ করা যে, তিনি দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিকে সাচ্ছন্দ ও উর্বরতায় পরিবর্তন করে দিবেন।

তৃতীয়তঃ মানুষকে এটি একটি ইঙ্গিত যে, নিজের অবস্থাকে আল্লাহ্ বিমূখতা ও নাফরমানী থেকে পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করা, তাঁর আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাক্বওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি আভ্যন্তরীন পোষাক। আর চাদর বা কাপড় বাহ্যিক পোষাক। অতএব সে বাহ্যিক পোষাককে উল্টিয়ে নেয়ার সাথে সাথে যেন আভ্যন্তরীন পোষাকেরও অবস্থান ঠিক করে নেয়।

প্রশ্নঃ (৩৩৮) কেউ কেউ বলে থাকে, "তোমরা ইস্তেস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ না করলেও বৃষ্টি হবে।" একথা সম্পর্কে আপনার মত কি ?

উত্তরঃ আমি মনে করি এ ব্যক্তি ভয়ানক বিপজ্জনক ও অপরাধের কথা বলেছে। কেননা আল্লাহ্ বলেন, (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) "তোমাদের পালনকর্তা বলেন তোমরা আমাকে ডাক (দু'আ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" (সূরা গাফের-৬০) আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী। নিজ অনুগ্রহ প্রদান করতে কখনো তিনি দেরী করেন, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে তারা তাঁর কাছে কত অভাবী, কত মুখাপেক্ষী, তিনি ছাড়া তাদের আর কোন রক্ষাকারী আশ্রয়দাতা নেই। তিনি অনেক সময় মানুষের দু'আর কারণে বৃষ্টি নাযিল করেন। কিন্তু অনেক সময় বৃষ্টি হয়ও না। নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র কোন হিকমত আছে এবং মানুষের কোন কল্যাণ আছে যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। কেননা আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। মানুষ নিজের উপর যতটুকু দয়াশীল আল্লাহ্ তাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়াশীল ও করুণাময়। অনেক সময় মানুষ দু'আ করে কিন্তু কবূল হয় না। কখনো দু'আ করে কাজ হয়, কখনো দু'আ করে কাজ হয় না। এ সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)

"তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে যে পর্যন্ত তাড়াহুড়া না করবে। বলবে, দু'আ তো অনেক করলাম, কিন্তু কবূল হল না।"[1] তখন অনেক লোক হাহুতাশ করবে আক্ষেপ করবে এবং দু'আ করাই ছেড়ে দিবে। (আঊযুবিল্লাহ্) অথচ মানুষ দু'আ করলেই তাকে ছওয়াব দেয়া হবে। কেননা দু'আ একটি ইবাদত। তাই দু'আ যে ব্যক্তিই করুক না কেন সে-ই লাভবান। বরং হাদীছে এসেছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا)

"যে কোন মুসলিম আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে-যে দু'আয় কোন গুনাহ্ থাকবে না, কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা থাকবে না। তাহলে আল্লাহ্ তাকে তিনটির যে কোন একটি দান করবেন (১) তার দু'আ দুনিয়াতেই কবূল করা হবে (২) আখেরাতে তার জন্য তা সঞ্চয় করে রাখা হবে। (৩) তার দু'আর অনুরূপ একটি অমঙ্গল তার থেকে দূরীভূত করা হবে।"[2] প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্য যে ব্যক্তি ব্যবহার করেছে তাকে নসীহত করছি, আপনি আল্লাহ্র কাছে তওবা করুন। কেননা এটি একটি মহা অপরাধ মূলক কথা। আল্লাহ্র নির্দেশ বিরোধী কথা ও তাঁর সাথে চ্যালেঞ্জ করা।

প্রশ্নঃ (৩৩৯) কোন ব্যক্তি নিজের দাফনের ব্যাপারে স্থান নির্ধারণ করে ওসীয়ত করলে তার বিধান কি ?

উত্তরঃ

প্রথমতঃ তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন সে এ স্থান নিজের জন্য চয়ন করল? যদি এরকম হয় যে, উক্ত স্থানে কোন ভন্ড মিথ্যুক ওলীর মাজার আছে। অথবা এমন মাজার আছে যেখানে অহরহ শির্কের চর্চা হয়। অথবা এ রকম কোন কারণ আছে যা শরীয়ত বহির্ভূত। তবে এ ক্ষেত্রে তার ওসীয়ত বাস্তবায়ন করা যাবে না। বরং সে মুসলিম হলে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখিত কোন কারণ যদি না থাকে। বরং এমনিই নিজ এলাকায় লাশ স্থানান্তরের ওসীয়ত করেছে। তবে এই ওসীয়ত পূর্ণ করতে গেলে যদি আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তা বাস্তবায়ন করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, বিশাল আকারের অর্থ ব্যয় না করলে তার ওসীয়তকৃত স্থানে লাশ নেয়া যাবে না, তবে তার ওসীয়ত বাস্তবায়ন করবে না। বরং মুসলমানদের যে কোন গোরস্থানে দাফন করে দিবে। কেননা আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর সকল স্থানের মর্যাদা একই রকম।

---

[1] , বুখারী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ বান্দার দু'আ কবূল হবে যে পর্যন্ত সে তাড়াহুড়া না করবে। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দু'আ ও যিকির, অনুচ্ছেদ: দু'আ কবূল হবে যে পর্যন্ত তাড়াহুড়া না করবে।

[2] . আহমাদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ বিপদোদ্ধার প্রভৃতির অপেক্ষা করা।

প্রশ্নঃ (৩৪০) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার তালক্বীন দিতে হবে ?

উত্তরঃ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় তালক্বীন দিতে হবে। যে ব্যক্তির রূহ বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে তার কাছে বসে তাকে পাঠ করতে বলবে, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। এই কালেমা দ্বারা আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার মুক্তির জন্য সুপারিশ করব।" কিন্তু চাচা আবু তালেব উহা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং শির্কের উপর মৃত্যু বরণ করেছে। (নাঊযুবিল্লাহ্)[1] কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী দাফনের পর তালক্বীন দেয়া একটি বিদআত। কেননা এ ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন হাদীছ প্রমাণিত নেই। তবে দাফনের পর যা করা উচিত সে সম্পর্কে আবূ দাঊদে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মৃতকে দাফন শেষ করলে তার কবরের কাছে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْــآنَ يُسْــأَلُ) "তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ়তা কামনা কর। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।"[2] কিন্তু কবরের কাছে কুরআন তেলাওয়াত বা সূরা পাঠ বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালক্বীন দেয়া ভিত্তিহীন বিদআত।

প্রশ্নঃ (৩৪১) দূর-দুরান্ত থেকে নিকটাত্মীয়দের উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে বিলম্ব করার বিধান কি ?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে দ্রুত দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ﴾

"তোমরা জানাযা বহণ করার সময় দ্রুত গতিতে চল। কেননা সে যদি নেক হয় তবে তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে খারাপ লোককে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে।"[3]কোন কোন নিকটাত্মীয়ের উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় বিলম্ব করা উচিত নয়। তবে অল্প কিছু সময় দেরী করাতে কোন দোষ নেই। তারপরও দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা করাই উত্তম। নিকটাত্মীয়গণ বিলম্বে পৌঁছলেও কোন অসুবিধা নেই। তারা মৃতের কবরের উপর জানাযা নামায আদায় করতে পারবে।

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর সময় মুশরিক যদি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর সময় ইসলাম গ্রহণ করা বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল।

[2]. আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ দাফন শেষে ফিরে যাওয়ার সময় কবরের কাছে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

[3]. বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ দ্রুত জানাযা দেয়া।

যেমনটি করেছিলেন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। জনৈক মহিলা মসজিদে নববী ঝাড়ু দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল। সে মৃত্যু বরণ করলে লোকেরা বিষয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না জানিয়েই তাকে দাফন করে দেয়। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কবরের উপর জানাযা নামায আদায় করেন।"[1]

প্রশ্নঃ (৩৪২) জানাযার নামাযে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবকে সংবাদ দেয়া কি নিষিদ্ধ 'নাঈ' তথা ঘটা করে মৃত্যু সংবাদ প্রচারের অন্তর্ভূক্ত হবে ? নাকি তা বৈধ ?

উত্তরঃ এ ধরণের সংবাদ প্রদান বৈধ। এজন্য নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজাশীর মৃত্যু দিনে তার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন।[2] তাছাড়া মসজিদে নববীর ঝাড়ুর কাজে নিয়োজিত মহিলাটি মৃত্যু বরণ করলে ছাহাবীগণ তাঁকে না জানিয়েই দাফন করে দেয়। তখন তিনি ছাহাবীদেরকে বলেন, "কেন তোমরা আমাকে জানালে না ?" অতএব মুছল্লী বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৃত্যু সংবাদ প্রদান করতে কোন দোষ নেই। কেননা এর উদাহরণ হাদীছে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে জানাযা নামাযে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিকটাত্মীয় ও শুভাকাংখীদেরকে সংবাদ দেয়াতেও কোন দোষ নেই।[*]

প্রশ্নঃ (৩৪৩) মৃত ব্যক্তির গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছেঃ গোসল দেয়ার সুন্নাত হল, প্রথমে তার লজ্জাস্থান ঢেঁকে দেবে, তারপর তার সমস্ত কাপড় খুলে নিবে। অতঃপর তার মাথাটা বসার মত করে উপরের দিকে উঠাবে এবং আস্তে করে পেটে চাপ দিবে, যাতে করে পেটের ময়লা বেরিয়ে যায়। এরপর বেশী করে পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করে নিবে। তারপর হাতে কাপড় জড়িয়ে বা হাত মুজা পরে তা দিয়ে উভয় লজ্জা স্থানকে (নযর না দিয়ে) ধৌত করবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ্' বলবে এবং নামাযের ন্যায় ওযু করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। বরং ভিজা কাপড় আঙ্গুলে জড়িয়ে তা দিয়ে উভয় ঠোঁটের ভিতরের অংশ ও দাঁত পরিষ্কার করবে। একইভাবে নাকের ভিতরও পরিষ্কার করবে। পানিতে কুল পাতা মিশিয়ে গোসল দেয়া

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ দাফনের পর জানাযার নামায আদায় করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরে জানাযা পড়া।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদ: মৃতের পরিবারকে তার মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযায় তাকবীর দেয়া।

[*]. [**নোটঃ** কিন্তু যে বিষয়টি নিষিদ্ধ তা হচ্ছে, ঘটা করে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা। এর জন্য অর্থ ব্যয় করে মাইকিং করা বা রেডিও টিভিতে মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা। কেননা হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী) তিনি (ﷺ) আরো বলেন, **إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ** "তোমরা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা থেকে সাবধান! কেননা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহেলিয়্যাতের রীতি।" (তিরমিযী, অধ্যায়ঃ জানাযা।]- অনুবাদক

মুস্তাহাব। প্রথমে ডান সাইডের সামনের দিক ও পিছন দিক ধৌত করবে। তারপর বাম দিক ধৌত করবে। এ ভাবে তিনবার গোসল দিবে। প্রতিবার হালকা ভাবে পেটে হাত বুলাবে এবং ময়লা কিছু বের হলে পরিষ্কার করে নিবে। গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজন মোতাবেক তিনবারের বেশী সাত বা ততোধিক গোসল দিতে পারে। শেষবার কর্পূর মিশ্রিত করে গোসল দেয়া সুন্নাত। কেননা নবী (ছাঃ) তাঁর কন্যা যায়নাবের (রাঃ) শেষ গোসলে কর্পূর মিশ্রিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং তাঁকে প্রয়োজন মনে করলে তিনবার বা পাঁচবার বা তার চেয়ে অধিকবার গোসল দিতে বলেছেন।[1]

প্রশ্নঃ (৩৪৪) দুর্ঘটনা কবলিত, আগুনে পুড়া প্রভৃতি কারণে শুধুমাত্র দু'একটি অঙ্গ পাওয়া গেলে তার জানাযা ও গোসলের নিয়ম কি ?

উত্তরঃ মৃতের উপর জানাযা পাঠ করার পর যদি তার সামান্য কোন অঙ্গ পাওয়া যায়, তবে তার জানাযা আর পড়তে হবে না। যেমন, জনৈক মৃত ব্যক্তিকে জানাযা দিয়ে আমরা তাকে দাফন করলাম। কিন্তু একটি পা বা হাত কাটা ছিল। দাফন করার পর উহা পাওয়া গেল। এখন এই কর্তিত অংশের জানাযা পড়তে হবে না। কেননা মৃতের উপর তো জানাযা হয়েই গেছে।

কিন্তু যদি মৃতের শরীরের মূল অংশই না পাওয়া যায়। শুধু তার কোন অঙ্গ পাওয়া গেল যেমন মাথা বা পা বা হাত। তবে যা পাওয়া যায় তাই গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে তার জানাযা পড়বে তারপর দাফন করবে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর গর্ভপাত হলে তার হুকুম

প্রশ্নঃ (৩৪৫) জনৈক মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের বয়স ছয় মাস হলে তা পড়ে যায়। সে কিন্তু বিভিন্ন ধরণের কষ্টকর ও ক্লান্তিকর কাজ করতো এবং সেই সাথে রামাযান মাসে রোযাও পালন করতো। তার আশংকা হচ্ছে এই গর্ভপাতের কারণ সে নিজেই। কারণ গর্ভ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতো। তাছাড়া জানাযা না পড়েই উক্ত মৃত সন্তানকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। তার জানাযা না পড়া কি ঠিক হয়েছে ? আর এই মহিলাই বা কি করবে, যে কঠিন পরিশ্রম করার কারণে বাচ্চা মারা গেছে এই অনুশোচনায় ভুগছে ?

উত্তরঃ চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর যদি গর্ভস্থ সন্তান পড়ে যায়, তবে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও দাফন করা ওয়াজিব। কেননা চার মাস পূর্ণ হলে প্রত্যেক ভ্রুণে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। যেমন আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেন,

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মৃতকে গোসল দেয়া।

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّه أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ في ذَلكَ عَلَقَةً مثْلَ ذَلكَ ثُمَّ يَكُونُ في ذَلكَ مُضْغَةً مثْلَ ذَلكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فيه الرُّوحَ

"রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িতঃ "তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে উহা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে উহা মাংশ পিন্ডে রুপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়।"[1] ইহা একশত বিশ দিন অর্থাৎ চার মাস। সে যদি এই সময়ের পর মাতৃগর্ভ থেকে পড়ে যায়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে এবং জানাযা পড়তে হবে। আর সে মানুষের সাথে ক্বিয়ামত দিবসে পূণঃরুত্থিত হবে। কিন্তু চার মাসের কম বয়সে পড়ে গেলে তাকে গোসল দিতে হবে না, কাফন পরাতে হবে না এবং জানাযাও দিতে হবে না। কেননা ওটা গোশতের একটি টুকরা মানুষ নয়।

প্রশ্নে উল্লেখিত সন্তানের বয়স ছয় মাস হওয়ার পর গর্ভপাত হয়ে গেছে। ওয়াজিব হচ্ছে, তার গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও জানাযা পড়া। কিন্তু যেহেতু এর কোনটাই করা হয়নি, তাকে দাফন করে দেয়া হয়েছে। তবে কবর কোনটি জানা থাকলে তার কবরে গিয়ে জানাযার নামায আদায় করতে হবে। আর জানা না থাকলে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করে নিবে। যে কোন ভাবে একবার জানাযা পড়ে নিলেই হল।

আর প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলাটির যে আশংকা তার কোন ভিত্তি ও প্রভাব নেই। এনিয়ে অনুশোচনায় ভুগা উচিত নয়। অনেক ভ্রুণই এভাবে মাতৃগর্ভে কারণে-অকারণে মরে যায় এবং পড়ে যায়। এনিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। তাকে কোন কিছুই করতে হবে না। অতএব আবশ্যক হচ্ছে এই সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা এবং স্বভাবিক জীবন-যাপন করা। (আল্লাই তাওফীক দাতা ও ক্ষমাকারী।)

প্রশ্নঃ (৩৪৬) জানাযা নামায আদায় করার পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ জানাযা পড়ার পদ্ধতি হচ্ছে, ইমাম পুরুষের লাশের মাথা বরাবর, আর মহিলার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দাঁড়াবে। চার তাকবীরের সাথে জানাযা আদায় করতে হয়। অন্তরে নিয়ত করে দাঁড়াবে। (আরবীতে বা বাংলায় মুখে নিয়ত বলা বা শিখিয়ে দেয়া বিদআত।) প্রথম তাকবীর দিয়ে আউযুবিল্লাহ্... বিসমিল্লাহ্... পাঠ করে সূরা ফাতিহা তারপর ছোট কোন সূরা পাঠ করবে। বিদ্বানদের অনেকে ছোট একটি সূরা পাঠ করা সুন্নাত বলেছেন। (তবে ছানা পাঠ করার কোন ছহীহ্ হাদীছ নেই) দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদে ইবরাহীম (যা ছালাতে পাঠ করতে হয়) পাঠ করবে।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ সৃষ্টির সূচনা। হা/২৯৬৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ তক্বদীর হা/৪৭৮১।

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

এরপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে জানাযার জন্য বর্ণিত যে কোন দু'আ পাঠ করবে। এই দু'আটি পাঠ করা যেতে পারে,

(اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَتُضِلَّنَا بَعْدَهُ)

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট ও বড় নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে যাদের আপনি জীবিত রেখেছেন তাদেরকে ইসলামের উপরে জীবিত রাখুন, এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার ছওয়াব হতে বঞ্চিত করবেন না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করবেন না।"[1] এবং এই দু'আটিও পড়তে পারে,

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِه واعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِه، وَأَهْلاً خَيْراً مِّنْ أَهْلِه، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِه، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ)

"হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন। তাকে মাফ করে দিন। তার আতিথেয়তা সম্মান জনক করুন। তার বাসস্থানকে প্রশস্থ করে দিন। আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার করুন যেমন করে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার (দুনিয়ার) ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর দান করুন। তার (দুনিয়ার) পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান করুন। আরো তাকে দান করুন দুনিয়ার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দিন, আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ দিন।"[2]

এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।" তারপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে। বাম দিকেও সালাম ফেরাতে পারে। পঞ্চম তাকবীর প্রদান করলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটাও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। অতএব কখনো কখনো পঞ্চম তাকবীর দিয়ে জানাযা পড়াও সুন্নাত। আর যা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে মানুষের উচিত হচ্ছে সেগুলোর উপর আমল করা। কখনো এটা আমল করবে কখনো ওটা আমল

[1]. আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, আহমাদ।

[2]. ছহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, হা/১৬০০।

করবে। যদিও চার তাকবীরে জানাযা পাঠ করার বিষয়টি বহুল প্রচলিত।

কয়েকটি লাশ একত্রিত হলে একসাথে জানাযা পড়া যাবে। তখন ইমামের নিকটবর্তী রাখবে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে, তারপর নাবালেগ পুরুষ, এরপর প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা, অতঃপর নাবালেগ মেয়েদেরকে রাখবে। এদেরকে সাজানোর তারতীব হচ্ছে, মহিলাদের বুক বরাবর পুরুষদের মাথা রাখতে হবে। আর ইমাম দাঁড়াবে পুরুষদের মাথা বরাবর। যাতে করে প্রত্যেকটি লাশের সামনে ইমামের দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত হয়।

লক্ষনীয় একটি বিষয়, সাধারণ মানুষের অনেকে ধারণা করে যে, যারা জানাযা উপস্থাপন করবে তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে, ইমামের ডানে বামে দাঁড়ানো। বরং কমপক্ষে একজন হলেও ইমামের সাথে দাঁড়াবে। কিন্তু এটা ভুল। কেননা সুন্নাত হচ্ছে, ইমাম সম্মুখে একাকী দাঁড়াবেন। যদি তারা প্রথম কাতারে স্থান না পায় তবে ইমামের পিছনে প্রথম কাতারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে।

বেনামাযীর জানাযা পড়া জায়েয নয়

প্রশ্নঃ (৩৪৭): মৃত ব্যক্তি যদি বেনামাযী হয় বা বেনামাযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে বা সে মূলতঃ নামাযী বা বেনামাযী তার বিষয়টি অজানা থাকে, তবে তার জানাযা পড়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ যদি জানা যায় যে মৃত ব্যক্তি বেনামাযী ছিল, তবে তার জানাযা আদায় করা নাজায়েয। বেনামাযী মৃতের অভিভাবকদের জন্য বৈধ নয়; তার লাশকে মুসলমানদের সামনে জানাযার জন্য উপস্থিত করা। কেননা সে কাফের-মুরতাদ। আবশ্যক হচ্ছে, তার জানাযা না পড়া এবং মুসলমানদের গোরস্থান ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে গর্ত খনন করে তার লাশ সেখানে নিক্ষেপ করা। তার কোনই মর্যাদা নেই। কেননা ক্বিয়ামত দিবসে তার হাশর হবে ফিরাউন, হামান, ক্বারূন ও উবাই বিন খালাফের সাথে।

কিন্তু যে ব্যক্তির অবস্থা অজ্ঞাত বা সন্দেহপূর্ণ তার জানাযা পড়তে হবে। কেননা আসল হচ্ছে সে মুসলিম এবং নামাযী। যতক্ষণ না প্রমাণিত হবে যে সে মুসলমান নয়। তবে সন্দেহ হলে দু'আর ক্ষেত্রে শর্ত করা যায়। দু'আয় এরূপ বলবেঃ اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه "হে আল্লাহ্! লোকটি যদি মু'মিন হয় তবে তাকে ক্ষমা কর, দয়া কর...। আর দু'আয় শর্ত করা বৈধ আছে। লে'আনের মাসআলায় স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরকে ব্যাভিচারের দোষারোপ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে লে'আন করবে। পুরুষ পঞ্চমবারে বলবে, "আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে আমার উপর আল্লাহ্র লা'নত।" আর স্ত্রীও পঞ্চমবারে বলবে, "আমার উপর আল্লাহ্র লা'নত, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই।"

জানাযার জন্য সময় এবং স্থান নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়

প্রশ্নঃ (৩৪৮) জানাযা নামাযের জন্য কোন সময় নির্ধারিত আছে কি ? রাতে কি দাফন করা জায়েয। জানাযার উপস্থিতিতে লোক সংখ্যার কি কোন সীমারেখা আছে ?

উত্তরঃ জানাযা নামায আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। এই কারণে যে, মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনই মানুষ মৃত্যু বরণ করবে তাকে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে তার জানাযা আদায় করবে। তা রাতে হোক বা দিনে। দাফন করবে রাতে হোক বা দিনে। তবে তিনটি সময়ে দাফন করা জায়েয নয়:

১) সূর্য উদয় থেকে নিয়ে এক তীর পরিমাণ সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত।

২) মধ্য দুপুরে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলা পর্যন্ত। অর্থাৎ পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার পূর্বে প্রায় দশ মিনিট।

৩) সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ এক তীর পরিমাণ সূর্য থাকার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

এই তিনটি সময়ে দাফন করা জায়েয নয়। এ সময়গুলোতে দাফন করা নিষেধ অর্থাৎ দাফন করা হারাম। কেননা উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, নামায আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে।"[1] জানাযা নামাযে সর্বনিম্ন কত লোক হতে হবে তার কোন সীমা নির্ধারণ করা নেই। বরং একজন লোকও যদি জানাযা পড়ে যথেষ্ট হবে।

গোরস্থানে গিয়ে জানাযা পড়া জায়েয। এজন্য বিদ্বানগণ গোরস্থানে নামায আদায় করার নিষেধাজ্ঞা থেকে জানাযার বিষয়টিকে স্বতন্ত্র রেখেছেন। তাঁরা বলেন, গোরস্থানে জানাযার নামায আদায় করা জায়েয। হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে, মসজিদে নববী ঝাড়ুর কাজে নিয়োজিত মহিলাটির জানাযা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কবরে গিয়ে আদায় করেছিলেন। সে রাতে মৃত্যু বরণ করলে ছাহাবীগণ তাঁকে না জানিয়েই দাফন করে দেয়। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেন, "তার কবর কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও।" তারপর তিনি তার কবরে জানাযা আদায় করলেন।[2]

প্রশ্নঃ (৩৪৯) গায়েবানা জানাযার বিধান কি ?

উত্তরঃ বিদ্বানদের মতামতের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে গায়েবানা জানাযা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে যে ব্যক্তির জানাযা হয়নি তার গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে। যেমন জনৈক মুসলমান কোন কাফের ভুখন্ডে মৃত্যু বরণ করল অথবা সমুদ্র বা নদীর পানিতে

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অধ্যায়ঃ নামায আদায় করার নিষিদ্ধ সময়।

[2] . বুখারী, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: দাফনের পর জানাযার নামায আদায় করা। মুসলিম, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: কবরে জানাযা পড়া।

ডুবে মৃত্যু বরণ করল কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেল না। তখন তার গায়েবানা জানাযা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু যার জানাযা পড়া হয়েছে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা এব্যাপারে নাজাশীর জন্য গায়েবানা জানাযা ছাড়া হাদীছে আর কোন দীলল নেই। কিন্তু নাজাশীর জানাযা তার নিজ দেশে পড়া হয়নি। এজন্য নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।[1]

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে অনেক নেতৃবৃন্দ ও গোত্রপ্রধান মৃত্যু বরণ করেন কিন্তু এরকম কোন বর্ণনা নেই যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের গায়েবানা জানাযা আদায় করেছেন। বিদ্বানদের মধ্যে আবার কেউ বলেন, মৃত ব্যক্তি যদি এমন পর্যায়ের লোক হয় যার সম্পদ, কার্যক্রম ও জ্ঞান-বিদ্যা দ্বারা ধর্মের উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়েছে তবে তার গায়েবানা জানাযা পড়া যায়। আর এরূপ না হলে গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না। আবার কেউ বলেন, কোন শর্ত ছাড়াই সব ধরণের ব্যক্তির জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েয। এটি সর্বাধিক দুর্বল মত।

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি

প্রশ্নঃ (৩৫০) কোন কোন দেশে মৃত ব্যক্তিকে পিঠের উপর শুইয়ে হাত দু'টো পেটের উপর রেখে দাফন করা হয়। দাফনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, মৃতকে ডান কাতে শুইয়ে কিবলামুখি রেখে দাফন করা। কেননা কা'বা শরীফ হচ্ছে সকল মুসলমানের জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থার কিবলা। যেমন করে ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হচ্ছে ডান কাতে শোয়া। তেমনি মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে রেখে দাফন করতে হবে। কেননা নিদ্রা ও মৃত্যুকে আল্লাহ্ তা'আলা ওফাতরূপে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীব সমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা যুমারঃ ৪২) তিনি আরো বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়: আনসারদের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ নাজাশীর মৃত্যু। মুসলিম, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযায় তাকবীর দেয়া।

"আর সেই মহা প্রভুই রাত্রিকালে নিদ্রারূপে তোমাদের নিকট এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, তারপর পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃত-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।" (সূরা আনআমঃ ৬০)

প্রশ্নকারী যা দেখেছে তা হয়তো ঐ এলাকার লোকদের অজ্ঞতার ফল। অন্যথা আমি জানিনা বিদ্বানদের কেউ এমত পোষণ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে পিঠের উপর শুইয়ে তার হাত দু'টোকে পেটের উপর রাখতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪৫১) গোরস্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দু'আ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ কবরে বা গোরস্থানে কুরআন তেলাওয়া করা বিদআত। এ সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই। আর যে ব্যাপারে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই তা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভাবন করা জায়েয নয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)

"প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত কাজই বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম।"[1] অতএব মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, পূর্ববর্তী নেক সম্প্রদায় ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। যাতে করে তারা কল্যাণ ও হেদায়াত লাভ করতে পারে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) "নিশ্চয় সর্বত্তোম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, আর সর্বত্তোম হেদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াত।"[2]

কবরের কাছে গিয়ে মৃতের জন্য দু'আ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কবরের কাছে দন্ডায়মান হয়ে সাধ্যানুযায়ী মৃতের জন্য দু'আ করবে। যেমন এরূপ বলবে, "হে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্ তাকে দয়া কর। হে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে আল্লাহ্ তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। .. ইত্যাদি। আর কবরের কাছে নিজের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি সেখানে যায়, তবে তা বিদআত। কেননা শরীয়তের প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন স্থানকে দু'আর জন্য নির্ধারণ করা যাবে না। আর যে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা নেই তা নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা বিদআত।

---

[1] . নাসাঈ, অধ্যায়ঃ দু'ঈদের নামায, অনুচ্ছেদঃ খুতবার নিয়ম।

[2] ইবনু মাজাহ্ ভুমিকা হা/ ৪৪। আহমাদ, হা/১৪৪৫৫

প্রশ্নঃ (৩৫২) কবর যিয়ারত করার নিয়ম কি ? নারীদের কবর যিয়ারত করার বিধান কি?

উত্তরঃ কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করার পর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

(كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ)

"পূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা উহা যিয়ারত করতে পার। কেননা কবর যিয়ারত তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করাবে।"[1] অতএব মরণের কথা স্মরণ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য কবর যিয়ারত করতে হবে। কেননা মানুষ যখন মৃত লোকদের কবর যিয়ারত করবে, যারা কিনা তাদের সাথে তাদের মতই পৃথিবীতে বিচরণ করত, খানা-পিনা করত, দুনিয়াদারী করত। আজ তারাই নিজেদের কর্মের হাতে বন্দী। কর্ম ভাল থাকলে তাদের পরিণাম ভাল। কর্ম মন্দ থাকলে পরিণাম মন্দ-তখন নিঃসন্দেহে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে তার অন্তর নরম হবে, সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। তখন আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে ফিরে আসবে তাঁর আনুগত্যের দিকে। কবর যিয়ারতের সময় সুন্নাত হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পঠিত দু'আ পাঠ করা। কবরবাসীকে সালাম দিবেঃ

(السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ ويَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ أَسأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ)

"হে কবরের অধিবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! আপনাদের প্রতি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর রহম করুন। আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি।"[2] আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি কবর যিয়ারতের সময় সূরা ফাতিহা, বা সূরা ইখলাছ বা দরূদ শরীফ পাঠ করেছেন। অতএব কবর যিয়ারতের সময় এগুলো পাঠ করা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়ত বহির্ভূত কাজ।

নারীদের কবর যিয়ারত করা হারাম। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারত কারীনীদেরকে লা'নত করেছেন। আরো লা'নত করেছেন কবরে বাতি জ্বালানো ও

[1] . আহমাদ হা/১১৭৩। হাদীছটি ছহীহ্ মুসলিমে প্রায় একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মায়ের কবর যিয়ারত করার জন্য নবী [ﷺ] এর আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি প্রার্থনা। হা/ ৯৭৭।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: গোরস্থানে প্রবেশ করলে যা পাঠ করতে হয়।

মসজিদ নির্মাণকারীদেরকে।[1] অতএব নারীদের জন্য কবর যিয়ারত হালাল নয়। এই নিষিদ্ধতা যদি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়। কিন্তু কবর যিয়ারতের নিয়ত ছাড়া অন্য কোন কারণে যদি ঘর থেকে বের হয়; তারপর চলার পথে কবর বা গোরস্থান পাওয়া যায়, তবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিখানো পদ্ধতিতে সালাম প্রদান করবে। অতএব ঘর থেকে শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে কবর যিয়ারত করা হারাম। কেননা এর মাধ্যমে নিজেকে ফিৎনার সম্মুখিন করবে। কিন্তু কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য না করে বের হয়ে চলতি পথে পাওয়া কবরে সালাম প্রদান করাতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৫৩) মৃতের বাড়ীতে কুরআন খানী নামে অনুষ্ঠান করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে কোরানখানী মাহফিল করা একটি বিদআত। কেননা ইহা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রচলিত ছিল না। কুরআন দ্বারা দুঃখ-চিন্তা হালকা হয়-যদি কোন ব্যক্তি উহা নীচু স্বরে তেলাওয়াত করে থাকে। জোরে চিৎকার করে বা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে পাঠ করলে এরূপ হয় না। কেননা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে সমস্ত মানুষ তা শুনে থাকে এমনকি খেলা-ধুলায় লিপ্ত লোকদের কানেও তা পৌঁছে কিন্তু তারা তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। এমনকি আপনি দেখবেন যারা গান-বাদ্য শুনে তাদের কাছেও ঐ কুরআনের আওয়াজ পৌঁছে। তারা গানও শুনছে কুরআনও শুনছে। ফলে তারা যেন এই কুরআনকে ঠাট্টা ও তাচ্ছিল্যের বিষয়ে পরিণত করেছে। কুরআনের অবমাননা করছে।

আর শোক-সমবেদনা জানাতে ও আগত লোকদের স্বাগত জানানোর জন্য মৃতের পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া একটি বিদআত। অনুরূপভাবে মৃতের বাড়ীতে ভোজের আয়োজন করাও একটি বিদআত। কেননা বিষয়টি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে পরিচিত ছিল না। তবে চলতে ফিরতে, মসজিদে বাজারে মৃতের পরিবারকে শোক জানানোতে কোন অসুবিধা নেই। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তার বাড়িতে সমবেত লোকদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাকে ছাহাবায়ে কেরাম নিষিদ্ধ নিয়াহা বা 'মৃতের জন্য বিলাপ' এর অন্তর্ভূক্ত বলেছেন। আর মৃতের জন্য বিলাপ করা কাবীরা গুনাহ। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাপকারীনী ও বিলাপ শ্রবণকারীনীকে লা'নত করেছেন। তিনি বলেন,

(النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ)

[1] . আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ নারীদের কবর যিয়ারত। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ কবরে মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধি। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরে বাতি জ্বালানোতে কঠোরতা।

"উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে ক্রন্দনকারীনী যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তবে ক্বিয়ামত দিবসে এমনভাবে উত্থিত করা হবে যে, তার গায়ে আলকাতরার একটি পায়জামা পরানো হবে এবং পরানো হবে খুঁজলী যুক্ত চাদর।"[1]

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার নসীহত, তারা যেন এরকম সবধরণের বিদআত থেকে সাবধান হয়। কেননা বিদআত পরিত্যাগে তাদের যেমন কল্যাণ আছে, তেমনি উপকার আছে মৃত ব্যক্তির। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)"নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দন ও বিলাপের কারণে।"[2] এখানে 'শাস্তি দেয়া হবে' একথার অর্থ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি এই ক্রন্দন ও বিলাপের কারণে ব্যথিত হয় কষ্ট পায়। যদিও বিলাপকারীর শাস্তি তাকে দেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "একজন অন্যজনের পাপের বোঝা বহণ করবে না।" (সূরা আনআমঃ ১৬৪) আর শাস্তি মানেই দন্ডিত হওয়া নয়। কেননা হাদীছে বলা হয়েছেঃ "সফর শাস্তির একটি অংশ।"[3] অথচ এখানে কোন দন্ড নেই; বরং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুঃখ, চিন্তা, মনোকষ্ট প্রভৃতি।

সারকথা মুসলিম ভাইদেরকে আমি নসীহত করি, তারা যেন শরীয়ত বহির্ভূত এই কুসংস্কার পরিত্যাগ করে যা তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং মৃতদের শাস্তি বৃদ্ধি করবে।

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ বিলাপ করার প্রতি কঠোরতা।

[2]. বুখারী অধ্যায়ঃ জানাযা হা/ ১২০৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা হা/১৫৩৭।

[3]. বুখারী অধ্যায়ঃ উমরা, অনুচ্ছেদঃ সফর শাস্তির একটি অংশ। হা/ ১৮০৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ সফর শাস্তির একটি অংশ। হা/ ১৯২৭।

অধ্যায়ঃ যাকাত

প্রশ্নঃ (৩৫৪) যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী কি কি ?

উত্তরঃ যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

ক) ইসলাম

খ) স্বাধীন

গ) নেসাবের মালিক হওয়া ও তা স্থীতিশীল থাকা।

ঘ) বছর পূর্ণ হওয়া।

ইসলামঃ কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়। যাকাতের নামে সে প্রদান করলেও আল্লাহ্ তা কবূল করবেন না। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

"তাদের সম্পদ ব্যয় শুধু মাত্র এই কারণে গ্রহণ করা হবে না যে, তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। অলসভঙ্গিতে ছাড়া তারা নামাযে আসে না। এবং মনের অসন্তুষ্টি নিয়ে খরচ করে।" (সূরা তওবাঃ ৫৪) কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয় এবং আদায় করলেও গ্রহণ করা হবে না একথার অর্থ এটা নয় যে, পরকালেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে; বরং তাকে এজন্য শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، عَنْ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কিন্তু ডান দিকস্থরা। তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে। বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে ? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। এমনকি আমাদের মৃত্যু এসে গেছে।" (সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ৩৮-৪৭) এথেকে বুঝা যায় ইসলামের বিধি-বিধান না মেনে চলার কারণে কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

স্বাধীনতাঃ ক্রীতদাসের কোন সম্পদ নেই। কোন সম্পদ থাকলেও তা তার মালিকের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعِ "সম্পদের অধিকারী কোন ক্রীতদাস যদি কেউ

বিক্রয় করে, তবে উক্ত সম্পদের মালিকানা বিক্রেতার থাকবে। কিন্তু যদি ক্রেতা উক্ত সম্পদের শর্তারোপ করে থাকে তবে ভিন্ন কথা।"[1]

নেসাবের মালিক হওয়াঃ অর্থাৎ তার কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ থাকবে, শরীয়ত যা নেসাব হিসেবে নির্ধারণ করেছে। সম্পদের প্রকারভেদ অনুযায়ী এর পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অতএব মানুষের কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে বা নেসাবের কম সম্পদ থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার সম্পদ কম। আর অল্প সম্পদ দ্বারা অন্যের কল্যাণ করা সম্ভব নয়।

চতুস্পদ জন্তুর নেসাবে শুরু এবং শেষ সংখ্যার খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু অন্যান্য সম্পদে শুধু প্রথমে কত ছিল তার হিসাব ধর্তব্য। পরে যা অতিরিক্ত হবে তার হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

বছর অতিক্রান্ত হওয়াঃ কেননা বছর পূর্ণ না হওয়া সত্বেও যাকাতের আবশ্যকতা সম্পদশালীর প্রতি কঠোরতা করা হয়। বছর পূর্তি হওয়ার পরও যাকাত বের না করলে যাকাতের হকদারদের প্রতি অবিচার করা হয়; তাদের ক্ষতি করা হয়। একারণে প্রজ্ঞাপূর্ণ শরীয়ত এর জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করেছে এবং এর মধ্যে যাকাতের আবশ্যকতা নির্ধারণ করেছে। আর তা হচ্ছে বছর পূর্তী। অতএব এর মধ্যে সম্পদশালী ও যাকাতের হকদারদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা বিধান করা হয়েছে।

এ কারণে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন মানুষ যদি মৃত্যু বরণ করে বা তার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য তিনটি জিনিস এ বিধানের ব্যতিক্রমঃ ১) ব্যবসার লভ্যাংশ ২) চতুস্পদ জন্তুর বাচ্চা ৩) উশর।

ব্যবসার লভ্যাংশে ব্যবসার মূল সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত দিতে হবে। আর চতুস্পদ জন্তুর ভুমিষ্ট বাচ্চার যাকাত তার মায়ের সাথে মিলিত করে দিতে হবে। আর উশর অর্থাৎ যমীনে উৎপাদিত ফসল ঘরে উঠালেই যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫৫) প্রতিমাসে প্রাপ্য বেতনের যাকাত কিভাবে প্রদান করতে হবে?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা হচ্ছে, প্রথম বেতনের যদি এক বছর পূর্তী হয়; তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে সবগুলোর যাকাত আদায় করে দিবে। যে বেতনে বছর পূর্ণ হয়েছে তার যাকাত সময়ের মধ্যেই আদায় করা হল। আর যাতে বছর পূর্ণ হয়নি তার যাকাত অগ্রীম আদায় হয়ে গেল। প্রতিমাসের বেতন আলাদা হিসাব রাখার চাইতে এটাই হচ্ছে সহজ পন্থা। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের বেতন আসার আগেই যদি প্রথম মাসের বেতন খরচ

[1] . বুখারী, কিতাবুল মুসাক্বাত, অনুচ্ছেদঃ খেজুরের বাগানে কারো যদি চলার পথ থাকে বা পানির ব্যবস্থা থাকে। মুসলিম, অধ্যায়ঃ বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদঃ ফল সমৃদ্ধ যে ব্যক্তি খেজুর গাছ বিক্রয় করে ।

হয়ে যায়, তবে তার উপর কোন যাকাত নেই। কেননা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে বছর পূর্ণ হওয়া।

প্রশ্নঃ (৩৫৬) শিশু ও পাগলের সম্পদে কি যাকাত ওয়াজিব হবে ?

উত্তরঃ বিষয়টি বিদ্বানদের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ। কেউ বলেন, নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা এরা তো শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলার বাধ্যবাধকতার বাইরে। অতএব তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে না।

কোন কোন বিদ্বান বলেন, বরং তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা যাকাত সম্পদের অধিকার। মালিক তা দেখার বিষয় নয়। আল্লাহ্ বলেন,(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন।" (সূরা তাওবাঃ ১০৩) এখানে আবশ্যকতার নির্দেশ সম্পদে করা হয়েছে। তাছাড়া মুআ'য বিন জাবাল (রাঃ) কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামান প্রেরণ করে বলেছিলেন,

(أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)

"তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ্ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"[1] অতএব এ ভিত্তিতে নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। তাদের অভিভাবক এ যাকাত বের করার দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রশ্নঃ (৩৫৭) প্রদত্ব ঋণের যাকাত আদায় করার বিধান কি ?

উত্তরঃ সম্পদ যদি ঋণ হিসেবে অন্যের কাছে থাকে, তবে ফিরিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। কেননা উহা তার হাতে নেই। কিন্তু ঋনগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সম্পদশালী লোক হয়, তবে প্রতি বছর তাকে (ঋণ দাতাকে) যাকাত বের করতে হবে। নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে তার যাকাত আদায় করে দিলে যিম্মামুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথা উহা ফেরত পাওয়ার পর হিসেব করে বিগত প্রত্যেক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা উহা সম্পদশালী লোকের হাতে ছিল। আর তা তলব করাও সম্ভব ছিল। সুতরাং ঋণদাতার ইচ্ছাতেই চাইতে দেরী করা হয়েছে।

কিন্তু ঋণ যদি অভাবী লোকের হাতে থাকে। অথবা এমন ধনী লোকের হাতে যার নিকট থেকে উদ্ধার করা কষ্টকর, তবে তার উপর প্রতি বছর যাকাত আবশ্যক হবে না। কেননা উহা হাতে পাওয়া তার জন্য অসম্ভব। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾

---

[1] . বুখারী, অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাকাত আবশ্যক হওয়া। মুসলিম, অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ কালেমায়ে শাহাদাত ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আহবান করা।

"যদি অভাবী হয় তবে তাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮০) অতএব তার জন্য সম্ভব নয় এসম্পদ পূণরুদ্ধার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। কিন্তু পূণরুদ্ধার করতে পারলে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, তখন থেকে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে। আবার কেউ বলেন, বিগত এক বছরের যাকাত বের করবে। এবং পরবর্তী বছর আসলে আবার যাকাত আদায় করবে। এটাই অত্যধিক সতর্ক অভিমত। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্নঃ (৩৫৮) মৃত ব্যক্তির ঋণ কি যাকাত থেকে পরিশোধ করা যাবে ?

উত্তরঃ ইবনু আবদুল বার্ ও আবু উবাইদা বলেন, বিদ্বানদের এজমা' বা ঐকমত্য হচ্ছে, কোন সম্পদ রেখে যায়নি এমন অভাবী ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কিন্তু আসলে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। অবশ্য অধিকাংশ আলেম বলে থাকেন, যাকাত দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। কেননা মৃত ব্যক্তি তো আখেরাতে পাড়ি জমিয়েছে। ঋণের কারণে জীবিত ব্যক্তি যে ধরণের লাঞ্ছনা ও অবমাননার স্বীকার হয় মৃত ব্যক্তি এরূপ হয় না। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃতের ঋণ যাকাত থেকে আদায় করতেন না; বরং গনীমতের সম্পদ থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতেন। এথেকে বুঝা যায় যাকাত থেকে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা বিশুদ্ধ নয়।

বলা হয়, মৃত ব্যক্তি যদি পরিশোধ করার নিয়ত রেখে ঋণ করে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দিবেন। কিন্তু গ্রহণ করার সময় পরিশোধের নিয়ত না থাকলে, অপরাধী হিসেবে তার জিম্মায় উহা অবশিষ্ট থাকবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে তা পরিশোধ করবে। আমার মতে এই মতটিই অধিক পছন্দনীয় যাকাত থেকে তার ঋণ পরিশোধ করার মতের চেয়ে।

এমনও বলা হয়, প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। জীবিত লোকদের অভাব, ঋণ, জিহাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি যাকাতের অধিক প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে তাদের বিষয়টি অগ্রগণ্য। কিন্তু তাদের এধরণের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকলে, সহায়-সম্বলহীন মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা নেই। সম্ভবতঃ এটি মধ্যমপন্থী মত।

প্রশ্নঃ (৩৫৯) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাদকা করা কি ঠিক হবে ? ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন ধরণের শরীয়তের দাবী থেকে মুক্তি পাবে ?

উত্তরঃ শরীয়ত নির্দেশিত একটি খরচ হচ্ছে দান-সাদকা। সাদকা জায়গা মত দেয়া হলে তা হবে আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অনুগ্রহ। সাদকাকারী ছওয়াব পাবে, ক্বিয়ামত দিবসে ছাদকার ছায়ার নীচে অবস্থান করবে। সাদকা কবূল হওয়ার শর্ত পূর্ণ করে যাকেই দান করা হোক তার দান গ্রহণ করা হবে। চাই দানকারী ঋণগ্রস্ত হোক বা না হোক। ইখলাছ বা একনিষ্ঠতার সাথে, হালাল উপার্জন থেকে জায়গামত দান করলেই শরীয়তের

দলীল অনুযায়ী তার দান কবূল হবে। দানকারী ঋণমুক্ত হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এমন ঋণে ডুবে থাকে যা পরিশোধ করার জন্য তার সমস্ত সম্পত্তি দরকার, তবে এটা কোন যুক্তি সংগত ও বিবেক সম্মত কথা নয় যে, জরুরী ও আবশ্যক ঋণ পরিশোধ না করে সে নফল দান-সাদকা করবে! অতএব তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, প্রথমে ফরয কাজ করা তারপর নফল কাজ করা। তারপরও ঐ অবস্থায় দান করলে তার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন, এরূপ করা জায়েয নয়। কেননা এতে পাওনাদারের ক্ষতি করা হয় এবং নিজের জিম্মায় আবশ্যিক ঋণের বোঝা বহন করে রাখা হয়। আবার কেউ বলেনঃ দান করা জায়েয আছে কিন্তু উত্তমতার বিপরীত।

মোটকথা, যে ব্যক্তির আপাদমস্তক ঋণে জর্জরিত আর পরিশোধ করার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি দরকার, তার পক্ষে দান-সাদকা করা উচিত নয়। কেননা নফল কাজের চাইতে ওয়াজিব কাজের গুরুত্ব বেশী এবং তা অগ্রগণ্য।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত কোন ধরণের শরীয়তের দাবী থেকে মুক্তি পাবে ?

তার মধ্যে একটি হচ্ছে হজ্জ। ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হজ্জের দায়িত্ব নেই বা হজ্জ ফরয নয়। কিন্তু যাকাতের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ঋণগ্রস্তের উপর থেকে যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হবে কি হবে না ? একদল আলেম বলেছেন, ঋণ পরিমাণ সম্পদে যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হবে। চাই উক্ত সম্পদ প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য। আরেক দল আলেম বলেন, তার উপর কোন সময় যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হবে না। হাতে যে সম্পদই থাক না কেন হিসেব করে তার যাকাত বের করতে হবে। যদিও তার উপর এমন ঋণ থাকে যা পরিশোধ করে দিলে অবশিষ্ট সম্পদ নেসাব পরিমাণ হয় না।

অন্যদল আলেম বলেন, বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তার সম্পদ যদি অপ্রকাশ্য ধরণের হয় যা প্রত্যক্ষ নয় গোপন থাকে, যেমন-টাকা-পয়সা এবং ব্যবসায়িক পণ্য, তবে তাতে ঋণ পরিমাণ সম্পদে যাকাত রহিত হবে। আর সম্পদ যদি প্রকাশ্য ধরণের হয়, যেমন- পশু, যমীন থেকে উৎপাদিত ফসল ইত্যাদি, তবে তাতে যাকাত রহিত হবে না।

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ কোন সময়ই যাকাত রহিত হবে না। চাই সম্পদ প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য। তার হাতে যে সম্পদ আছে তা যদি যাকাতের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং নেসাব পরিমাণ হয়, তবে তার যাকাত দিতে হবে। যদিও তার উপর ঋণ থাকে। কেননা যাকাত হচ্ছে সম্পদের অধিকার। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"(হে নবী) আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন, আর তাদের জন্য দু'আ করুন। নিঃসন্দেহে আপনার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ। আর আল্লাহ্ খুব শোনেন, খুব

জানেন।” (সূরা তাওবা- ১০৩) তাছাড়া মুআ'য বিন জাবাল (রাঃ) কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামান প্রেরণ করে বলেছিলেন,

(أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)

“তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ্ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে।”[1] কুরাআন-সুন্নাহ্র এই দলীলের ভিত্তিতে বিষয় দু'টি আলাদা হয়ে গেল। অতএব যাকাত ও ঋণের মাঝে কোন দ্বন্দ থাকল না। কেননা ঋণ হচ্ছে ব্যক্তির যিম্মায় আবশ্যক। আর যাকাত সম্পদে আবশ্যক। প্রত্যেকটি বিষয় তার নির্দিষ্ট স্থানে আবশ্যক হবে। কেউ কারো স্থলাভিষিক্ত হবে না। অতএব ঋণ ব্যক্তির যিম্মায় বাকী থাকবে। আর সময় ও শর্ত পূর্ণ হলে অবশ্যই যাকাত বের করে দিবে।

প্রশ্নঃ (৩৬০) জনৈক ব্যক্তি চার বছর যাকাত আদায় করেনি। এখন তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ যাকাত আদায়ে বিলম্ব করার কারণে এ লোক গুনাহ্গার। কেননা মানুষের উপর ওয়াজিব হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে যাকাত আদায় করে দেয়া। আবশ্যিক বিষয়ের মূল হচ্ছে, সময় হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে তা সম্পাদন করে ফেলা। এ লোকের উচিত আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তওবা করা। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে পূর্বের বছরগুলোর হিসেব করে যাকাত আদায় করে দেয়া। উক্ত যাকাতের কোন কিছুই তার থেকে রহিত হবে না। তাকে তওবা করতে হবে এবং দ্রুত যাকাত আদায় করে দিতে হবে। যাতে করে দেরী করার কারণে গুনাহ্ আরো বাড়তে না থাকে।

প্রশ্নঃ (৩৬১) বছরের অর্ধেক সময় পশু চারণ ভূমিতে চরে খেলে তাতে কি যাকাত দিতে হবে ?

উত্তরঃ যে পশু বছরের পূর্ণ অর্ধেক সময় চারণ ভূমিতে চরে খায় তাতে যাকাত দিতে হবে না। কেননা পশু সায়েমা না হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। সায়েমা সেই পশুকে বলা হয়, যা বছরের পূর্ণ সময় বা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ঘাটে চরে বেড়ায় ও তৃণ-লতা খেয়ে বড় হয়। কিন্তু বছরের কিছু সময় বা অর্ধেক সময় চরে খেলে তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। অবশ্য যদি উহা ব্যবসার জন্য হয়ে থাকে, তখন তার বিধান ভিন্ন। ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে যাকাত বের করতে হবে। বছর পূর্ণ হলে মূল্য নির্ধারণ করে ২.৫% আড়াই শতাংশ) হারে যাকাত বের করবে।

[1]. (বুখারী, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাকাত আবশ্যক হওয়া। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ কালেমায়ে শাহাদাত ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আহবান করা।)

বাড়ী-ঘরের আশেপাশে ফলদার বৃক্ষের ফলের যাকাত।

প্রশ্নঃ (২৬২) তিন বছর আগে আমি বাড়ী ক্রয় করেছি। (আল্ হামদু লিল্লাহ্) বাড়ীর সীমানার মধ্যে তিনটি খেজুর গাছ আছে। প্রত্যেক গাছে প্রচুর পরিমাণে খেজুর পাওয়া যায়। এ খেজুরে কি যাকাত দিতে হবে ? যাকাত দেয়া ওয়াজিব হয়ে থাকলে তো এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছেঃ ১) খেজুরগুলো নেসাব পরিমাণ হল কি না তা জানার উপায় কি ? আমি তো বিভিন্ন সময় খেজুর পেড়ে থাকি ?

২) কিভাবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে ? প্রত্যেক প্রকার খেজুরের যাকাত কি আলাদাভাবে বের করতে হবে ? নাকি সবগুলো একত্রিত করে যে কোন এক প্রকার থেকে যাকাত দিলেই চলবে ?

৩) খেজুরথেকে যাকাত না দিয়ে এর বিনিময় মূল্য দিলে চলবে কি ?

৪) বিগত বছরগুলোতে তো যাকাত বের করিনি। এখন আমি কি করব ?

উত্তরঃ বাড়ির আশে পাশে খেজুর গাছে প্রাপ্ত খেজুর থেকে যে যাকাত আবশ্যক হতে পারে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না, প্রশ্নকারীর একথা সত্য ও সঠিক। কারো বাড়িতে সাতটি, কারো দশটি, কারো কম বা বেশী সংখ্যার গাছ থাকে। এগুলোর ফল নেসাব পরিমাণও হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না যে এতেও যাকাত দিতে হবে। তাদের ধারণা যে, বাগানের খেজুরেই শুধু যাকাত দিতে হবে। অথচ খেজুর বৃক্ষ বাগানে হোক বা বাড়ীতে হোক, উৎপাদিত ফসল নেসাব পরিমাণ হলেই তাতে যাকাত দিতে হবে। এই ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষ অনুমান করবে, এ গাছগুলোতে যাকাতের নেসাব পরিমাণ খেজুর আছে কি না ? যদি নেসাব পরিমাণ হয় তবে কিভাবে যাকাত দিবে সে তো বিভিন্ন সময় ফল পেড়ে খেয়ে থাকে ?

আমি মনে করি, এ অবস্থায় খেজুরের মূল্য নির্ধারণ করবে এবং পূর্ণ মূল্যের এক বিশমাংশ যাকাত হিসেবে বের করবে। কেননা এ পদ্ধতি মালিকের জন্য যেমন সহজ তেমনি অভাবীদের জন্যও উপকারী। এতে যাকতের পরিমাণ হবে ৫% (শতকরা পাঁচ) টাকা। কেননা ইহা হচ্ছে ফসলের যাকাত ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত নয়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদ যদি হয় যেমন-স্বর্ণ-রৌপ্য, টাকা-পয়সা, তবে তাতে যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে ২.৫% শতকরা আড়াই) টাকা।

আর অজ্ঞতা বশতঃ বিগত যে কয় বছরের যাকাত আদায় করেনি, তার জন্য অনুমান করে সর্বমোট একটা পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তারপর তার যাকাত এখনই আদায় করে

দিবে। আর যাকাত আদায় করতে এই দেরীর কারণে তার কোন গুনাহ্ হবে না। কেননা সে ছিল অজ্ঞ। কিন্তু বিগত বছরগুলোর যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬৩) স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব কি ? আর কিলোগ্রাম হিসেবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছা' এর পরিমাণ কত ?

উত্তরঃ স্বর্ণের নেছাব হচ্ছে বিশ মিসক্বাল তথা ৮৫ পঁচাশি গ্রাম।

আর রৌপ্যের নেছাব হচ্ছে ১৪০ (একশ চল্লিশ) মিসক্বাল তথা সৌদী আরবের রৌপ্যের দিরহাম অনুযায়ী ৫৬ রিয়াল। অর্থাৎ ৫৯৫ গ্রাম। আর কিলোগ্রাম হিসেবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছা' এর পরিমাণ হচ্ছে, দু'কিলো চল্লিশ গ্রাম (২.৪০ কেজি) পাকা পুষ্ট গম।

প্রশ্নঃ (৩৬৪) মেয়েদেরকে দেয়া স্বর্ণ একত্রিত করলে নেসাব পরিমাণ হয়। একত্রিত না করলে নেসাব হয় না। এ অবস্থায় করণীয় কি ?

উত্তরঃ কোন মানুষ যদি গয়নাগুলো তার মেয়েদেরকে ধার স্বরূপ শুধুমাত্র পরিধান করার জন্য দিয়ে থাকে, তবে সেই তার মালিক। সবগুলো একত্রিত করে যদি নেসাব পরিমাণ হয় তবে যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু যদি তাদেরকে সেগুলো দান স্বরূপ প্রদান করে থাকে অর্থাৎ মেয়েরাই সেগুলোর মালিক হয়, তবে গয়নাগুলো একত্রিত করা আবশ্যক নয়। কেননা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে স্বর্ণগুলোর মালিক। অতএব তাদের একজনের স্বর্ণ যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তবেই যাকাত প্রদান করবে। অন্যথায় নয়।

প্রশ্নঃ (৩৬৫) নিজের প্রদত্ব যাকাত থেকে গ্রহীতা যদি উপহার স্বরূপ কিছু প্রদান করে, উহা কি গ্রহণ করা যাবে ?

উত্তরঃ যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্ত যাকাত থেকে প্রদানকারীকে কিছু হাদিয়া বা উপহার স্বরূপ দেয়, তবে উহা নিতে কোন বাধা নেই। কিন্তু তাদের মাঝে যদি পূর্ব থেকে কোন গোপন সমঝোতা হয়ে থাকে তবে তা হারাম। এই কারণে তার উক্ত হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ না করাই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৩৬৬) সম্পদের যাকাতের পরিবর্তে কাপড় ইত্যাদি প্রদান করা কি জায়েয হবে ?

উত্তরঃ না, তা জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৬৭) স্বর্ণের সাথে মূল্যবান ধাতু হীরা প্রভৃতি থাকলে কিভাবে স্বর্ণের যাকাত দিবে ?

উত্তরঃ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহা নির্ধারণ করবে। স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে পরিমাণ জেনে নিবে। এখানে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে তা নেসাব পরিমাণ হয় কি না ? নেসাব পরিমাণ না হলে যাকাত নেই। তবে তার কাছে অন্য স্বর্ণ থাকলে তা দ্বারা নেসাব

পূর্ণ করে হিরা প্রভৃতি মিশ্রিত স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করে তা থেকে ২.৫%(আড়াই শতাংশ) হারে যাকাত আদায় করবে।

প্রশ্নঃ (৩৬৮) যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি ? ফক্বীর বা অভাবী কাকে বলে ?

উত্তরঃ যাকাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে আট শ্রেণীর কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন খাতে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আয়াতে إنما অব্যয় দ্বারা যাকাত প্রদানের খাতকে আট শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"যাকাত তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাব গ্রস্তদের আর এই যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং ইসলামের প্রতি তাদের (কাফেরদের) হৃদয় আকৃষ্ট করতে, ঋণ পরিশোধে, আল্লাহর পথে জিহাদে, আর মুসাফিরদের সাহায্যে। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবাঃ ৬০) সুতরাং তা মসজিদ নির্মাণের কাজে বা জ্ঞানার্জনের কাজে খরচ করা জায়েয হবে না। আর নফল সাদকা সমূহের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে যেখানে বেশী উপকার পাওয়া যাবে সেখানে প্রদান করা।

ফক্বীরের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ স্থান ও কাল ভেদে যার কাছে পূর্ণ এক বছরের নিজের ও পরিবারের খরচ পরিমাণ অর্থ না থাকবে তাকে বলা হয় ফক্বীর। স্থান-কাল ভেদে এজন্য বলা হয়েছে, হয়তো কোন কালে বা কোন স্থানে এক হাজার রিয়ালের অধিকারীকে ধনী বলা হয়। আবার কোন কালে বা কোন স্থানে এটা কোন সম্পদই নয়। কেননা সে সময় বা স্থানে জীবন ধারণের উপকরণ খুবই চড়া মূল্যের।

প্রশ্নঃ (৩৬৯) ভাড়া বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত গাড়ীতে কি যাকাত আবশ্যক ?

উত্তরঃ ভাড়ার কাজে মানুষ যে গাড়ী ব্যবহার করে অথবা নিজের ব্যক্তিগত কাজে যে গাড়ী ব্যবহার করা হয় তার কোনটাতেই যাকাত নেই। তবে প্রাপ্ত ভাড়া যদি নেসাব পরিমাণ হয় বা তা অন্য অর্থের সাথে মিলিত করে তা নেসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হয় তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে ভাড়ায় ব্যবহৃত যমি বা ভূমিতে যাকাত নেই। তার প্রাপ্ত ভাড়া থেকে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৭০) ভাড়া দেয়া হয়েছে এমন বাড়ীর যাকাত দেয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ ভাড়া দেয়া হয়েছে এমন বাড়ী যদি ভাড়ার জন্যই নির্মাণ করা হয়ে থাকে তবে বাড়ীর মূল্যে কোন যাকাত নেই। তবে বাড়ী থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার যাকাত দিতে হবে, যদি

ভাড়া দেয়ার দিন থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর বছর পূর্ণ হয়। ভাড়ার চুক্তি নামা স্বাক্ষর করার দিন থেকে যদি বছর পূর্ণ না হয় তবে তাতে যাকাত নেই। যেমন বছরে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদানের চুক্তিতে ঘর ভাড়া দেয়া হল। চুক্তির শুরুতে পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করে উহা খরচ হয়ে গেল। অবশিষ্ঠ পাঁচ হাজার টাকা বছরের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রহণ করে উহাও বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই খরচ হয়ে গেল, তবে এক বছরে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকার এই ভাড়ার মধ্যে কোন যাকাত দিতে হবে না। কেননা এই অর্থে বছর পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু বাড়ীটি যদি ব্যবসার জন্য নির্মাণ করে মূল্য বৃদ্ধি বা লাভের অপেক্ষায় থাকে এবং বিক্রি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভাড়া আদায় করে, তবে উক্ত বাড়ীর মূল্যে যাকাত দিতে হবে এবং ভাড়ারও যাকাত দিতে হবে যখন বছর পূর্ণ হবে।। কেননা উহা ব্যবসার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। নিজ মালিকানায় থেকে যাওয়া বা তা থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। আর এমন প্রত্যেক বস্তু যা ব্যবসা বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয় তাতেই যাকাত রয়েছে। কেননা নবী (ﷺ) বলেন, "প্রত্যেকটি কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ যা নিয়ত করে তাই রয়েছে তার জন্য।"[1]

এই ব্যক্তির নিকট উপার্জনের জন্য যে সম্পদ রয়েছে। তার লক্ষ্য তো বস্তুটির মূল্যের প্রতি-মূল বস্তু নয়। আর উহার মূল্য হচ্ছে দিরহাম বা টাকা বা নগদ অর্থ আর নগদ অর্থে বা টাকা-পয়সায় যাকাত ওয়াজিব। অতএব যে গৃহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বছর শেষে তার মূল্য নির্ধারণ করে তাতে এবং উহা যদি ভাড়ায় থাকে তবে ভাড়ার চুক্তির দিন থেকে বছর পূর্ণ হলে তাতেও যাকাত দিতে হবে।

বসবাসের উদ্দেশ্যে যমীন খরিদ করার পর উহা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করলে তার যাকাত।

প্রশ্নঃ (৩৭১) জনৈক ব্যক্তি বসবাসের উদ্দেশ্যে একটি যমীন খরিদ করেছে। তিন বছর পর সে উহা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করল। এখন উক্ত তিন বছরের কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তরঃ বিগত বছরগুলোর জন্য কোন যাকাত ওয়াজিব হবেনা। কেননা সে তো বসবাসের জন্য উহা খরিদ করেছিল। কিন্তু ব্যবসা ও উপার্জনের নিয়ত করার সময় থেকেই বছরের হিসাব শুরু করতে হবে। যখন বছর পূর্ণ হবে তখনই তাতে যাকাত আবশ্যক হবে।

প্রশ্নঃ (৩৭২) রামাযানের প্রথম দশকে যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) আদায় করার বিধান কি ?

উত্তরঃ যাকাতুল ফিতর শব্দটির নামকরণ করা হয়েছে রোযা ভঙ্গকে কেন্দ্র করে। রোযা ভঙ্গ বা শেষ করার কারণেই উক্ত যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। সুতরাং উক্ত নির্দিষ্ট কারণের সাথেই সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে, অগ্রীম করা চলবে না। একারণে ফিতরা বের করার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন নামাযের পূর্বে। কিন্তু ঈদের একদিন বা দু'দিন আগে তা

---

[1] . বুখারী ও মুসলিম।

আদায় করা জায়েয। কেননা এতে প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর জন্য সহজতা রয়েছে। কিন্তু এরও আগে বের করার ব্যাপারে বিদ্বানদের সঠিক মত হচ্ছে তা জায়েয নয়। এই ভিত্তিতে ফিতরা আদায় করার সময় দু'টিঃ ১) জায়েয বা বৈধ সময়। তা হচ্ছে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে। ২) ফযীলতপূর্ণ উত্তম সময়। তা হচ্ছে ঈদের দিন-ঈদের নামাযের পূর্বে। কিন্তু নামাযের পর পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা হারাম। ফিতরা হিসেবে কবূল হবেনা। ইবনু আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

(مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)

"নামাযের পূর্বে যে উহা আদায় করে তার যাকাত গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর আদায় করবে তার জন্য উহা একটি সাধারণ সাদ্কা বা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে।"[1] তবে কোন লোক যদি জঙ্গল বা মরুভূমি বা এ ধরণের জনমানবহীন কোন স্থানে থাকার কারণে ঈদের দিন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং ঈদের নামায শেষ হওয়ার পর সে সম্পর্কে অবগত হয়, তবে ঈদের পর ফিতরা আদায় করলেও তার কোন অসুবিধা হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৭৩) সাদ্কার নিয়তে বেশী করে ফিতরা আদায় করা জায়েয হবে কি ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, বেশী করে ফিতরা আদায় করা জায়েয। ফিতরার অতিরিক্ত বস্তু সাদ্কার নিয়তে প্রদান করবে। যেমন আজকাল বহু লোক এরূপ করে থাকে। মনে করুন একজন লোক দশ জনের ফিতরা আদায় করবে। এই উদ্দেশ্যে সে এক বস্তা চাউল খরিদ করে যাতে দশ জনের অধিক ব্যক্তির ফিতরা আদায় করা যাবে। অতঃপর উহা নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে আদায় করে। এটা জায়েয যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তার চাইতে বেশী চাউল আছে। বস্তার মধ্যে নির্দিষ্ট ফিতরার পরিমাপ যদি জানা যায় তবে উহা আদায় করাতে কোন দোষ নেই।

চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করা

প্রশ্নঃ (৩৭৪) কতিপয় বিদ্বান মনে করেন, যে সমস্ত বস্তু দ্বারা ফিতরা দেয়ার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা যেহেতু বর্তমানে পাওয়া যায়, তাই চাউল দ্বারা ফিতরা দেয়া বিধিসম্মত নয়। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই ?

উত্তরঃ একদল আলেম বলেন, হাদীসে উল্লেখিত পাঁচ প্রকার বস্তুঃ গম, খেজুর, যব, কিসমিস এবং পনীর- এগুলো যদি থাকে তবে অন্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়েয হবে না। অন্য একটি মত হচ্ছে উল্লেখিত বস্তু এবং অন্য যে কোন বস্তু এমনকি টাকা-পয়সা দ্বারাও ফিতরা আদায় করা বৈধ। পরস্পর বিরোধী দু'টি মত। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ-মানুষের

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাকাতুল ফিতর, ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ সাদাকা ফিতর।

সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। কেননা সহীহ্ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

(كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)

"আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক ছা' পরিমাণ খাদ্য ফিতরা হিসেবে বের করতাম। খেজুর, যব, কিসমিস ও পনীর।"[1] এ হাদীসে গমের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া যাকাতুল ফিতরে গম দেয়া যাবে এরকম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোন হাদীস আমার জানা নেই। কিন্তু তারপরও নিঃসন্দেহে গম দ্বারা ফিতরা আদায় বৈধ। আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)

"রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন রোযাদ্বারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের জন্য খাদ্য স্বরূপ।"[2] অতএব মানুষের প্রচলিত খাদ্য থেকে ফিতরা বের করাই যথেষ্ট। যদিও উহা ফিকাহ্‌বিদদের উক্তিতে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত না হয়। কেননা এই প্রকার সমূহ যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- চারটি ছিল। যা নবী (সাঃ) এর যুগে মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। অতএব চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়েয। বরং আমি মনে করি বর্তমান যুগে ফিতরা হিসেবে চাউলই উত্তম। কেননা উহা সহজলভ্য ও মানুষের অধিক পছন্দনীয় বস্তু। তাছাড়া বিষয়টি স্থানভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। হতে পারে গ্রামাঞ্চলে কোন কোন গোষ্ঠির নিকট খেজুর অধিক প্রিয় খাদ্য। তারা খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করবে। কোন এলাকায় কিসমিস, কোন এলাকায় পনীর প্রিয় খাদ্য হতে পারে তারা তা দিয়েই ফিতরা আদায় করবে। প্রত্যেক এলাকা ও সম্প্রদায়ের জন্য সেটাই উত্তম যেটাতে রয়েছে তাদের জন্য অধিক উপকার।

মৃত ব্যক্তির ওছীয়তকৃত সম্পদে এবং ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত

প্রশ্নঃ (৩৭৫) কারো নিকট যদি মৃত ব্যক্তির ওছীয়তকৃত সম্পদ্দর এক তৃতীয়াংশ থাকে এবং ইয়াতীমের কিছু সম্পদ থাকে, তাতে কি যাকাত দিতে হবে ?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদের উক্ত এক তৃতীয়াংশে কোন যাকাত নেই। কেননা তার কোন মালিক নেই। উহা তো অসীয়ত অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কাজে

[1] . বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: ফিতরা হচ্ছে এক ছা' পরিমাণ খাদ্য।

[2] . আবু দাউদ, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাতুল ফিতর, ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: সাদাকাতুল ফিতর।

ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ইয়াতীমের অর্থ যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং বছর পূর্ণ হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইয়াতীমের অভিভাবক সেই যাকাত বের করবে। বিদ্বানদের মতসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া বা বিবেকবান হওয়া শর্ত নয়। কেননা যাকাত সম্পদে ওয়াজিব হয়।

প্রশ্নঃ (৩৭৬) ব্যক্তিগত গাড়ীতে কি যাকাত দিতে হবে ?

উত্তরঃ এতে কোন যাকাত নেই। স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া মানুষের ব্যবহৃত কোন বস্তুতে যাকাত নেই। যেমন গাড়ী, উট, ঘোড়া, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) "মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস, ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই।"[1]

প্রশ্নঃ (৩৭৭) যাকাত দেয়ার সময় কি বলে দিতে হবে যে, এটা যাকাত ?

উত্তরঃ যাকে যাকাত প্রদান করা হবে সে যদি যাকাতের হকদার হয় কিন্তু সাধারণতঃ সে যাকাত গ্রহণ করেনা, তাহলে যাকাত দেয়ার সময় তাকে বলে দিতে হবে যে, এটা যাকাত। যাতে করে বিষয়টি তার নিকট সুস্পষ্ট হয়, ফলে সে ইচ্ছা হলে যাকাত গ্রহণ করবে ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করবে। আর যে লোক যাকাত গ্রহণে অভ্যস্ত তাকে যাকাত দেয়ার সময় কোন কিছু না বলাই উচিত। কেননা এতে তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের খোঁটা দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾

"হে ঈমানদারগণ খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের সাদ্‌কা বা দান সমূহকে বিনষ্ট করে দিও না।" (সূরা বাকারাঃ ২৬৪)

প্রশ্নঃ (৩৭৮) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাকাত স্থানান্তর করার বিধান কি ?

উত্তরঃ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করলে যদি কল্যাণ থাকে তবে তা জায়েয। যাকাত প্রদানকারীর কোন নিকটাত্মীয় যাকাতের হকদার যদি অন্য শহরে থাকে তবে তার নিকট যাকাত প্রেরণ করলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে জীবন যাত্রার মান উঁচু এমন দেশে বসবাস করে এবং তুলনামূলক অভাবী দেশে যদি যাকাত প্রেরণ করে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি অন্য শহরে বা দেশে যাকাত প্রেরণ করাতে তেমন কোন কল্যাণ না থাকে তবে তা স্থানান্তর করা যাবে না।

অন্য স্থানে বসবাসকারী পরিবারের লোকদের ফিতরা আদায় করা

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাসে যাকাত নেই। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাত নেই।

প্রশ্নঃ (৩৭৯) জনৈক ব্যক্তি মক্কায় থাকে আর তার পরিবার থাকে রিয়াদে। সে কি নিজ পরিবারের লোকদের ফিতরা মক্কায় আদায় করতে পারবে ?

উত্তরঃ নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা জায়েয যদিও তারা তার সাথে তার শহরে না থাকে। অতএব সে মক্কায় আর তার পরিবার রিয়াদে, সে মক্কাতেই তার ও তার পরিবারের ফিতরা আদায় করতে পারে। কিন্তু উত্তম হচ্ছে যে স্থানে ফিতরা আদায় করার সময় হবে সে স্থানেই উহা আদায় করা। ফিতরা আদায় করার সময় সে যদি মক্কায় থাকে তবে মক্কাতেই আদায় করবে। রিয়াদে থাকলে রিয়াদে। পরিবারের কিছু লোক মক্কায় কিছু রিয়াদে। যারা মক্কায় আছে তারা মক্কায় যারা রিয়াদে আছে তারা রিয়াদে ফিতরা আদায় করবে। কেননা ফিতরা শরীরের সাথে সম্পর্কিত। রোযাদার যেখানে তার ফিতরাও সেখানে।

প্রশ্নঃ (৩৮০) ঋণগ্রস্তের হাতে যাকাত দেয়া উত্তম ? না কি তার পাওনাদারের নিকট গিয়ে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা উত্তম ?

উত্তর ঃ বিষয়টির বিধান অবস্থা ভেদে ভিন্ন রকম হতে পারে। ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তি যদি দায়মুক্তি ও ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। অর্থ হাতে এলে ঋণ পরিশোধ করবে এরকম বিশস্ত হয় তবে যাকাতের অর্থ তার হাতেই প্রদান করা উচিত। যাতে করে উহা পরিশোধ করতে পারে। তার ব্যাপারটা গোপন থাকে। দাবীদারদের সামনে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বেহিসাবী অপব্যয়ী হয়। তার হাতে অর্থ আসলে ঋণ পরিশোধের পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় খাতে তা খরচ করে, তবে যাকাতের অর্থ তাকে না দিয়ে সরাসরি পাওনাদারের নিকট গিয়ে, প্রাপ্য জেনে নিয়ে-তা পরিশোধ করে দিবে অথবা সাধ্যানুযায়ী তার ঋণ হালকা করে দিবে।

প্রশ্নঃ (৩৮১) যারাই যাকাত গ্রহণের জন্য হাত বাড়ায় তারাই কি তার হকদার ?

উত্তরঃ যাকাতের জন্য যে কেউ হাত বাড়ালেই তাকে যাকাত দেয়া উচিত নয়। কেননা সম্পদশালী হওয়া সত্বেও অনেক মানুষ পয়সার লোভে হাত বাড়ায়। এসমস্ত লোক কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় আসবে যে তার মুখমন্ডলে এক টুকরা গোস্তও থাকবে না (নাউযুবিল্লাহ) সমস্ত মানুষের সাক্ষাতে কিয়ামত দিবসে তার মুখ মন্ডলের শুধুমাত্র হাড়-হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)

"যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে সে যেন জাহান্নামের আগুন চাইল। অতএব বেশী চাইলে চাক বা কম চাইলে চাক।"[1]

এ সুযোগে আমি সর্তক করছি সেই লোকদেরকে যারা ভিক্ষা বৃত্তি চর্চা করে। সর্তক

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়া নাজায়েয।

করছি সেই লোকদেরকে যারা যাকাতের হকদার না হওয়া সত্বেও যাকাত গ্রহণ করে। সাবধান! যাকাতের হকদার না হয়েও আপনি যদি যাকাত গ্রহণ করেন, তবে আপনি হারাম খেলেন। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহকে ভয় করুন। অথচ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,(وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ)"যে ব্যক্তি অভাব মুক্ত থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র করে দেন।"[1] তবে কোন লোক যদি আপনার কাছে হাত পাতে, আর তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে আপনি মনে করেন সে যাকাতের হকদার, তবে তাকে যাকাত দিলে আদায় হয়ে যাবে এবং আপনি দায় মুক্ত হবেন। পরবর্তীতে যদি জানা যায় যে, সে যাকাতের হকদার ছিল না তবে পুনরায় যাকাত দেয়া যাবেনা। দলীলঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ(قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ الليلة بصَدَقَة فَخَرَجَ بصَدَقَته فَوَضَعَهَا في يَد سَارِق فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَة فَخَرَجَ بصَدَقَته فَوَضَعَهَا في يَدَيْ زَانيَة فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانيَة فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانيَة لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَة فَخَرَجَ بصَدَقَته فَوَضَعَهَا في يَدَيْ غَنيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق وَعَلَى زَانيَة وَعَلَى غَنيٍّ فَأُتيَ فَقيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِق فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَته وَأَمَّا الزَّانيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ)

আবু হুরায়রাহ (রাযি:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "একদা(বনী ইসরাঈলের) জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি এ রাত্রে কিছু দান করবো। এ উদ্দেশ্যে সে স্বীয় দান নিয়ে বের হলো, এবং (গোপনীয়তার কারণে নিজের অজান্তে) এক চোরের হাতে তা রেখে দিল। সকালে মানুষ বলাবলি করতে লাগলো, কি আশ্চর্য! আজ রাতে এক চোরকে দান করা হয়েছে! সে বললো, হে আল্লাহ! চোরের হাতে আমার দান যাওয়ার কারণে সকল প্রশংসা তোমার জন্য। অবশ্যই আবার দান করবো। অতঃপর সে তার দান নিয়ে বের হলো এবং এক ব্যভিচারিণীর হাতে রেখে দিল। সকালে মানুষ বলাবলি করতে লাগলো, কি আশ্চর্য! গত রাতে একজন ব্যভিচারিণীকে দান করা হয়েছে। সে বললো, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীকে দান করার কারণে সমস্ত প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। অবশ্যই (আবার) এ রাত্রে সাদাকা করবো। সে তার দান নিয়ে বের হলো অত:পর এক ধনী লোকের হাতে তা দিয়ে দিল। সকালে মানুষ বলতে লাগলো, আশ্চর্যব্যাপার! আজ রাতে একজন ধনী মানুষকে দান করা হয়েছে। সে বললো, হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য। চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী লোককে দান করার কারণে। তার নিকটে আসা হলো অতঃপর তাকে বলা হলো, তোমার দান চোরের হাতেযাওয়ার কারণে- হতে

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ সম্পদের প্রতি লোভমুক্ত না হয়ে সাদকা হয় না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ পবিত্র থাকা ও ধৈর্যাবলম্বন করার ফযীলত।

পারে সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। আর ব্যভিচারিণী, হতে পারে সে এ দানের কারণে ব্যভিচার থেকে বিরত হবে। আর ধনী ব্যক্তি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে হতে পারে সেও তার সম্পদ দান করবে।

তেখুন সৎ নিয়তের কিরূপ প্রভাব হয়। এতএব যে ব্যক্তি আপনার কাছে হাত পেতেছে আপনি তাকে ফকীর বা অভাবী মনে করে দান করেছেন কিন্তু পরে জানা গেল যে, সে অভাবী নয় সম্পদশালী তবে আপনার যাকাত হয়ে যাবে পুনরায় আদায় করতে হবে না।

যাকাত বন্টনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি যাকাতের হকদার নয়

প্রশ্নঃ ৩৮২) জনৈক ধনী ব্যক্তি একজন লোককে বলল আপনি যাদেরকে হকদার মনে করেন তাদের কাছে আমার এই যাকাত বন্টন করে দিন। এখন এই ব্যক্তি কি যাকাতের কাজে নিযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের হকদার হবে ?

উত্তরঃ না, এ লোক যাকাতের কাজে নিযুক্ত বলে গণ্য হবে না। ফলে সে যাকাতেরও হকদার হবে না। কেননা সে নির্দিষ্ট ভাবে এক ব্যক্তির যাকাত বন্টন করার দায়িত্ব নিয়েছে। (আল্লাহই ভাল জানেন) পবিত্র কুরআনের বাক্য ভঙ্গির গোপন উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই- আল্লাহ বলেন, (والعاملين عليها) এখানে علىঅব্যয় দ্বারা এক প্রকার কর্তৃত্ব বুঝা যায়। অর্থাৎ যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর্মচারী। এ জন্য নির্দিষ্ট ভাবে একক ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর্মচারী কুরআনে বর্ণিত উক্ত প্রকারের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৮৩) দুর্বল ঈমানের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে ঈমান শক্তিশালী করার জন্য যাকাত দেয়া যাবে কি ? সে কোন এলাকার নেতা বা সরদার নয়।

উত্তরঃ মাসআলাটি বিদ্বানদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। আমার মতে ইসলামের প্রতি ধাবিত করতে ঈমান শক্তিশালী করার জন্য তাকে যাকাত দিলে কোন অসুবিধা নেই। যদিও সে কোন কবীলা বা এলাকায় সরদার বা নেতা না হয়। যদিও একান্ত ব্যক্তিগতভাবে উক্ত উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "তাদের হৃদয়গুলো ইসলামের দিকে ধাবিত করার জন্য।" যখন ফকীর ও অভাবীকে যাকাত দেয়া বৈধ তখন দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিকে তা প্রদান করা তো আরো অধিক বৈধ। কেননা কোন ব্যক্তির শরীর শক্তিশালী করার চেয়ে তার ঈমানকে শক্তিশালী করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নঃ (৩৮৪) ইসলামী জ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রকে যাকাত দেয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ছাত্রদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয, যদিও তারা কামাই রোজগার করার সামর্থ রাখে। কেননা ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করা এক প্রকার জিহাদ। আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে যাকাতের একটি খাত। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"যাকাত তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাব গ্রস্তদের আর এই যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং ইসলামের প্রতি যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে হয়, গোলাম আযাদ করার জন্য, ঋণ পরিশোধে, আল্লাহর পথে জিহাদে আর মুসাফিরদের সাহায্যে। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী অতিপ্রজ্ঞাময়।" (সূরা তওবাঃ ৬০)

কিন্তু শিক্ষার্থী যদি শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী থাকে তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবেনা। আমরা তাকে বলব তুমি তো দুনিয়ার কর্মেই ব্যস্ত আছ। অতএব চাকরী করার মাধ্যমে তো দুনিয়া অর্জন করতে পার। তাই তোমাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

কিন্তু আমরা যদি এমন লোক পাই যে নিজ পানাহার ও বাসস্থানের জন্য রোজগার করতে সক্ষম কিন্তু তার নিকট এমন সম্পদ নাই যা দ্বারা সে বিবাহ করতে পারে, তবে যাকাতের অর্থ দিয়ে কি এ ব্যক্তির বিবাহের ব্যবস্থা করা যাবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, বিবাহের জন্য তাকে যাকাত দেয়া যাবে। যাকাত থেকে তার পূর্ণ মোহর আদায় করা যাবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় বিবাহে অপরাগ ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে?

জবাবে আমরা বলবঃ কেননা মানুষের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কখনো খানা পিনার মতই এর প্রয়োজনীয়তা মানুষের জীবনে প্রকট হয়ে দেখা যায়। এ জন্য বিদ্বানগণ বলেন, কারো ভরণ-পোষণের অর্থ বহন করা যার উপর আবশ্যক থাকে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে তার বিবাহেরও ব্যবস্থা করে দেয়া- যদি তার কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকে। অতএব পুত্র যদি বিবাহ উপযুক্ত হয় এবং বিবাহের দরকার মনে করে তবে পিতার উপর ওয়াজিব হচ্ছে পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়া। কিন্তু আমি শুনেছি পুত্র যদি বিবাহের কথা উত্থাপন করে তবে কোন কোন পিতা নিজেদের যৌবন কালের কথা ভুলে গিয়ে পুত্রকে ধমক দেন আর বলেন, নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে উপার্জন কর তারপর বিবাহ কর। এটা মোটেও জায়েয না। পিতা সামর্থবান থাকলে পুত্রের সাথে এরকম ব্যবহার করা হারাম। পিতার সামর্থ থাকা সত্বেও পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা না করলে সে অবশ্যই কিয়ামত দিবসে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে।

একটি মাসাআলাঃ জনৈক ব্যক্তির কয়েকটি পুত্র সন্তান আছে। সে যদি উপযুক্ত বড় ছেলের বিবাহ নিজের খরচে প্রদান করে, তবে মৃত্যুর পূর্বে ছোট ছেলেদের জন্য কি নিজ সম্পত্তি থেকে বড় ছেলের মোহরের অনুরূপ প্রদান করার ওছিয়ত করে যেতে পারে ?

উত্তরঃ না এরূপ করা জায়েয হবে না। তবে পিতার জীবদ্দশাতেই যদি ছোট ছেলেরা বিবাহের উপযুক্ত হয় এবং বড় ছেলের ন্যায় তাদের নিজ খরচে বিবাহ দিয়ে দেয় তবে তা

জায়েয। কিন্তু তারা এখনও ছোট তাই মৃত্যুর পর তাদের জন্য আলাদা অছিয়ত করে যাবে তা হারাম। এর দলীল হচ্ছেঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক অধিকারীকে তার নির্দিষ্ট অধিকার প্রদান করেছেন। অতএব উত্তরাধিকারের জন্য কোন অছিয়ত নেই।"[1]

প্রশ্নঃ (৩৮৫) মুজাহিদদেরকে যাকাত প্রদান করা কি জায়েয ?

উত্তরঃ যাকাত প্রদানের খাত সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব আল্লাহর পথের মুজাহিদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয। কিন্তু আল্লাহর পথে মুজাহিদ কে ? জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লড়াইকারী সর্ম্পকে প্রশ্ন করলেন, একজন বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য লড়াই করে, একজন গোত্রীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য লড়াই করে, একজন নিজের শক্তি প্রর্দশনের জন্য যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে কে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পথে ? এর জবাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইনসাফপূর্ণ মূল্যবান একটি মাপকাঠি প্রদান করেছেন, তিনি বলেন, (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)"যে ব্যক্তি লড়াই করবে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে সেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী।"[2] অতএব প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করবে- লড়াই করবে আল্লাহর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, কাফের রাষ্ট্রে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য সে-ই আল্লাহর পথে, সেই মুজাহিদ। তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। তাকে নগদ অর্থ প্রদান করবে, যাতে জিহাদের পথে উহা ব্যয় করতে পারে অথবা যাকাতের অর্থ দ্বারা যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয় করে দিবে।

প্রশ্নঃ (৩৮৬) মসজিদ নির্মাণের কাজে যাকাত প্রদান করার বিধান কি ?

উত্তরঃ মসজিদ নির্মাণের কাজ কুরআনের বাণী 'ফি সাবিলিল্লার' অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা তাফসীরবিদগণ 'ফি সাবিলিল্লার' তাফসীরে উল্লেখ করেছেনঃ এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। মসজিদ নির্মাণসহ অন্যান্য জনকল্যাণ মূলক কাজে যাকাত ব্যয় করা প্রকৃত কল্যাণের পথকে বিনষ্ট করারই নামান্তর। কেননা কৃপণতা ও লোভ অনেক লোকের মধ্যে স্বভাবজাত প্রকৃতি। যখন তারা দেখবে মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য সব ধরণের কল্যাণ মূলক ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া হচ্ছে, তখন তারা সমস্ত যাকাত সে সকল

[1]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদঃ উত্তরাধিকারকে ওছীয়ত করার বর্ণনা। তিরমিযী, ওছীয়ত করার বর্ণনা,

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে।

কাজেই ব্যবহার করা শুরু করবে। ফলে দুঃস্থ অভাবী মানুষ তাদের অভাব অনটনের মধ্যেই রয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৮৭) নিকটাত্মীয়দের যাকাত প্রদান করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছেঃ নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করা যদি যাকাত প্রদানকারীর উপর ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে থাকে, তবে তাকে (উক্ত নিকটাত্মীয়কে) যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কিন্তু সে যদি এমন ব্যক্তি হয় যার খরচ বহন করা যাকাত প্রদানকারীর উপর আবশ্যক নয়, তবে তাকে যাকাত প্রদান করা জায়েয। যেমন সহদোর ভাই। যদি ভাইয়ের পুত্র সন্তান থাকে, তবে তার ব্যয়ভার বহন করা অন্য ভাইয়ের উপর আবশ্যক নয়। কেননা তার পুত্র সন্তান থাকার কারণে দু'ভাই পরষ্পর মীরাছ (উত্তরাধিকার) পাবে না। এ অবস্থায় উক্ত ভাই যদি যাকাতের হকদার হয় তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়ের কোন ব্যক্তি ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে যদি অভাবী না হয়, কিন্তু সে ঋণগ্রস্থ, তবে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। যদিও উক্ত নিকটাত্মীয় নিজের পিতা মাতা ছেলে বা মেয়ে হোক। যখন এই ঋণ ভরণ-পোষণে ক্রুটির কারণে নয়।

উদাহরণঃ জনৈক ব্যক্তির পুত্র গাড়ি দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার কারণে বড় একটি জরিমানার সম্মুখিন হয়েছে। অথচ তার নিকট জরিমানা আদায় করার মত কোন অর্থ নেই। এ অবস্থায় তার পিতা নিজের যাকাতের অর্থ পুত্রের ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রদান করলে তা বৈধ হবে। কেননা এই ঋণ ভরণ-পোষণের কারণে নয়। এমনি ভাবে কোন মানুষ যাকাতের কারণ ছাড়া অন্য কারণে যদি কোন আত্মীয়কে যাকাত থেকে প্রদান করে, তবে তা জায়েয।

প্রশ্নঃ (৩৮৮) যাকাত-সাদকা আদায় করা কি শুধু রামাযান মাসের জন্যই বিশিষ্ট ?

উত্তরঃ দান-সাদকা রামাযান মাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং উহা সর্বাবস্থায় প্রদান করা মুস্তাহাব। আর নেসাব পরিমাণ সম্পদে বছর পূর্ণ হলেই যাকাত দেয়া ওয়াজিব। রামাযানের অপেক্ষা করবে না; হ্যাঁ রামাযান যদি নিকটবর্তী হয় যেমন শাবান মাসে বছর পূর্ণ হচ্ছে- তবে রামাযান পর্যন্ত বিলম্ব করে যাকাত বের করলে কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু যাকাত যদি উদাহরণ স্বরূপ মুহাররমে আবশ্যক হয়, তবে রামাযান পর্যন্ত অপেক্ষা করা জায়েয হবে না। অবশ্য যদি পূর্ববর্তী রামাযানে অগ্রীম যাকাত বের করে তবে তা জায়েয। কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার পর বিলম্ব করা জায়েয নয়। কেননা নির্দিষ্ট কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়াজিব সমূহ উক্ত কারণ পাওয়া গেলেই আদায় করতে হবে। বিলম্ব করা জায়েয হবে না। তাছাড়া মানুষের জীবনের এমন তো কোন গ্যারান্টি নেই যে বিলম্বিত সময় পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে। যদি যাকাত প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তার যিম্মায় যাকাত রয়েই গেল। হতে পারে উত্তরাধিকারীগণ বিষয়টি না জানার কারণে

তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবে না অথবা হতে পারে সম্পদের লোভে ও মোহে পড়ে তারা তা করবে না।

কিন্তু দান-সাদকার জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই। বছরের প্রতিদিনই তার সময়। কিন্তু লোকেরা রামাযান মাসে দান সাদকা ও যাকাত প্রদান পছন্দ করে। কেননা সময়টি ফযীলত পূর্ণ। দান ও বদান্যতার সময়। নবী (ﷺ) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। রামাযান মাসে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাঁকে কুরআন পড়াতেন।

জানা আবশ্যক যে রামাযান মাসে যাকাত প্রদান বা দান সাদকার ফযীলত নির্দিষ্ট সময়ের (শুধু এক মাস) ফযীলতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর চাইতে ফযীলতপূর্ণ অন্য কোন সময় বা অবস্থা যদি পাওয়া যায়, তবে সে সময়ই দান করা বা যাকাত প্রদান করা উত্তম। যেমন রামাযান ছাড়া অন্য সময় যদি ফকীর মিসকীনদের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে বা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, তবে সে সময় দান করার ছাওয়াব রামাযান মাসে দান করার চাইতে নিঃসন্দেহে বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফকীর মিসকীনদের অবস্থা রামাযান ছাড়া অন্যান্য মাসে বেশী শোচনীয় থাকে। রামাযান মাসে দান সাদকা বা যাকাতের ব্যাপকতার কারণে তারা সে সময় অনেকটা অভাবমুক্ত হয়। কিন্তু বছরের অবশিষ্ট সময়ে তারা প্রচন্ড অভাব ও অনটনের মাঝে দিন কাটায়। সুতরাং বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

সাদকায়ে জারিয়া কাকে বলে?

প্রশ্নঃ (৩৮৯) মানুষ তার জীবদ্দশায় যা দান করে তাকেই কি সাদকায়ে জারিয়া বলে ? নাকি মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের দানকে সাদকায়ে জারিয়া বলে ?

উত্তরঃ হাদীছে এরশাদ হয়েছে মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়।

১) সাদকায়ে জারিয়া

২) ইসলামী জ্ঞান, উপকারী বিদ্যা লিপিবদ্ধ করে যাওয়া

৩) সৎ সন্তানদের দু'আ।[1]

এ হাদীছের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, জীবিত অবস্থায় ব্যক্তির দানকেই সাদকা জারিয়া বলা হয়। মৃত্যুর পর তার সন্তানদের দানকে নয়। কেননা মৃত্যুর পর সন্তানদের থেকে যা হবে তা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।'

অতএব কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে কিছু দান করার অসীয়ত করে যায় অথবা ওয়াক্‌ফ্‌ করে যায়, তবে তা সাদকা জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে। মৃত্যুর পর কবরে সে তা

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ অসীয়ত, অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর পর মানুষ যার ছওয়াব পেয়ে থাকে তার বর্ননা।

থেকে উপকৃত হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী জ্ঞান, তার উপার্জন থেকে হতে হবে। এমনি ভাবে সন্তান, যদি পিতার জন্য দু'আ করে। এ জন্য কেউ যদি প্রশ্ন করে আমি কি পিতার জন্য দু'রাকাত নামায পড়ব ? নাকি নিজের জন্য দু'রাকাত নামায আদায় করে এর মধ্যে পিতার জন্য দু'আ করব ? আমি বলব: উত্তম হচ্ছে নিজের জন্য দু'রাকাত নামায আদায় করবেন এবং এর মধ্যে পিতার জন্য দু'আ করবেন। কেননা এ দিকেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, অথবা 'সৎ সন্তান' যে তার জন্য দু'আ করবে, এরূপ বলেন নি যে তার জন্য নামায আদায় করবে বা অন্য কোন নেক আমল করবে।

স্বামীর সম্পদ থেকে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান করা জায়েয নয়

প্রশ্নঃ ৩৯০) স্ত্রী যদি স্বামীর সম্পদ থেকে নিজের জন্য দান করে বা তা মৃত নিকটাত্মীয়ের জন্য দান করে, তবে তা জায়েয হবে কি ?

উত্তরঃ একথা নিশ্চিত জানা যে, স্বামীর সম্পদ স্বামীরই। অনুমতি ছাড়া কারো সম্পদ দান করা কারো জন্য বৈধ নয়। স্বামী যদি অনুমতি প্রদান করে তবে স্ত্রীর নিজের জন্য বা তার মৃত আত্মীয়ের জন্য দান করা জায়েয, কোন অসুবিধা নেই। অনুমতি না পেলে এরূপ করা হালাল নয়। কেননা এটা তার সম্পদ। আত্মার সন্তুষ্টি ছাড়া কারো জন্য কারো সম্পদ খরচ করা বৈধ নয়।

বন্টনের জন্য যাকাত নিয়ে এসে নিজের কাছেই রেখে দেয়া ঃ

প্রশ্নঃ (৩৯১) জনৈক ফক্বীর এক ধনী লোকের যাকাত নিয়ে আসে এই কথা বলে যে, তার পক্ষ থকে সে তা বিতরণ করে দিবে। তারপর তা সে নিজের কাছেই রেখে দেয়। তার এ কাজের বিধান কি ?

উত্তরঃ এটা হারাম। ইহা আমানতের খিয়ানত। কেননা মালিক তো দায়িত্বশীল হিসেবে তাকে যাকাত দিয়েছে। যাতে করে উহা বন্টন করে দেয়। অথচ সে নিজেই তা রেখে দেয়। বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন, কোন বস্তুর জিম্মাদারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত বস্তু থেকে নিজের জন্য কোন কিছু নিতে পারবে না। অতএব এই ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে যাকাতের মালিককে একথা বলে দেয়া যে, ইতিপূর্বে যা সে নিয়েছিল তা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। মালিক যদি তাতে অনুমতি দিয়ে দেয় তো ভাল, অন্যথা যা সে নিয়েছে তার জিম্মাদার হবে এবং তাকে তা আদায় করতে হবে।

এ উপলক্ষে একটি বিষয়ে আমি মানুষকে সতর্ক করতে চাই। তা হচ্ছে, ফক্বীর থাকাবস্থায় যাকাত নিয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তাকে সম্পদশালী করেন। কিন্তু তখনও মানুষ তাকে যাকাত দিতে থাকে আর সেও নিতে থাকে। বলে, আমি তো চাইনি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার কাছে এ রিযিক এসেছে..। কিন্তু এটা হারাম। কেননা আল্লাহ্ যাকে অভাবমুক্ত করেন, যাকাত গ্রহণ করা তার জন্য হারাম।

আবার কেউ কেউ যাকাত নিয়ে নিজে খায় না, অন্য মানুষকে দেয়। কিন্তু যাকাতের মালিক বিষয়টি জানেনা বা তাকে এ ব্যাপারে দায়িত্বও দেয়া হয়নি। এরূপ করাও তার জন্য হরাম। যদিও এলোকের বিষয়টি আগের জনের চাইতে কিছুটা হালকা। কিন্তু তারপরও নাজায়েয। সে যাকাতের মালিককে বিষয়টি অবহিত করে অনুমতি নিয়ে নিবে। অনুমতি না দিলে তার ঘাড়ে যিম্মাদারী রয়ে যাবে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

فتاوى الصيـــام

অধ্যায়ঃ রোযা

প্রশ্নঃ (৩৯২) রোযা ফরয হওয়ার হিকমত কি ?

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করলেই আমরা জানতে পারি যে, রোযা ফরয হওয়ার হিকমত কি ? আর তা হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি অর্জন করা ও আল্লাহ্র ইবাদত করা। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৩) তাক্বওয়া হচ্ছে হারাম কাজ পরিত্যাগ করা। ব্যাপক অর্থে তাক্বওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয় বাস্তবায়ন করা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)

"যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যার কারবার ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার খানা-পিনা পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।"[1]

অতএব এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, রোযাদার যাবতীয় ওয়াজিব বিষয় বাস্তবায়ন করবে এবং সবধরণের হারাম থেকে দূরে থাকবে। মানুষের গীবত করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুগলখোরী করবে না, হারাম বেচা-কেনা করবে না, ধোঁকাবাজী করবে না। মোটকথা চরিত্র ধ্বংসকারী অন্যায় ও অশ্লীলতা বলতে যা বুঝায় সকল প্রকার হারাম থেকে বিরত থাকবে। আর একমাস এভাবে চলতে পারলে বছরের অবশিষ্ট সময় সঠিক পথে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

কিন্তু আফসোসের বিষয় অধিকাংশ রোযাদার রামাযানের সাথে অন্য মাসের কোন পার্থক্য করে না। অভ্যাস অনুযায়ী ফরয কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করে, হালাল-হারামে কোন পার্থক্য নেই। তাকে দেখলে বুঝা যাবে না তার মধ্যে ছিয়ামের মর্যাদার কোন মূল্য আছে। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় ছিয়ামকে ভঙ্গ করে দিবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার ছওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

সারাবিশ্বে একসাথে রামাযানের রোযা শুরু করা

প্রশ্নঃ (৩৯৩) মুসলিম জাতির একতার লক্ষ্যে কেউ কেউ চাঁদ দেখার বিষয়টিকে মক্কার

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযা রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তার কারবার পরিত্যাগ করে না। হাদীছটির বাক্য ইবনু মাজাহ্ থেকে নেয়া হয়েছে।

সাথে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। তারা বলে মক্কায় যখন রামাযান মাস শুরু হবে তখন বিশ্বের সবাই রোযা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

উত্তরঃ বিষয়টি মহাকাশ গবেষণার দিক থেকে অসম্ভব। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, চন্দ্র উদয়ের স্থান বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ ঐক্যমত্য। আর এই বিভিন্নতার দাবী হচ্ছে প্রত্যেক এলাকায় ভিন্ন রকম বিধান হবে। একথার স্বপক্ষে দলীল কুরআন হাদীছ ও সাধারণ যুক্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) "অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন রোযা পালন করে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫) যদি পৃথিবীর শেষ সীমান্তের লোকেরা এ মাসে উপস্থিত না হয় অর্থাৎ চাঁদ না দেখে আর মক্কার লোকেরা চাঁদ দেখে, তবে কিভাবে এই আয়াত তাদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে যারা চাঁদই দেখেনি। আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (صُومُوا لِرُؤْيَته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَته) "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ কর।"[1] মক্কার অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে তবে পাকিস্তান এবং তার পূর্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের কিভাবে আমরা বাধ্য করতে পারি যে তারাও ছিয়াম পালন করবে ? অথচ আমরা জানি যে, তাদের আকাশে চাঁদ দেখা যায়নি। আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিয়ামের বিষয়টি চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন।

যুক্তিগত দলীল হচ্ছে, বিশুদ্ধ ক্বিয়াস যার বিরোধীতা করার অবকাশ নেই। আমরা ভাল ভাবে অবগত যে, পশ্চিম এলাকার অধিবাসীদের আগেই পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের নিকট ফজর উদিত হয়। এখন পূর্ব এলাকায় ফজর উদিত হলে কি আমরা পশ্চিম এলাকার লোকদের বাধ্য করব একই সাথে খানা-পিনা থেকে বিরত হতে ? অথচ তাদের ওখানে এখনও রাতের অনেক অংশ বাকী আছে ? উত্তরঃ কখনই না। সূর্য যখন পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের আকাশে অস্তমিত হয়, তখন পশ্চিম এলাকার দিগন্তে তো সূর্য দেখাই যাচ্ছে তাদেরকে কি আমরা ইফতার করতে বাধ্য করব ? উত্তরঃ অবশ্যই না। অতএব চন্দ্রও সম্পূর্ণরূপে সূর্যের মতই। চন্দ্রের হিসাব মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সূর্যের হিসাব দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা অনুচ্ছেদঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী যখন তোমরা চাঁদ দেখবে...। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা অনুচ্ছেদঃ চাঁদ দেখে রামাযানের রোযা রাখা ওয়াজিব।

حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

"রোযার রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে; তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ। তোমরা যে নিজেদের খিয়ানত করছিলে, আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন। এ জন্যে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের (ভার) লাঘব করে দিলেন; অতএব এক্ষণে তোমরা (রোযার রাত্রেও) তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর। এবং প্রত্যুষে (রাতের) কালো রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ করার সময় (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করবে না; এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না। এভাবে আল্লাহ্ মানব মন্ডলীর জন্যে তাঁর নিদর্শন সমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযত হয়।" (সূরা বাক্বারা- ১৮৭)

সেই আল্লাহ্ই বলেন, ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ "অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন রোযা পালন করে।" অতএব যুক্তি ও দলীলের নিরীখে রোযা ও ইফতারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থানের জন্য আলাদা বিধান হবে। যার সম্পর্ক হবে বাহ্যিক আলামত বা চিহ্ন দ্বারা যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এবং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সুন্নাতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে চাঁদ প্রত্যক্ষ করা এবং সূর্য বা ফজর প্রত্যক্ষ করা।

মানুষ যে এলাকায় থাকবে সে এলাকায় চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে রোযা ভঙ্গ করবে

প্রশ্নঃ (৩৯৪) রোযাদার যদি এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হয়, কিন্তু আগের দেশে ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেকি এখন রোযা ভঙ্গ করবে? উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় দেশে ঈদের চাঁদ এখনও দেখা যায়নি।

উত্তরঃ কোন মানুষ যদি এক ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অপর ইসলামী রাষ্ট্রে গমণ করে আর উক্ত রাষ্ট্রে রোযা ভঙ্গের সময় না হয়ে থাকে, তবে সে তাদের সাথে ছিয়াম চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না তারা রোযা ভঙ্গ করে। কেননা মানুষ যখন রোযা রাখে তখন রোযা রাখতে হবে, মানুষ যখন রোযা ভঙ্গ করে তখন রোযা ভঙ্গ করতে হবে। মানুষ যেদিন কুরবানীর ঈদ করে সেদিন তোমরা কুরবানীর ঈদ করবে। যদিও তার একদিন বা দু'দিন বেশী হয়ে যায় তার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন কোন লোক রোযা রেখে পশ্চিম দিকের কোন দেশে ভ্রমণে শুরু করল। সেখানে সূর্য অস্ত যেতে দেরী হচ্ছে। তখন সে সূর্যাস্ত

পর্যন্ত অবশ্যই দেরী করবে। যদিও সময় সাধারণ দিনের চেয়ে দু'ঘন্টা বা তিন ঘন্টা বা তার চাইতে বেশী হয়।

দ্বিতীয় শহরে সে যখন পৌঁছেছে তখন সেখানে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি। অতএব সে অপেক্ষা করবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে চাঁদ না দেখে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, (صُومُوا لِرُؤْيَتِــهِ وَأَفْطِــرُوا لِرُؤْيَتِــهِ) "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ কর।"[1]

এর বিপরীত কেউ যদি এমন দেশে সফর করে যেখানে নিজের দেশের পূর্বে চাঁদ দেখা গেছে (যেমন কেউ বাংলাদেশ থেকে সঊদী আরব সফর করে) তবে সে ঐ দেশের হিসাব অনুযায়ী রোযা ভঙ্গ করবে এবং ঈদের নামায পড়ে নিবে। আর যে কটা ছিয়াম বাকী থাকবে তা রামাযান শেষে কাযা আদায় করে নিবে। চাই একদিন হোক বা দু'দিন। কেননা আরবী মাস ২৯ দিনের কম হবে না বা ৩০দি নের বেশী হবে না। ২৯ দিন পূর্ণ না হলেও রোযা ভঙ্গ করবে এজন্য যে, চাঁদ দেখা গেছে। আর চাঁদ দেখা গেলে তো রোযা ভঙ্গ করা আবশ্যক। কিন্তু যেহেতু একটি রোযা কম হল তাই রামাযান শেষে তা কাযা করতে হবে। কেননা মাস ২৮ দিনে হয় না।

কিন্তু পূর্বের মাসআলাটি এর বিপরীত। নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা নতুন চাঁদ না উঠা পর্যন্ত রামাযান মাস বহাল। যদিও দু'একদিন বেশী হয়ে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। সেটা এক দিনে কয়েক ঘন্টা বৃদ্ধি হওয়ার মত। (অতিরিক্ত রোযা নফল হিসেবে গণ্য হবে।)

কষ্টকর কঠিন কাজ করার কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়

প্রশ্নঃ (৩৯৫) যে ব্যক্তি কষ্টকর কঠিন কাজ করার কারণে রোযা রাখতে অসুবিধা অনুভব করে তার কি রোযা ভঙ্গ করা জায়েয ?

উত্তরঃ আমি যেটা মনে করি, কাজ করার কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়, হারাম। রোযা রেখে কাজ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে রামাযান মাসে ছুটি নিবে, অথবা কাজ কমিয়ে দিবে, যাতে করে রামাযানের রোযা পালন করা সম্ভব হয়। কেননা রামাযানের রোযাইসলামের অন্যতম একটি রুকন। যার মধ্যে শিথীলতা করা জায়েয নয়।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা অনুচ্ছেদঃ নবী [ﷺ] এর বাণী যখন তোমরা চাঁদ দেখবে...। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা অনুচ্ছেদঃ চাঁদ দেখে রামাযানের রোখা ওয়াজিব।

ঋতুর দিনগুলোতে ছেড়ে দেয়া রোযা কাযা আদায় করা আবশ্যক

প্রশ্নঃ (৩৯৬) জনৈক বালিকা ছোট বয়সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। সে অজ্ঞতা বশতঃ ঋতুর দিনগুলোতে রোযা পালন করেছে। এখন তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, ঋতু অবস্থায় যে কয়দিনের রোযা আদায় করেছে সেগুলোর কাযা আদায় করা। কেননা ঋতু অবস্থায় রোযা পালন করলে বিশুদ্ধ ও গ্রহণীয় হবে না। যদিও তা অজ্ঞতা বশতঃ হয়ে থাকে। তাছাড়া পরবর্তীতে যে কোন সময় তা কাযা করা সম্ভব। কাযা আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

এর বিপরীত আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, অল্প বয়সে জনৈক বালিকা ঋতুবতী হয়ে গেছে। কিন্তু লজ্জার কারণে বিষয়টি কারো সামনে প্রকাশ করেনি এবং তার ছিয়ামও পালন করেনি। এর উপর ওয়াজিব হচ্ছে, উক্ত মাসের ছিয়াম কাযা আদায় করা। কেননা নারী ঋতুবতী হয়ে গেলেই প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা তার উপর ফরয হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ (৩৯৭) জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করার বিধান কি?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগ করে এই যুক্তিতে যে, সে নিজের এবং পরিবারের জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত। সে যদি এই তা'বীল বা অপব্যাখ্যা করে যে, অসুস্থ ব্যক্তি যেমন রোযা ভঙ্গ না করলে বেঁচে থাকতে অক্ষম তেমনি আমিও তো দরিদ্র অভাবী, জীবিকা উপার্জন করতে হলে আমাকে রোযা ভঙ্গ করতে হবে, তবে এই যুক্তি খোঁড়া এবং নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি মূর্খ। অতএব অজ্ঞতা ও অপব্যাখ্যার কারণে সে উক্ত সময়ের কাযা আদায় করবে যদি সে জীবিত থাকে। জীবিত না থাকলে তার পরিবার তার পক্ষ থেকে রেযা কাযা আদায় করে দিবে। কেউ কাযা আদায় না করলে তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে।

কিন্তু যদি কোন ধরণের ব্যাখ্যা না করে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পরিত্যাগ করে থাকে, তবে বিদ্বানদের মতামত সমূহের মধ্যে থেকে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত সমূহ বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে সময় অতিবাহিত করে আদায় করলে তা কবূল হবে না। তাই এ লোকের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা, নেক আমল ও নফল ইবাদত সমূহ বেশী বেশী সম্পাদন করা ও ইস্তেগফার করা। এর দলীল হচ্ছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই। তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"[1] সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ইবাদত সমূহ যেমন সময়ের পূর্বে আদায় করলে কবূল হবে না। অনুরূপভাবে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু যদি অজ্ঞতা বা ভুলের কোন ওযর থাকে, তবে ভুল সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার ফয়সালা অনুচ্ছেদঃ বাতিল ফয়সালা ভঙ্গ করা এবং নতুন বিষয় প্রত্যাখ্যান।

(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أو نام عنها فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)

"যে ব্যক্তি নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে বা ভুলে যায়, তবে স্মরণ হলেই সে তা আদায় করবে। এটাই তার কাফ্‌ফারা।"[1]

প্রশ্নঃ (৩৯৮) রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ কি কি ?

উত্তরঃ রোযা ভঙ্গের কারণ সমূহ হচ্ছেঃ

১) অসুস্থতা, ২) সফর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে (সে রোযা ভঙ্গ করে) অন্য দিনে তা কাযা আদায় করে নিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫)

৩) গর্ভবতী নারীর নিজের বা শিশুর জীবনের আশংকা করলে রোযা ভঙ্গ করবে।

৪) সন্তানকে দুগ্ধদানকারীনী নারী যদি রোযা রাখলে নিজের বা সন্তানের জীবনের আশংকা করে তবে রোযা ভঙ্গ করবে।

৫) কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে রোযা ভঙ্গ করা: যেমন পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার, আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে দরকার হলে রোযা ভঙ্গ করা।

৬) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে থাকার সময় শরীরে শক্তি বজায় রাখার জন্য রোযা ভঙ্গ করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, (إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا) "আগামীকাল তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করবে, রোযা ভঙ্গ করলে তোমরা অধিক শক্তিশালী থাকবে, তাই তোমরা রোযা ভঙ্গ কর।" [2]

বৈধ কোন কারণে রোযা ভঙ্গ করলে দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। কেননা সে তো গ্রহণযোগ্য ওযরের কারণেই রোযা ভঙ্গ করেছে। এজন্য এ মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ কোন রুগী যদি অসুস্থতার কারণে দিনে রোযা ভঙ্গ করে আর দিন শেষ হওয়ার আগেই সুস্থ হয়ে যায়, তবে দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থায় থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। কোন মুসাফির যদি রোযা ভঙ্গ অবস্থায় দিন থাকতেই সফর থেকে ফিরে আসে তারও দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থায় থাকার আবশ্যকতা নেই। অনুরূপ বিধান ঋতুবতী নারীরও। কেননা এরা সবাই বৈধ কারণে রোযা ভঙ্গ করেছে। তাই ঐ দিবস তাদের জন্যই। তাতে তাদের প্রতি ছিয়ামের আবশ্যকতা নেই।

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ ছুটে যাওয়া নামায কাযা আদায় করা।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ সফরে কাজের দায়িত্বে থাকলে রোযা ভঙ্গ করার প্রতিদান।

কেননা শরীয়ত তাদেরকে রোযা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করে আবার তা আবশ্যক করবে না।

এর বিপরীত মাসআলা হচ্ছে, রামাযান মাসের চাঁদ দেখা গেছে একথা যদি দিনের বেলায় প্রমাণিত হয়, তবে খবর পাওয়ার সাথে সাথে রোযার নিয়ত করে নিতে হবে এবং দিনের বাকী সময় রোযা অবস্থায় কাটাতে হবে। উভয় মাসআলায় পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা যখন দিনের বেলায় রামাযান মাস শুরু হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে, তখন তাদের উপর সে দিনের ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। কিন্তু না জানার কারণে তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং তাদের ছিয়াম বিশুদ্ধ। এই কারণে তারা যদি জানতে পারত যে আজ রামাযান শুরু হয়েছে, তবে রোযা রাখা তাদের জন্য আবশ্যক হত।

ফজর হওয়ার পর যদি জানতে পারে যে রামাযান মাস শুরু হয়েছে, তখন কি করবে ?

প্রশ্নঃ (৩৯৯) রামাযান মাস শুরু হয়েছে কিনা এ সংবাদ না পেয়েই জনৈক ব্যক্তি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে সে ছিয়ামের নিয়ত করেনি ফজর হয়ে গেছে। ফজরের সময় সে জানতে পারল আজ রামাযানের প্রথম দিন। এ অবস্থায় তার করণীয় কি ? উক্ত দিনের ছিয়াম কি কাযা আদায় করতে হবে ?

উত্তরঃ যখন সে জানতে পারবে তখনই রোযার নিয়ত করে ফেলবে এবং ছিয়াম পালন করবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এ দিনটির রোযা পরে সে কাযা আদায় করবে। তবে ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এতে বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, জানার সাথে নিয়তের সম্পর্ক। এ লোক তো জানতেই পারেনি। অতএব তার ওযর গ্রহণযোগ্য। সে জানতে পারলে রাতে কখনই) রোযার নিয়ত করা ছাড়তো না। কিন্তু সে তো ছিল অজ্ঞ। আর অজ্ঞ ব্যক্তির ওযর গ্রহণযোগ্য। অতএব জানার পর যদি রোযার নিয়ত করে ফেলে তবে রোযা বিশুদ্ধ। তাকে কাযা আদায় করতে হবে না।

অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, তাকে উক্ত দিনের রোযা রাখা আবশ্যক এবং তার কাযা আদায় করাও আবশ্যক। এর কারণ হিসেবে বলেন, এ লোকের দিনের একটি অংশ নিয়ত ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে। তাই তাকে কাযা আদায় করতে হবে। আমি মনে করি, সতর্কতা বশতঃ উক্ত দিনের রোযা কাযা করে নেয়াই উচিত।

রোযা ভঙ্গের ওযর শেষ হয়ে গেলে কি দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থায় কাটাবে ?

প্রশ্নঃ (৪০০) কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তি যদি রোযা ভঙ্গ করে আর দিন শেষ হওয়ার আগেই উক্ত ওযর দূর হয়ে যায়। সে কি দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থায় কাটাবে?

উত্তরঃ না, দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। তবে রামাযান শেষে উক্ত দিবসের কাযা তাকে আদায় করতে হবে। কেননা শরীয়ত অনুমদিত কারণেই সে রোযা ভঙ্গ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ অসুস্থ ব্যক্তির অপারগতার কারণে শরীয়ত তাকে ঔষুধ সেবনের

অনুমতি দিয়েছে। ঔষুধ সেবন করা মানেই রোযা ভঙ্গ। অতএব পূর্ণ এই দিনটির রোযা তার উপর আবশ্যক নয়। দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থায় থাকার অবশ্যকতায় শরীয়ত সম্মত কোন ফায়েদা নেই। যেখানে কোন উপকার নেই তা আবশ্যক করাও চলে না।

উদাহরণ স্বরূপঃ জনৈক ব্যক্তি দেখল একজন লোক পানিতে ডুবে যাচ্ছে। সে বলছে আমি যদি পানি পান করি তবে এই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারব। পানি পান না করলে তাকে বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় সে পানি পান করবে এবং তাকে পানিতে ডুবা থেকে উদ্ধার করবে। অতঃপর দিনের অবশিষ্ট অংশ খানা-পিনা করবে। এ দিনের সম্মান তার জন্য আর নেই। কেননা শরীয়তের দাবী অনুযায়ীই রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য বৈধ হয়েছে। তাই দিনের বাকী অংশ রোযা রাখা আবশ্যক নয়।

যদি কোন লোক অসুস্থ থাকে তাকে কি আমরা বলব, ক্ষুধার্ত না হলে খানা খাবে না? পিপাসিত না হলে পানি পান করবে না? অর্থাৎ-প্রয়োজন না হলে খানা-পিনা করবে না? না,এরূপ বলব না। কেননা এ লোককে তো রোযা ভঙ্গের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব শরঈ দলীলের ভিত্তিতে রামাযানের রোযা ভঙ্গকারী প্রত্যেক ব্যক্তির দিনের অবশিষ্ট অংশ রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করা আবশ্যক নয়। এর বিপরীত মাসআলায় বিপরীত সমাধান। অর্থাৎ- বিনা ওযরে যদি রোযা ভঙ্গ করে তবে তাকে দিনের অবশিষ্ট অংশ রোযা অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য বৈধ ছিল না। শরীয়তের অনুমতি ছাড়াই সে এদিনের সম্মান নষ্ট করেছে। অতএব দিনের বাকী অংশ রোযা পালন করা যেমন আবশ্যক তেমনি কাযা আদায় করাও যরূরী।

কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রোযা ভঙ্গ করে মিসকীন খাওয়াবে

প্রশ্নঃ (৪০১) জনৈক মহিলা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ডাক্তারগণ তাকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছে। এর বিধান কি ?

উত্তরঃ আল্লাহ্ বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾

"রামাযান হচ্ছে সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য কঠিন কামনা করেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫)

মানুষ যদি এমন রোগে আক্রান্ত হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার কোন আশা নেই। তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। খাদ্য দেয়ার পদ্ধতি

হচ্ছে, মিসকীনকে পরিমাণমত চাউল প্রদান করা এবং সাথে মাংস ইত্যাদি তরকারী হিসেবে দেয়া উত্তম। অথবা দুপুরে বা রাতে তাকে একবার খেতে দিবে। এটা হচ্ছে ঐ রুগীর ক্ষেত্রে যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই। আর নারী এ ধরণের রোগে আক্রান্ত। তাই আবশ্যক হচ্ছে সে প্রতিদিনের জন্য একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে।

প্রশ্নঃ (৪০২) কখন এবং কিভাবে মুসাফির নামায ও রোযা আদায় করবে ?

উত্তরঃ মুসাফির নিজ শহর থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত দু'দু রাকাত নামায আদায় করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

(أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ)

"সর্বপ্রথম যে নামায ফরয করা হয়েছিল তা হচ্ছে দু'রাকাত। সফরের নামাযকে ঐভাবেই রাখা হয়েছে এবং গৃহে অবস্থানের সময় নামাযকে পূর্ণ (চার রাকাত) করা হয়েছে।" অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, "গৃহে অবস্থানের সময় নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে।"[1] আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তিনি মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত দু'দু রাকাত করে নামায আদায় করলেন।

কিন্তু মুসাফির যদি স্থানীয় ইমামের সাথে নামায আদায় করে তবে পূর্ণ চার রাকাতই পড়বে। চাই নামাযের প্রথম থেকে ইমামের সাথে থাকুক বা পরে এসে অংশ গ্রহণ করুক। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাধারণ বাণী একথার দলীল।

(إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

"যখন নামাযের ইকামত প্রদান করা হয় তখন হেঁটে হেঁটে ধীর-স্থীর এবং প্রশান্তির সাথে নামাযের দিকে আগমণ করবে। তাড়াহুড়া করবে না। অতঃপর নামাযের যতটুকু অংশ পাবে আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা পরে পূর্ণ করে নিবে।"[2]

এ হাদীছটি স্থানীয় ইমামের পিছনে নামায আদায়কারী মুসাফিরদেরও শামিল করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এটা কি কথা মুসাফির একাকী নামায পড়লে দু'রাকাত পড়বে আর স্থানীয় ইমামের পিছনে পড়লে চার রাকাত পড়বে? তিনি বললেন, এটা সুন্নাত।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায কছর করা, অনুচ্ছেদঃ নিজ এলাকা থেকে বের হলে নামায কছর করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায এবং কছর করা, অনুচ্ছেদঃ মুসাফিরের নামায এবং কছর করা।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ নামাযে দ্রুত যাবে না। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ ধীরস্থীরভাবে মসজিদে আগমণ করা।

মুসাফিরের জন্য জামাআতের নামায রহিত নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾

"আর যখন আপনি তাদের সাথে থাকেন আর তাদেরকে জামাআতের সাথে নামায পড়ান, তবে তা এইভাবে হবে যে, তাদের মধ্যে থেকে একদল আপনার সাথে নামাযে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখবে। অনন্তর যখন তারা সিজদা করবে (এক রাকাআত পূর্ণ করবে), তখন তারা আপনাদের পিছনে চলে যাবে এবং অন্য দল যারা এখনও নামায পড়েনি তারা আসবে এবং আপনার সাথে নামায পড়ে নিবে।" (সূরা নিসাঃ ১০২)

অতএব মুসাফির যদি নিজ শহর ছেড়ে অন্য শহরে অবস্থান করে, তবে আযান শুনলেই মসজিদে জামাআতের নামাযে উপস্থিত হবে। তবে যদি মসজিদ থেকে বেশী দূরে থাকে বা সফর সঙ্গীদের ক্ষতির আশংকা করে তবে মসজিদে না গেলেও চলবে। কেননা সাধারণ দলীল সমূহ একথাই প্রমাণ করে যে, আযান বা এক্বামত শুনলেই জামাআতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।

নফল বা সুন্নাত নামাযের ক্ষেত্রেঃ মুসাফির যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নাত ছাড়া সবধরণের নফল ও সুন্নাত আদায় করবে। রাতের নফল (তাহাজ্জুদ), বিতর, ফজরের সুন্নাত, চাশত, তাহিয়্যাতুল ওযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, সফর থেকে ফেরত এসে দু'রাকাত নামায আদায় করবে।

দু'নামায জমা' বা একত্রিত করার বিধান হচ্ছেঃ সফর যদি চলমান থাকে তবে উত্তম হচ্ছে দু'নামাযকে একত্রিত করা। যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশা একত্রিত আদায় করবে। প্রথম নামাযের সময়ই দু'নামায একত্রিত আদায় করবে অথবা দ্বিতীয় নামাযের সময় দু'নামাযকে একত্রিত করবে। যেভাবে তার জন্য সুবিধা হয় সেভাবে করবে। কিন্তু সফরে গিয়ে কোন জায়গায় যদি অবস্থান করে তবে উত্তম হচ্ছে দু'নামাযকে একত্রিত না করা। একত্রিত করলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা উভয়টিই রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে।

ছিয়ামের ক্ষেত্রে মুসাফিরের জন্য উত্তম হচ্ছে ছিয়াম পালন করা। ছিয়াম ভঙ্গ করলেও কোন অসুবিধা নেই। পরে উক্ত দিনগুলোর কাযা আদায় করে নিবে। তবে ছিয়াম ভঙ্গ করা যদি বেশী আরাম দায়ক হয় তাহলে ছিয়াম ভঙ্গ করাই উত্তম। কেননা আল্লাহ্ বান্দাকে যে ছুটি দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তিনি পসন্দ করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

প্রশ্নঃ (৪০৩) সফর অবস্থায় কষ্ট হলে রোযা রাখার বিধান কি ?

উত্তরঃ সফর অবস্থায় যদি এমন কষ্ট হয় যা সহ্য করা সম্ভব, তবে সে সময় রোযা রাখা মাকরূহ। কেননা একদা সফরে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন জনৈক ব্যক্তির পাশে লোকজন ভীড় করছে এবং তাকে ছাঁয়া করছে। তিনি বললেন, এর কি

হয়েছে ? তারা বলল, লোকটি রোযাদার। তখন তিনি বললেন, (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّــفَرِ) "সফর অবস্থায় রোযা পালন করা কোন পূণ্যের কাজ নয়।" [1]

কিন্তু সফরে রোযা রাখা যদি অধিক কষ্টদায়ক হয় তবে ওয়াজিব হচ্ছে রোযা ভঙ্গ করা। কেননা সফর অবস্থায় লোকেরা যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট অভিযোগ করল যে তাদের কষ্ট হচ্ছে তখন তিনি রোযা ভঙ্গ করলেন। অতঃপর বলা হল, কিছু লোক এখনও রোযা রেখেছে। তিনি বললেন, (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) "ওরা নাফরমান, ওরা নাফরমান।"[2] কিন্তু রোযা রাখতে যার কোন কষ্ট হবে না, তার জন্য উত্তম হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করে রোযা পালন করা। কেননা সফর অবস্থায় তিনি রোযা রাখতেন। আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَمَا فِينَا صَــائِمٌ إِلَّــا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةَ)

"একদা রামাযান মাসে কঠিন গরমের সময় আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ছাড়া আর কেউ রোযা রাখেন নি।"[3]

সফর আরাম দায়ক হলে রোযা ভঙ্গ না করাই উত্তম

প্রশ্নঃ (৪০৪) আধুনিক যুগের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ও আরাম দায়ক হওয়ার কারণে সফর অবস্থায় রোযা রাখা মুসাফিরের জন্য কষ্টকর নয়। এ অবস্থায় রোযা রাখার বিধান কি ?

উত্তরঃ মুসাফির রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ১৮৫) ছাহাবায়ে কেরাম নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে থাকলে কেউ রোযা রাখতেন কেউ রোযা ভঙ্গ করতেন। কোন রোযা ভঙ্গকারী অপর রোযাদারকে দোষারোপ করতেন না, রোযাদারও রোযা ভঙ্গকারীকে দোষারোপ করতেন না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সফর অবস্থায় রোযা রেখেছেন। আবু দারদা

---

[1] . বুখারী, অধ্যায় ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ কঠিন গরমে যাকে ছাঁয়া দেয়া হচ্ছিল তার সম্পর্কে নবী [ﷺ] এর বাণী: "সফর অবস্থায়] রোযা পালন করা কোন পূণ্যের কাজ নয়।" মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদ: পাপের সফর না হলে রামাযান মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদ: পাপের সফর না হলে রামাযান মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ নং ৩৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদ: সফরে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা ইচ্ছাধীন।

(রাঃ) বলেন, "একদা রামাযান মাসে কঠিন গরমের সময় আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ছাড়া আর কেউ রোযা রাখে নি।"[1]

মুসাফিরের জন্য মূলনীতি হচ্ছে, সে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। কিন্তু কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। কেননা এতে তিনটি উপকারীতা রয়েছেঃ

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ।

দ্বিতীয়তঃ রোযা রাখতে সহজতা। কেননা সমস্ত মানুষ যখন রোযা রাখে তখন সবার সাথে রোযা রাখা অনেক সহজ।

তৃতীয়তঃ দ্রুত নিজেকে যিম্মামুক্ত করা।

কিন্তু কষ্টকর হলে রোযা রাখবে না। এ অবস্থায় রোযা রাখা পূণ্যেরও কাজ নয়। কেননা এক সফরে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন জনৈক ব্যক্তির পাশে লোকজন ভীড় করছে এবং তাকে ছাঁয়া দিচ্ছে। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে ? তারা বলল, লোকটি রোযাদার। তখন তিনি বললেন, (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) "সফর অবস্থায়) রোযা পালন করা কোন পূণ্যের কাজ নয়।"[2]

এ ভিত্তিতে আমরা বলব, বর্তমান যুগে সাধারণতঃ সফরে তেমন কোন কষ্ট হয় না। তাই রোযা পালন করাই উত্তম।

মুসাফির মক্কায় পৌঁছে রোযা ছেড়ে দিয়ে প্রশান্তির সাথে ওমরা করতে পারে

প্রশ্নঃ (৪০৫) রোযা অবস্থায় মুসাফির যদি মক্কায় পৌঁছে। তবে ওমরা আদায় করতে শক্তি পাওয়ার জন্য রোযা ভঙ্গ করা কি জায়েয হবে ?

উত্তরঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় রামাযান মাসের বিশ তারিখে মক্কায় প্রবেশ করেন। সে সময় তিনি রোযা ভঙ্গ অবস্থায় ছিলেন। সেখানে দু'দু রাকআত করে নামায কসর আদায় করেছেন। আর মক্কাবাসীদের বলেছেন,"হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা নামায পূর্ণ করে নাও। কেননা আমরা মুসাফির।"[3] ছহীহ্ বুখারীতে একথাও প্রমাণিত হয়েছে, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো রোযা ভঙ্গ অবস্থাতেই অতিবাহিত করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন মুসাফির।

তাই ওমরাকারী মক্কা পৌঁছলেই তার সফর শেষ হয়ে যায় না। যদি রোযা ভঙ্গ

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ নং ৩৫। মুসলিম, অধ্যায় ঃ রোযা, অনুচ্ছেদ: সফরে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা ইচ্ছাধীন।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ কঠিন গরমে যাকে ছাঁয়া দেয়া হচ্ছিল তার সম্পর্কে নবী [ﷺ] এর বাণী: "সফর অবস্থায়]রোযা পালন করা কোন পূণ্যের কাজ নয়।" মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদ: পাপের সফর না হলে রামাযান মাসে মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ মাগাযী, অনুচ্ছেদ: রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ।

অবস্থায় মক্কা পৌঁছে থাকে, তবে দিনের বাকী অংশ পানাহার ত্যাগ করা আবশ্যক নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে যেহেতু সফর আরাম দায়ক তাই রোযা রাখাও তেমন কষ্টকর নয়। সেহেতু কেউ যদি রোযা রেখে মক্কায় পৌঁছে অত্যধিক ক্লান্তি অনুভব করে, তখন চিন্তা করে আমি কি রোযা পূর্ণ করে ইফতারের পর ওমরার কাজ শুরু করবো? নাকি রোযা ভঙ্গ করব এবং সর্বপ্রথম ওমরা আদায় করে নিব?

এ অবস্থায় আমরা তাকে বলব, আপনার জন্য উত্তম হচ্ছে, সুস্থাবস্থায় ওমরা পালন করার জন্য রোযা ভঙ্গ করা। কেননা হজ্জ-ওমরা আদায়কারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, উক্ত উদ্দেশ্যে মক্কা আগমণ করলে, সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই হজ্জ-ওমরার কাজে আত্মনিয়োগ করা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় মক্কা আগমণ করলে দ্রুত মসজিদে হারামে গমণ করতেন। এমনকি সোয়ারীকে মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে বসাতেন।

অতএব ওমরাকারীর জন্য উত্তম হচ্ছে, দিনের বেলায় কর্মশক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে রোযা ভঙ্গ করে ওমরা পালন করা। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করা।

ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের জন্য যখন সফরে ছিলেন এবং তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন, তখন কতিপয় লোক এসে অভিযোগ করল, রোযা রাখতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি কি করছেন এটা দেখার অপেক্ষায় আছে তারা। তখন সময়টি ছিল আছরের পর। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি চাইলেন এবং পান করলেন। লোকেরা সবাই দেখল।[1] অতএব নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর অবস্থায় দিনের শেষ প্রহরে রোযা ভঙ্গ করলেন। একাজ যে জায়েয একথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সফরে কষ্ট স্বীকার করে কিছু লোক যে ছিয়াম পালন করতেই থাকে নিঃসন্দেহে তা সুন্নাহ্ বিরোধী কাজ। তার ব্যাপারেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) "সফর অবস্থায় রোযা রাখা কোন পূণ্যের কাজ নয়।"[2]

প্রশ্নঃ (৪০৬) সন্তানকে দুগ্ধদানকারীনী কি রোযা ভঙ্গ করতে পারবে ? ভঙ্গ করলে কিভাবে কাযা আদায় করবে ? নাকি রোযার বিনিময়ে খাদ্য দান করবে ?

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায় ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ পাপের সফর না হলে রামাযান মাসে মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বৈধ।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ কঠিন গরমে যাকে ছাঁয়া দেয়া হচ্ছিল তার সম্পর্কে নবী [ﷺ] এর বাণীঃ "সফর অবস্থায়]রোযা পালন করা কোন পূণ্যের কাজ নয়।" মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ পাপের সফর না হলে রামাযান মাসে মুসাফিরের রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা উভয়টিই বাধা।

উত্তরঃ দুগ্ধদানকারীনী রোযা রাখার কারণে যদি সন্তানের জীবনের আশংকা করে অর্থাৎ রোযা রাখলে স্তনে দুধ কমে যাবে ফলে শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তবে মায়ের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। কিন্তু পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করে নিবে। কেননা এ অবস্থায় সে অসুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ। যার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫)

অতএব রোযা রাখার ব্যাপারে যখনই বাধা দূর হবে তখনই কাযা আদায় করবে। চাই তা শীতকালে অপেক্ষাকৃত ছোট দিনে হোক অথবা সম্ভব না হলে পরবর্তী বছর হোক। কিন্তু ফিদ্ইয়া স্বরূপ মিসকীন খাওয়ানো জায়েয হবে না। তবে ওযর যদি চলমান থাকে অর্থাৎ সার্বক্ষণিক রোযা রাখায় বাধা দেখা যায় যা বাধা দূর হওয়ার সম্ভবনা না থাকে, তখন প্রতিটি রোযার বদলে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াবে।

প্রশ্নঃ (৪০৭) ক্ষুধা-পিপাসা ও অতিরিক্ত ক্লান্তির সাথে রোযা পালন করলে রোযার বিশুদ্ধতায় কি কোন প্রভাব পড়বে ?

উত্তরঃ ক্ষুধা-পিপাসা ও অতিরিক্ত ক্লান্তির সাথে রোযা পালন করলে রোযার বিশুদ্ধতায় কোন প্রভাব পড়বে না। বরং এতে অতিরিক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাঃ) কে বলেছিলেন, "তোমার ক্লান্তি ও কষ্ট অনুযায়ী তুমি ছওয়াব পাবে।"[1] অতএব আল্লাহ্র আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের ক্লান্তি যত বেশী হবে ততই তার প্রতিদান বেশী হবে। তবে রোযার ক্লান্তি দূর করার জন্য মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালা বা ঠান্ডা শীতল স্থানে আরাম গ্রহণ করা যেতে পারে।

রামাযানের পূরা মাসের রোযার নিয়ত একবার করে নিলেই চলবে

প্রশ্নঃ (৪০৮) রামাযানের প্রত্য ক দিনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কি নিয়ত করা আবশ্যক ? নাকি পূর্ণ মাসের নিয়ত একবার করে নিলেই হবে ?

উত্তরঃ রামাযানের প্রথমে পূর্ণ মাসের জন্য একবার নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা রোযাদার যদি প্রতিদিনের জন্য রাতে নিয়ত না করে, তবে তা রামাযানের প্রথমের নিয়তের শামিল হয়ে তার রোযা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সফর, অসুস্থতা প্রভৃতি দ্বারা যদি মাসের মধ্যখানে বিচ্ছিন্নতা আসে, তবে নতুন করে আবার নিয়ত আবশ্যক। কেননা

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওমরাহ্, অনুচ্ছেদঃ ক্লান্তি অনুযায়ী ওমরার ছওয়াব। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ নেফাস বিশিষ্ট নারীদের ইহরাম করা।

মাসের প্রথমে সে যে রোযার নিয়ত করেছিল তা সফর বা অসুস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভঙ্গ করে ফেলেছে।

প্রশ্নঃ (৪০৯) রোযা ভঙ্গের জন্য অন্তরে দৃঢ় নিয়ত করলেই কি রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ একথা সর্বজন বিদিত যে, রোযা হচ্ছে নিয়ত এবং পরিত্যাগের সমষ্টির নাম। অর্থাৎ রোযা বিনষ্টকারী যাবতীয় বস্তু পরিত্যাগ করে রোযাদার রোযার দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের নিয়ত করবে। কিন্তু সত্যিই যদি এটাকে সে ভঙ্গ করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলে তবে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। আর এটা রামাযান মাসে হলে দিনের অবশিষ্ট অংশ তাকে পানাহার ছাড়াই কাটাতে হবে। কেননা বিনা ওযরে যে ব্যক্তি রামাযানে রোযা ভঙ্গ করবে তাকে যেমন দিনের বাকী অংশ রোযা অবস্থাতেই কাটাতে হবে, অনুরূপভাবে তার কাযাও আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি দৃঢ় সংকল্প না করে বরং দ্বিধা-দ্বন্দে থাকে, তবে তার ব্যাপারে বিদ্বানদের মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ বলেছেন, তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা দ্বিধা-দ্বন্দ দৃঢ়তার বিপরীত।

কেউ বলেছেন, বাতিল হবে না। কেননা আসল হচ্ছে, নিয়তের দৃঢ়তা অবশিষ্ট থাকা, যে পর্যন্ত তা আরেকটি দৃঢ়তা দ্বারা বিচ্ছিন্ন না করবে। আমার দৃষ্টিতে এমতই বিশুদ্ধ। (আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্নঃ (৪১০) রোযাদার ভুলক্রমে পানাহার করলে তার রোযার বিধান কি ? কেউ এটা দেখলে তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ রামাযানের রোযা রেখে কেউ যদি ভুলক্রমে পানাহার করে তবে তার রোযা বিশুদ্ধ। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বিরত থাকা ওয়াজিব। এমনকি খাদ্য বা পানীয় যদি মুখের মধ্যে থাকে এবং স্মরণ হয়, তবে তা সাথে সাথে ফেলে দেয়া ওয়াজিব। রোযা বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)

"যে ব্যক্তি রোযা রেখে ভুলক্রমে পানাহার করে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্‌ই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।"[1] তাছাড়া ভুলক্রমে নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে পানাহার করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

"হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬) আল্লাহ্ বলেন, আমি তাই করলাম।

কেউ যদি দেখতে পায় যে ভুলক্রমে কোন মানুষ পানাহার করছে, তবে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, তাকে বাঁধা দেয়া এবং রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। কেননা ইহা গর্হিত কাজে বাধা দেয়ার অন্তর্গত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان)

"যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ হতে দেখবে, সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে, যদি সম্ভব না হয় তবে যবান দ্বারা বাধা দিবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা তা ঘৃণা করবে।"[1] এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে রোযা রেখে পানাহার করা একটি গর্হিত কাজ। কিন্তু ভুল ক্রমে হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা দেখবে তার জন্য তাতে বাধা না দেয়ার কোন ওযর থাকতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৪১১) রোযা রেখে চোখে সুরমা ব্যবহার করার বিধান কি ?

উত্তরঃ রোযাদারের জন্য সুরমা ব্যবহার করায় কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে চোখে বা কানে ঔষুধ (ড্রপ) ব্যবহার করতেও কোন অসুবিধা নেই, যদিও এতে গলায় ড্রপের স্বাদ অনুভব করে। এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা ইহা খাদ্য বা পানীয় নয় বা খানা-পিনার বিকল্প হিসেবেও ব্যবহৃত নয়। একথার দলীল হচ্ছে, রোযার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা তা হচ্ছে পানাহার করা। সুতরাং যা খানা-পিনার অন্তর্ভূক্ত নয় তা এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে গণ্য হবে না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু যদি নাকে ড্রপ ব্যবহার করে এবং তা পেটে পৌঁছে, তবে রোযা ভঙ্গ হবে-যদি রোযা ভঙ্গের উদ্দেশ্য করে থাকে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) "রোযাঅবস্থায় না থাকলে ওযুর ক্ষেত্রে নাকে অতিরিক্ত পানি নিবে।"[2]

প্রশ্নঃ (৪১২) রোযা অবস্থায় মেসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করার বিধান কি ?

উত্তরঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে দিনের প্রথম ভাগে যেমন শেষ ভাগেও তেমনই মেসওয়াক করা সুন্নাত। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ومَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)

"মেসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা ও প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।"[3] তিনি আরো বলেন,

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ গর্হিত কাজে বাধা দেয়া ঈমানের অন্তর্ভূক্ত।

[2] . আবু দাঊদ, অধ্যায়: নাক ঝাড়া, ১৪২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: নাকে পানি নেয়ায় বাড়াবাড়ি করা। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা।

[3] . বুখারী মুআল্লাক সনদে, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদ: রোযাদারের কাঁচা ও শুকনা মেসওয়াক ব্যবহার করা।

(لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ)

"আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে আমি প্রত্যেক নামাযের সময় তাদেরকে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[1] অনুরূপভাবে আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করাও রোযাদারের জন্য জায়েয। চাই তা দিনের প্রথম ভাগে হোক বা শেষ ভাগে। চাই উক্ত সুগন্ধি ভাপ হোক বা তৈল জাতীয় বা সেন্ট প্রভৃতি হোক। তবে ভাপের সুগন্ধি নাকে টেনে নেয়া জায়েয নয়। কেননা ধোঁয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুভবযোগ্য কিছু অংশ আছে যা নাক দ্বারা গ্রহণ করলে নাকের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে পেটে পৌঁছায়।[2] এজন্য নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাক্বীত বিন ছাবুরা (রাঃ) কে বলেছেন, بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "রোযা অবস্থায় না থাকলে ওযুর ক্ষেত্রে নাকে অতিরিক্ত পানি নিবে।"[3]

প্রশ্নঃ (৪১৩) রোযা ভঙ্গকারী বিষয় কি কি?

উত্তরঃ রোযাভঙ্গকারী বিষয়গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

ক) স্ত্রী সহবাস।

খ) খাদ্য গ্রহণ।

গ) পানীয় গ্রহণ।

ঘ) উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত করা।

ঙ) খানা-পিনার অন্তর্ভূক্ত এমন কিছু গ্রহণ করা। যেমন সেলাইন ইত্যাদি।

চ) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা।

ছ) শিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করা।

জ) হায়েয বা নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর দলীল নিম্নরূপ ঃ

সহবাস ও পানাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"অতএব এক্ষণে তোমরা (রোযার রাত্রেও) তাদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর। এবং প্রত্যুষে (রাতের)

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের কাঁচা ও শুকনা মেসওয়াক ব্যবহার করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ মেসওয়াক করা।

[2] . ধুমপানের ক্ষেত্রে যেহেতু ধুঁয়াটাই নাকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এজন্য তা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে। অবশ্য ধুমপান মূলতঃ হারাম কাজ। যা থেকে বেঁচে থাকা মুসলমান সহ অবশ্যই প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য।

[3] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নাক ঝাড়া, ১৪২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা।

কাল রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৭)

উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত রোযা ভঙ্গের কারণ। দলীল, হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা রোযাদারের উদ্দেশ্যে বলেন, "সে খানা-পিনা ও উত্তেজনা পরিত্যাগ করে আমারই কারণে।"[1] উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত করার ক্ষেত্রে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا)

"স্ত্রী সঙ্গমেও তোমাদের জন্য সাদকার ছওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেসা করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের একজন তার উত্তেজনার চাহিদা মেটাবে, আর এতে ছওয়াবের হকদার হবে এটা কেমন কথা ? তিনি জবাবে বললেনঃ তোমরা কি মনে কর, সে যদি এই কাজ কোন হারাম স্থানে করত তবে পাপের অধিকারী হত না ? তেমনি হালাল স্থানে ব্যবহার করার কারণে অবশ্যই সে পুরস্কারের অধিকারী হবে।"[2] আর উত্তেজনার চাহিদা মেটানোর মাধ্যম হচ্ছে স্ববেগে বীর্য নির্গত হওয়া। এজন্য বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, মযী[3] বের হলে ছিয়াম বিনষ্ট হবে না, যদিও তা উত্তেজনা, চুম্বন ও স্পর্শ করার কারণে হয়।

খানা-পিনার অন্তর্ভূক্ত এমন কিছু গ্রহণ করা রোযা ভঙ্গের কারণ। যেমন, খানা-পিনার অভাব পূর্ণ করবে এরকম সেলাইন গ্রহণ করা। কেননা ইহা যদিও সরাসরি খানা-পিনা নয় কিন্তু ইহা খানা-পিনার কাজ করে এবং তার প্রয়োজন মেটায়। একারণেই তো ইহা দ্বারা শরীরের গঠন প্রকৃতি ঠিক থাকে, খানা-পিনার অভাব অনুভব করে না।

কিন্তু খানা-পিনার কাজ করে না এরকম ইন্জেকশন গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। চাই উহা শিরার মধ্যে প্রদান করা হোক বা পেশীতে বা শরীরের যে কোন স্থানে। ইচ্ছাকৃত বমি করা। অর্থাৎ বমির মাধ্যমে পেটের মধ্যে যা আছে তা মুখ দিয়ে বাইরে বের করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ)

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে সে যেন রোযা কাযা আদায় করে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত

---

[1]. ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযার ফযীলত।

[2]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক সৎকাজকে সাদকা বলা হয় তার বর্ণনা।

[3]. মযীঃ, স্ত্রী শৃঙ্গার করার কারণে বা যে কোন ভাবে উত্তেজিত হলে লিঙ্গের আগায় যে আঠালো পানি বের হয় তাকে আরবীতে মযী বলা হয়। এতে ওযু আবশ্যক হয় গোসল নয়।

যার বমি হয় তার কোন কাযা নেই।"[1] এর কারণ হচ্ছে, মানুষ বমি করলে তার পেট খাদ্যশুন্য হয়ে যায়। তখন তার এই শুন্যতা পূরণের প্রয়োজন পড়ে। এ কারণে আমরা বলব, রোযা ফরয হলে কোন মানুষের বমি করা জায়েয নয়। কেননা বমি করলে তার ফরয ছিয়াম বিনষ্ট হয়ে যাবে। তবে অসুস্থতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে রোযা নষ্ট হবে না।

শিঙ্গা লাগানো। অর্থাৎ শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত বের করা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,(أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) "যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগায় ও যার শিঙ্গা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।"[2]

হায়েয বা নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের সম্পর্কে বলেন, (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ) "সে কি এমন নয় যে, ঋতুবতী হলে নামায পড়বে না ও রোযা রাখবে না।"[3]

উল্লেখিত বিষয়গুলো নিম্ন লিখিত তিনটি শর্তের ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য হবেঃ

১) জ্ঞান থাকা।
২) স্মরণ থাকা।
৩) ইচ্ছাকৃতভাবে করা।

প্রথম শর্তঃ জ্ঞান থাকা। অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অথবা ছিয়ামের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা।

যদি শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে তার ছিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন, ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬) । আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাবঃ ৫)

---

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাকৃত বমি করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করার বর্ণনা।

[2] . বুখারী সনদ বিহীন মুআল্লাক বর্ণনা করেন। অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিঙ্গা লাগানো ও বমি করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিঙ্গা লাগানো ঠিক না।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতীর রোযা পালন না করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ নেক কাজ কম হলে ঈমানও কমে যায়।

সুন্নাহ্ বা হাদীছ থেকে ছিয়ামের ক্ষেত্রে বিশেষ দলীল হচ্ছে, ছহীহ্ হাদীছে আ'দী বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রোযা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে উট বাঁধার দু'টো রশী বালিশের নীচে রেখে দিলেন। একটি কালো রঙের অন্যটির রং সাদা। এরপর খানা-পিনা করতে থাকলেন। যখন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সাদা ও কালো রশী চিনতে পারলেন তখন খানা-পিনা বন্ধ করলেন। সকালে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি তাকে বললেন, কুরআনের আয়াতে সাদা ও কালো সুতা বলতে আমাদের পরিচিত সূতা বা রশী উদ্দেশ্য নয়। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাদা সুতা বলতে দিনের শুভ্রতা (সুবহে সাদেক বা ফজর হওয়া) আর কালো সূতা বলতে রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ছিয়াম কাযা আদায় করার আদেশ করেন নি।[1] কেননা বিষয়টি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অজ্ঞ। ভেবেছিলেন এটাই আয়াতের অর্থ।

আর ছিয়ামের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও তার ছিয়াম বিশুদ্ধ। দলীলঃ ছহীহ্ বুখারীতে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে ইফতার করে নিয়েছিলাম। তার কিছুক্ষণ পর আবার সূর্য দেখা গিয়েছিল।" কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করার আদেশ করেন নি। কেননা কাযা আদায় করা ওয়াজিব হলে তিনি অবশ্যই সে আদেশ প্রদান করতেন। আর সে আদেশ থাকলে আমাদের কাছেও তার বর্ণনা পৌঁছতো। কেননা আল্লাহ্ বলেন,﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾"নিশ্চয় আমি যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আর আমিই তার সংরক্ষণকারী।" (সূরা হিজ্‌রঃ ৯) অতএব প্রয়োজন থাকা সত্বেও যখন এ ক্ষেত্রে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তাই বুঝা যায় যে, তিনি তাদেরকে এর কাযা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন নি। অতএব অজ্ঞতা বশতঃ দিন থাকতেই পানাহার করে ফেললে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। জানার সাথে সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকবে এবং দিনের বাকী অংশ ছিয়াম অবস্থায় অতিবাহিত করবে।

অনুরূপভাবে কোন লোক যদি খানা-পিনা করে এই ভেবে যে এখনও রাত আছে- ফজর হয়নি। কিন্তু পরে জানলো যে সে ফজর হওয়ার পরই পানাহার করেছে, তবে তার রোযাবিশুদ্ধ হবে। তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা সে ছিল অজ্ঞ।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্র বাণী, 'প্রত্যুষে (রাতের) কালো রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর।' মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ফজর উদিত হলেই রোযা শুরু হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় শর্তঃ স্মরণ থাকা। অর্থাৎ সে যে রোযা রেখেছে একথা ভুলে না যাওয়া। অতএব রোযা রেখে ভুলক্রমে কোন মানুষ যদি খানা-পিনা করে ফেলে, তবে তার ছিয়াম বিশুদ্ধ এবং তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)

"যে ব্যক্তি রোযা রেখে ভুলক্রমে পানাহার করে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্ই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।"[1]

তৃতীয় শর্তঃ ইচ্ছাকৃত করা। অর্থাৎ রোযাদার নিজ ইচ্ছায় উক্ত রোযা ভঙ্গের কাজে লিপ্ত হবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে হলে তার রোযা বিশুদ্ধ হবে চাই তাকে জোর জবরদস্তী করা হোক বা না হোক। কেননা বাধ্য করে কুফরীকারী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যার উপর জবরদস্তী করা হয়েছে এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।" (সূরা নাহালঃ ১০৬) বাধ্য অবস্থায় কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পাপ যদি ক্ষমা করা হয়; তবে তার নিম্ন পর্যায়ের পাপে বাধ্য হয়ে লিপ্ত হলে ক্ষমা হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া হাদীছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল ক্রমে করে ফেলা এবং আবশ্যিক বিষয় করতে ভুলে যাওয়া ও বাধ্য অবস্থায় করে ফেলা পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[2]

এভিত্তিতে কারো নাকে যদি ধুলা ঢুকে পড়ে এবং তার স্বাদ গলায় পৌঁছে ও পেটের ভিতর প্রবেশ করে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা সে এটার ইচ্ছা করেনি।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযাম, অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে পানাহার করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

[2] . ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ তালাক, অনুচ্ছেদঃ ভুল ক্রমে এবং বাধ্য করে তালাক।

অনুরূপভাবে) কোন ব্যক্তিকে যদি ইফতার করতে জবরদস্তি করা হয় আর সে বাধ্য হয়ে ইফতার করে ফেলে, তবে তার রোযা বিশুদ্ধ। কেননা সে অনিচ্ছাকৃতভাবে একাজ করেছে। এমনিভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হলে, তার রোযাও বিশুদ্ধ। কেননা সে ছিল ঘুমন্ত, ইচ্ছাও ছিল না তার একাজে। কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে তার সাথে সহবাস করতে বাধ্য করে তবে তার (স্ত্রীর) রোযা বিশুদ্ধ। কেননা একাজে তার কোন এখতিয়ার ছিল না।

একটি মাসআলাঃ খুবই সতর্ক থাকা উচিত। কোন মানুষ যদি রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে নিম্ন লিখিত পাঁচটি বিধান তার ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবেঃ

১) সে গুনাহগার হবে।
২) দিনের বাকী অংশ তাকে ছিয়াম অবস্থায় কাটাতে হবে।
৩) তার উক্ত দিনের ছিয়াম নষ্ট হবে।
৪) তাকে কাযা আদায় করতে হবে।
৫) কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।

সহবাসে লিপ্ত হলে কি ধরণের কাফ্‌ফারা দিতে হবে এ সম্পর্কে জানা থাক বা নাজানা থাক কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হল- রোযাও তার উপর ফরয-[1] কিন্তু তার এই জ্ঞান নেই যে, একাজ করলে তাকে এত কাফ্‌ফারা দিতে হবে, তবুও তার উপর উল্লেখিত বিধান সমূহ প্রজোয্য হবে। কেননা সে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করেছে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গের কাজে লিপ্ত হলে, তার উপর যাবতীয় বিধান প্রজোয্য হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, "কিসে তোমাকে ধ্বংস করল ?" সে বলল, রামাযানের রোযা রেখে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করার আদেশ করলেন।[2] অথচ লোকটি জানতো না যে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে কি হবে না।

আমরা বলেছি, তার উপর রোযা ফরয। অর্থাৎ সে মুসাফির নয় নিজ গৃহে মুক্বীম হিসেবে অবস্থান করছে। যদি সফরে থেকে কোন ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করে এবং স্ত্রী সহবাস করে তবে কাফ্‌ফারা দিতে হবেনা। কেননা সফর অবস্থায় রোযা রাখা ফরয নয়। রোযা ভঙ্গ করা ও রাখার ব্যাপারে সে স্বাধীন। তবে ভঙ্গ করলে পরে কাযা আদায় করতে হবে।

---

[1] . অর্থাৎ- রোযা ভঙ্গের বৈধ কোন কারণ তার সামনে নেই। যেমন সে সফরেও নয়, অসুস্থও নয়।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে..। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের রামাযানের দিনে স্ত্রী সহবাস কঠোরভাবে হারাম।

প্রশ্নঃ (৪১৪) রোযা অবস্থায় শ্বাসকষ্টের কার ণে স্প্রে (nabulijer) **ব্যবহার করার বিধান কি ? এ দ্বারা কি রোযা ভঙ্গ হবে ?**

উত্তরঃ এই স্প্রে নাকে প্রবেশ করে কিন্তু পেট পর্যন্ত পৌঁছে না। তাই রোযা রেখে ইহা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। এতে রোযা ভঙ্গও হবে না। কেননা এটা এমন বস্তু যা উড়ে বেড়ায় নাকে প্রবেশ করে এবং বিলীন হয়ে যায়, এর অংশ বিশেষ পেটের মধ্যে প্রবেশ করে না। তাই এদ্বারা রোযাভঙ্গ হবে না।

প্রশ্নঃ (৪১৫) বমি করলে কি রোযা ভঙ্গ হবে ?

উত্তরঃ কোন লোক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে রোযা ভঙ্গ হবেনা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ)

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করবে সে যেন রোযা কাযা আদায় করে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত যার বমি হয় তার কোন কাযা নেই।"[1] কিন্তু বমি যদি আপনাকে পরাজিত করে ফেলে-বমি বের হয়েই যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হবেনা। মানুষ যদি পেটের মধ্যে খিচুনী অনুভব করে, মনে হয় যেন ভিতর থেকে সব কিছু বের হয়ে আসবে, তখন তাতে বাধা দিবেনা। সাধারণভাবে থাকার চেষ্টা করবে। ইচ্ছা করে কোন কিছু বের করার চেষ্টা করবে না। নিজে নিজে বের হয়ে আসলে কোন ক্ষতি হবেনা এবং রোযাও নষ্ট হবেনা।

প্রশ্নঃ (৪১৬) রোযাদারের দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হলে কি রোযা নষ্ট হবে ?

উত্তরঃ দাঁত থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে রোযার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু সাধ্যানুযায়ী রক্ত গিলে নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। অনুরূপভাবে নাক থেকে রক্ত বের হলেও রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু রক্ত ভিতরে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। নাক বা দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। অতএব কাযা আদায় করার প্রশ্নই উঠে না।

ঋতুবতী ফজরের পূর্বে পবিত্র হলে রোযা রাখবে

প্রশ্নঃ (৪১৭) ঋতুবতী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে, তবে তার রোযার বিধান কি ?

উত্তরঃ ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়েছে এব্যাপারে নিশ্চিত হলে, তার রোযা বিশুদ্ধ হবে। কেননা নারীদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, ধারণা করে যে পবিত্র হয়ে গেছে অথচ সে আসলে পবিত্র হয়নি। এই কারণে নারীরা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে আসতেন তাদের

---

[1] . আবু দাঊদ, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করার বর্ণনা।

লজ্জাস্থানে তুলা লাগিয়ে উক্ত তুলার চিহ্ন দেখানোর জন্য যে, তারা কি পবিত্র হয়েছেন ? তখন তিনি বলতেন, (لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) 'তোমরা তাড়াহুড়া করবে না যতক্ষণ না তোমরা কাছ্ছা বাইযা (বা সাদা পানি) না দেখ।' অতএব মহিলাগণ অবশ্যই ধীরস্থীরতার সাথে লক্ষ্য করবে এবং নিশ্চিত হবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে কিনা। যদি পবিত্র হয়ে যায় তবে রোযার নিয়ত করে নিবে। ফজর হওয়ার পর গোসল করবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু নামাযের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত গোসল সেরে নেয়ার চেষ্টা করবে, যাতে করে সময়ের মধ্যেই ফজর নামায আদায় সম্ভব হয়।

আমরা শুনতে পাই অনেক মহিলা ফজরের পূর্বে বা পরে ঋতু থেকে পবিত্র হয়, কিন্তু তারা গোসল করতে দেরী করে নামাযের সময় পার করে দেয়। পরিপূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার যুক্তিতে সূর্য উঠার পর গোসল করে। কিন্তু এটা মারাত্মক ধরণের ভুল। চাই তা রামাযান মাসে হোক বা অন্য মাসে। কেননা তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সময়মত নামায আদায় করার জন্য দ্রুত গোসল সেরে নেয়া। নামাযের স্বার্থে গোসলের ওয়াজিব কাজগুলো সারলেই যথেষ্ট হবে। তারপর দিনের বেলায় আবারো যদি পরিপূর্ণরূপে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করে, তবে কি অসুবিধা আছে ?

ঋতুবতী নারীর মত অন্যান্য নাপাক ব্যক্তিগণ (যেমন স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্ন দোষের কারণে) নাপাক অবস্থাতেই রোযার নিয়ত করতে পারবে। এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো স্ত্রী সহবাসের কারণে নাপাক অবস্থাতেই রোযার নিয়ত করতেন এবং ফজর হওয়ার পর নামাযের আগে গোসল করতেন।[1] (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্নঃ (৪১৮) রোযা অবস্থায় দাঁত উঠানোর বিধান কি ?

উত্তরঃ সাধারণ দাঁত বা মাড়ির দাঁত উঠানোতে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা এতে শিঙ্গা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে না। তাই এত রোযাও ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্নঃ (৪১৯) রোযা রেখে রক্ত পরীক্ষা (Blood test) করার জন্য রক্ত প্রদান করার বিধান কি ? এতে কি রোযা নষ্ট হবে ?

উত্তরঃ ব্লাড টেষ্ট করার জন্য রক্ত বের করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা ডাক্তার অসুস্থ ব্যক্তির চেকআপ করার জন্য রক্ত নেয়ার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু এই রক্ত নেয়া অল্প হওয়ার কারণে শিঙ্গা লাগানোর মত এর কোন প্রভাব শরীরে দেখা যায় না, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হবেনা। আসল হচ্ছে রোযা ভঙ্গ না হওয়া -যতক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গের জন্য

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের গোসল করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে গেলেও রোযা বিশুদ্ধ হবে।

শরীয়ত সম্মত দলীল না পাওয়া যাবে। আর সামান্য রক্ত বের হলে রোযা ভঙ্গ হবে এখানে এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না।

কিন্তু রোগীর শরীরে রক্ত প্রবেশ করার জন্য বেশী পরিমাণে রক্ত প্রদান করা রোযা ভঙ্গের অন্যতম কারণ। কেননা এর মাধ্যমে শিঙ্গা লাগানোর মত শরীরে প্রভাব পড়ে। অতএব ছিয়াম যদি ওয়াজিব হয়, তবে এভাবে বেশী পরিমাণে রক্ত দান করা জায়েয নয়। তবে রোগীর অবস্থা যদি আশংকা জনক হয়, মাগরিব পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে এবং ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত যে, এই রোযাদারের রক্তই শুধু রোগীর উপকারে আসবে ও তার প্রাণ বাঁচানো সম্ভবপর হতে পারে, তবে এই অবস্থায় রক্ত দান করতে কোন অসুবিধা নেই। রক্ত দানের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করে পানাহার করবে। অতঃপর এই রোযার কাযা আদায় করবে। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্নঃ (৪২০) রোযাদার হস্ত মৈথুন করলে কি রোযা ভঙ্গ হবে ? তাকে কি কোন কাফ্ফারা দিতে হবে ?

উত্তরঃ রোযাদার হস্ত মৈথুন করে যদি বীর্যপাত করে তবে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। দিনের বাকী অংশ তাকে ছিয়াম অবস্থায় কাটাতে হবে। এ অপরাধের জন্য আল্লাহ্র কাছে তওবা করতে হবে এবং উক্ত দিনের রোযা কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। কেননা কাফ্ফারা শুধুমাত্র সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করলে আবশ্যক হবে।

প্রশ্নঃ (৪২১) রোযাদারের জন্য আতর-সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়ার বিধান কি ?

উত্তরঃ রোযাদারের আতর-সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। চাই তৈল জাতীয় হোক বা ধোঁয়া জাতীয়। তবে ধোঁয়ার সুঘ্রাণ নাকের কাছে নিয়ে শুঁকবে না। কেননা এতে একজাতীয় পদার্থ আছে যা পেট পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন পানি বা তদানুরূপ বস্তু। কিন্তু সাধারণ ভাবে তার সুঘ্রাণ নাকে ঢুকলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৪২২) নাকে ধোঁয়া টানা এবং চোখে বা নাকে ড্রপ দেয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তরঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নাকে ভাপের ধোঁয়া টানা নিজ ইচ্ছায় হয়ে থাকে। যাতে করে ধোঁয়ার কিছু অংশ পেটে প্রবেশ করে, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ড্রপ ব্যবহার করে উহা পেটে পৌঁছানোর ইচ্ছা করা হয় না; বরং এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে নাকে বা চোখে শুধু ড্রপ ব্যবহার করা।

প্রশ্নঃ (৪২৩) রোযাদারের নাকে, কা ন ও চোখে ড্রপ ব্যবহার করার বিধান কি ?

উত্তরঃ নাকের ড্রপ যদি নাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সাহাবী লাক্বীত বিন সাবুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেন,(وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُــونَ صَــائِمًا) "রোযা অবস্থায় না থাকলে ওযুর

ক্ষেত্রে নাকে অতিরিক্ত পানি নিবে।"[1] অতএব পেটে পৌঁছে এরকম করে রোযাদারের নাকে ড্রপ ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু পেটে না পৌঁছলে কোন অসুবিধা নেই।

চোখে ড্রপ ব্যবহার করা সুরমা ব্যবহার করার ন্যায়। এতে রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে কানে ড্রপ ব্যবহারেও রোযা নষ্ট হবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কোন দলীল নেই। এবং যে সব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এগুলো তারও অন্তর্ভূক্ত নয়। চোখ বা কান দ্বারা পানাহার করা যায় না। এগুলো শরীরের অন্যান্য চামড়ার লোমকুপের মত।

বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন, কোন লোকের পায়ের তলায় যদি তরল কোন পদার্থ লাগানো হয় এবং এর স্বাদ গলায় অনুভব করে, তবে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা উহা খানা-পিনা গ্রহণের স্থান নয়। অতএব সুরমা ব্যবহার করলে, চোখে বা কানে ড্রপ ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হবে না-যদিও এগুলো ব্যবহার করলে গলায় স্বাদ অনুভব করে। অনুরূপভাবে চিকিৎসার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যদি কেউ তৈল ব্যবহার করে, তাতেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না। এমনিভাবে শ্বাস কষ্ট দূর করার জন্য যদি মুখে পাইপ লাগিয়ে অক্সিজেনের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে চলমান করা হয়, এবং তা পেটে পৌঁছে, তাতেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা উহা পানাহারের অন্তর্ভূক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৪২৪) রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি রোযা বিশুদ্ধ হবে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তার রোযা বিশুদ্ধ হবে। কেননা স্বপ্নদোষ রোযা বিনষ্ট করে না। স্বপ্নদোষ তো মানুষের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। আর নিদ্রা অবস্থায় সংঘটিত বিষয় থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি সতর্কতাঃ বর্তমান যুগে অনেক মানুষ রামাযানের রাতে জেগে থাকে। কখনো আজেবাজে কর্ম এবং কথায় রাত কাটিয়ে দেয়। তারপর গভীর নিদ্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। বরং মানুষের উচিত হচ্ছে, রোযার সময়টাকে আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি আনুগত্যপূর্ণ ও আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী কাজে অতিবাহিত করা।

প্রশ্নঃ (৪২৫) রোযাদারের ঠান্ডা ব্যবহার করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ঠান্ডা-শীতল বস্তু অনুসন্ধান করা রোযাদার ব্যক্তির জন্য জায়েয, কোন অসুবিধা নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযা রেখে গরমের কারণে বা তৃষ্ণার কারণে মাথায় পানি ঢালতেন।[2] ইবনু ওমর (রাঃ) রোযা রেখে গরমের প্রচন্ডতা অথবা

---

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়: নাক ঝাড়া, ১৪২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ নাকে পানি নেয়ায় বাড়াবাড়ি করা। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: আঙ্গুল খিলাল করার বর্ণনা।

[2] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ তৃষ্ণায় রোযাদারের মাথায় পানি ঢালা।

পিপাসা হ্রাস করার জন্য শরীরে কাপড় ভিজিয়ে রাখতেন। কাপড়ের এই সিক্ততার কোন প্রভাব নেই। কেননা উহা এমন পানি নয়, যা নাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

প্রশ্নঃ (৪২৬) রোযাদার কুলি করা বা নাকে পানি নেয়ার কারণে যদি পেটে পৌঁছে যায়, তবে কি তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ রোযাদার কুলি করা বা নাকে পানি নেয়ার কারণে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি পেটে পৌঁছে যায়, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা এতে তার কোন ইচ্ছা ছিল না। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাবঃ ৫)

প্রশ্নঃ (৪২৭) রোযাদারের আতরের সুঘ্রাণ ব্যবহার করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ৪২১ নং প্রশ্ন র উত্তর দেখুন।

প্রশ্নঃ (৪২৮) নাক থেকে রক্ত বের হলে কি রোযা নষ্ট হবে ?

উত্তরঃ নাক থেকে রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে না-যদিও বেশী পরিমাণে বের হয়। কেননা এখানে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা থাকেনা।

সতর্কতা বশতঃ ফজরের দশ বা পনর মিনিট পূর্বে পানাহার বন্ধ করাঃ

প্রশ্নঃ (৪২৯) রামাযানের কোন কোন ক্যালেন্ডারে দেখা যায় সাহরীর জন্য শেষ টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তার প্রায় দশ/পনর মিনিট পর ফজরের টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে। হাদীসে কি এর পক্ষে কোন দলীল আছে নাকি এটা বিদআত ?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে এটি বিদআত। সুন্নাতে নববীতে এর কোন প্রমাণ নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত কিতাবে বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"এবং প্রত্যুষে (রাতের) কাল রেখা হতে (ফজরের) সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৭) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)

"নিশ্চয় বেলাল রাত থাকতে আযান দেয়, তখন তোমরা খাও ও পান কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান শোন। কেননা ফজর উদিত না হলে সে আযান দেয় না।"[1] ফজর

[1] . বুখারী, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: নবী [ﷺ] এর বাণী তোমাদেরকে যেন বাধা না দেয়...।

না হতেই খানা-পিনা বন্ধ করার জন্য লোকেরা সময় নির্ধারণ করে যে ক্যালেন্ডার তৈরী করেছে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরযের উপর বাড়াবাড়ী। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের মাঝে অতিরঞ্জন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)

"অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক। অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক। অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক।"[1]

প্রশ্নঃ (৪৩০) এয়ারপোর্টে থাকাবস্থায় সূর্য অস্ত গেছে মুআয্‌যিন আযান দিয়েছে, ইফতারও করে নিয়েছে। কিন্তু বিমানে চড়ে উপরে গিয়ে সূর্য দেখতে পেল। এখন কি পানাহার বন্ধ করতে হবে ?

উত্তরঃ খানা-পিনা বন্ধ করা অবশ্যক নয়। কেননা যমীনে থাকাবস্থায় ইফতারের সময় হয়ে গেছে সূর্যও ডুবে গেছে। সুতরাং ইফতার করতে বাধা কোথায় ? রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم)

"এদিক থেকে যখন রাত আগমণ করবে এবং ঐদিক থেকে দিন শেষ হয়ে যাবে ও সূর্য অস্ত যাবে, তখন রোযাদার ইফতার করে ফেলবে।"[2] অতএব এয়ারপোর্টের যমীনে থাকাবস্থায় যখন সূর্য ডুবে গেছে, তখন তার দিনও শেষ হয়ে গেছে, তাই সে শরীয়তের দলীল মোতাবেক ইফতারও করে নিয়েছে। সুতরাং শরীয়তের দলীল ব্যতীরেকে আবার তাকে পানাহার বন্ধ করার আদেশ দেয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (৪৩১) রোযাদারের কফ অথবা থুথু গিলে ফেলার বিধান কি ?

উত্তরঃ কফ বা শ্লেষা যদি মুখে এসে একত্রিত না হয় গলা থেকেই ভিতরে চলে যায় তবে তার রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি গিলে ফেলে তবে সে ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দু'টি মত রয়েছেঃ

১ম মতঃ তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা উহা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত।

২য় মতঃ রোযা নষ্ট হবে না। কেননা উহা মুখের সাধারণ থুথুর অন্তর্গত। মুখের মধ্যে সাধারণ পানি যাকে থুথু বলা হয় তা দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না। এমনকি যদি থুথু মুখের মধ্যে একত্রিত করে গিলে ফেলে তাতেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

আমরা জানি আলেমগণ মতবিরোধ করলে তার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ্‌ থেকে খুঁজতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাতে সুস্পষ্ট কোন উক্তি নেই। এ বিষয়ে যখন সন্দেহ হয়ে গেল, তার ইবাদতটি নষ্ট হয়ে গেল না নষ্ট হল না। তখন আমাদেরকে মূলের দিকে

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইলম, অনুচ্ছেদঃ "অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক।"

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ সফরে রোযা রাখা ও রোযা ভঙ্গ করা।

ফিরে যেতে হবে। মূল হচ্ছে দলীল ছাড়া ইবাদত বিনষ্ট না হওয়া। অতএব কফ গিলে নিলে রোযা নষ্ট হবে না।

মোটকথা কফ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবে। উহা গলার নীচে থেকে মুখে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে না। কিন্তু মুখে এসে পড়লে বাইরে ফেলে দিবে। চাই রোযাদার হোক বা না হোক। কিন্তু গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হবে এর জন্য দলীল দরকার।

প্রশ্নঃ (৪৩২) খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করলে কি রোযা নষ্ট হবে ?

উত্তরঃ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে যদি তা গিলে না ফেলে, তবে রোযানষ্ট হবে না। কিন্তু একান্ত দরকার না পড়লে এরূপ করা উচিত নয়। এ অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত যদি পেটে কিছু ঢুকে পড়ে তবে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্নঃ (৪৩৩) রোযা রেখে হারাম বা অশ্লীল কথাবার্তা উচ্চারণ করলে কি রোযা নষ্ট হবে ?

উত্তরঃ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করলেই জানতে পারি যে,ছিয়াম ফরয হওয়ার হিকমত কি ? আর তা হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি অর্জন করা ও আল্লাহ্র ইবাদত করা। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৩) তাক্বওয়া হচ্ছে হারাম কাজ পরিত্যাগ করা। ব্যাপক অর্থে তাক্বওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয় বাস্তাবায়ন করা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)

"যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যা অভ্যাস ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।"[1] অতএব এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, রোযাদার যাবতীয় ওয়াজিব বিষয় বাস্তবায়ন করবে এবং সব ধরণের হারাম কাজ থেকে দূরে থাকবে। মানুষের গীবত করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুগলখোরী করবে না, হারাম বেচা-কেনা করবে না, ধোঁকাবাজী করবে না। মোটকথা চরিত্র ধ্বংসকারী অন্যায় ও অশ্লীলতা বলতে যা বুঝায় সকল প্রকার হারাম থেকে বিরত থাকবে। আর একমাস এভাবে চলতে পারলে বছরের অবশিষ্ট সময় সঠিক পথে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: রোযা রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তার কারবার পরিত্যাগ করে না। হাদীছটির বাক্য ইবনু মাজাহ্ থেকে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু আফসোসের বিষয় অধিকাংশ রোযাদার রামাযানের সাথে অন্য মাসের কোন পার্থক্য করে না। অভ্যাস অনুযায়ী ফরয কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করে, হালাল-হারামে কোন পার্থক্য নেই। গর্হিত ও অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত থাকে। মিথ্যা, ধোঁকাবাজী প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাকে দেখলে বুঝা যাবে না তার মধ্যে ছিয়ামের মর্যাদার কোন মূল্য আছে। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় রোযাকে ভঙ্গ করে দিবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার ছওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

প্রশ্নঃ (৪৩৪) মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার বিধান কি? ইহা কি রোযা নষ্ট করে?

উত্তরঃ মিথ্যা সাক্ষী দেয়া অন্যতম কাবীরা গুনাহ্। আর তা হচ্ছে না জেনে কোন বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া অথবা জেনে শুনে বাস্তবতার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করা। এতে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কিন্তু ছিয়ামের ছওয়াব কমিয়ে দিবে।

প্রশ্নঃ (৪৩৫) রোযার আদব কি কি?

উত্তরঃ রোযার গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে, আল্লাহ্‌ভীতি অর্জন করা তথা আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৩) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)

"যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যা কাজ-কারবার ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।"[1]

রোযার আরো আদব হচ্ছে, বেশী বেশী দান-খায়রাত করা, নেককাজ ও জনকল্যাণ মূলক কাজ বাস্তবায়ন করা। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। রামাযান মাসে যখন জিবরীল (আঃ) তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তখন তিনি আরো বেশী দান করতেন।[2]

আরো আদব হচ্ছে, আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। যাবতীয় মিথ্যাচার, গালিগালাজ, ধোকা, খিয়ানত, হারাম অশ্লীল বস্তু দেখা বা শোনা প্রভৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা প্রতিটি মানুষের উপর ওয়াজিব। বিশেষ করে রোযাদারের জন্য তো অবশ্যই।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ রোযা রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তার কারবার পরিত্যাগ করে না। হাদীছটির বাক্য ইবনু মাজাহ্ থেকে নেয়া হয়েছে।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ নবী [ﷺ] রামাযানে সর্বাধিক দানশীল হতেন।

রোযার আদব হচ্ছে, সাহরী খাওয়া। এবং তা দেরী করে খাওয়া। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَـةً) "তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে রয়েছে বরকত।"[1]

রোযার আদব হচ্ছে, দ্রুত ইফতার করা। সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিত হলে বা অস্ত যাওয়ার অনুমান প্রবল হলেই সাথে সাথে দেরী না করে ইফতার করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُـوا الْفِطْـرَ) "মানুষ ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে।"[2] ইফতারের আদব হচ্ছে, কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, সম্ভব না হলে যে কোন খেজুর দ্বারা। খেজুর না পেলে পানি দ্বারাই ইফতার করবে।

প্রশ্নঃ (৪৩৬) ইফতারের জন্য কোন দু'আ কি প্রমাণিত আছে ? রোযাদার কি মুআয্যিনের জবাব দিবে নাকি ইফতার চালিয়ে যাবে ?

উত্তরঃ দু'আ কবূল হওয়ার অন্যতম সময় হচ্ছে ইফতারের সময়। কেননা সময়টি হচ্ছে ইবাদতের শেষ মুহূর্ত। তাছাড়া মানুষ সাধারণতঃ ইফতারের সময় অধিক দুর্বল হয়ে পড়ে। আর মানুষ যত দুর্বল হয় তার অন্তর তত নরম ও বিনয়ী হয়। তখন দু'আ করলে মনোযোগ আসে বেশী এবং আল্লাহ্‌র দিকে অন্তর ধাবিত হয়। ইফতারের সময় দু'আ হচ্ছেঃ (اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَـرْتُ) "হে আল্লাহ্ আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।"[3] নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইফতারের সময় এই দু'আ পাঠ করতেনঃ (ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) "তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা তরতাজা হয়েছে এবং আল্লাহ্ চাহে তো প্রতিদান সুনিশ্চিত হয়েছে।"[4] হাদীছ দু'টিতে যদিও দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিদ্বান উহাকে হাসান বলেছেন। মোটকথা এগুলো দু'আ বা অন্য কোন দু'আ পাঠ করবে। ইফতারের সময় হচ্ছে দু'আ কবূল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। কেননা হাদীছে এরশাদ হয়েছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ) "রোযা পালনকারীর ইফতারের সময়কার দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।"[5]

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: সাহরীর বরকত। মুসলিম, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: সাহরীর ফযীলত।

[2]. বুখারী, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: দ্রুত ইফতার করা। মুসলিম, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদঃ সাহরী র ফযীলত।

[3]. আবু দাউদ, অনুচ্ছেদঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ইফতারের দু'আ। তবে এই দু'আটির সনদ (সূত্র) দুর্বল তাই উহা গ্রহণযোগ্য নয়। (দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৬-৩৯ পৃঃ যঈফ আবু দাউদ, আলবানী)

[4]. আবু দাউদ, অনুচ্ছেদঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ ইফতারের দু'আ। (এ হাদীছটি ছহীহ, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৯২০)

[5]. [হাদীছ ছহীহ] ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ রোযা হা/ ১৭৪৩, ১৭৫৩।

আর ইফতারের সময় মুআয্যিনের জবাব দেয়া শরীয়ত সম্মত। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ) "মুআয্যিনের আযান শুনলে তার জবাবে সে যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বল।"[1] এ হাদীছটি প্রত্যেক অবস্থাকে শামিল করে। তবে দলীলের ভিত্তিতে কোন অবস্থা ব্যতিক্রম হলে ভিন্ন কথা।

প্রশ্নঃ (৪৩৭) রোযা কাযা থাকলে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখার বিধান কি ?

উত্তরঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)

"যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে সারা বছর রোযা রাখার প্রতিদান লাভ করবে।"[2] কোন মানুষের যদি রোযা কাযা থাকে আর সে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, সে কি রামাযানের পূর্বে রোযা রাখল না রামাযানের পর।

উদাহরণঃ জনৈক লোক রামাযানের ২৪টি রোযা রাখল। বাকী রইল ছয়টি। এখন সে যদি কাযা আদায় না করেই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, তাকে কি বলা যাবে সে রামাযানের রোযা পূর্ণ করার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখল ? কেননা সে তো রামাযানের রোযা পূর্ণই করেনি। অতএব রামাযানের রোযা কাযা থাকলে শাওয়ালের ছয় রোযার প্রতিদান তার জন্য প্রমাণিত হবে না।

এ বিষয়ে অবশ্য আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, কারো রোযা কাযা থাকলে তার জন্য নফল রোযা জায়েয কি না ? কিন্তু আমাদের এই মাসআলাটি এই মতবিরোধের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা শাওয়ালের ছয়টি রোযা রামাযানের সাথে সম্পর্কিত। যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা পূর্ণ করেনি তার জন্য উক্ত ছয় রোযার ছওয়াব সাব্যস্ত হবেনা।

কাযা রোযা বাকী রেখে মৃত্যু বরণ করলে তার বিধান ঃ

প্রশ্নঃ (৪৩৮) জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি রামাযানে রোযা কাযা করেছে। কিন্তু পরবর্তী মাস শুরু হওয়ার চারদিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। তার পক্ষ থেকে কি কাযা রোযাগুলো আদায় করতে হবে ?

উত্তরঃ তার এই অসুখ যদি চলতেই থাকে সুস্থ না হয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করে তবে তার পক্ষ থেকে কাযা আদায় করতে হবেনা। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ আযান শুনলে কি বলতে হয়। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ মুআয্যিনের অনুরূপ জবাব দেয়া মুস্তাহাব।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব।

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫) অতএব অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সুস্থ হলেই কাযা রোযাগুলো দ্রুত আদায় করে নেয়া। কিন্তু রোযা রাখতে সমর্থ হওয়ার পূর্বেই যদি মৃত্যু বরণ করে, তবে রোযার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে তো এমন কোন সময় পায়নি যাতে সে রোযাগুলো কাযা আদায় করতে পারে। যেমন একজন লোক রামাযান আসার পূর্বেই শাবানে মৃত্যু বরণ করল। অতএব রামাযানের রোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু অসুস্থতা যদি এমন হয় যা সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তবে তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে।

প্রশ্নঃ (৪৩৯) রামাযানের রোযা বাকী থাকাবস্থায় পরবর্তী রামাযান এসে গেলে কি করবে ?

উত্তরঃ একথা সবার জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫) অতএব এ লোকটি যখন শরীয়ত সম্মত দলীলের ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করেছে, তখন আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে তা কাযা আদায় করা উচিত। পরবর্তী রামাযান আসার পূবেই উহা কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমার রামাযানের কিছু রোযা বাকী থেকে যেত। কিন্তু শা'বান মাস না আসলে আমি উহা কাযা আদায় করতে পারতাম না।'[1] আর তার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাঁর ব্যস্ততা। সুতরাং আয়েশা (রাঃ) এর উক্ত বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তী রামাযান আসার পূর্বে উহা অবশ্যই কাযা আদায় করতে হবে।

কিন্তু সে যদি পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত দেরী করে এবং রোযাটি বাকি থেকে যায়, তবে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ্র কাছে তওবা ইস্তেগফার করা, এই শীথিলতার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং যত দ্রুত সম্ভব তা কাযা আদায় করে নেয়া। কেননা দেরী করলে কাযা আদায় করার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায় না।

প্রশ্নঃ (৪৪০) শাওয়ালের ছয়টি রোযা পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি কি ?

উত্তরঃ শাওয়ালের ছয়টি রোযা পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, ঈদের পর পরই তা আদায় করা এবং পরস্পর আদায় করা। বিদ্বানগণ এভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে রামাযানের অনুসরণ বাস্তবায়ন হয়। হাদীছে বলা হয়েছে "যে

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ কাযা রোযা কখন আদায় করবে।

ব্যক্তি রামাযানের পরে পরে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে.. ।" তাছাড়া এতে নেক কাজ সম্পাদনে তাড়াহুড়া করা হল, যে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া এতে বান্দার দৃঢ়তার প্রমাণ রয়েছে। দৃঢ়তা মানুষের পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সচেতন বান্দা সুযোগ হাতছাড়া করে না। কেননা মানুষ জানে না পরবর্তীতে কি তার জন্য অপেক্ষা করছে। অতএব বান্দা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইলে তাকে প্রতিটি নেক কর্মের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪৪১) শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখার জন্য কি ইচ্ছামত দিন নির্ধারণ করা জায়েয? নাকি তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা আছে ? এ দিনগুলো রোযা রাখলে কি উহা ফরযের মত হয়ে যাবে এবং প্রতি বছর আবশ্যিকভাবে রোযা পালন করতে হবে ?

উত্তরঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِستٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الـــدَّهْرَ) "যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখার পর শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে সারা বছর রোযা রাখার প্রতিদান লাভ করবে।"[1] এ ছয়টি রোযার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা নেই। মাসের যে কোন সময় রোযাগুলো রাখা যায়। চাই মাসের প্রথম দিকে হোক বা মধ্যখানে বা শেষের দিকে। লাগাতার হোক বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হোক-সবই জায়েয। বিষয়টি প্রশস্ত-সুযোগ সম্পন্ন (আল্ হামদুল্লিাহ্)। তবে রামাযান শেষ হওয়ার পর পরই মাসের প্রথম দিকে দ্রুত করে নেয়া বেশী উত্তম। কেননা এতে নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা হল, যা কাম্য। কোন বছর এ রোযা পালন করবে কোন বছর করবে না তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ ছিয়াম নফল ফরয নয়।

প্রশ্নঃ (৪৪২) আশুরা রোযার বিধান কি ?

উত্তরঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করে মদীনা আগমণ করে দেখেন ইহুদীরা মুহার্‌রামের দশ তারিখে রোযা পালন করছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ(فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصـــيَامه)"আমরা মূসার অনুসরণ করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে অধিক হকদার। তিনি নিজে সে দিনের রোযা রাখলেন এবং ছাহাবীদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।"[2] বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনু আব্বাসের হাদীছে বলা হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরা দিবসে রোযা রেখেছেন এবং ছাহাবীদেরকে রোযা রাখার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। এ রোযার ফযীলত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ আশুরার রোযা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ আশুরার রোযা।

(أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) "আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি তিনি বিগত এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"[1] কিন্তু ইহুদীদের বিরোধীতা করার জন্য তিনি এর একদিন পূর্বে ৯ তারিখ অথবা এক দিন পরে ১১ তারিখ রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আশুরার রোযার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, মুহার্‌রমের দশ তারিখের সাথে ৯ তারিখ অথবা ১১ তারিখের রোযা রাখা। অবশ্য ১১ তারিখের চেয়ে ৯ তারিখ রোযা রাখা অধিক উত্তম।

প্রশ্নঃ (৪৪৩) শাবান মাসে রোযা রাখার বিধান কি ?

উত্তরঃ শাবান মাসে রোযা রাখা এবং অধিক হারে রাখা সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (مَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ) "শাবান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এত বেশী রোযা রাখতে দেখিনি।"[2] এ হাদীছ অনুযায়ী শাবান মাসে অধিকহারে রোযা রাখা উচিত।

বিদ্বানগণ বলেন, শাবান মাসে রোযা রাখা সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের অনুরূপ। এই রোযা যেন রামাযান মাসের ভুমিকা। অর্থাৎ রামাযানের পূর্বের সুন্নাত রোযা। অনুরূপভাবে শাওয়ালের রোযা রামাযানের পরের সুন্নাত স্বরূপ। যেমন ফরয নামাযের আগে ও পরে সুন্নাত রয়েছে। তাছাড়া শাবান মাসে রোযার উপকারিতা হচ্ছে, নিজেকে রামাযানের রোযা রাখার ব্যাপারে প্রস্তুত করা, রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। যাতে করে ফরয রোযা রাখা তার জন্য সহজসাধ্য হয়।[3]

প্রশ্নঃ (৪৪৪) যার অভ্যাস আছে একদিন রোযা রাখা ও একদিন ছাড়া। সে কি শুক্রবারেও রোযা রাখতে পারে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ। কোন মানুষ যদি এক দিন পর পর রোযা রাখার অভ্যাস থাকে এবং তার রোযার দিন শুক্রবার হয় বা শনিবার বা রোববার হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। তবে সে দিন যেন এমন না হয় যখন রোযা রাখা হারাম। যেমন দু'ঈদের দিন, আইয়্যামে তাশরীকের দিন (কুরবানী ঈদের পরের তিন দিনকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়)। তখন রোযা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। নারীদের ক্ষেত্রে ঋতু বা নেফাসের দিনগুলো রোযা রাখা হারাম।

প্রশ্নঃ (৪৪৫) ছওমে বিছাল কাকে বলে ? এটা কি শরীয়ত সম্মত ?

উত্তরঃ ছওমে বিসাল বা অবিচ্ছিন্ন রোযা হচ্ছে, ইফতার না করে দু'দিন একাধারে রোযা

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক মাসে তিনটি এবং আরাফার দিবসে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ শাবানের রোযা।

[3] . কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে শুধুমাত্র মধ্য শাবানে অর্থাৎ ১৫ তারিখে রোযা রাখা বিদআত। আমাদের দেশে এটাকে শবে বরাতের রোযা বলা হয়। কেননা এর ভিত্তি ছহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। ইবনু মাজার বর্ণনায় বলা হয়ঃ "মধ্য শাবান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত করবে ও দিনে রোযা পালন করবে..।" এ হাদীছটি যাল। কেননা এর সনদে ইবনু আবী সাবরাহ্‌ নামক জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছে। সে হাদীছ যাল করত। (আহকামু রজব ওয়া শাবান।)- অনুবাদক।

রাখা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরকম রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, কেউ যদি অবিচ্ছিন্ন করতে চায়, তবে শেষ রাতে সাহরীর সময় পর্যন্ত মিলিত করতে পারে।"[1] সাহরী পর্যন্ত রোযাকে অবিচ্ছিন্ন করণ জায়েয, সুন্নাত নয়; কোন ফযীলতপূর্ণ কাজও নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করাকে কল্যাণের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

(لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْـرَ) "মানুষ ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে।"[2] কিন্তু সাহরীর সময় পর্যন্ত রোযাকে চালিয়ে যাওয়া বৈধ করেছেন। লোকেরা যখন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো ইফতার না করেই রোযা চালিয়ে যান ? তিনি বললেন, "আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে আমার পালনকর্তা খাওয়ান ও পান করান।"[3]

প্রশ্নঃ (৪৪৬) বিশেষভাবে জুমআর দিবস রোযা রাখা নিষেধ। এর কারণ কি ? কাযা রোযাও কি এদিন রাখা নিষেধ?

উত্তরঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, (لا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ ولا ليلتها بقيام) "এককভাবে শুধুমাত্র শুক্রবারের দিনে রোযা রাখবে না এবং রাতে ক্বিয়াম করবে না।"[4] রোযা রাখার জন্য এককভাবে এ দিনকে বেছে নেয়া নিষেধের হিকমত হচ্ছে, জুমআর দিন সপ্তাহিক ঈদের দিন। জুমআ' ইসলামের তৃতীয় ঈদ হিসেবে গণ্য। প্রথম ঈদ হচ্ছে রামাযান শেষে ঈদুল ফিতর। দ্বিতীয়টি কুরবানীর ঈদ। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, সাপ্তাহিক ঈদ জুমআর দিন।[5] একারণেই আলাদাভাবে এদিনে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

তাছাড়া এদিনে পুরুষদের জন্য উচিত হচ্ছে আগেভাগে জুমআ'র নামাযে যাওয়া, দু'আ যিক্র ও কুরআন তেলাওয়াতে মাশগুল হওয়া। এদিনটি আরাফার দিবসের অনুরূপ। আরাফার দিবসে হাজীগণ রোযা রাখবেন না। কেননা এদিন তিনি দু'আ ও যিক্রে মাশগুল থাকবেন। একটি মূলনীতি হচ্ছেঃ কয়েকটি ইবাদত যদি একত্রিত হয়, তখন যেটা পিছানো সম্ভব হবে না সেটা তাৎক্ষণিক আদায় করবে এবং যেটি পিছানো সম্ভব হবে তা পিছিয়ে দিয়ে পরে আদায় করবে।

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ সাহরীর সময় পর্যন্ত রোযা মিলিত করা।

[2]. বুখারী, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: দ্রুত ইফতার করা। মুসলিম, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: সাহরী খাওয়ার ফযীলত।

[3]. বুখারী, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: সাহরী খাওয়ার বরকত; কিন্তু সাহরী খাওয়া ওয়াজিব নয়। মুসলিম, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: মিলিতভাবে রোযা রাখা নিষেধ।

[4]. মুসলিম, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: এককভাবে জুমআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

[5]. রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় জুমআর দিন ঈদের দিন।" (আহমাদ হা/৭৬৮২)

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, জুমআ'র দিন সাপ্তাহিক ঈদের দিন হওয়ার কারণে যদি রোযা রাখা নিষেধ হয়ে থাকে, তবে তো অপর দু'টি ঈদের মত এদিনে অন্যান্য রোযা রাখাও হারাম হয়ে যায় ? উত্তরে আমরা বলবঃ এদিনটির বিধান অন্য দু'ঈদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা ইহা প্রতি মাসে চারবার আগমণ করে। একারণে এদিনে রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে হারাম নয়। তাছাড়া দু'ঈদের মাঝে আরো বিশেষ যে বৈশিষ্ট রয়েছে তা জুমআর দিনে নেই। কিন্তু যদি জুমআর পূর্বে একদিন ও পরে একদিন রোযা পালন করে, তখন বুঝা যাবে যে, এককভাবে জুমআর দিবস রোযা পালন করার উদ্দেশ্য ছিল না। আর এটা জায়েয।[1]

এককভাবে জুমআর দিনে রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা নফল এবং কাযা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। কেননা হাদীছের নিষেধাজ্ঞা থেকে সাধারণভাবে একথাই বুঝা যায়। তবে যদি কোন মানুষ এরকম ব্যস্ত থাকে যে, তার কাযা রোযা জুমআর দিবস ছাড়া অন্য সময় আদায় করা সম্ভব নয়, তখন তার জন্য এককভাবে সে দিন রোযা করা মাকরূহ নয়। কেননা তার ওযর রয়েছে।

ইচ্ছাকৃতভাবে নফল রোযা ভঙ্গ করে ফেলার বিধান ঃ

প্রশ্নঃ (৪৪৭) কোন মানুষ যদি নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করে ফেলে, তবে কি গুনাহগার হবে ? যদি সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করে, তবে কি কাফ্ফারা দিতে হবে ?

উত্তরঃ কোন মানুষ নফল রোযা রেখে যদি পানাহার বা স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করে ফেলে, তবে কোন গুনাহ্ নেই। নফল রোযা শুরু করলেই তা পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। তবে হজ্জ-ওমরার কাফ্ফারার রোযা পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু নফল রোযা শুরু করার পর পূর্ণ করাই উত্তম। তাই নফল রোযা রেখে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা তা পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। কিন্তু রোযা যদি ফরয হয় এবং স্ত্রী সহবাস করে তবে তা নাজায়েয। কেননা বিশেষ প্রয়োজন না দেখা দিলে ফরয রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। তবে রামাযানের রোযা যদি তার উপর ফরয থাকে এবং দিনের বেলা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে কাফ্ফারা দিতে হবে। "রামাযানের রোযা যদি তার উপর ফরয থাকে" একথার অর্থ হচ্ছে: যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সফরে থাকে, দু'জনেই রোযা রাখে, তারপর সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করে, তবে তারা গুনাহগার হবে না। তাদেরকে কাফ্ফারা দিতে হবেনা। অবশ্য তাদেরকে উক্ত দিনের রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪৪৮) এ'তেকাফ এবং এ'তেকাফকারীর বিধান কি ?

---

[1] . রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেহ যেন শুধুমাত্র জুমআর দিবসে রোযা না রাখে। তবে এর পূর্বে একদিন বা পরে একদিন মিলিয়ে রোযা রাখতে পারে।" (বুখারী, অধ্যায়ঃ রোযা হা/১৮৪৯)

উত্তরঃ এ'তেকাফ হচ্ছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার জন্য মসজিদে অবস্থান করা। লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্য এ'তেকাফ করা সুন্নাত। আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"মসজিদে এ'তেকাফ করা অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৭) ছহীহ্‌ বুখারীতে প্রমাণিত আছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ'তেকাফ করেছেন, তাঁর সাথে ছাহাবায়ে কেরামও এ'তেকাফ করেছেন।[1] এ'তেকাফের এই বিধান শরীয়ত সম্মত। তা রহিত হয়ে যায়নি। ছহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করেছেন, এমনকি আল্লাহ্‌ তাকে মৃত্যু দান করেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীরাগণও এ'তেকাফ করেছেন।"[2] ছহীহ্‌ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযানের প্রথম দশকে এ'তেকাফ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় দশকে এ'তেকাফ করেছেন। অতঃপর বলেন,

(إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ)

"নিশ্চয় আমি রামাযানের প্রথম দশকে এ'তেকাফ করে এই রাত্রি (লায়লাতুল কদর) অনুসন্ধান করেছি। তারপর দ্বিতীয় দশকে এ'তেকাফ করেছি। অতঃপর ঐশী আগন্তুক কর্তৃক আমাকে বলা হয়েছে, নিশ্চয় উহা শেষ দশকে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ'তেকাফ করতে চায়, সে যেন এ'তেকাফ করে।"[3] অতঃপর লোকেরা তাঁর সাথে এ'তেকাফ করেছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'এ'তেকাফ করা যে সুন্নাত সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আমার জানা নেই।' তাই কুরআন-সুন্নাহ্‌ ও ইজমার দলীলের ভিত্তিতে এ'তেকাফ করা সুন্নাত।

এ'তেকাফ করার স্থান হচ্ছে, যে কোন শহরে অবস্থিত মসজিদ। যেখানে জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হয়। কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ "মসজিদ সমূহে ই'তেকাফ করা অবস্থায়..।" উত্তম হচ্ছে জুমআর মসজিদে এ'তেকাফ করা। যাতে করে জুমআ' আদায় করার জন্য বের হতে না হয়। অন্য মসজিদে এ'তেকাফ করলেও কোন অসুবিধা নেই, তবে জুমআর জন্য আগে ভাগে মসজিদে চলে যাবে।

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ই'তেকাফ, অনুচ্ছেদঃ এ'তেকাফ করা।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ই'তেকাফ, অনুচ্ছেদঃ শেষ দশকে এ'তেকাফ করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ই'তেকাফ, অনুচ্ছেদঃ রামাযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা।

[3]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ই'তেকাফ, অনুচ্ছেদঃ শেষ দশকে এ'তেকাফ করা।

এ'তেকাফ কারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যপূর্ণ কাজ তথা কুরআন তেলাওয়াত, যিক্‌র, নফল নামায প্রভৃতিতে মাশগুল থাকা। কেননা এ'তেকাফের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। মানুষের সামান্য কথাবার্তায় কোন অসুবিধা নেই, বিশেষ করে কথা যদি উপকারী হয়। এ'তেকাফকারীর জন্য স্ত্রী সহবাস ও স্ত্রী সোহাগ বা শৃঙ্গার প্রভৃতি হারাম।

*** মসজিদ থেকে বের হওয়া তিন ভাগে বিভক্তঃ**

১) জায়েয। শরীয়ত অনুমদিত ও অভ্যাসগত যরূরী কাজে বের হওয়া। যেমন জুমআর নামাযের জন্য বের হওয়া, পানাহার নিয়ে আসার কেউ না থাকলে সে উদ্দেশ্যে বের হওয়া। ওযু, ফরয গোসল, পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া।

২) ওয়াজিব নয় এমন নেকীর কাজে বের হওয়া। যেমন, রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া। তবে এ'তেকাফ শুরু করার সময় এ সমস্ত কাজের জন্য বের হওয়ার যদি শর্ত করে নেয়, তবে জায়েয হবে। অন্যথায় নয়।

৩) এ'তেকাফের বিরোধী কাজে বের হওয়া। যেমন বাড়ী যাওয়া বা কেনা-বেচার জন্য বের হওয়া। স্ত্রী সহবাস করা। এ সমস্ত কাজ কোনভাবেই এ'তেকাফকারীর জন্য জায়েয নয়।

فتاوى الحج

অধ্যায়ঃ হজ্জ

প্রশ্নঃ (৪৪৯) বেনামাযীর হজ্জের বিধান কি ? যদি এ ব্যক্তি তওবা করে, তবে সমস্ত ইবাদত কি কাযা আদায় করতে হবে ?

উত্তরঃ নামায পরিত্যাগ করা কুফরী। নামায ছেড়ে দিলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। একথার দলীল হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি। অতএব যে লোক নামায পড়ে না তার জন্য মক্কা শরীফে প্রবেশ করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে।" (সূরা তাওবাঃ ২৮)

যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবেনা এবং কবূলও হবেনা। কেননা কাফেরের কোন ইবাদতই সঠিক নয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

"আর তাদের দান-খায়রাত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, তারা শৈথিল্যের সাথে ছাড়া ছালাত আদায় করে না। আর তারা দান করে না, কিন্তু অনিচ্ছার সাথে করে।" (সূরা তাওবাঃ ৫৪)

যে সমস্ত আমল তারা পূর্বে পরিত্যাগ করেছে তা কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾

"(হে নবী ﷺ!) আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে (এবং আল্লাহর দ্বীনে ফিরে আসে) তবে পূর্বে যা হয়েছে তা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন।" (সূরা আনফালঃ ৩৮)

সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ অন্যায় করেছে সে যেন আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে তওবা করে। নেক কাজ চালিয়ে যায়। বেশী বেশী তওবা ইস্তেগফার ও অধিকহারে ভাল কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুণাহ্ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু"। (সূরা যুমারঃ ৫৩)

যারা তওবা করতে চায় আল্লাহ্ তাদের জন্য এই আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। সুতরাং বান্দা যে পাপই করে না কেন- যদি শির্কও হয় এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহই সরল সঠিক পথে হেদায়াতদানকারী।

হজ্জ ফরয হয়ে গেলে আদায় করতে বিলম্ব করা উচিত নয় ঃ

প্রশ্নঃ (৪৫০) ব্যাপকভাবে দেখা যায় অনেক মুসলমান বিশেষ করে অনেক যুবক ফরয হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে শীথিলতা প্রদর্শন করে। এ বছর নয় ঐ বছর এভাবে বিলম্ব করে। কখনো কর্ম ব্যস্ততার ওযর পেশ করে। এদের সম্পর্কে আপনার নছীহত কি ?

কখনো দেখা যায় কোন কোন পিতা যুবক ছেলেদেরকে ফরয হজ্জ আদায় করতে বাধা দেয় এই যুক্তিতে যে, এখনো তাদের বয়স হয়নি, হজ্জের ক্লান্তি সহ্য করতে পারবে না। অথচ হজ্জের পূর্ণ শর্ত তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। পিতার এ কাজের বিধান কি ? এ ধরণের পিতার আনুগত্য করার বিধান কি ?

উত্তরঃ একথা সর্বজন বিদিত যে, হজ্জ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন এবং বিরাট একটি ভিত্তি। হজ্জের শর্ত পাওয়া গেলে হজ্জ আদায় না করলে মানুষের ইসলাম পূর্ণ হয় না। হজ্জ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ তাৎক্ষণিক আদায় করতে হবে। মানুষ জানে না ভবিষ্যতে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। হতে পারে অর্থ শেষ হয়ে যাবে বা অসুস্থ হয়ে যাবে বা মৃত্যু বরণও করতে পারে। হজ্জ আদায় করার শর্ত পূর্ণ হলে এবং হজ্জের সফরে ধর্মীয় ও চারিত্রিক দিক থেকে নির্ভরযোগ্য সাথী থাকলে, সন্তানদেরকে হজ্জ আদায় করতে বাধা দেয়া পিতা-মাতার জন্য জায়েয নয়।

হজ্জ ওয়াজিব হলে, হজ্জ ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নির্দেশ মান্য করা চলবে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টিকুলের আনুগত্য করা যাবে না। তবে বাবা-মা যদি তাদেরকে নিষেধের ব্যাপারে কোন শরঈ কারণ উপস্থাপন করে, তখন তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৪৫১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কি হজ্জ করা আবশ্যক ?

উত্তরঃ মানুষের উপর যদি এমন ঋণ থাকে যা পরিশোধ করার জন্য তার সমস্ত সম্পদ দরকার, তবে তার উপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা আল্লাহ্ তো শুধুমাত্র সামর্থবান মানুষের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। তিনি এরশাদ করেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"মানুষের উপর আল্লাহ্র অধিকার এই যে, যারা এই ঘর পর্যন্ত আসার সমর্থ রাখে তারা এর হজ্জ পালন করবে।" (সূরা আল ইমরানঃ ৯৭)

সুতরাং ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি তো সামর্থবান নয়। অতএব প্রথমে সে ঋণ পরিশোধ করবে তারপর সম্ভব হলে হজ্জ আদায় করবে। কিন্তু ঋণ যদি কম হয় এবং ঋণ পরিশোধ করে হজ্জে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করার সমান খরচ বিদ্যমান থাকে, তবে হজ্জ করবে। হজ্জ চাই ফরয হোক বা নফল। কিন্তু ফরয হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়। আর নফল হজ্জ তো ইচ্ছাধীন। মন চাইলে করবে মন চাইলে করবে না, কোন গুনাহ্ হবে না।

বদলী হজ্জ

প্রশ্নঃ (৪৫২) মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য জনৈক লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে; কিন্তু পরে জানা গেল এ লোক আরো কয়েকজনের হজ্জ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছে। এ সময় করণীয় কি ? এ লোকের বিধান কি ?

উত্তরঃ প্রত্যেক মানুষের উচিত হচ্ছে, যে কোন কাজ করার পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া। ধর্মীয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য না হলে তাকে কোন কাজের দায়িত্ব দিবে না। লোকটি বিশ্বস্ত কিনা, যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা, তার নিকট সে ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিনা প্রভৃতি যাচাই বাছাই করবে।

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই আপনার পিতা বা মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য এমন লোক নির্বাচন করবেন, যিনি জ্ঞান ও ধর্মীয় দিক থেকে বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য। কেননা অনেক মানুষ হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। যথাযোগ্য নিয়মে হজ্জ আদায় করে না। যদিও তারা নিজেদের ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। কিন্তু তারা ধারণা করে এটুকুই তাদের উপর ওয়াজিব। অথচ তারা অনেক ভুল করে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এ ধরণের মানুষের কাছে হজ্জের দায়িত্ব প্রদান করা উচিত নয়।

আবার অনেক লোক এমন আছে, যারা হয়তো হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখে কিন্তু তারা আমানতদার নয়। ফলে হজ্জের কার্যাদি আদায় করার ক্ষেত্রে কথা ও কাজে কোন গুরুত্বারোপ করে না। শুধুমাত্র দায়সারা গোছের কাজ করে। এ ধরণের লোকের কাছে হজ্জ পালনের আমানত অর্পন করা উচিত নয়। সুতরাং হজ্জের দায়িত্ব প্রদান করার জন্য দ্বীন ও আমানতদারীতে নির্ভর করা যায় এ রকম লোক অনুসন্ধান করা জরূরী।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যে কয়জনের হজ্জের দায়িত্ব নিয়েছে- হতে পারে সে অন্য লোকদের দ্বারা তাদের হজ্জগুলো আদায় করে দিবে। কিন্তু এরূপ করাও কি তার জন্য জায়েয হবে ? অর্থাৎ- হজ্জ বা ওমরা আদায় করে দেয়ার জন্য কয়েক জনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেয়ার পর সরাসরি উহা নিজে আদায় না করে অন্য লোককে দায়িত্ব দেয়া কি জায়েয হবে?

উত্তরঃ এটাও জায়েয বা বৈধ নয়। এটা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ। কেননা

এটা হজ্জ-ওমরা নিয়ে ব্যবসা করা। মানুষের হজ্জ-ওমরা আদায় করে দেয়ার নাম করে তাদের নিকট থেকে পয়সা নেয়; অতঃপর কম মূল্যে অন্য লোককে নিয়োগ করে। এতে সে অন্যায়ভাবে কিছু সম্পদ কামাই করল। কেননা হতে পারে হজ্জের দায়িত্ব প্রদানকারী এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করা উচিত। মানুষের অর্থ নিজের পকেটে ঢুকানোর আগে চিন্তা করা উচিত এটা কি ঠিক হল না বেঠিক?[1]

ইহরাম বাঁধার পর হজ্জ-ওমরা আদায় করতে অক্ষম হলে

প্রশ্নঃ (৪৫৩) অতিবৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তি ওমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছার পর ওমরা আদায় করতে অপারগ হয়ে গেছে এখন সে কি করবে ?

উত্তরঃ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে, অতঃপর ওমরা আদায় করবে। কিন্তু যদি ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে থাকে, তবে ইহরাম খুলে ফেলবে, তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। তাকে ওমরা পূর্ণ করতে হবে না এবং বিদায়ী তওয়াফও করতে হবে না। ইহরামের সময় শর্ত করার নিয়ম হচ্ছেঃ এই দু'আ পাঠ করবেঃ [আল্লাহুম্মা ইন হাবাসানী হাবেসুন ফা মাহেল্লী হায়সু হাবাসতানী] "হে আল্লাহ্! কোন কারণে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই (হজ্জ-ওমরার কাজ সমাধা করতে না পরি), তবে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হব, সেটাই আমার হালাল হওয়ার স্থান।"[2]

কিন্তু যদি উক্ত শর্ত না করে আর ওমরা আদায় কোন ক্রমেই সম্ভব না হয়, তবে সে ইহরাম খুলে ফেলে হালাল হয়ে যাবে এবং ফিদ্‌ইয়া হিসেবে একটি কুরবানী করে দিবে যদি সামর্থ থাকে। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ-ওমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাগ্রস্থ হও তবে যা সহজপ্রাপ্য তাই কুরবানী কর। আর কুরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুন্ডন করবে না।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৬) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৬ষ্ঠ হিজরী সনে ওমরা পালন করতে গেলে হুদায়বিয়া নামক এলাকায় মক্কার কাফেরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানেই কুরবানী যবেহ করেন এবং হালাল হয়ে যান।

প্রশ্নঃ (৪৫৪) বদলী হজ্জ করার পর কিছু অর্থ অতিরিক্ত থেকে গেলে কি করবে ?

উত্তরঃ বদলী হজ্জ করার জন্য যদি অর্থ নিয়ে থাকে, আর হজ্জ সম্পাদন করার পর কিছু অর্থ তার কাছে থেকে যায়, তবে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক নয়। তবে অর্থ দাতা প্রদান

---

[1] . উল্লেখ্য যে, হজ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় যদি তাকে বলে নেয় যে, আমি নিজে না পারলে আমার দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য কোন লোককে দিয়ে আপনার এই হজ্জ পালন করিয়ে দিব। একথায় যদি দায়িত্ব প্রদানকারী রাজি হয়, তবে অন্য লোক দ্বারা হজ্জ করানোতে কোন অসুবিধা নেই।- অনুবাদক।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ হা/ ৪৬৯৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ হা/ ২১০১।

করার সময় যদি এরূপ বলে যে, 'এই অর্থ থেকে যা লাগে তা দিয়ে হজ্জ করবেন।' তবে হজ্জ শেষে কোন কিছু বাকী থাকলে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক। সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা ফেরত নাও নিতে পারে, ইচ্ছা করলে ফেরত নিতে পারে। কিন্তু অর্থ দেয়ার সময় যদি এরূপ বলে, 'এই অর্থ দ্বারা আপনি হজ্জ করবেন।' তাহলে যা বাকী থাকবে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক নয়। অবশ্য এভাবে প্রদান করার সময় প্রদানকারী যদি না জানে যে হজ্জের খরচ কত লাগতে পারে তাই তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দেয়, তখন তার পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পাদনকারীর এ কথা বলা ওয়াজিব যে, আপনার অর্থ দ্বারা আমি হজ্জ সম্পাদন করেছি ঠিকই; কিন্তু তাতে এই পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে। বাকীটা আমার কাছে রয়ে গেছে। এখন সে যদি তাকে উহা গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অন্যথা তা ফেরত দিতে হবে।

কারো পক্ষ থেকে হজ্জ বা ওমরা করলে নিজের জন্য দু'আ করা যাবে কি ?

প্রশ্নঃ (৪৫৫) পুত্র যদি পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ বা ওমরা সম্পাদন করে, তবে নিজের জন্য দু'আ করতে পারবে কি ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, সে হজ্জ বা ওমরা অবস্থায় নিজের জন্য তার পিতার জন্য এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য দু'আ করতে পারবে। কেননা কারো পক্ষ থেকে হজ্জ-ওমরা আদায় করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার পক্ষ থেকে নিয়ত করে বাহ্যিক ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত কর্ম সমূহ আদায় করা। কিন্তু দু'আর বিষয়টি হজ্জ বা ওমরার কোন ফরয বা ওয়াজিব বা শর্ত নয়। তাই যার জন্য হজ্জ বা ওমরা করছে তার জন্য, নিজের জন্য, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দু'আ করতে পারবে।

প্রশ্নঃ (৪৫৬) হজ্জ বা ওমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করার বিধান কি ?

উত্তরঃ বদলী হজ্জ বা ওমরা করার দু'টি অবস্থাঃ

প্রথম অবস্থাঃ তার পক্ষ থেকে ফরয হজ্জ বা ওমরা আদায় করবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ তার পক্ষ থেকে নফল হজ্জ বা ওমরা আদায় করবে।

ফরয হজ্জ বা ওমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। তবে কোন বাধার কারণে যদি মক্কা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব না হয়- যেমন, কঠিন অসুখ যা ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই অথবা অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছে ইত্যাদি, তাহলে তার পক্ষ থেকে কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করাবে। কিন্তু অসুস্থতা যদি এমন হয় যে তা থেকে আরোগ্য পাওয়ার আশা আছে, তবে অপেক্ষা করবে এবং সুস্থ হলে নিজেই নিজের হজ্জ-ওমরা সম্পাদন করবে। কেননা কোন বাধা না থাকলে হজ্জ বা ওমরার ব্যাপারে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"মানুষের উপর আল্লাহ্‌র অধিকার এই যে, যারা এই ঘর পর্যন্ত আসার সমর্থ রাখে তারা ইহার হজ্জ পালন করবে।" (সূরা আল ইমরানঃ ৯৭) ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ উহা নিজে বাস্তবায়ন করবে; যাতে করে আল্লাহ্‌র জন্য তার দাসত্ব-গোলামী ও বিনয়ের পূর্ণতা লাভ করে। আর নিঃসন্দেহে অন্যকে দায়িত্ব দিলে ইবাদতের এই মহান উদ্দেশ্য সঠিকভাবে আদায় হবে না।

কিন্তু সে যদি নিজের ফরয হজ্জ ও ওমরা আদায় করে থাকে, অতঃপর আবার তার পক্ষ থেকে নফল হজ্জ বা ওমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করে, তবে জায়েয হবে কি না ? এ ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, জায়েয। কেউ বলেছেন, নাজায়েয। আমার মতে যেটা সঠিক মনে হয়, তা হচ্ছে নাজায়েয। অর্থাৎ- নফল হজ্জ আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা ইবাদতের মূলনীতি হচ্ছে, ব্যক্তি নিজে তা আদায় করবে। যেমন করে নিজের পক্ষ থেকে রোযা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। অবশ্য ফরয রোযা কাযা রেখে যদি কেউ মৃত্যু বরণ করে, তবে তার পক্ষ থেকে পরিবারের যে কেউ তা আদায় করে দিবে। অনুরূপ হচ্ছে হজ্জ। এটি এমন একটি ইবাদত যা আদায় করার জন্য শারিরীক পরিশ্রম আবশ্যক। এটা শুধু আর্থিক ইবাদত নয়। আর ইবাদত যদি শারিরীক হয়, তবে উহা অন্যকে দিয়ে আদায় করলে বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু হাদীছের দলীলের ভিত্তিতে যেটুকু অনুমতি পাওয়া যায় তার কথা ভিন্ন। আর বদলী নফল হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে হাদীছে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ইমাম আহমাদ থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার একটি বর্ণনা আমাদের কথার সমর্থক। অর্থাৎ নফল হজ্জ বা ওমরা আদায় করার জন্য কাউকে নিয়োগ করা যাবে না। চাই তার সামর্থ থাক বা না থাক।

আমাদের এই মতানুযায়ী সম্পদশালী লোককে নিজেই নিজের হজ্জ বা ওমরা আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কেননা অনেক মানুষ এমন আছে, বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে অথচ কখনো তারা মক্কা সফর করে নি। এই যুক্তিতে যে, সে তো প্রতি বছর তার পক্ষ থেকে হজ্জ বা ওমরা আদায় করার জন্য কাউকে না কাউকে প্রেরণ করে থাকে। অথচ তাদের জানা নেই যে, এ দ্বারা ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য আদায় হয় না।

প্রশ্নঃ (৪৫৭) মৃতের পক্ষ থেকে ওমরা আদায় করা কি জায়েয ?

উত্তরঃ মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ বা ওমরা আদায় করা জায়েয। অনুরূপভাবে তওয়াফ এবং যাবতীয় নেক আমল তার পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েয। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, যে কোন নৈকট্যপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করে যদি তার ছওয়াব জীবিত বা মৃতের জন্য দান করে দেয়, তবে সে উপকৃত হবে। কিন্তু ছওয়াব দান করার চাইতে মৃতের জন্য দু'আ করা বেশী উত্তম। দলীল হচ্ছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ তিনি বলেন,

(إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

"মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তিনটি আমল ছাড়া তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। (১) সাদকায়ে জারিয়া (২) উপকারী ইসলামী বিদ্যা (৩) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করবে।"[1] এই হাদীছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বলেন নি, সৎ সন্তান, যে তার জন্য ইবাদত করবে বা কুরআন পড়বে বা নামায পড়বে কিংবা ওমরা করবে বা রোযা রাখবে ইত্যাদি। অথচ হাদীছটিতে প্রথমে দু'টি আমলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মৃতের জন্য আমল করা উদ্দেশ্য হত, তবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই বলতেন, "এবং সৎ সন্তান, যে তার জন্য আমল করবে।" কিন্তু মানুষ যদি কোন নেক আমল করে তার ছওয়াব কারো জন্য দান করে দেয়, তবে তা জায়েয।[2]

মাহরাম ছাড়া নারীর হজ্জ সম্পাদন করার বিধান

প্রশ্নঃ (৪৫৮) মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কোন নারী যদি হজ্জ সম্পাদন করে, তবে কি উহা বিশুদ্ধ হবে? বুদ্ধিমান বালক কি মাহরাম হতে পারে ? মাহরাম হওয়ার জন্য কি কি শর্ত আবশ্যক ?

উত্তরঃ তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু মাহরাম ছাড়া সফর করা হারাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাফরমানী। কেননা তিনি এরশাদ করেন, "নারী কোন মাহরাম ছাড়া যেন সফর না করে।"[3] বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি এমন বালক মাহরাম হতে পারে না। কেননা তার নিজেরই তো অভিভাবক ও তত্বাবধান দরকার। অতএব এধরণের মানুষ কি করে অন্যের অভিভাবক বা তত্বাবধায়ক হতে পারে ?

মাহরাম ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে, সে মুসলিম হবে, পুরুষ হবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হবে এবং বিবেক সম্পন্ন হবে। এগুলো শর্তের কোন একটি না থাকলে সে মাহরাম হতে পারবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আফসোসের সাথে লক্ষ্য করা যায়, অনেক নারী মাহরাম ছাড়া একাকী উড়োজাহাজে সফর করে থাকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, মাহরাম পুরুষ তাদেরকে এয়ারপোর্টে বিমানে তুলে দেয় এবং পরবর্তী এয়ারপোর্টে আরেক মাহরাম তাদেরকে রিসিভ করে থাকে। আর সে তো উড়োজাহাজের মধ্যে নিরাপদেই থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তিটি অসাড়ঃ কেননা তার মাহরাম তো এরোপ্লেনে তাকে উঠিয়ে দিতে পারে না। খুব বেশী

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ ওছিয়ত, অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর পর মানুষের কাছে যে ছওয়াব পৌঁছে থাকে তার বর্ণনা।

[2]. কিন্তু সম্মানিত শায়খ সাহেবের এই কথাটি স্ববিরোধী। কেননা নামায, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি তো নেক আমল। তাহলে কি নামায পড়ে, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি নেক আমল করে মৃতের জন্য হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করা যাবে? কখনই নয়। কেননা এগুলোর পক্ষে কোন দীলল নেই। কিন্তু হজ্জ আদায় করা, রোযা বাকী রেখে মৃত্যু বরণ করলে তার পক্ষ থেকে রোযা করা, দান-সাদকা করা প্রভৃতির পক্ষে দলীল বিদ্যমান। অতএব এটাই কি ইনসাফ নয় যে, আমরা প্রতিটি বিষয়কে দলীলের সাথে সম্পৃক্ত করে কথা বলব? যেটার পক্ষে দলীল পাওয়া যাবে সেটা জায়েয, দলীল না পাওয়া গেলে নাজায়েয। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। - অনুবাদক

[3]. বুখারী অধ্যায়ঃ শিকারের জরিমানা, অনুচ্ছেদঃ নারীর হজ্জ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জের সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা।

তাকে ওয়েটিং হল বা ইমিগ্রেশন পর্যন্ত ছেড়ে আসতে পারে। কখনো প্লেন ছাড়তে দেরী হতে পারে। কখনো কারণ বশতঃ গন্তব্য এয়ারপোর্টে প্লেন অবতরণ করা সম্ভব হয় না। তখন এ নারীর কি অবস্থা হবে ? কখনো হয়তো গন্তব্য এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করল ঠিকই কিন্তু মাহরাম ব্যক্তিটি তাকে রিসিভ করতে পারল না। হয়তো সে অসুস্থ হয়ে গেল, কোন সড়ক দুর্ঘটনা হল ইত্যাদি যে কোন কারণ ঘটতে পারে।

উল্লেখিত কারণগুলো কোনটিই হল না। ঠিকঠাক মত প্লেন উড়ল, গন্তব্য এয়ারপোর্টে মাহরাম তাকে রিসিভ করল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে-প্লেনের মধ্যে তার সিটের পাশে এমন লোক বসেছে, যে আল্লাহকে ভয় করে না, ফলে সে নারীকে বিরক্ত করতে পারে বা নারীই তার প্রতি আসক্ত হতে পারে। তাহলেই তো নিষিদ্ধ ফেতনার বীয বপন হয়ে গেল- যেমনটি কারো অজানা নয়।

অতএব নারীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং কোন মাহরাম ছাড়া কখনো সফরে বের না হওয়া। অভিভাবক পুরুষদের উপরও ওয়াজিব হজ্জে তাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা, নারীদের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় না দেয়া, নিজেদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা। প্রত্যেকে তার পরিবার সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা এদেরকে আল্লাহ্ তাদের কাছে আমানত রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"হে ঈমানদরগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।" (সূরা তাহরীমঃ ৬)

সহদোর বোন, তার স্বামী ও মায়ের সাথে ওমরায় যাওয়া

প্রশ্নঃ (৪৫৯) জনৈক নারীর কথা হচ্ছে, আমি রামাযানে ওমরা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। কিন্তু আমার সাথে থাকছে আমার সহদোর বোন, তার স্বামী ও আমার মা। এই ওমরায় যাওয়া কি আমার জন্য জায়েয হবে ?

উত্তরঃ এদের সাথে ওমরায় যাওয়া আপনার জন্য জায়েয হবেনা। কেননা বোনের স্বামী আপনার মাহরাম নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি শুনেছি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবায় বলেনঃ

(لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)

"কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জন না হয়। মাহরাম ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে।" তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল আমার স্ত্রী হজ্জ আদায় করার জন্য বের হয়ে গেছে। আর আমি উমুক উমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি? নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ পালন কর।"[1] নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছে কোন ব্যাখ্যা চাইলেন না তোমার স্ত্রীর সাথে কি অন্য কোন নারী আছে না নেই? সে কি যুবতী না বৃদ্ধা? রাস্তায় সে কি নিরাপদ না নিরাপদ নয়? প্রশ্নকারী এই নারী মাহরাম না থাকার কারণে যদি ওমরায় না যায়, তবে তার কোন গুনাহ্ হবে না। যদিও ইতোপূর্বে সে কখনো ওমরা না করে থাকে। কেননা হজ্জ-ওমরা ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে নারীর মাহরাম থাকা।

প্রশ্নঃ (৪৬০) হজ্জের মাস কি কি ?

উত্তরঃ হজ্জের সময় শুরু হয় শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং শেষ হয় যিলহজ্জের দশ তারিখে তথা ঈদের দিনে বা জিলহজ্জের শেষ তারিখে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা আল্লাহ্ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَـــاتٌ "হজ্জের মাস সমূহ সুনির্দিষ্ট জানা।" এখানে বহুবচন أشهر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা হাকীকী অর্থে ব্যবহার হবে। অর্থাৎ এই তিনটি মাসে হজ্জের কাজ চলবে। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, এ তিন মাসের যে কোন দিনে হজ্জের কাজ করতে হবে। [অর্থাৎ- শাওয়ালের প্রথমেই কেউ যদি হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধে এবং তওয়াফ সাঈ করে, তবে তা হজ্জের জন্যই হল। কিন্তু আরাফাত এবং তৎপরবর্তী কাজের জন্য তো সময় নির্ধারণ করাই আছে।] আর যিলহজ্জের শেষ নাগাদ হজ্জের সময় প্রলম্বিত একথার অর্থ হচ্ছে, হজ্জের তওয়াফ এবং সাঈ যিলহজ্জের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয আছে। এর পর আর বিলম্বিত করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি কোন ওযর থাকে সে কথা ভিন্ন। যেমন হজ্জের তওয়াফ করার পূর্বে কোন নারীর নেফাস শুরু হয়ে গেল। নেফাস অবস্থা শেষ হতে হতে যিলহজ্জ মাস পার হয়ে গেল। তার এই ওযর গ্রহণযোগ্য নেফাস শেষ হলেই সে তওয়াফ ও সাঈ সম্পাদন করবে।

ওমরার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। বছরের যে কোন সময় উহা সম্পাদন করা যায়। কিন্তু রামাযানে ওমরা করলে হজ্জের সমান ছাওয়াব লাভ করা যায়। হজ্জের মাস গুলিতেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর যাবতীয় ওমরা আদায় করেন। হুদায়বিয়ার ওমরা যিল-কা'দ মাসে। কাযা ওমরা আদায় করেছেন যিল-কা'দ মাসে,

[1]. বুখারী অধ্যায়ঃ শিকারের জরিমানা, অনুচ্ছেদঃ নারীর হজ্জ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জের সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা।

জে'রানার ওমরাও ছিল যিল-কা'দ মাসে। আর বিদায় হজ্জের সাথের ওমরাও ছিল যিল-কা'দ মাসে। এতে বুঝা যায় হজ্জের মাস সমূহে ওমরা করার আলাদা বৈশিষ্ট ও ফযীলত রয়েছে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমরা আদায় করার জন্য এ মাসগুলোকেই নির্বাচন করেছেন।

প্রশ্নঃ (৪৬১) হজ্জের মাস সমূহ আসার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধার বিধান কি ?

উত্তরঃ হজ্জের মাস সমূহ আসার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

কেউ বলেন, এটা বিশুদ্ধ হবে এবং হজ্জের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে। তবে হজ্জের মাস আগমণ করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। দ্বিতীয় মতঃ তার এই ইহরাম হজ্জের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে না। তবে তা ওমরা হয়ে যাবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,(دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ) "ওমরা হজ্জের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।"[1] তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমরাকে ছোট হজ্জ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন আমর বিন হাযমের বিখ্যাত মুরসাল হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। যা লোকেরা সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে।[2]

প্রশ্নঃ (৫৬২) হজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান সমূহ কি কি ?

উত্তরঃ হজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান সমূহ হচ্ছে পাঁচটিঃ (১) যুল হুলায়ফা (২) জুহ্‌ফা (৩) ইয়ালামলাম (৪) কারণে মানাযেল (৫) যাতু ঈরক্ব।

১) যুল হুলায়ফাঃ যাকে বর্তমানে আবা'রে আলী বলা হয়। ইহা মদীনার নিকটবর্তী। মক্কা থেকে এর অবস্থান ১০ মারহালা দূরে (বর্তমান হিসেবে প্রায় ৪০০ কিঃ মিঃ)। মক্কা থেকে এটি সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। এটি মদীনাবাসী এবং সেপথ দিয়ে গমণকারী অন্যান্যদের মীক্বাত।

২) জুহ্‌ফাঃ শাম তথা সিরিয়াবাসীদের মক্কা গমণের পথে পুরাতন একটি গ্রামের নাম জুহ্‌ফা। সেখান থেকে মক্কার দূরত্ব ৩ মারহালা। (বর্তমানে প্রায় ১৮৬ কিঃ মিঃ)। এটা এখন আর গ্রাম নেই। বর্তমানে লোকেরা এর বদলে পার্শবর্তী স্থান রাবেগ থেকে ইহরাম বাঁধে।

৩) ইয়ালামলামঃ ইয়ামানের লোকদের মক্কা আগমণের পথে একটি পাহাড় বা একটি স্থানের নাম ইয়ালামলাম। বর্তমানে এ স্থানকে সা'দিয়া বলা হয়। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা। (বর্তমানে প্রায় ৯২ কিঃ মিঃ।)

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জের মাস সমূহে ওমরা করা জায়েয।

[2] . দারাকুতনী ২/২৮৫ হা/ (১২২)

৪) কারণে মানাযেলঃ নজদ তথা পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের মক্কা গমণের পথে তায়েফের কাছে একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে একে সায়লুল কাবীর বলা হয়। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা (বর্তমানে প্রায় ৭৮ কিঃ মিঃ।)

৫) যাতু ইরক্বঃ ইরাকের অধিবাসীদের মক্কা আগমণের পথে একটি স্থানের নাম। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা। (বর্তমানে প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ।)

প্রথম চারটি মীক্বাত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত।[1] শেষেরটিও আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারণকৃত মীক্বাত। যেমনটি নাসাঈ ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।[2] কিন্তু যাতু ইরক্বের ব্যাপারে ছহীহ্ সূত্রে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি উহা কূফা ও বস্‌রার অধিবাসীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তারা এসে অভিযোগ করল, হে আমীরুল মু'মেনীন! নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নজদবাসীদের জন্য কারণে মানাযেলকে (তায়েফ) মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে অনেকটা পথ ঘুরে সেখানে যেতে হয় এবং আমাদের অনেক কষ্ট হয়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের পথে ঐ মীক্বাতের বরাবর কোন স্থান তোমরা অনুসন্ধান কর। তখন যাতু ইরক্ব মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।[3]

মোটকথা, যদি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয় তবে তো কোন প্রশ্ন নেই। যদি প্রমাণিত না হয়, তবে উহা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর সুন্নাত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি চার খলীফার মধ্যে অন্যতম। যারা ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত এবং তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ওমরের সমর্থনে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে কয়েকটি বিধান নাযিল করেছেন। আয়েশা বর্ণিত হাদীছটি যদি ছহীহ্ হয়, তবে এটাও তাঁর প্রতি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমর্থন। তাছাড়া ওমরের নির্দেশ যুক্তি সংগত। কেননা কোন মানুষ যদি মীক্বাত থেকে ভিতরে যেতে চায় তবে সেখান থেকেই তাকে ইহরাম বাঁধতে হবে। কিন্তু এ স্থানের বরাবর কোন পথ দিয়ে ভিতরে যেতে চাইলে মীক্বাত অতিক্রমকারী হিসেবে উক্ত স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

ওমর (রাঃ) এর এই হাদীছে বর্তমান যুগে আমাদের জন্য বিরাট ধরণের উপকার বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, কোন মানুষ যদি বর্তমান যুগে এরোপ্লেনযোগে হজ্জ বা ওমরা করতে আসতে চায়, তবে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যে মীকাতের উপর দিয়ে যাবে তার

---

[1]. বুখারী অধ্যায়ঃ হজ্জ অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ওমরার জন্য মক্কাবাসীদের মীক্বাত। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ওমরার জন্য মীক্বাতের স্থান।

[2]. নাসাঈ, অধ্যায়ঃ হজ্জ অনুচ্ছেদঃ ইরাকবাসীদের মীকাত। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ হজ্জ অনুচ্ছেদঃ মীকাতের বর্ণনা।

[3]. বুখারী অধ্যায়ঃ হজ্জ অনুচ্ছেদঃ ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত হচ্ছে যাতু ইরক্ব।

বরাবর হলেই তাকে ইহরাম বাঁধতে হবে। বিলম্ব করা বৈধ হবে না এবং জেদ্দায় গিয়ে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না- যেমনটি অনেক লোক করে থাকে। কেননা স্থল পথে হোক, বা আকাশ পথে হোক বা সমুদ্র পথে হোক কোন পার্থক্য নেই-মীকাতের বরাবর হলেই ইহরাম বাঁধতে হবে। এজন্য হজ্জ যাত্রী যে দেশেরই হোক সমুদ্র পথে মক্কা আসতে চাইলে ইয়ালামলাম বা রাবেগের বরাবর হলে তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪৬৩) বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কি ?

উত্তরঃ বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমকারী দু'প্রকারের লোক হতে পারেঃ

১)হজ্জ বা ওমরা আদায় করার ইচ্ছা করেছে। তাহলে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে হজ্জ বা উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে আসা। যদি এরূপ না করে তাহলে একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে বিদ্বানদের মতে ফিদ্‌ইয়া বা জরিমানা দিতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া।

২) হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্য ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা। এ অবস্থায় তার কোন অসুবিধা নেই। চাই মক্কায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করুক বা স্বল্প সময়। কেননা এ অবস্থায় যদি ইহরাম আবশ্যক করা হয় তবে প্রতিবার আগমণে হজ্জ বা ওমরা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবনে একবারের বেশী হজ্জ বা ওমরা আবশ্যক নয়। এর বেশী হলে সবই হবে নফল। বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমের ব্যাপারে বিদ্বানদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

প্রশ্নঃ (৪৬৪) 'লাব্বাইক্' বলাটাই কি ইহরামে প্রবেশ করার নিয়ত ?

উত্তরঃ হজ্জ বা ওমরার কাজে প্রবেশ করার জন্য অন্তরে নিয়ত (ইচ্ছা বা সংকল্প) করে পাঠ করবেঃ 'লাব্বাইকা ওমরাতান' আর হজ্জের জন্য বলবে, 'লাব্বাইকা হজ্জান্'। কিন্তু এরূপ বলা জায়েয নয়ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা' অথবা 'উরীদুল হাজ্জা'। বা নাওয়াইতু আন আ'তামিরা উমরাতান্। বা নাওয়াইতু আন আহুজ্জা হাজ্জান্। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এগুলো প্রমাণিত নেই।

প্রশ্নঃ (৪৬৫) আকাশপথে আগমণকারী কিভাবে ইহরাম বাঁধবে ?

উত্তরঃ হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে আকাশ পথে আগমণকারী যে স্থানের উপর দিয়ে যাবে সে এলাকার মীকাতের বরাবর হলে ইহরাম বাঁধবে। তাই গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রথমে বাড়িতেই প্রস্তুতি নিবে। তারপর মীক্বাত পৌঁছার পূর্বে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। মীকাতের বরাবর পৌঁছলেই অন্তরে নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে ফেলবে। দেরী করবে না। কেননা এরোপ্লেন দ্রুত চলে। মিনিটেই অনেক পথ এগিয়ে যায়। অনেক মানুষ এক্ষেত্রে ভুল করে। পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। "আমরা মীকাতের বরাবর পৌঁছেছি" প্লেনের ক্রুর এ ঘোষণা

শোনার পর তাড়াহুড়া শুরু করে। পরনের কাপড় খুলে ইহরামের কাপড় পরিধান করে। এটি মারাত্মক ভুল।

অবশ্য প্লেনের দায়িত্বশীল অফিসারের উচিত হচ্ছে, মীকাতের বরাবর পৌঁছার কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে ঘোষণা দেয়া। যাতে করে লোকেরা সতর্ক হয় এবং ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। তবে হাজী সাহেবগণ যদি প্লেনে উঠার পূর্বে ইহরামের কাপড় পরিধান করে নেন, তাহলে এটা তাদের জন্য অতি উত্তম হয়। মীকাতের বরাবর হলে সংকেত বা ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথেই তারা ইহরামের দু'আ পড়ে ইহরাম বেঁধে ফেলবেন।

প্রশ্নঃ (৪৬৬) ওমরার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কি ?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মীকাত অতিক্রম করতে চায় সে যেন ইহরাম ছাড়া অতিক্রম না করে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মদীনাবসীগণ ইহরাম বাঁধবে যুল হুলায়ফা থেকে..।"[1] অর্থাৎ তাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম না করা। যদি করেই ফেলে তবে ওয়াজিব হচ্ছে মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা গমণ করা। এতে তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু যদি ফিরে না আসে এবং মীকাত অতিক্রম করার পর ইহরাম বাঁধে তবে বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া।

উড়োজাহাজে কিভাবে নামায আদায় করবে ও ইহরাম বাঁধবে ?

উত্তরঃ প্রথমতঃ উড়োজাহাজে নামায পড়ার পদ্ধতিঃ

১) নফল নামাযের পদ্ধতি হচ্ছে, বিমানের সিটে বসে বসেই নামায আদায় করবে। ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সিজদা করবে। সিজদার জন্য রুকূর চাইতে একটু বেশী মাথা ঝুকাবে।

২) সময় হলেই উড়োজহাজের উপর নামায আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু নামাযের নির্দিষ্ট সময় বা দু'নামায একত্রিত করার সময় শেষ হওয়ার আগেই যদি বিমান অবতরণ করার সম্ভাবনা থাকে, আর যমীনে থাকাবস্থায় যেভাবে নামায আদায় করতে হয় সেভাবে যদি বিমানের উপর সম্ভব না হয়, (যেমন- কিবলামুখী হওয়া, রুকূ', সিজদা, কওমা ও বসা প্রভৃতি করা যদি সম্ভব না হয়) তবে সেখানে ফরয নামায আদায় করবে না। বরং অবতরণ করার পর যমীনে নামায আদায় করবে। যেমনঃ জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে বিমান উড্ডয়ন করল। এখন আকাশে থাকাবস্থায় মাগরিব নামায আদায় করবে না। পরবর্তী এয়ারপোর্টে

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মদীনাবাসীদের মীকাত।

বিমান অবতরণ করার পর নামায পড়বে। কিন্তু যদি দেখে যে, মাগরিব নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে এশা নামাযের সাথে মাগরিবকে একত্রিত করার নিয়ত করে নিবে। অতঃপর অবতরণ করে মাগরিব নামাযকে দেরী করে এশার সময় একত্রিত আদায় করবে। কিন্তু যদি বিমান চলতেই থাকে-অবতরণের সম্ভাবনা না থাকে এবং এশা নামাযেরও সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে বিমানের উপরেই সময় অতিক্রম হওয়ার আগেই মাগরিব ও এশা নামায একত্রিত আদায় করে নিবে।

৩) বিমানের উপর ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি হচ্ছে, ক্বিবলামুখী দন্ডায়মান হয়ে তাকবীর দিবে। ছানা, সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকূ করবে। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদা করবে। নিয়ম মাফিক সিজদা করতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং বসাবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে সিজদা করবে। নামায শেষ করা পর্যন্ত এরূপই করবে। আর পূর্ণ সময় ক্বিবলামুখী হয়েই থাকবে। কিন্তু ক্বিবলা চিনতে না পারলে বা নির্ভরযোগ্য কেউ তাকে কিবলার সন্ধান দিতে না পারলে নিজ অনুমান ও গবেষণা অনুযায়ী নামায আদায় করলে কোন অসুবিধা হবে না।

৪) উড়োজাহাজে মুসাফির নামায কসর করবে। চার রাকাত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত করে আদায় করবে।

দ্বিতীয়তঃ উড়োজাহাজে হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধার পদ্ধতিঃ

১) এয়ারপোর্টে আসার আগেই গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করবে। এবং এয়ারপোর্টে এসে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে।

২) প্লেন মীকাতের নিকটবর্তী হলে যদি ইহরামের কাপড় পরিধান না করে থাকে তবে পরিধান করবে।

৩) মীকাতের বরাবর হলেই অন্তরে নিয়ত করে হজ্জ বা ওমরার জন্য তালবিয়া পড়ে ইহরামে প্রবেশ করবে।

৪) মীকাতের বরাবর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বেই যদি সতর্কতা বশতঃ বা খেয়াল থাকবে না এই ভয়ে ইহরাম বেঁধে নেয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৪৬৭) কোন ব্যক্তি যদি নিজ দেশ থেকে জেদ্দা সফর করে অতঃপর ওমরাহ আদায় করার ইচ্ছা করে। সে কি জেদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে?

উত্তরঃ এ মাসআলাটির দু'টি অবস্থাঃ

প্রথমঃ লোকটি ওমরার নিয়ত না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কাজে জেদ্দা সফর করেছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর ওমরা করার ইচ্ছা হয়েছে, তবে সে জেদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) এর হাদীছে মীক্বাতের আলোচনায় বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি এই মীক্বাত সমূহের মধ্যে অবস্থান করে, সে

যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।"[1]

দ্বিতীয়ঃ দৃঢ়ভাবে ওমরার নিয়ত করেই জেদ্দা সফর করেছে। তাহলে যে মীক্বাতের নিকট দিয়ে গমণ করবে তাকে অবশ্যই সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না। কেননা জেদ্দার অবস্থান মীক্বাতের সীমানার মধ্যে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি মীক্বাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْــرَةَ) "এগুলো স্থান সেখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং যারা এর বাইরে থাকে সেখান দিয়ে যেতে চায় তাদের জন্য ইহরাম বাঁধার মীক্বাত-যারা হজ্জ ও ওমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে।"[2]

যদি জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধে এবং মক্কা প্রবেশ করে, তবে বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদ্ইয়া স্বরূপ মক্কায় একটি কুরবানী করতে হবে এবং তার গোস্ত মক্কার ফক্বীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। তাহলেই তার ওমরা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। জেদ্দা যাওয়ার আগে যদি ওমরার নিয়ত করে থাকে এবং বিনা ইহরামে জেদ্দা প্রবেশ করে, তবে নিকটবর্তী কোন মীকাতে ফেরত গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। এতে কোন ফিদ্ইয়া লাগবে না।

প্রশ্নঃ (৪৬৮) ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর গোসল করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ইহরামে প্রবেশ করার পর গোসল করতে কোন বাধা নেই। কেননা ইহা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। চাই একবার গোসল করুক বা দু'বার। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে জানাবাতের (নাপাকীর) গোসল করা ওয়াজিব। আর ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (৪৬৯) মৃত দাদার পক্ষ থেকে হজ্জ করার বিধান কি ? অবশ্য তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়কারী পূর্বে নিজের হজ্জ সম্পাদন করেছে।

উত্তরঃ যে মৃত দাদা নিজের হজ্জ করেনি তার পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পাদন করা জায়েয। কেননা সুন্নাতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৪৭০) ইহরামের জন্য বিশেষ কোন নামায আছে কি ?

উত্তরঃ ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট কোন নামায নেই। কিন্তু কোন লোক যদি এমন সময় মীক্বাতে পৌঁছে যখন ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন তার জন্য উত্তম হচ্ছে ফরয নামায সম্পাদন করার পর ইহরাম বাঁধা।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদ: হজ্জ ওমরার জন্য মক্কাবাসীর মীক্বাত।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মীক্বাতের ভিতরে যারা থাকেন তাদের মীক্বাত। হা/১৫২৯।

ফরয নামাযের সময় নয় কিন্তু চাশতের নামাযের (ছালাতে যুহা) সময়ে মিক্বাতে পৌঁছলো, তাহলে প্রথমে পরিপূর্ণরূপে গোসল করবে, সুগন্ধি মাখবে, ইহরামের কাপড় পরিধান করে চাশতের নিয়তে নামায আদায় করবে তারপর ইহরামের নিয়ত করবে। চাশত নামাযের সময় না হলে তাহিয়্যাতুল ওযুর নিয়ত করে দু'রাকাত নামায পড়ে ইহরামে প্রবেশ করা উত্তম। কিন্তু ইহরামের নিয়তে নামায আদায় করার কোন দলীল নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই।

প্রশ্নঃ (৪৭১) কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের মাসে ওমরাহ আদায় করে মদীনা সফর করে, অতঃপর যুলহুলায়ফা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধে, তবে সে কি তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে?

উত্তরঃ যখন এ ব্যক্তি হজ্জের মাসে ওমরাহ সম্পাদন করে এবছরেই হজ্জ আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছে, তখন সে তামাত্তুকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ওমরা ও হজ্জের মধ্যবর্তী কোন সফর তামাত্তুকে বাতিল করবে না। তবে যদি ওমরা আদায় করার পর নিজ দেশে ফেরত যায় এবং সেখান থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করে, তবে তার তামাত্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেকটি কাজ সে আলাদা আলাদা সফরে সম্পাদন করেছে। অতএব ওমরা সম্পাদন করার পর যে লোক মদীনা সফর করে যুলহুলায়ফা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে, সে তামাত্তু হজ্জকারী হিসেবে কুরবানী দিবে। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾

"যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরা করার নিয়ত করবে, সে সাধ্যানুযায়ী কুরবানী দিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৬)

প্রশ্নঃ (৪৭২) কোন ব্যক্তি যদি শাওয়াল মাসে ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরা পূর্ণ করে। কিন্তু সে সময় সে হজ্জের নিয়ত করেনি। কিন্তু হজ্জের সময় তার হজ্জ করার সুযোগ হল। সে কি তামাত্তুকারী গণ্য হবে ?

উত্তরঃ না, সে তামাত্তুকারী গণ্য হবে না। অতএব তাকে কুরবানীও দিতে হবে না।

তালবিয়ার সুন্নাতী নিয়ম

প্রশ্নঃ (৪৭৩) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত তালবিয়াটি কি ? ওমরা এবং হজ্জের ক্ষেত্রে কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে ?

উত্তরঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত তালবিয়াটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক্, লাব্বাইকা ল-শারীকা লাকা লাব্বাইক্, ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক্, লা-শারীকা লাক।"[1] ইমাম আহমাদ একটু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন, "লাব্বাইকা ইলাহাল হক্ব।" এর সনদ হাসান।

ওমরার ক্ষেত্রে তওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে। আর হজ্জের ক্ষেত্রে দশ তারিখে ঈদের দিন জামরা আকাবায় পাথর মারার পূর্বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। তিরমিযীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমরাতে হাজরে আস্ওয়াদ স্পর্শ করার সময় তালবিয়া বলা বন্ধ করতেন।"[2] ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে ছহীহ্ বলেন। কিন্তু এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা নামক জনৈক বর্ণনাকারী আছে। অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে তাঁর আরোহীর পিছনে উসামা (রাঃ) কে বসিয়েছিলেন। মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে ফায্ল বিন আব্বাস (রাঃ) কে পিছনে বসিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে (উসামা ও ফায্ল) বলেছেন, তিনি ﷺ জামরা আকাবায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থেকেছেন।[3]

ইমাম মালেকের মতে হারাম শরীফে পৌঁছার সাথে সাথে তালবিয়া বলা বন্ধ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, বায়তুল্লাহ্র কাছে পৌঁছলে বা কাবা ঘর দেখলেই তালবিয়া বলা বন্ধ করবে। লাব্বাইক বলার অর্থ হচ্ছেঃ আপনার আনুগত্যের কাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনার আহবানে সাড়া দিচ্ছি।

প্রশ্নঃ (৪৭৪) ইহরাম বেঁধে কি মাথা আঁচড়ানো জায়েয আছে ?

উত্তরঃ ইহরাম অবস্থায় মাথা আঁচড়ানো উচিত নয়। কেননা ইহরামকারীর উচিত হচ্ছে এলোকেশ ও ধুলোমলিন থাকা। তবে গোসল করতে কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া মাথা আঁচড়ালে চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইহরামকারী মাথা বা শরীর প্রভৃতি চুলকালে যদি কোন চুল পড়ে যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে ইচ্ছাকৃত চুল উঠায়নি। জেনে রাখা উচিত যে, ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ যদি কেউ ভুলক্রমে করে ফেলে, তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু সে ব্যাপারে তোমাদের

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তালবিয়া। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ অনুচ্ছেদঃ তালবিয়া ও তার পদ্ধতি।

[2]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ওমরাতে কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হবে।

[3]. বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জে আরোহণ করা এবং একে অপরের পিছনে আরোহণ করা। মুসলিম....

অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।” (সূরা আহযাবঃ ৫) আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

“হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদের ভুল হয় বা ত্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে ধৃত করবেন না।” (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬)

ইহরামের অন্যতম নিষিদ্ধ কাজ শিকার করা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় বন্য শিকারকে হত্যা করো না; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক তাকে হত্যা করবে, তার উপর তখন জরিমানা ওয়াজিব হবে, যা মূল্যের দিক দিয়ে সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে। তার অনুমানিক মূল্যের মীমাংসা তোমাদের মধ্যে হতে দু’জন নির্ভরযোগ্য লোক করে দেবে।” (সূরা মায়িদাঃ ৯৫) এই আয়াতে ‘ইচ্ছাপূর্বক’ শব্দ উল্লেখ করাতে বুঝা যায়-যদি অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে ফেলে, তবে তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। এ বিধানই ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা ইসলাম ধর্ম ক্ষমা ও সহজতার বৈশিষ্টে অনন্য।

অতএব কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ যদি কেউ অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ করে ফেলে, তবে তার বিরুদ্ধে কোন বিধান প্রজোয্য হবে না, কোন ফিদ্ইয়া আবশ্যক হবে না-এমনকি স্ত্রী সহবাস করে ফেললেও হজ্জ নষ্ট হবে না। উল্লেখিত শরীয়তের দলীলের দাবী অনুযায়ী এটাই বিশুদ্ধ কথা।

প্রশ্নঃ (৪৭৫) অজ্ঞতা বশতঃ মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে হালাল হয়ে গেলে তার উপর আবশ্যক কি ?

উত্তরঃ অজ্ঞতা বশতঃ যে হাজী সাহেব মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে হালাল হয়ে গেছে, তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা সে অজ্ঞ। তবে জানার পর তাকে পূর্ণ মাথা থেকে চুল কাটতে হবে। এ উপলক্ষে আমি মুসলিম ভাইদেরকে নসীহত করতে চাই, কোন ইবাদত করতে চাইলে, তার সীমারেখা ও নিয়ম-নীতি না জেনে তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যাতে করে অজ্ঞতা বশতঃ এমন কিছু না করে ফেলে যাতে ইবাদতটিই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা’আলা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وسبحان الله وما أنا من المشركين﴾

“আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ আল্লাহর দিকে বুঝে-শুনে দা’ওয়াত দেই-আমি এবং আমার অনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।” (সূরা

ইউসুফঃ ১০৮) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

"আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি এক বরাবর ? বুদ্ধিমানরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" (সূরা যুমারঃ ৯)

অতএব একজন লোক বুঝে-সুঝে আল্লাহর সীমারেখা জেনে-শুনে তাঁর ইবাদত করবে এটা খুবই উত্তম। অজ্ঞতার সাথে বা মানুষের অন্ধানুসরণ করে আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। কেননা না জেনে ইবাদত করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশী তেমনি যাদের অনুসরণ করবে তাদের মধ্যে জ্ঞান থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

প্রশ্নঃ (৪৭৬) প্রশাসনকে ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করে মক্কায় পৌঁছে ইহরাম বাঁধলে হজ্জ বিশুদ্ধ হবে কি ?

উত্তরঃ তার হজ্জ তো বিশুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু মুসলিম শাসককে ফাঁকি দেয়ার জন্য সে হারাম কাজ করেছে। এটা হারাম হয়েছে দু'কারণেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করেছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুসলিম শাসকের আনুগত্য করার। অবশ্য আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। অতএব তার উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর কাছে তওবা করা। আর ফিদ্ইয়া প্রদান করা অর্থাৎ-একটি কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। কেননা সে মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধেনি। বিদ্বানদের মতে হজ্জ বা ওমরার কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে তার জন্য ফিদ্ইয়া প্রদান করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৪৭৭) তামাত্তুকারী যদি নিজ দেশে ফেরত গিয়ে আবার হজ্জের জন্য সফর করে, তবে কি ইফরাদকারী হিসেবে গণ্য হবে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তামাত্তুকারী ওমরা আদায় করার পর নিজ দেশে ফেরত গিয়ে আবার সেই বছর হজ্জের জন্য মক্কা সফর করলে সে ইফরাদকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নিজ পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরার মাঝে বিচ্ছিন্নতা করেছে। আবার সফর শুরু করার অর্থ হচ্ছে সে হজ্জের জন্য নতুনভাবে সফর করছে। তখন তার এই হজ্জ ইফরাদ হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তামাত্তুকারীর মত কুরবানী করা তার জন্য ওয়াজিব হবে না। কিন্তু নিজ দেশে ফিরে যাওয়াটা যদি তার কুরবানী রহিত করার বাহানা হয়, তবে কুরবানী রহিত হবে না। কেননা কোন ওয়াজিব রহিত করার বাহানা করলে উহা রহিত হবে না।

প্রশ্নঃ (৪৭৮) ইহরাম অবস্থায় ছাতা ব্যবহার করার বিধান কি ? অনুরূপভাবে সিলাইকৃত বেল্ট ব্যবহার করা যাবে কি ?

উত্তরঃ সূর্যের তাপ বা বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাতা ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। কোন ক্ষতি নেই। একাজ হাদীছে পুরুষের মাথা ঢাকার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এটা মাথা ঢাকা নয়; বরং তা রৌদ্র প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়া গ্রহণ করা। ছহীহ্ মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে, বিদায় হজ্জে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে উসামা বিন যায়েদ ও বেলাল (রাঃ) ছিলেন। তাদের একজন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উটনির লাগাম ধরে ছিলেন। অপরজন একটি কাপড় উপরে উঠিয়ে তাঁকে ছাঁয়া করছিলেন, এভাবে চলতে চলতে তিনি জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন।[1] এ হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যায় যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় হালাল হওয়ার পূর্বে কাপড় দিয়ে ছাঁয়া গ্রহণ করেছেন।

লুঙ্গি বাঁধার জন্য যে কোন ধরণের বেল্ট ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। আর 'সেলাইকৃত বেল্ট' প্রশ্নকারীর এই কথাটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তাদের ধারণা, যে কোন প্রকারের সিলাই থাকলেই তা পরিধান করা যাবে না। কিন্তু কথাটি ভুল। 'সিলাইকৃত কাপড় পরিধান করা যাবে না' একথা দ্বারা বিদ্বানগণ বুঝিয়েছেন এমন সব কাপড় পরিধান করা যা শরীরের মাপে বানানো হয়েছে। সাধারণভাবে পোষাক হিসেবে যা পরিধান করা হয়। যেমন, জামা, পায়জামা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া প্রভৃতি। এ কারণে কোন মানুষ যদি এমন চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করে যা জোড়া-তালি দেয়া, তবে কোন অসুবিধা নেই- এমনকি যদি তার উভয় প্রান্ত সেলাই করা থাকে তাতেও কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্নঃ (৪৭৯) শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কিভাবে ইহরাম করবে ?

উত্তরঃ কোন মানুষ যদি ইহরামের কাপড় পরিধান করতে সক্ষম না হয়, তবে যে ধরণের কাপড় পরতে সক্ষম হবে তাই পরিধান করবে। তখন বিদ্বানদের মতেঃ

ক) তাকে ফিদ্ইয়া হিসেবে একটি কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

খ) অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' তথা সোয়া কেজি পরিমাণ খাদ্য দিবে।

গ) অথবা তিনদিন রোযা পালন করবে।

রোগের কারণে মাথা মুন্ডন করতে বাধ্য হলে যে বিধান প্রজোয্য হয়, তার উপর কিয়াস করে বিদ্বানগণ উক্ত সমাধান দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

"কোন লোক যদি পীড়িত হয় বা তার মাথা যন্ত্রনাগ্রস্ত হয়, তবে সে রোযা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা তার বিনিময় (ফিদ্ইয়া) আদায় করবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৬) আর

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কুরবানীর দিন আরোহী অবস্থায় জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা মুস্তাহাব।

রোযা ও সাদকার বিষয়টি পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রশ্নঃ (৪৮০) ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার হজ্জের বিধান কি ?

উত্তরঃ একথা সুবিদিত যে, স্ত্রী সহবাস ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম; বরং তা ইহরামের সর্বাধিক কঠিন ও বড় নিষেধাজ্ঞা। আল্লাহ্ বলেন,

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

"হজ্জের মাস সমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হজ্জ করার ইচ্ছা করবে, তার জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া জায়েয নয়। জায়েয নয় কোন অশোভন কাজ করা, না কোন ঝগড়া বিবাদে লিপ্তহওয়া। " (সূরা বাকারাঃ ১৯৭)

الرفث। এর অর্থ হচ্ছে, সহবাস ও তার পূর্বের কাজ সমূহ। অতএব ইহরামের সর্বাধিক কঠিন নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। হজ্জের ইহরামে থেকে কোন লোক যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে হয় তা প্রথম হালালের পূর্বে হবে অথবা প্রথম হালালের পর হবে। যদি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস হয়, তবে তার উপর নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবেঃ

প্রথমতঃ তার ঐ হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। চাই উহা ফরয হজ্জ হোক বা নফল হজ্জ হোক।

দ্বিতীয়তঃ সে গুনাহগার হবে।

তৃতীয়তঃ হজ্জের অবশিষ্ট কাজ তাকে পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ- হজ্জ নষ্ট হওয়া সত্বেও হজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

চতুর্থতঃ পরবর্তী বছর অবশ্যই তাকে উক্ত হজ্জের কাযা আদায় করতে হবে। চাই তা ফরয হজ্জ হোক বা নফল হজ্জ হোক। হজ্জ ফরয হলে তো কাযা আদায় করার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে সে হজ্জের ফরযিয়াতের যিম্মা মুক্ত হতে পারে নি। কিন্তু নফল হজ্জ হলেও তাকে কাযা আদায় করতে হবে। কেননা হজ্জ আরম্ভ করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও ওমরাকে পূর্ণ কর।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৬) তাছাড়া হজ্জের কাজ শুরু করলে তা ফরয হয়ে যায়। যেমনটি পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। "হজ্জের মাস সমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হজ্জ ফরয করবে...।" এই জন্য আমরা বলব, হজ্জ নফল হোক বা ফরয হোক, যে কোন কারণে তা বিনষ্ট করে ফেললে তা কাযা আদায় করতে হবে।

পঞ্চমতঃ কাফ্ফারা স্বরূপ তাকে জরিমানা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি উট যবেহ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দেয়া। উটের পরিবর্তে যদি সাতটি ছাগল যবেহ করে তাও জায়েয আছে।

এই বিধান হচ্ছে প্রথম হালালের পূর্বে হলে। (অর্থাৎ- ১০ তারিখে বড় জামরায় কংকর মেরে মাথা মুন্ডন করার পূর্বে) কিন্তু প্রথম হালালের পর সহবাস করলে তার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবেঃ

প্রথমতঃ সে গুনাহগার হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহরাম নষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ কাফ্ফারা হিসেবে নিম্ন লিখিত তিনটি বিষয়ের কোন একটি করবেঃ

ক) একটি ছাগল যবেহ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে। অথবা

খ) ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' পরিমাণ খাদ্য দিবে। অথবা

গ) তিন দিন রোযা রাখবে।

এ তিনটির যে কোন একটি জরিমানা স্বরূপ আদায় করবে।

চতুর্থতঃ নতুন করে ইহরামে প্রবেশ করবে। মক্কার হারাম সীমানার বাইরে নিকটতম কোন স্থানে গমণ করে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে আসবে এরপর তওয়াফে এফাযা বা হজ্জের তওয়াফ সম্পন্ন করবে। এভাবেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন। **যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ প্রথম হালাল হওয়ার অর্থ কি ?**

জবাবঃ হাজী সাহেব যখন ঈদের দিন (যিল্ হজ্জের দশ তারিখে) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করে তখন সে প্রথম হালাল হয়ে যায়। তখন স্ত্রী সহবাস ব্যতীত ইহরামের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইহরাম বাঁধার পূর্বে, এবং হালাল হওয়ার পর বায়তুল্লাহর তওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।'[1] এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, হালাল হওয়ার পরেই আছে বায়তুল্লাহর তওয়াফ। যেমনটি পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ঈদের দিন বড় জামরায় কঙ্কর মারার পর মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করার মাধ্যমে প্রথম হালাল হবে। এই হালালের পূর্বে সহবাস হলে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় আবশ্যক হবে। আর এই হালালের পর সহবাস হলে, উল্লেখিত চারটি বিষয় আবশ্যক হবে।

কোন লোক যদি মূর্খতা বশতঃ এই কাজ করে অর্থাৎ-ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম একথা তার জানা নেই, তবে তার কোন ক্ষতি হবে না। কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। চাই প্রথম হালালের পূর্বে হোক বা পরে হোক। কেননা আল্লাহ্ বলেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলক্রমে কোন কিছু করে

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ ইহরামকারীর ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ফেলি অথবা ভুলে যাই তবে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬) আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাবঃ ৫)

যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম এ লোক যদি একথা জানে কিন্তু এটা জানে না যে, সহবাস করলে এত কিছু আবশ্যক হবে বা এই জরিমানা দিতে হবে, জানলে হয়তো সে একাজে লিপ্ত হতো না। তবে এর বিধান কি ? তার এই অজ্ঞতার ওযর কি গ্রহণযোগ্য হবে ?

জবাবঃ তার এই ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ওযর হচ্ছে, বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকা। বিষয়টি যে হারাম সে ব্যাপারে তার কোনই জ্ঞান না থাকা। কিন্তু বিষয়টি হালাল না হারাম এই বিধান জানার পর, করলে কি লাভ বা না করলে কি ক্ষতি তা জানা আবশ্যক নয়। এই নাজানা ওযর হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন, জনৈক বিবাহিত ব্যক্তি যদি জ্ঞান রাখে যে, ব্যভিচার হারাম। সে বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। সে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে অবশ্যই তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করতে হবে। সে যদি বলে যে, ব্যভিচার করলে যে রজমের শাস্তি আছে আমি তা জানতাম না। জানলে এ অন্যায় আমি করতাম না, তার এই কথা গ্রহণ করা হবে না। তাকে রজম করতেই হবে।

এই কারণে জনৈক ব্যক্তি রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তার করণীয় কি জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। অথচ সহবাস করার সময় সে কাফ্ফারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এ থেকে বুঝা যায়, কোন মানুষ যদি অন্যায়ে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করে, তখন উক্ত অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে। যদিও এর শাস্তি সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকে।

প্রশ্নঃ (৪৮১) ইহরাম অবস্থায় নারী কিভাবে পর্দা করবে ? পর্দা মুখ স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোন শর্ত আছে কি ?

উত্তরঃ ইহরাম অবস্থায় নারী যদি মাহরাম নয় এমন কোন পুরুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে বা তার নিকট কোন পুরুষ অতিক্রম করে, তবে অবশ্যই স্বীয় মুখমন্ডল ঢেকে নিবে। যেমনটি মহিলা ছাহাবীগণ (রাঃ) করতেন। একারণে তাকে কোন ফিদ্ইয়া দিতে হবে না। কেননা পরপুরুষের সামনে মুখমন্ডল ঢাকা আল্লাহর নির্দেশ। আর নির্দেশ কখনো নিষেধ হতে পারে না।

পর্দা মুখমন্ডল স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোন শর্ত নেই। এতে কোন অসুবিধা নেই। পরপুরুষের সামনে এলেই তাকে অবশ্যই মুখ ঢাকতে হবে। কিন্তু যদি খিমা বা

তাঁবুতে অবস্থান করে এবং সেখানে কোন পরপুরুষ না থাকে, তবে মুখমন্ডল খোলা রাখবে। কেননা ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে মুখ খোলা রাখা।

প্রশ্নঃ (৪৮২) নারী বিদায়ী তওয়াফ করার পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়লে করণীয় কি ?

উত্তরঃ যদি সে তওয়াফে এফাযাসহ হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে থাকে এবং শুধুমাত্র বিদায়ী তওয়াফ বাকী থাকে, তারপর ঋতুবতী হয় তবে বিদায়ী তওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْـــدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ**'লোকদের আদেশ দেয়া হয়েছে, কাবা ঘরের তওয়াফ যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয়। তবে বিষয়টি ঋতুবতীদের জন্য হালকা করে দেয়া হয়েছে।'[1] যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলা হল যে, উম্মুল মু'মেনীন ছাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ) ঋতুবতী হয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি তওয়াফে ইফাযা বা হজ্জের তওয়াফ করে নিয়েছেন। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাহলে তোমরা বের হয়ে যাও।"[2] তিনি তার জন্য বিদায়ী তওয়াফকে রহিত করে দিলেন।

কিন্তু তওয়াফে ইফাযা বা হজ্জের তওয়াফ ঋতুবতীর জন্য রহিত হবে না। ঋতুবতী হয় মক্কায় থেকে অপেক্ষা করবে এবং পবিত্র হলে তওয়াফে এফাযা করবে। অথবা সে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে কিন্তু ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে এবং পবিত্র হলে মক্কায় ফিরে এসে শুধুমাত্র হজ্জের তওয়াফ করবে। যদি নিজ দেশে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তবে সুন্দর হয়-প্রথমে ওমরা করে নিবে (তওয়াফ করবে, সাঈ করবে এবং চুল খাট করবে) তারপর হজ্জের তওয়াফ করবে।

উল্লেখিত পন্থার কোনটিই যদি সম্ভব না হয়, তবে লজ্জাস্থানে প্যাড বা এ জাতীয় কোন কিছু দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিবে যাতে করে স্রাবের রক্ত মসজিদে না পড়ে, তারপর হজ্জের তওয়াফ করে নিবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা একান্ত জরূরী অবস্থা।

ঋতুবতী নারী পবিত্রতায় সন্দেহ হলে দ্বিতীয়বার ওমরা করে নিবে।

প্রশ্নঃ (৪৮৩) জনৈক নারী স্বামীর সাথে ঋতু অবস্থাতেই ইহরাম বাঁধে। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর কোন মাহরাম ছাড়াই সে ওমরার কাজ সমাধা করে। কাজ শেষ হলে আবার রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। এর বিধান কি ?

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ বিদায়ী তওয়াফ। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জের তওয়াফের পর নারী ঋতুবতী হলে। মুসলিম অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নের ধরণে বুঝা যায় এ নারী মাহরামের সাথে মক্কায় আগমণ করেছে। কিন্তু ঋতু অবস্থাতেই সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে। ঋতু অবস্থায় তার এই ইহরাম বিশুদ্ধ। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে যুলহুলায়ফার মীকাতে আগমণ করলে আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) প্রশ্ন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ঋতুবতী হয়ে গেছি। তিনি বললেন, اغْتَسلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِــي "গোসল করে তোমার লজ্জাস্থানে কাপড় বা নেকড়া বেঁধে দাও এবং ইহরাম বাঁধ।"[1] মক্কায় আসার পর পবিত্র হয়ে মাহরাম ছাড়া যদি ওমরার কাজ সম্পাদন করে থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে শহরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ওমরা সম্পাদন করার পর সে যে আবার রক্ত দেখেছে তাতে তার পবিত্রতার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন দাঁড় করায়। আমরা বলব, যদি সে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা দেখে থাকে তবে তার ওমরা বিশুদ্ধ। কিন্তু এই পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকলে নতুন করে ওমরা করে নিবে। অবশ্য এর জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধার জন্য মীকাত যেতে হবে না। শুধুমাত্র তওয়াফ, সাঈ ও চুল খাট করার কাজগুলো নতুন করে সম্পাদন করবে।

তাওয়াফে এফাযার পূর্বে নারী ঋতুবতী হয়ে পড়লে কি করবে ?

প্রশ্নঃ (৪৮৪) জনৈক নারী তওয়াফে এফাযা করেনি। ইতোমধ্যে সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। তার ঠিকানা সঊদী আরবের বাইরে। হজ্জ কাফেলাও চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই দেরী করা সম্ভব হবে না। এবং পরবর্তীতে মক্কা ফিরে আসাটাও তার জন্য দুরহ ব্যাপার। এখন সে কি করবে ?

উত্তরঃ বিষয়টি যদি এরূপই হয় যেমন প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজ্জের তওয়াফ না করেই নারী ঋতুবতী হয়ে গেছে। পবিত্র হয়ে তওয়াফ করার জন্য মক্কায় থেকে যাওয়াটাও তার জন্য দুঃসাধ্য অথবা চলে গেলে আবার মক্কা ফেরত আসাটাও অসম্ভব, তবে এ অবস্থায় নিম্ন লিখিত দু'টি সমাধানের যে কোন একটি সে গ্রহণ করতে পারেঃ

১)ঋতু বন্ধ করার জন্য ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার করবে-যদি তাতে ক্ষতির আশংকা না থাকে- তারপর তওয়াফ করবে।

২) লজ্জাস্থানে প্যাড বা কাপড় বেঁধে দিবে যাতে করে মসজিদে রক্ত না পড়ে। তারপর তওয়াফ করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) পসন্দ করেছেন।

এর বিপরীত সমাধান হচ্ছে, নিম্ন লিখিত দু'টির যে কোন একটিঃ

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ নবী (ﷺ) এর হজ্জ।

১) ইহরামের অবশিষ্ট যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা থেকে বিরত থেকে ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। অর্থাৎ-স্বামী সহবাসে লিপ্ত হবে না। অবিবাহিতা হলে কোন বিবাহের আকদ করবে না। তারপর পবিত্র হলে তওয়াফ করবে।

২) অথবা নিজেকে হজ্জের কর্ম সমূহ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত মনে করবে, এবং হালাল হওয়া যাবে এবং ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী করবে। কিন্তু এ অবস্থায় তার এই হজ্জটি হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে না।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের উভয়টিই কঠিন। কারণ ইহরাম অবস্থায় থেকে যাওয়াটা যেমন কঠিন ব্যাপার, তেমনি হজ্জ বাতিল করে দেয়াটা আরো কঠিন। এ কারণে জরূরী অবস্থা হিসেবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এর মতটিই এখানে সঠিক। আর আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দ্বীনের মাঝে কোন অসুবিধা রাখেননি।" (সূরা হজ্জঃ ৭৮) তিনি আরো বলেন,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কঠিন কিছু তিনি চান না।" (সূরা বাকারাঃ ১৮৫) কিন্তু এ নারীর জন্যে যদি সম্ভব হয় চলে গিয়ে পবিত্র হলে আবার ফেরত এসে হজ্জের তওয়াফ করা, তবে কোন অসুবিধা নেই। তবে এই সময়ের মধ্যে স্বামী সহবাস জায়েয হবে না। কেননা তওয়াফ না করলে হাজী সাহেব দ্বিতীয় হালাল বা পূর্ণ হালাল হয় না।

প্রশ্নঃ (৪৮৫) ঋতু এসে যাওয়ার কারণে জনৈক নারী ওমরা না করেই মক্কা থেকে ফেরত চলে গেছে। তার বিধান কি ?

উত্তরঃ ওমরার ইহরাম বাঁধার পর যদি নারীর ঋতু এসে যায়, তবে ইহরাম বাতিল হবে না। ওমরার ইহরাম বাঁধার পর ঋতুর কারণে তওয়াফ-সাঈ না করেই মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে, সে ইহরাম অবস্থাতেই রয়েছে। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে তওয়াফ, সাঈ ও চুল ছোট করে হালাল হওয়া। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। চুল বা নখ কাটবে না, স্বামী থাকলে তার সাথে সহবাস করবে না। তবে ইহরাম বাঁধার সময় যদি ঋতুর আশংকায় শর্ত আরোপ করে নেয় যে, যেখানেই বাধাগ্রস্থ হবে সেখানেই সে হালাল হয়ে যাবে। তবে ঋতু আসার পর ইহরাম খুলে ফেললে তাকে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

নারীর জন্য কি ইহরামের বিশেষ কোন পোষাক আছে ?

প্রশ্নঃ (৪৮৬) ইহরাম অবস্থায় নারী কি স্বীয় কাপড় বদল করতে পারবে ? নারীর জন্য কি ইহরামের বিশেষ কোন পোষাক আছে ?

উত্তরঃ নারী যে কাপড়ে ইহরাম করেছে তা পরিবর্তন করে অন্য কাপড় পরিধান করতে পারে। পরিবর্তন করার দরকার থাক বা না থাক কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যে কাপড় পরবে তাতে যেন বেপর্দা হওয়ার আশংকা না থাকে বা পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রকাশ না ঘটে। নারীর জন্য ইহরামের বিশেষ কোন পোষাক নেই। তার ইচ্ছামত যে কোন পোষাক পরিধান করতে পারে। তবে নেকাব পরবে না এবং হাতমোজা পরিধান করবে না। নেকাব হচ্ছে এমন পর্দা মুখমন্ডলে ব্যবহার করা যাতে চোখের জন্য ছিদ্র করা থাকে। আর পুরুষের ইহরামের জন্য বিশেষ পোষাক আছে। তা হচ্ছে একটি চাদর অন্যটি লুংঙ্গি। তাই সে জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া, গেঞ্জি, পাগড়ী, টুপি, মোজা প্রভৃতি পরবে না।

প্রশ্নঃ (৪৮৭) ইহরামকারী নারীর হাত মোজা এবং পা মোজা পরার বিধান কি ?

উত্তরঃ হাতমোজা ব্যবহার করা জায়েয নেই। পায়ের মোজা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। হাত মোজার ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "নারী হাত মোজা পরিধান করবে না।"[1]

ঋতুবতী নারী বিলম্ব করে পবিত্র হওয়ার পর ওমরা আদায় করবে

প্রশ্নঃ (৪৮৮) জনৈক নারী ঋতু অবস্থায় মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধেছে। মক্কায় আগমণ করে বিলম্ব করে পবিত্র হওয়ার পর ওমরা আদায় করেছে। তার এই ওমরার বিধান কি ?

উত্তরঃ তার ওমরা বিশুদ্ধ। যদিও একদিন বা দু'দিন বা ততোধিক দিন বিলম্ব করে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঋতু থেকে পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পরই কেবল ওমরা আদায় করবে। কেননা ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা জায়েয নয়। এজন্য আয়েশা (রাঃ) ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় আগমণ করলে ঋতুবতী হয়ে পড়েন, তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন,

(افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)

"হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করে যাও, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করো না।"[2] যখন সাফিয়া (রাঃ) ঋতুবতী হয়ে গেলেন, তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে নাকি ? তিনি

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ শিকারের জরিমানা অনুচ্ছেদঃ ইহরাম পরিধানকারী নারী-পুরষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী তওয়াফ ছাড়া হজ্জের যাবতীয় কাজ করবে।

ভেবেছিলেন ছুফিয়া তওয়াফে এফাযা করেন নি। তারা বলল, তিনি তো তওয়াফে এফাযা করে নিয়েছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়'।[1]

অতএব ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা বৈধ নয়। মক্কায় এসে ঋতুবতী হয়ে পড়লে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহর ঘর তওয়াফ শেষ করে সাঈ করার পূর্বে যদি ঋতু এসে যায়, তবে ওমরা পূর্ণ করবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আর সাঈ শেষ করার পর ঋতু আসলে তখন বিদায়ী তওয়াফের আবশ্যকতা নেই। কেননা ঋতুবতীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ রহিত।

ঋতুবতী নারী ইহরামের পর পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করতে পারে

প্রশ্নঃ (৪৮৯) মীকাত থেকে ঋতুবতী অবস্থায় জনৈক নারী ইহরাম বাঁধে। মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র সে খুলে ফেলে। এর বিধান কি ?

উত্তরঃ ঋতুবতী অবস্থায় নারী যদি মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে, তারপর মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র খুলে ফেলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ কাপড় পরিবর্তন করে ইচ্ছামত যে কোন বৈধ পোষাক পরিধান করা জায়েয। অনুরূপভাবে পুরুষও পরিধেয় ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করে অনুরূপ ইহরামের কাপড় পরিধান করতে পারে। কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৪৯০) হজ্জের সময় নিকাব দিয়ে নারীর মুখ ঢাকার বিধান কি ? আমি একটি হাদীছ পড়েছি যার অর্থ হচ্ছেঃ "ইহরামকারী নারী নেকাব পরবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।" আয়েশা (রাঃ) এর অন্য একটি কথা পড়েছি। তিনি বলেন, "আমাদের সামনে কোন পুরুষ এলে আমরা মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন আমরা ওদের সামনে চলে যেতাম, তখন মুখমন্ডল খুলে রাখতাম" সে সময় তারা হজ্জে ছিলেন। দু'টি হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য কি ?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, হাদীছের মর্ম অনুযায়ী নারী ইহরাম অবস্থায় নেকাব পরবে না। পুরুষ তার সম্মুখে আসুক বা না আসুক কোন অবস্থাতেই তার জন্য নেকাব ব্যবহার করা জায়েয নয়। সে হজ্জে থাক বা ওমরায় । নেকাব নারী সমাজে পরিচিত। আর তা হচ্ছে একটি পর্দা দিয়ে মুখন্ডল ঢেকে নেয়া যাতে দু'চোখের জন্য আলাদা আলাদা দু'টি ছিদ্র থাকে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) এর হাদীছ নেকাব নিষিদ্ধের হাদীছের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ নয়। কেননা আয়েশার হাদীছে একথা বলা হয়নি যে তারা নেকাব পরতেন। বরং নেকাব না পরে মুখ ঢেকে ফেলতেন। আর পরপুরুষ সামনে এলে নারীদের মুখ ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। কেননা মাহরাম নয় এমন পুরুষের সামনে নারীর মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জের তওয়াফের পর নারী ঋতুবতী হলে। মুসলিম অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

অতএব ইহরামের ক্ষেত্রে সবসময় নেকাব পরিধান করা হারাম। আর পরপুরুষ সামনে না এলে মুখমন্ডল খোলা রাখা ওয়াজিব। কিন্তু সামনে এলে ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। তবে নেকাব ছাড়া অন্য কাপড় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪৯১) ভুল ক্রমে অথবা অজ্ঞতা বশতঃ ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেললে, তার বিধান কি ?

উত্তরঃ ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা করে ইহরাম না বেঁধে থাকে আর নিষিদ্ধ কোন কাজ করে তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা নিয়ত করে ইহরামে প্রবেশ করাটাই ধর্তব্য। ইহরামের কাপড় পরিধান করা মানেই ইহরাম বাঁধা নয়। কিন্তু সঠিকভাবে নিয়ত করে ইহরামে প্রবেশ করার পর যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে, তবে কোন কিছু দিতে হবে না। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা শিখিয়ে দেয়ার সাথে সাথে অজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত হবে।

উদাহরণঃ ইহরাম করার পর ভুলক্রমে জামা পরে নিয়েছে, তার কোন গুনাহ নেই। তবে মনে পড়ার সাথে সাথে তাকে উক্ত জামা খুলে ফেলতে হবে। অনুরূপভাবে ভুলক্রমে সে পায়জামা খুলে নি। নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করার পর মনে পড়েছে যে, পায়জামা তো খুলা হয় নি। তখন সাথে সাথে সে তা খুলে ফেলবে। কোন লোক সেলাই ছাড়া শুধু গিরা দিয়ে তৈরীকৃত একটি গেঞ্জি পরিধান করে যদি মনে করে যে, ইহরামকারীর জন্য শুধু সেলাইকৃত কাপড় পরা নিষেধ। তাই আমি ইহা পরিধান করেছি, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। কেননা সে অজ্ঞ। কিন্তু যখন তাকে জানানো হবে যে, শরীরের মাপে তৈরীকৃত যাবতীয় পোষাক পরিধান করা নিষিদ্ধ তখন তা খুলে ফেলা তার জন্য আবশ্যক হবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজ যদি কোন মানুষ ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ বা বাধ্যগত অবস্থায় করে, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন, (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬) আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" (সূরা আহযাবঃ ৫) ইহরাম অবস্থায় বিশেষভাবে নিষিদ্ধকৃত পশু শিকার করা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে উহা (শিকার) হত্যা করে।" (সূরা মায়েদাঃ ৯৫)

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। সকল ক্ষেত্রে বিধান একই। যেমন, পোষাক পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো প্রভৃতি অথবা শিকার হত্যা করা, চুল কেটে ফেলা প্রভৃতি। আলেমদের মধ্যে কেউ পার্থক্য করে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা

হচ্ছে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ভুল বা অজ্ঞতা বা বাধ্যগত কারণে মানুষ মা'যুর বা তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য।

হজ্জে ভুল হলে তার ফিদ্ইয়া কোথায় আদায় করতে হবে?

প্রশ্নঃ (৪৯২) জনৈক ব্যক্তি হজ্জ আদায় করার ক্ষেত্রে ভুলে লিপ্ত হয়েছে। ভুলের কাফ্ফারা দেয়ার জন্য তার কাছে তেমন কিছু ছিল না। সে দেশে ফেরত চলে গেছে। উক্ত কাফ্ফারা কি নিজ দেশে আদায় করা জায়েয হবে ? নাকি মক্কাতেই পাঠাতে হবে ? যদি মক্কাতেই পাঠাতে হয়, তবে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া কি জায়েয হবে ?

উত্তরঃ হজ্জ পালনকারী কি ভুল করেছেন তা নির্দিষ্টভাবে অবশ্যই জানতে হবে। যদি কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করে থাকে, তবে ফিদ্ইয়া হিসেবে মক্কাতে একটি কুরবানী করতে হবে। মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও প্রদান করলে জায়েয হবে না। কেননা তা হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত।

কিন্তু যদি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে, তবে নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারেঃ

ক) একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

খ) অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' (প্রায় সোয়া কেজী) পরিমাণ খাদ্য দিবে। আর তা মক্কায় হতে হবে অথবা যে স্থানে ঐ নিষিদ্ধ কাজ করা হয়েছে সেখানে। অথবা

গ) তিন দিন রোযা রাখবে। এই তিনটি রোযা মক্কা বা যে কোন স্থানে রাখতে পারে।

তবে নিষিদ্ধ কাজটি যদি হজ্জের প্রথম হালালের আগে স্ত্রী সহবাস হয়, তবে ওয়াজিব হচ্ছেঃ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার স্থানে অথবা মক্কায় একটি উট যবেহ করবে এবং ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। অথবা নিষিদ্ধ কাজটি যদি কোন প্রাণী শিকার করা হয়, তবে ওয়াজিব হচ্ছেঃ তার অনুরূপ প্রাণী যবেহ করা অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা বা তিনটি ছিয়াম পালন করা। ছিয়াম পালন যে কোন স্থানে করা যায়। কিন্তু খাদ্য দান বা কুরবানী যবেহ করা অবশ্যই মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে হতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন, "কুরবানী কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।" (সূরা মায়েদাঃ ৯৫)

অন্য মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে উক্ত কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয আছে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অবশিষ্ট কুরবানীগুলো যবেহ করার জন্য আলী (রাঃ) কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ (৪৯৩) তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা কি জায়েয ?

উত্তরঃ তওয়াফে এফাযার পূর্বে সাঈ করা জায়েয। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানীর দিন একস্থানে দন্ডায়মান হলেন, লোকেরা তাকে প্রশ্ন করতে লাগল। কেউ প্রশ্ন করল, سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُـوفَ 'তওয়াফ করার পূর্বে আমি সাঈ করে নিয়েছি।'

তিনি বললেন, لاحَرَجَ "কোন অসুবিধা নেই।"[1] তামাত্তুকারী যদি তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে এবং ইফরাদকারী বা ক্বেরাণকারী তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকলে হজ্জের তওয়াফের পূর্বে যদি সাঈ করে, তবে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৪৯৪) রামাযানে বারবার ওমরা করার বিধান কি ? এরকম কোন সময় কি নির্দিষ্ট আছে যে, এতদিন পরপর ওমরা করতে হবে ?

উত্তরঃ রামাযানে বারবার ওমরা করা বিদআত। কেননা এক মাসের মধ্যে বারবার ওমরা করা সালাফে সালেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরামের নীতির বিপরীত। এমনকি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) তাঁর ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন, সালাফে সালেহীনের ঐকমত্যে বারবার বেশী পরিমাণে ওমরা করা মাকরূহ। বিশেষ করে যদি ইহা রামাযানে হয়। বিষয়টি যদি পছন্দনীয় হত, তবে তাঁরা তো এব্যাপারে অধিক অগ্রগামী হতেন এবং বারবার ওমরা করতেন। দেখুন না নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। নেক কাজকে সর্বাধিক ভালবাসতেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় উনিশ দিন সেখানে অবস্থান করেছেন নামায আদায় করেছেন। কিন্তু কোন ওমরা আদায় করেননি। আয়েশা (রাঃ) যখন ওমরা করার ব্যাপারে পিড়াপিড়ী করছিলেন, তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ভ্রাতা আব্দুর রহমানকে বললেন, একে তানঈম নিয়ে গিয়ে ইহরাম করিয়ে নিয়ে আস। যাতে করে তিনি ওমরা আদায় করতে পারেন। কিন্তু আব্দুর রহমানকে একথা বললেন না, তুমিও তাঁর সাথে ওমরা করে নিও। যদি বিষয়টি শরীয়ত সম্মত হতো তবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সে নির্দেশনা দিতেন। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট বিষয়টি শরীয়ত সম্মত হলে আব্দুর রহমান তা করতেন। কেননা তিনি তো হারাম এলাকার বাইরে গিয়েছিলেন। দু'ওমরার মাঝে কত ব্যবধান হওয়া উচিত এসম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, দেখবে যে পর্যন্ত মাথা পোড়া কাঠের মত কালো না হয়। অর্থাৎ- মাথা ভর্তি চুল না হয়।

প্রশ্নঃ (৪৯৫) তওয়াফ চলাবস্থায় যদি নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তবে কি করবে ? তওয়াফ কি পুনরায় শুরু করবে ? পুনরায় শুরু না করলে কোথা থেকে তওয়াফ পূর্ণ করবে ?

উত্তরঃ মানুষ যদি ওমরা বা হজ্জ বা বিদায়ী তওয়াফ বা নফল তওয়াফে লিপ্ত থাকে, আর ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তবে তওয়াফ ছেড়ে দিয়ে নামাযের কাতারে শামিল হয়ে যাবে। নামায শেষ হলে যেখান থেকে তওয়াফ ছেড়েছিল সেখান থেকে বাকি তওয়াফ পূর্ণ করবে। নতুনভাবে তওয়াফ শুরু করার দরকার নেই এবং ঐ চক্করও নতুনভাবে শুরু করবে না। কেননা সে তো শরীয়ত সম্মত বিশুদ্ধ ভিত্তির উপরই বাকী

[1]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ হজ্জ-ওমরা, অনুচ্ছেদঃ হজ্জে একটি কাজের পূর্বে অন্যটি করে ফেলার বিধান। হা/১৭২৩।

কাজ আদায় করছে। সুতরাং শরীয়তের দলীল ছাড়া তার আগের কাজকে বাতিল বলা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৪৯৬) ওমরায় তওয়াফের পূর্বে সাঈ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ওমরাকারী তওয়াফের পূর্বে যদি সাঈ করার পর তওয়াফ করে থাকে তবে তাকে পুনরায় সাঈ করতে হবে। কেননা দু'টি কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। প্রথমে তওয়াফ তারপর সাঈ। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরকম ধারাবাহিকতায় আদায় করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ-ওমরার নিয়ম শিখে নাও।"[1] আমরা নবীজীর শিখানো পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমে আমাদেরকে তওয়াফ শুরু করতে হবে। তারপর সাঈ। কিন্তু যদি বলে যে, আমি প্রথমবার সাঈ করাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা তাকে বলব, তুমি কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সাঈ কর। কিন্তু ভুলের উপর অটল থাকা চলবে না। তাবেঈদের মধ্যে কেউ এবং কতিপয় বিদ্বান মত পোষণ করেন যে, ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ কেউ যদি ওমরাতে তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে ফেলে, তবে তাকে কোন কিছু দিতে হবে না। যেমনটি হজ্জের বেলায় হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ (৪৯৭) ইয্তেবা' কাকে বলে ? এ কাজ কোন সময় সুন্নাত ?

উত্তরঃ ইয্তেবা' হচ্ছে গায়ের চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে তার উভয় দিক বাম কাঁধের উপর রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা। তওয়াফে কুদূম তথা মক্কায় আগমণের পর প্রথম তওয়াফের সময় এ কাজ সুন্নাত। অন্য সময় ইয্তেবা' করা জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (৪৯৮) নফল সাঈ করা কি জায়েয আছে ?

উত্তরঃ নফল সাঈ করা জায়েয নয়। কেননা সাঈ শুধুমাত্র হজ্জ-ওমরার সময় শরীয়ত সম্মত। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَـوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের হজ্জ বা ওমরা করবে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দূষণীয় নয়। আর কোন ব্যক্তি সেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞাত।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫)

প্রশ্নঃ (৪৯৯) অজ্ঞতা বশতঃ তওয়াফে এফাযা ছেড়ে দিলে করণীয় কি ?

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদঃ পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফতোয়া দেয়া। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুন্ডন করেছে।

উত্তরঃ তওয়াফে এফাযা (হজ্জের তওয়াফ) হজ্জের অন্যতম রুকন। ইহা আদায় না করলে হজ্জ সম্পন্ন হবে না। কোন মানুষ ইহা ছেড়ে দিলে তার হজ্জ পূর্ণ হল না। ইহা অবশ্যই আদায় করতে হবে-যদিও এজন্য তাকে নিজ দেশে থেকে ফিরে আসতে হয়। এই অবস্থায় যেহেতু সে হজ্জের তওয়াফ করে নি, তাই তার জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়। কেননা সে এখনো পূর্ণ হালাল হয়নি। তওয়াফে এফাযার সাথে যদি সাঈও ছেড়ে থাকে, তবে তামাত্তুকারীকে তওয়াফে এফাযা এবং সাঈ করতে হবে এবং কেরাণ ও ইফরাদকারী তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকলে, তাদেরকেও তওয়াফে এফাযার সাথে সাঈ করতে হবে, তবেই তারা পূর্ণ হালাল হবে এবং হজ্জ বিশুদ্ধ হবে।

তওয়াফের সময় হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা আবশ্যক নয়

প্রশ্নঃ (৫০০) অনেক তওয়াফকারীকে দেখা যায় ভীড়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে তাদের নারীদেরকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য পাঠায়। তাদের জন্য কোনটি উত্তম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা ? নাকি পুরুষদের ভীড় থেকে দূরে অবস্থান করা।

উত্তরঃ প্রশ্নকারী যখন এই আশ্চর্য বিষয় দেখেছে, আমি এর চাইতে অধিক আশ্চর্য জনক বিষয় দেখেছি। আমি দেখেছি কিছু লোক ফরয নামাযান্তে এক দিকে সালাম ফেরানো হলে দ্বিতীয় সালাম ফেরানোর পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার জন্য দৌড় দেয়। এতে তো তার ফরয নামাযই বাতিল হয়ে গেল। যে নামায ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন। অথচ সে এমন একটি কাজ করতে ছুটেছে যা ওয়াজিব নয়। এমনকি তওয়াফ অবস্থায় না থাকলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা শরীয়ত সম্মতও নয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরাট ধরণের দুঃখ জনক অজ্ঞতা। তওয়াফ ছাড়া হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সুন্নাত নয়। এব্যাপারে আমার কোন দলীল জানা নেই। আমি এই স্থান থেকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আমার জ্ঞানের বাইরে যদি কারো কাছে এমন কোন দীলল জানা থাকে যে, তওয়াফ না করলেও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা শরীয়ত সম্মত, তবে সে যেন আমাদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

অতএব হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা তওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্গত। তাছাড়া এটা তখনই সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে যখন উহা চুম্বন করতে গিয়ে তওয়াফকারী কষ্ট পাবে না বা অন্য কাউকে কষ্ট দেয়া হবে না। যদি তওয়াফকারীর কষ্ট হয় বা অন্য কাউকে কষ্ট দেয়া হয়, তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপ অবলম্বন করবে এবং তা হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতকে চুম্বন করবে। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যদি একাজও কষ্ট করা ও কষ্ট দেয়া ছাড়া আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে আমরা তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়ে দূর থেকে হাজরে আসওয়াদকে এক হাত দ্বারা ইশারা করব। কিন্তু সে হাতকে চুম্বন করব না। এটাই হচ্ছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সুন্নাতী পদ্ধতি।

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বনের বিষয়টি আরো জটিল ও কঠিন হবে-যেমনটি প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন- নারীদেরকে পাথর চুম্বন করার জন্য ঠেলে দেয়া, হতে পারে সে নারী গর্ভবতী বা বৃদ্ধা কিংবা দুর্বল, যুবতী অথবা শিশুকে উপরে উঠিয়ে চুম্বনের জন্য এগিয়ে দেয়া, তবে এসব কাজ গর্হিত ও নাজায়েয। কেননা এতে দুবর্ল লোকদেরকে ভয়ঙ্কর এক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, যেখানে আছে সংকীর্ণতা ও পুরুষদের ভীড়ের প্রচন্ডতা। তাই বিষয়টি মাকরূহ অথবা হারামের অন্তর্গত। আল্লাহ্‌র রহমতে অন্য ব্যবস্থা থাকতে কোন মানুষের পক্ষে এদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। আপনি যদি কঠিনভাবে ইসলামের বিধান পালন করতে চান, তবে পরাজিত হবেন।

পূর্ণ সাত চক্কর তওয়াফ না করলে ওমরা হবে না

প্রশ্নঃ (৫০১) জনৈক নারী স্বামীর সাথে তামাত্তু হজ্জ করতে এসেছে। তারা ওমরার তওয়াফ করার সময় ৬ষ্ঠ চক্করে স্বামী বললেন, এটাই ৭ম চক্কর। এবং তিনি নিজ মতের উপর অটল ছিলেন। এখন স্ত্রীর করণীয় কি ?

উত্তরঃ উক্ত নারী যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সে৬ষ্ট চক্কর দিয়েছে এবং তওয়াফ পূর্ণ করে নি। তবে এখন পর্যন্ত তার উক্ত ওমরা পূর্ণ হয়নি। কেননা ওমরার অন্যতম রুকন হচ্ছে পূর্ণ সাত চক্কর তওয়াফ করা। এরপর যদি হজ্জের ইহরাম করে থাকে, তখন সে কেরাণকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ওমরা শেষ করার আগেই সে ওমরাকে হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করে নিয়েছে। কিন্তু স্বামীর অটলতা দেখে যদি স্ত্রী সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়, তবে কোন অসুবিধা নেই। তখন তার ওমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তার সন্দেহ, আর স্বামীর নিশ্চয়তা এ অবস্থায় স্বামীর কথায় ফিরে আসবে এবং সেটাকেই প্রাধান্য দিবে।

হজ্জ-ওমরায় নিজের ভাষায় দু'আ করাই উত্তম

প্রশ্নঃ (৫০২) ওমরা বা হজ্জকারী যদি দু'আ না জানে, তবে তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতির সময় কি কোন বই হাতে নিয়ে দেখে দেখে দু'আ পাঠ করা জায়েয হবে?

উত্তরঃ হজ্জ বা ওমরাকারী যে সমস্ত দু'আ জানে এগুলোই তার জন্যে যথেষ্ট। কেননা সাধারণতঃ সে যা জানে তা সে বুঝে। আর বুঝে-শুনেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু যদি কোন বই হাতে নিয়ে দু'আ পড়ে বা কাউকে ভাড়া নিয়ে তার শিখিয়ে দেয়া দু'আ পড়ে- যার কিছুই সে বুঝে না, তবে তাতে কোনই উপকার হবে না। তাছাড়া বাজারের এই বইগুলোতে তওয়াফ-সাঈর জন্য যে দু'আ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বিদআত এবং বিভ্রান্তি। কোন মুসলমানের জন্য এগুলো পাঠ করা জায়েয নয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা ও বিশেষ কোন দু'আ শিক্ষা দেননি। ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ)

"আল্লাহর ঘরের তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করা।"[1] তাই সকল মু'মিনের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এ ধরণের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক থাকা। আর নিজের দরকারের কথা আল্লাহর কাছে এমন ভাষায় পেশ করা যার অর্থ সে নিজে অনুধাবন করে। সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর যিক্র করা। অর্থ বুঝে না এমন শব্দ ব্যবহার করার চাইতে এটাই তার জন্য উত্তম। অনেকে এমনও আছে যে অর্থ বুঝা তো দূরের কথা বইয়ের শব্দ বা বাক্যগুলোই ভালভাবে পড়তে পারে না।

প্রশ্নঃ (৫০৩) তওয়াফ-সাঈতে কি বিশেষ কোন দু'আ আছে ?

উত্তরঃ হজ্জ-ওমরার জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। মানুষ জানা যে কোন দু'আ পাঠ করতে পারবে। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত দু'আ সমূহ পাঠ করা উত্তম। বিশেষ করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাতঃ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ্, ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।" অনুরূপভাবে সাফা-মারওয়ায় ও আরাফার দিবসের প্রমাণিত দু'আ পাঠ করতে পারে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে সমস্ত দু'আ জানা আছে তাই পাঠ করা উচিত। কিন্তু জানা না থাকলে তার মনে যে দু'আই আসে তাই পাঠ করা যাবে। কেননা এই দু'আ পাঠ করা ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং উহা মুস্তাহাব।

এ উপলক্ষে আমি বলতে চাইঃ হজ্জ-ওমরার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা হাজীদের হাতে দেখা যায়। তাতে তওয়াফ-সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দু'আ নির্দিষ্ট করা থাকে। এটা বিদআত। এতে নিশ্চিতভাবে অনেক ধরণের বিপদ আছে। যেমন,

১) যারা এটা পাঠ করে ধারণা করে যে, বইয়ের দু'আগুলো নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত।

২) তারা এই দু'আর প্রত্যেকটি শব্দ পাঠ করা ইবাদত মনে করে।

৩) কোন মর্ম বা অর্থ না বুঝেই তা পাঠ করে।

৪) প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ নির্দিষ্ট করে।

৫ ভীড়ের কারণে চক্কর পূর্ণ হওয়ার আগেই দু'আ পড়া শেষ হয়ে গেলে চুপ করে থাকে।

৬) আর দু'আ শেষ হওয়ার আগে চক্কর শেষ হয়ে গেলে দু'আ পড়া ছেড়ে দেয়। এই বিদআতী আমলের কারণে এতগুলো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

---

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মানসেক, অনুচ্ছেদঃ রমল করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কিভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

অনুরূপভাবে মাক্বামে ইবরাহীমের কাছে পাঠ করার জন্য ঐ বইয়ে যে দু'আ পাওয়া যায়, তাও বিদআত। কেননা উহা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। বরং তিনি সেখানে গিয়ে পাঠ করেছেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْـــرَاهِيمَ مُصَــــلًّى "তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।" (সূরা বাক্বারাঃ-১২৫) এবং তিনি এর পিছনে দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন। অতএব যারা এখানে এসে অতিরিক্ত দু'আ পাঠ করে এবং অন্যান্য মুছল্লী ও তওয়াফকারীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাদের এই কাজ দু'টি কারণে গর্হিত ও বিদ্‌আতঃ

ক) এ সমস্ত দু'আ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কারণে তা বিদআত।

খ) যারা মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে নামায আদায় করে তাদের নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

প্রশ্নঃ (৫০৪) ওমরা শেষ করার পর ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পেলে কি করবে ?

উত্তরঃ কোন মানুষ ওমরার তওয়াফ ও সাঈ শেষ করার পর যদি ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পায়, তবে তার তওয়াফ বিশুদ্ধ, সাঈ বিশুদ্ধ তথা ওমরা বিশুদ্ধ। কেননা কারো কাপড়ে যদি তার অজানাতে কোন নাপাকী লেগে থাকে অথবা জানে কিন্তু তা পরিষ্কার করতে ভুলে যায় এবং সেই কাপড়ে নামায আদায় করে, তবে তার নামায বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে ঐ কাপড়ে যদি তওয়াফ করে তবে তওয়াফও বিশুদ্ধ। একথার দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَـــا "হে আমাদের পালনকর্তা আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৬) এটি একটি সাধারণ দলীল। ইহা ইসলামের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এখানে একটি বিশেষ দলীল আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ তিনি জুতা খুলে ফেললেন। লোকেরাও জুতা খুলে ফেললেন। নামায শেষ করে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি হয়েছে ? কেন তোমরা জুতা খুলে ফেললে ? তারা বললেন, আপনি জুতা খুলে ফেলেছেন, আপনার দেখাদেখি আমরাও জুতা খুলে ফেললাম। তিনি বললেন, "জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার জুতায় নাপাকী আছে। তাই আমি ইহা খুলে ফেলেছি।"[1] কিন্তু নবী (সাঃ) নতুন করে আর নামায আদায় করলেন না। অথচ তাঁর নামাযের প্রথম দিকের কিছু অংশ নাপাকী নিয়েই হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা জানতেন না। অতএব ভুলক্রমে অথবা না

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ জুতা পরে নামায আদায় করা।

জানার কারণে কেউ যদি কাপড়ে নাপাকী নিয়ে নামায আদায় করে বা তওয়াফ করে তবে তা বিশুদ্ধ হবে।

একটি মাসআলাঃ কোন মানুষ যদি ছাগলের মাংস মনে করে উটের মাংস খায় এবং এ ভিত্তিতে ওযু না করেই নামায আদায় করে। যখন বিষয়টি সে জানবে তখন তাকে কি নামায পুনরায় পড়তে হবে? হ্যাঁ, ওযু করে তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে। কেউ যদি প্রশ্ন করে, এটা কেমন কথা অজ্ঞতা বশতঃ নাপাকী নিয়ে নামায আদায় করলে তা দোহরাতে হবে না; কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ উটের মাংস খেয়ে ওযু না করে নামায আদায় করলে তা দোহরাতে হবে?

এর জবাবঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি (theory) হচ্ছে, [নির্দেশ মূলক বিষয় অজ্ঞতা ও ভুলের কারণে রহিত হয় না। কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয় অজ্ঞতা ও ভুলের কারণে রহিত হয়ে যায়।] এই মূলনীতির দলীল হচ্ছেঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে বা ভুলে যায়, তবে স্মরণ হলেই সে যেন উহা আদায় করে নেয়।"[1] কোন এক সময় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভুলক্রমে দু'রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলেন, বিষয়টি তাঁকে স্মরণ করানো হলো, তিনি তখন শুধুমাত্র ছুটে যাওয়া দু'রাকাতই আদায় করলেন। এথেকে বুঝা যায় নির্দেশিত বিষয় ভুলে যাওয়ার কারণে রহিত হয় না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ করেছেন নামায ভুলে গেলে স্মরণ হলেই আদায় করে নিতে হবে। তা ছেড়ে দেয়া যাবে না।

অনুরূপভাবে অজ্ঞতার কারণে নির্দেশ মূলক রহিত হয় না তার দলীল হচ্ছে, জনৈক ব্যক্তি এসে খুব তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করলো, তারপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে সালাম দিলো, তিনি তাকে বললেনঃ ফিরে যাও আবার নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামাযই আদায় করো নি। এভাবে তিন বার তাকে ফেরালেন। প্রতিবারই সে নামায আদায় করে তাঁর কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, "ফিরে গিয়ে নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামাযই আদায় করো নি।"[2] শেষ পর্যন্ত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নামায শিখিয়ে দিলেন, ফলে সে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নামায আদায় করল। এই লোকটি নামাযের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব 'ধীরস্থিরতা' অজ্ঞতার কারণে পরিত্যাগ করেছিল। সে বলেছিল, 'শপথ সেই সত্বার যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চাইতে সুন্দর ভাবে নামায আদায় করতে জানি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।' অজ্ঞতার কারণে যদি ওয়াজিব রহিত হয়ে যেত,

---

[1] . দেখুন ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ক্বেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

তবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ওযর গ্রহণ করতেন এবং বারংবার তাকে নামায পড়তে বলতেন না।

প্রশ্নঃ (৫০৫) মাক্বামে ইবরাহীমে যে পদচিহ্ন দেখা যায়, তা কি প্রকৃতই ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের চিহ্ন ?

উত্তরঃ সন্দেহ নেই মাক্বামে ইবরাহীম সুপ্রমাণিত। কাঁচে ঘেরা স্থানটিই মাক্বামে ইবরাহীম। কিন্তু এর মধ্যে যে গর্ত দেখা যায় তাতে পায়ের কোন চিহ্ন প্রকাশিত নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, বহুকাল পর্যন্ত পাথরের উপর দু'পায়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানের এই গর্তটি শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য করা হয়েছে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, এই গর্তই ইবরাহীম (আঃ) এর পদদ্বয়ের চিহ্ন।

এ উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনেক ওমরাকারী ও হজ্জ পালনকারী মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে এসে এমন কিছু দু'আ পাঠ করে যা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। কখনো এরা উঁচু কণ্ঠে দু'আ পাঠ করে এবং মুছল্লী বা তওয়াফকারীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মাক্বামে ইবরাহীমের জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই। মানুষ যা পাঠ করে তা মৌলবীদের তৈরীকৃত। সুন্নাত হচ্ছে তওয়াফ শেষ করে (মাক্বামে ইবরাহীমের) পিছনে এসে হালকা করে দু'রাকাত নামায আদায় করা। (বেশী ভীড় থাকলে সেখানে নামায না পড়ে আরো পিছনে বা যে কোন স্থানে নামায পড়া যাবে।) তারপর নামায হয়ে গেলেই সেখানে বসে থাকবে না; যারা নামায পড়তে চায় তাদের জন্য জায়গা খালি করে দিবে।

প্রশ্নঃ (৫০৬) কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে দু'আ বা কান্নাকাটি করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে বরকত কামনা করা বা দু'আ বা কান্নাকাটি করা বিদআত। কেননা এ কাজ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই। মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) তওয়াফ করার সময় যখন কা'বা ঘরের প্রতিটি কোণ স্পর্শ করছিলেন, তখন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) এর প্রতিবাদ করেছেন। মুআবিয়া বললেন, 'কা'বা ঘরের কোন অংশই ছাড়ার নয়।' তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) জবাবে বললেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমি দেখেছি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু মাত্র দু'টি কর্ণার স্পর্শ করেছেন। অর্থাৎ- হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী। অতএব আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে কা'বা ঘরকে ছোঁয়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে শুধুমাত্র সুন্নাত থেকে প্রমাণিত দলীলেরই অনুসরণ করব। কেননা এতেই আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উত্তম আদর্শকে আঁকড়ে থাকতে পারব। অবশ্য মুলতাযিম অর্থাৎ কা'বা ঘরের দরজা ও

হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্পর্শ করে দু'আ করা, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্নঃ (৫০৭) ওমরায় মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করার বিধান কি ? এ দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম ?

উত্তরঃ ওমরায় মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে মক্কায় আগমণ করে তওয়াফ ও সাঈ করার পর যারা কুরবানী সাথে নিয়ে আসেনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই আদেশ ওয়াজিবের অর্থ বহণ করে। অতএব চুল ছোট করা আবশ্যক। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৬ষ্ঠ হিজরীতে ওমরা করার জন্য গমণ করলে হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি ছাহাবীদেরকে সেখানেই মাথা মুন্ডন করার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা নির্দেশ পালনে দ্বিধায় ভোগলে তিনি তাদের উপর রাগন্বিত হন। আর মাথার চুল ছোট করার চাইতে মাথা মুন্ডন করা উত্তম।[1] তবে তামাত্তুকারী যদি শেষ সময়ে মক্কায় পৌঁছে, তবে ওমরা করার পর চুল ছোট করাই ভাল, যাতে করে হজ্জের সময় মুন্ডন করার জন্য মাথায় চুল পাওয়া যায়।

তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কিত একটি মাসআলা

প্রশ্নঃ (৫০৮) জনৈক হাজী সাহেব তামাত্তু হজ্জ করতে এসে, ওমরার তওয়াফ ও সাঈ শেষ করে ইহরাম খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করে নিয়েছে। মাথা মুন্ডন করেনি বা চুল ছোট করেনি। হজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ করার পর এ সম্পর্কে সে জানতে চেয়েছে। এখন তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ এ ব্যক্তি ওমরার একটি ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করেছে। তা হচ্ছে, চুল খাটো করা বা মাথা মুন্ডন করা। বিদ্বানদের মতে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ফিদ্ইয়া হিসেবে একটি কুরবানী করা। তা মক্কাতেই আদায় করতে হবে এবং সেখানকার ফকীরদের নিকট তার গোস্ত বিতরণ করতে হবে। তবেই তার তামাত্তু হজ্জ সম্পাদন হবে এবং ওমরা বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্নঃ (৫০৯) যে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বেঁধে ওমরা শেষ করে চুল কাটেনি বা মুন্ডনও করেনি। পরে হজ্জের সমস্ত কাজ শেষ করেছে তাকে কি করতে হবে ?

উত্তরঃ এ ব্যক্তি ওমরায় চুল ছোট করা পরিত্যাগ করেছে। যা ওমরার একটি ওয়াজিব। বিদ্বানদের মতে ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে দম তথা কুরবানী ওয়াজিব হবে। তা মক্কায়

---

[1] . কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার দু'আ করেছেন এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করেছেন। বুখারী অধ্যায়ঃ হজ্জ হা/১৬১৩ মুসলিম অধ ্যায়ঃ হজ্জ হা/ ২২৯৫।

যবেহ করে সেখানকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করতে হবে। আর এর মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণতা লাভ করবে। মক্কার বাইরে অবস্থান করলে যে কোন লোককে উক্ত ফিদ্‌ইয়া মক্কায় আদায় করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারে। (আল্লাহ্‌ তাওফীক দাতা)

প্রশ্নঃ (৫১০) তামাত্তুকারী কুরবানী দিতে পারেনি। হজ্জে সে তিনটি রোযা রেখেছে। কিন্তু হজ্জ থেকে ফিরে এসে সাতটি রোযা রাখেনি। এভাবে তিন বছর কেটে গেছে। তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ তার উপর আবশ্যক হচ্ছে দশ দিনের মধ্যে থেকে অবশিষ্ট সাত দিনের ছিয়াম এখনই পালন করে নেয়া। (আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য সাহায্য চাই)

প্রশ্নঃ (৫১১) ওমরা করে জনৈক লোক নিজ দেশে গিয়ে মাথা মুন্ডন করেছে। তার ওমরার বিধান কি ?

উত্তরঃ বিদ্বানগণ বলেন, মাথা মুন্ডন করার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। মক্কা বা মক্কা ছাড়া অন্য কোন স্থানে মুন্ডন করলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মাথা মুন্ডন করার উপর ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া নির্ভর করছে। তাছাড়া মুন্ডন করার পর বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। ওমরার কাজগুলোর ধারাবাহিকতা এরকমঃ ইহরাম, তওয়াফ, সাঈ, মাথা মুন্ডন বা ছোট করা এবং ওমরার কাজ শেষ করার পর মক্কায় কিছুকাল অবস্থান করলে বিদায়ী তওয়াফ করা। কিন্তু ওমরার কাজ শেষ করে মক্কায় অবস্থান না করলে বিদায়ী তওয়াফের দরকার নেই। অতএব মক্কায় অবস্থান করতে চাইলে ওমরার কাজ শেষ করে মক্কাতেই তাকে মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করতে হবে। কারণ তাকে এরপর বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। কিন্তু তওয়াফ-সাঈ শেষ করার সাথে সাথেই যদি মক্কা থেকে বের হয়ে থাকে, তবে নিজ দেশে বা শহরে গিয়ে মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করতে পারে। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থাতেই থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৫১২) তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বেঁধে ওমরা করে কোন কারণ বশতঃ হজ্জের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে। তাকে কি কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে ?

উত্তরঃ তাকে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। কেননা তামাত্তুকারী ওমরার ইহরাম বাঁধার পর ওমরা পূর্ণ করে যদি হজ্জের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা দু'টি কাজ আলাদা আলাদা ইহরামে সম্পাদন করতে হয়। হ্যাঁ, সে যদি মানত করে থাকে যে এ বছরই হজ্জ করবে তবে মানত পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৫১৩) তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর ওমরা শেষ করে অজ্ঞতা বশতঃ হালাল হয়নি। এভাবে হজ্জের কাজ শেষ করে কুরবানী করেছে। তার করণীয় কি? তার হজ্জ কি বিশুদ্ধ?

উত্তরঃ জানা আবশ্যক যে, কোন মানুষ তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বাঁধলে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, তওয়াফ, সাঈ শেষ করে মাথার চুল খাটো করে হালাল হয়ে যাওয়া। কিন্তু ওমরার তওয়াফ শুরু করার পূর্বে যদি হজ্জের নিয়ত করে ফেলে এবং ইহরাম খোলার ইচ্ছা না করে, তবে কোন অসুবিধা নেই। এ অবস্থায় তার হজ্জ কেরাণ হজ্জে পরিণত হবে। তার কুরবানীও হবে কেরাণ হজ্জের কুরবানী। কিন্তু যদি ওমরার নিয়তেই থাকে এমনকি তওয়াফ-সাঈ শেষ করে ফেলে, তবে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, তার হজ্জের ইহরাম শুদ্ধ নয়। কেননা ওমরার তওয়াফ শুরু করার পর ওমরাকে হজ্জে প্রবেশ করানো বিশুদ্ধ নয়। বিদ্বানদের মধ্যে অন্যদের মত হচ্ছে, এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সে ছিল অজ্ঞ। আমি মনে করি তাকে কোন কিছু দিতে হবে না। তার হজ্জ বিশুদ্ধ ইনশাআল্লাহ্। (আল্লাহই তাওফীক দাতা।)

প্রশ্নঃ (৫১৪) আরাফাত থেকে ফেরার পথে একদল লোক মুযদালিফার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। রাত একটার দিকে তারা মাগরিব ও এশা নামায আদায় করে। মুযদালিফা পৌঁছার সময় ফজরের আযান হয়ে যায়। সেখানে তারা ফজর নামায আদায় করে। এখন তাদেরকে কি কোন জরিমানা দিতে হবে ?

উত্তরঃ এদেরকে কোন ফিদ্ইয়া বা জরিমানা দিতে হবেনা। কেননা তারা ফজরের আযানের সময় মুযদালিফায় প্রবেশ করেছে এবং সেখানে অন্ধকার থাকতেই ফজর নামায আদায় করেছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেন,

(مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ)

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে এই ছালাতে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রস্থান করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করেছে। আর এর পূর্বে আরাফাতে রাতে বা দিনে অবস্থান করেছে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করে নিয়েছে এবং ইবাদত আদায় করে নিয়েছে।"[1] কিন্তু এরা মধ্যরাত্রির পর মাগরিব-এশা নামায আদায় করে ভুল করেছে। কেননা এশা নামাযের শেষ সময় মধ্যরাত্রি। যেমনটি ছহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'ছ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে প্রমাণিত আছে।

সামর্থ থাকা সত্বেও অন্যকে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব প্রদান করা

প্রশ্নঃ (৫১৫) জনৈক নারী মুযদালিফা থেকে শেষ রাত্রে যাত্রা করেছে। এবং সামর্থ থাকা সত্বেও নিজের ছেলেকে তার পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব প্রদান করেছে। এর বিধান কি?

[1] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, হা/ ৮১৫।

উত্তরঃ হজ্জের কার্যাদির মধ্যে অন্যতম কাজ হচ্ছে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেন,

(إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ)

"আল্লাহর ঘরের তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করা।"[1] এটি একটি ইবাদত। মানুষ এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করবে। তাঁর যিকিরকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যেহেতু এটার ভিত্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উপর, তাই উচিত হচ্ছে, কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর জন্য ভীত হবে ও বিনয়াবনত হবে। তবে প্রথম সময়েই তাড়াহুড়া করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে যাবে না; বরং দেরী করে শেষ সময়ে নিক্ষেপ করবে। অবস্থাভেদে সিদ্ধান্ত নিবে। শেষ সময়ে যদি প্রশান্তি, ধীরস্থিরতা, বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতির সাথে নিক্ষেপ করা যায়, তবে দেরী করাই উত্তম। কেননা এটা এমন বৈশিষ্ট যা ইবাদতের বিশুদ্ধতার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যে বৈশিষ্ট ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট তা ইবাদতের সময় ও স্থানের উপর অগ্রগণ্য। এ কারণে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) "খাদ্য উপস্থিত হলে এবং দু'টি নাপাক বস্তুর (পেশাব-পায়খানার) চাপ থাকলে নামায নেই।"[2] অর্থাৎ-প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং মনের চাহিদা পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ নামাযকে প্রথম সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করবে। অতএব কঙ্কর মারার জন্য প্রথম সময়ে যদি ভীড়ের কারণে বেশী কষ্ট হয়, কঙ্কর মারার চাইতে নিজের জান বাঁচানোর দায় বেশী হয়, আর বিলম্বে কঙ্কর মারলে যদি প্রশান্তির সাথে অন্তর উপস্থিত রাখা যায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে এই ইবাদত করা যায়, তবে বিলম্বে কঙ্কর মারাই উত্তম। এজন্য নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে শেষ রাতেই মুযদালিফা ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে করে তারা ভীড়ের মধ্যে পড়ে কষ্ট না পায়।

অতএব একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক সামর্থবান হলে কাউকে কঙ্কর মারার দায়িত্ব দেয়া জায়েয নয়। নিজেই কঙ্কর মারার ইবাদতটি পালন করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর।" এতে নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য নেই। তবে কোন পুরুষ বা নারী অসুস্থ হয় বা নারী গর্ভবতী হয় এবং ভীড়ের মধ্যে গেলে গর্ভের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে, তবে তারা যে

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদঃ রমল করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কিভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদঃ খাদ্যের উপস্থিতিতে নামায পড়া মাকরূহ।

কাউকে কঙ্কর মারার দায়িত্ব দিতে পারে। প্রশ্নে উল্লেখিত যে নারী সামর্থ থাকা সত্বেও নিজের ছেলেকে দিয়ে কঙ্কর মারিয়েছে-আমি মনে করি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে সতর্কতা বশতঃ সে একটি কুরবানী করবে এবং তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

কঙ্কর যদি হাওয বা গর্তের মধ্যে না পড়ে

প্রশ্নঃ (৫১৬) জনৈক হাজী পূর্ব দিক থেকে জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মেরেছে। কিন্তু তা হাওয বা গর্তের মধ্যে পড়েনি। ঘটনাটি ছিল ১৩ তারিখে। তাকে কি তিনটি জামরাতেই পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে?

উত্তরঃ সবগুলো স্থানে তাকে পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে না; বরং যে ক্ষেত্রে ভুল করেছে সেটাই শুধু পুনরায় মারবে। অতএব শুধুমাত্র জামরা আক্বাবায় পুনরায় কঙ্কর মারবে। সঠিক পদ্ধতিতে মারবে। পূর্ব দিক থেকে মারলে যদি হাওযে কঙ্কর না পড়ে তবে মারা জায়েয হবে না। কেননা কঙ্কর মারার স্থানই হচ্ছে হাওয। এই কারণে যদি ব্রীজের উপরে গিয়ে পূর্ব দিক থেকে কঙ্কর মারে এবং তা হাওযে পড়ে তবে তা জায়েয হবে।

সাতটি কঙ্করের মধ্যে দু'একটি কঙ্কর হাওযে না পড়লে

প্রশ্নঃ (৫১৭) সাতটি কঙ্করর ম ধ্যে থেকে যদি একটি বা দু'টি কঙ্কর জামরায় না পড়ে এবং এ ভাবে এক বা দু'দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে কি তাকে সবগুলো জামরায় পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে ?

উত্তরঃ যদি কারো কোন জামরায় একটি বা দু'টি পাথর নিক্ষেপ বাকী থাকে, তবে ফিক্বাহবিদগণ বলেন, যদি এটা শেষ জামরায় হয়ে থাকে, তবে শুধু বাকীটা মেরে দিলেই হয়ে যাবে, পূর্বেরগুলো আর মারতে হবেনা। কিন্তু যদি প্রথম বা মধ্যবর্তী জামরার কোন একটিতে এক বা একাধিক পাথর মারা বাকী থাকে, তবে সেটা পূর্ণ করবে এবং তারপরের জামরাগুলোতে পাথর মারবে। কেননা পাথর মারার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাকী পাথরটাই মারবে। তারপরের জামরাতে আর পাথর মারতে হবে না। কেননা ভুল বা অজ্ঞতার কারণে ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাবে। এই লোক যখন মধ্যবর্তী জামরাতে পাথর মেরেছে, তার তো এই ধারণা নেই যে, এর পূর্বে কোন পাথর মারা তার বাকী আছে। সুতরাং বিষয়টি সে ভুলে গেছে অথবা তাতে সে অজ্ঞ। তাই তাকে আমরা বলব, যে ক'টা পাথর মারা বাকী রয়েছে তা মেরে দিন। এরপর আর কোনা পাথর মারতে হবে না। এ জবাব শেষ করার আগে আমি সতর্ক করতে চাই যে, জামরা হচ্ছে পাথর একত্রিত হওয়ার স্থান বা পাথরের হাওয। যে লম্বা স্তম্ভ দেখা যায় সেটাই জামরা নয়। এটা শুধু চিহ্নের জন্য রাখা হয়েছে।

অতএব যদি হাওয়ে বা গর্তের মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং ঐ স্তম্ভে না লাগে তাতে কোন অসুবিধা নেই তার নিক্ষেপ বিশুদ্ধ। (আল্লাহ্ অধিক জানেন)

যে কঙ্কর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে

প্রশ্নঃ (৫১৮) কেউ কেউ বলেন, যে কঙ্কর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা নাকি আবার নিক্ষেপ করা যাবে না। এ কথাটি কি ঠিক ? এর কোন দলীল আছে কি ?

উত্তরঃ একথা সঠিক নয়। কেননা যারা নিক্ষিপ্ত কঙ্কর পুনরায় নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন তাদের যুক্তি হচ্ছেঃ

১) নিক্ষিপ্ত কঙ্কর (মায়ে মুস্তা'মাল) তথা ব্যবহৃত পানির মত। ফরয পবিত্রতায় যদি কোন পানি ব্যবহার করা হয়, তবে ব্যবহৃত পানিটা পবিত্র থাকে কিন্তু সে পানি অন্যকে পবিত্র করতে পারে না।

২) বিষয়টি ক্রীতদাসের মত। কাফ্ফারা প্রভৃতিতে যদি তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়, তবে তো তাকে আবার মুক্ত করা যাবে না।

৩) এতে বুঝা যায় সমস্ত হাজীর জন্য একটি মাত্র পাথর মারাই জায়েয হবে। আপনি পাথরটি মারবেন, তারপর আবার সেটা নিবেন এবং মারবেন, তারপর আবার নিবেন এবং মারবেন এভাবে সাতবার পূর্ণ করবেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে সেই পাথরটি সাতবার নিয়ে সাতবার মারবে।

এ তিনটি যুক্তি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় খুবই দুর্বলঃ

১) ব্যবহৃত পানির যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। কেননা কোন ওয়াজিব পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ব্যবহার করা হলে পানি নিজে পবিত্র থাকবে কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারবে না এটি দলীল বিহীন একটি কথা। পানির যে প্রকৃত গুণ রয়েছে অর্থাৎ পবিত্রতা তা দলীল ছাড়া রহিত করা যাবে না। অতএব ওয়াজিব পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র অন্যকেও পবিত্র করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রথম যুক্তির খন্ডন হয়ে গেল। এবং কঙ্কর মারাকে তার সাথে তুলনা করা ভুল প্রমাণিত হল।

২) নিক্ষিপ্ত কঙ্করকে মুক্ত ক্রীতদাসের সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। কেননা উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। ক্রীতদাসকে মুক্ত করা হলে সে তো স্বাধীন হয়ে গেল। তাকে আবার মুক্ত করার সুযোগ থাকলো না। কিন্তু কঙ্কর মারা হয়ে গেলেও সেটা কঙ্করই রয়ে যায়। যে কারণে তা নিক্ষেপ করা হয়েছিল সে কারণ তাতে অবশিষ্ট রয়েছে। এই কারণে ক্রীতদাস আবার যদি কখনো শরঈ দলীলের ভিত্তিতে দাসে পরিণত হয়, তবে পুনরায় তাকে মুক্ত করা যাবে।

৩) তৃতীয় যুক্তির জবাবে আমরা বলবঃ সমস্ত হাজীকে একটি মাত্র পাথর নিক্ষেপ আবশ্যক করা- যদি সম্ভব হয় তো হোক। কিন্তু তা অসম্ভব। অসংখ্য পাথর থাকতে কোন বুদ্ধিমান ঐ চিন্তা করতে পারে না।

সুতরাং কঙ্কর মারতে গিয়ে যদি আপনার হাত থেকে দু'একটি কঙ্কর পড়ে যায় তবে সম্মুখ থেকে সহজলভ্য কঙ্কর কুড়িয়ে নিয়ে তা মেরে দিন-চাই তা একবার মারা হয়েছে বা হয়নি তা দেখার বিষয় নয় এবং তাতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৫১৯) তওয়াফে এফাযার পূর্বে হজ্জের সাঈ করা কি জায়েয ?

উত্তরঃ হাজী সাহেব যদি ইফরাদ বা কেরাণকারী হয়, তবে তার জন্য তওয়াফে এফাযার পূর্বে হজ্জের সাঈ করা জায়েয আছে। তওয়াফে কুদুমের পর পরই উহা আদায় করে নিবে। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীদের মধ্যে যারা কুরবানী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তারা করেছিলেন।

কিন্তু তামাত্তুকারী হলে তাকে দু'বার সাঈ করতে হবে। প্রথমবার মক্কায় আগমণ করে ওমরার জন্য। প্রথমে তওয়াফ করবে, তারপর সাঈ করে চুল খাট করে হালাল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়বার সাঈ করবে (আরাফাত দিবসের পর) হজ্জের জন্য। উত্তম হচ্ছে তওয়াফে এফাযা আদায় করার পর এই সাঈ করা। কেননা সাঈ তওয়াফের পরের কাজ। অবশ্য যদি তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে ফেলে তবে বিশুদ্ধ মতে কোন অসুবিধা হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছেঃ আমি তো তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, "কোন অসুবিধা নেই।"[1]

হাজী সাহেব ঈদের দিন তথা দশই জিলহজ্জ পাঁচটি কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করবেঃ

১) জামরা আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা
২) তারপর কুরবানী
৩) তারপর মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করা
৪) অতঃপর কা'বা ঘরের তওয়াফ করা
৫) সবশেষে ছাফা-মারওয়া সাঈ করা।

অবশ্য ইফরাদকারী ও ক্বেরাণকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ করে নিয়ে থাকে, তবে পুনরায় তাকে সাঈ করতে হবে না। উত্তম হচ্ছে উল্লেখিত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে

[1] আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ হজ্জ-ওমরা, অনুচ্ছেদঃ হজ্জে একটি কাজের পূর্বে অন্যটি করে ফেলার বিধান। হা/১৭২৩।

আদায় করা। কিন্তু যদি আগ-পিছ হয়ে যায় বা করে ফেলে-বিশেষ করে প্রয়োজন দেখা দিলে তবে কোন অসুবিধা নেই। এটা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র করুণার একটি বড় প্রমাণ।[1]

প্রশ্নঃ (৫২০) কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলে আদায় হবে ? এবং কখন মারলে কাযা মারা হবে ?

উত্তরঃ ঈদের দিন সর্বসাধারণের জন্য কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে, সূর্য উঠার পর থেকে শুরু হবে। আর দুর্বলদের জন্য এ সময় শুরু হবে শেষ রাত থেকে। কঙ্কর মারার শেষ সময় হচ্ছে পরবর্তী দিন ১১ তারিখ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি উক্ত সময়ের মধ্যে মারা সম্ভব না হয়, তবে আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) যে সময় কঙ্কর মারা শুরু হবে সে সময়ই বিগত দিনের জামরা আক্বাবার কাযা পাথর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার পর থেকে পাথর মারা শুরু হবে। আর শেষ হবে পরবর্তী দিন ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ তারিখ) হলে রাত্রে কঙ্কর মারা যাবে না। কেননা সেদিন সূর্য অস্ত হলেই আইয়ামে তাশরীক শেষ হয়ে গেল এবং ১৪তারিখ শুরু হয়ে গেল। সর্বাবস্থায় দিনের বেলায় কঙ্কর নিক্ষেপ করাই উত্তম। কিন্তু এই সময়ে হাজীদের ভীড়ের প্রচন্ডতার কারণে, হাজীদের একে অপরের প্রতি বেপরওয়া হওয়ার কারণে যদি জানের ক্ষতির আশংকা করে বা কঠিন কষ্টকর হয়ে উঠে, তবে রাত্রে মারলে কোন অসুবিধা হবে না। অবশ্য কোন আশংকা না থাকলেও রাতে মারলে কোন অসুবিধা নেই। তবে এই মাসআলায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং একান্ত অসুবিধা না থাকলে রাতে কঙ্কর না মারা উচিত।

প্রশ্নঃ (৫২১) বিশেষ করে ঈদের দিনে তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা কি জায়েয ?

উত্তরঃ সঠিক কথা হচ্ছে ঈদের দিন বা অন্য দিনে কোন পার্থক্য নেই। সর্বাবস্থায় তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা জায়েয আছে। এমনকি ঈদের দিনের পরও যদি হয়। কেননা হাদীছের সাধারণ অর্থ একথাই প্রমাণ করে। জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করলেন, তওয়াফের পূর্বে আমি সাঈ করেছি। তিনি বললেনঃ "কোন অসুবিধা নেই।"

তওয়াফের পর কি সরাসরি সাঈ করতে হবে ? নাকি বিলম্ব করা যাবে ?

[1] . আমাদের দেশ থেকে অনেক হাজী তামাত্তু হজ্জ করতে এসে ৭ বা ৮ই জিলহজ্জে হজ্জের ইহরাম বেঁধে মিনা যাওয়ার পূর্বেই ইহরাম বিহীন অবস্থায় অগ্রীম সাফা-মারওয়া সাঈ করে নেয়। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ নয়। এতে তাদের হজ্জ হবে না। কেননা তারা হজ্জের নিয়ত না করেই হজ্জের কিছু কাজ সম্পাদন করছে।- অনুবাদক

প্রশ্নঃ (৫২২) সাঈ আবশ্যক ছিল কিন্তু তওয়াফ করার পর সরাসরি সাঈ না করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। পরে তাকে বিষয়টি জানানো হলো, সে কি এখন শুধু সাঈ করবে ? নাকি পুনরায় তওয়াফ করার পর সরাসরি সাঈ করবে ?

উত্তরঃ কোন মানুষ যদি তওয়াফ করে এই বিশ্বাসে যে তাকে সাঈ করতে হবে না। কিন্তু পরে তাকে জানানো হল যে, তাকে অবশ্যই সাঈ করতে হবে। তখন তার শুধুমাত্র সাঈ করলেই হয়ে যাবে। পুনরায় তাওয়াফ করার দরকার নেই। কেননা তাওয়াফের পর পরই সাঈ করতে হবে এরকম কোন শর্ত নেই। এমনকি কোন মানুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সাঈ করতে বিলম্ব করে- তবুও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু উত্তম হচ্ছে তওয়াফ শেষ করার পর পরই বিলম্ব না করে সাঈ করে নেয়া।

প্রশ্নঃ (৫২৩) ওমরায় যে ব্যক্তি মাথার এদিক ওদিক থেকে অল্প করে চুল কাটে, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ আমি মনে করি এ লোকের চুল খাটো করা সম্পন্ন হয়নি। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ইহরামের কাপড় পুনরায় পরিধান করে বিশুদ্ধভাবে মাথার সম্পূর্ণ অংশ থেকে চুল খাটো করা তারপর হালাল হওয়া। এ উপলক্ষে আমি সতর্ক করতে চাই, কোন কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে চাইলে সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সীমারেখা জানা আবশ্যক। যাতে করে জেনে-শুনে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে। ইবাদতটি যেন অজ্ঞতার সাথে না হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেছেনঃ

﴿قُلْ هَذِه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي﴾

"আপনি বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে।" (সূরা ইউসুফঃ ১০৮) কোন মানুষ যদি মক্কা থেকে মদীনা সফর করতে চায়, তবে রাস্তা সম্পর্কে অবশ্যই নির্দেশনা নিতে হবে। মানুষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। যাতে করে পথভুলে হারিয়ে না যায়। বাহিরের পথের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে আভ্যন্তরিণ পথ যা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাবে সে সম্পর্কে কি জ্ঞানার্জন করতে হবেনা? সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে না ?

মাথার চুল খাটো করার অর্থ হচ্ছে মাথার সমস্ত অংশ থেকে চুলের কিছু কিছু অংশ কেটে ফেলা। চুল খাটো করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মেশিন ব্যবহার করা। কারণ এতে সমস্ত মাথা থেকেই চুল কাটা হয়। অবশ্য কেঁচি দ্বারা চুল কাটাতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে মাথার চতুর্দিক থেকে চুল কাটতে হবে। যেমন করে মাথা মুন্ডন করলে সমস্ত মাথা মুন্ডন করতে হয়। যেমন ওযুর সময় সমস্ত মাথাকে মাসেহ্ করতে হয়। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্নঃ (৫২৪) কঙ্কর মারার সময় কখন ?

উত্তরঃ জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে ঈদের দিন। সামর্থবান লোকদের জন্য এ সময় শুরু হবে ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে। আর মানুষের ভীড় সহ্য করতে পারবে না এরকম দুর্বল, নারী, শিশু, প্রভৃতির জন্য সময় হচ্ছে ঈদের দিন শেষ রাত থেকে। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ঈদের রাতে চাঁদ অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করতেন। চাঁদ অস্ত গেলেই মুযদালিফা ছেড়ে মিনা রওয়ানা হতেন এবং জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারতেন। আর এর শেষ সময় হচ্ছে ঈদের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু যদি ভীড় প্রচন্ড থাকার কারণে বা জামরা থেকে দূরে অবস্থানের কারণে রাতে কঙ্কর মারে তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু পরবর্তী দিন ১১ তারিখের ফজর পর্যন্ত যেন বিলম্ব না করে।

আইয়্যামে তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু হবে মধ্য দিনে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর থেকে তথা যোহরের সময় থেকে এবং তা চলতে থাকবে রাত পর্যন্ত। আর কষ্ট ও ভীড়ের কারণে বিলম্ব করে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহা নিক্ষেপ করা যাবে। এ তিন দিন যোহরের সময়ের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পূর্বে নিক্ষেপ করেননি। আর লোকদের বলেছেনঃ "তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ-ওমরার বিধি-বিধান শিখে নাও।"[1] সকালের দিকে ঠান্ডা এবং সহজ থাকা সত্বেও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলম্ব করে কঠিন গরমে দুপুরের সময় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন- এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, এই সময়ের পূর্বে নিক্ষেপ করা জায়েয হবে না।

এ কথার পক্ষে আরো প্রমাণ হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য ঢলার সাথে সাথে যোহরের নামায আদায় না করে প্রথমে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে নিক্ষেপ করা জায়েয হতো, তবে প্রথমে কঙ্কর মেরে প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায আদায় করতেন। কেননা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা উত্তম। মোটকথা, আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে সূর্য ঢলার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (৫২৫) জনৈক হাজী সাহেব আরাফাতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মীনায় রাত কাটায়নি, কঙ্করও নিক্ষেপ করেনি এবং তাওয়াফে এফাযাও করেনি। তাকে এখন কি করতে হবে?

উত্তরঃ আরাফাতের ময়দানে যে লোকটি অসুস্থ হয়েছে, তার অসুখ যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, হজ্জের অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করা তার জন্য অসম্ভব, আর ইহরামের পূর্বে সে শর্ত করেছে ('যদি আমি বাধাগ্রস্ত হই তবে যেখানে বাধাগ্রস্থ সেখানেই হালাল হয়ে যাব' এরূপ কথা বলেছে।) তবে সে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে কোন অসুবিধা হবে না।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদঃ পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফতোয়া দেয়া। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুন্ডন করেছে।

কিন্তু এটা ফরয হজ্জ হলে পরবর্তী বছর পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর ইহরাম বাঁধার সময় যদি শর্ত না করে থাকে এবং হজ্জের কাজ পূর্ণ করতে সক্ষম না হয়, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে কুরবানী যবেহ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ-ওমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাগ্রস্থ হও, তবে সহজ সাধ্য কুরবানী করবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৬) এখানে বাধাগ্রস্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা অন্য যে কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। আর বাধাগ্রস্থ হওয়া মানে, কোন কারণ বশতঃ হজ্জ-ওমরার কাজ পূর্ণ করতে সক্ষম না হওয়া। এই ভিত্তিতে সে হালাল হয়ে যাবে এবং কুরবানী যবেহ করবে। এছাড়া তার উপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি ফরয হজ্জ আদায় না করে থাকে তবে পরবর্তী বছর তা আদায় করবে।

আর এই অসুস্থ ব্যক্তি যদি হজ্জের কাজ চালিয়ে যায়। আরাফাত থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় রাত কাটায় কিন্তু মিনায় রাত কাটাতে সক্ষম না হয় এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করতে না পারে, তবে প্রত্যেকটি ওয়াজিবের জন্য একটি করে কুরবানী করবে। দু'টি কুরবানী করতে হবে। একটি কুরবানী মিনায় রাত না কাটানোর জন্য অন্যটি জামরা সমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ না করার জন্য। কিন্তু সুস্থ হলে তওয়াফে এফাযা আদায় করবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তওয়াফে এফাযা জিল হজ্জের শেষ পর্যন্ত করা যাবে। কিন্তু বাধা যদি আরো বড় হয় তবে, বাধা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তারপর তওয়াফ করবে।

প্রশ্নঃ (৫২৬) মুযদালিফার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বাইরে অবস্থান করলে করণীয় কি ?

উত্তরঃ বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদ্ইয়া স্বরূপ একটি দম দিতে হবে অর্থাৎ-একটি কুরবানী যবেহ করতে হবে এবং উহা মক্কার ফক্বীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। কেননা সে হজ্জের একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করেছে।

এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত হাজী ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, হজ্জে এসে আরাফাত ও মুযদালিফার সীমনা সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। দেখা যায়, অনেক হাজী আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থান করেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আরাফাতের সীমানার মধ্যে প্রবেশ না করে সেখান থেকেই ফিরে আসেন। এদের হজ্জ বিশুদ্ধ হবে না। তারা হজ্জ না করেই ফিরে এলেন। এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরূরী। আল্ হামদু লিল্লাহ্ এ সীমানা জানার জন্য আরাফাত ময়দানের

চতুর্পাশ্বে বিশাল বিশাল বোর্ডের ব্যবস্থা আছে। তার প্রতি খেয়াল করলেই কোন সমস্যা থাকবে না।

প্রশ্নঃ (৫২৭) এফরাদ হজ্জকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ করে নেয়, তবে তওয়াফে এফাযার পর তাকে কি আবার সাঈ করতে হবে ?

উত্তরঃ তাওয়াফে এফাযার পর তাকে আর সাঈ করতে হবে না। কেননা তার ওমরা নেই। সুতরাং তওয়াফে কুদূমের সাথে সে যদি সাঈ করে থাকে, তবে এটাই হজ্জের সাঈ হিসেবে গণ্য হবে। পরে আর সাঈ করতে হবে না।

প্রশ্নঃ (৫২৮) ক্বিরাণকারীর জন্য একটি তওয়াফ ও একটি সাঈ কি যথেষ্ট হবে ?

উত্তরঃ কোন মানুষ যদি ক্বিরাণ হজ্জ করতে চায়, তবে তার তওয়াফে এফাযা বা হজ্জের তওয়াফ ও হজ্জের সাঈ ওমরা ও হজ্জ উভয়টির জন্য যথেষ্ট হবে। তখন তওয়াফে কুদূম তার জন্য সুন্নাত। সে ইচ্ছা করলে হজ্জের সাঈ তওয়াফে কুদূমের পরপরই আদায় করে নিতে পারে। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। ইচ্ছা করলে সাঈ বাকী রেখে তওয়াফে এফাযার পর করতে পারে। কিন্তু পূর্বেই করে নেয়া উত্তম। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেছিলেন। অতঃপর ঈদের দিন শুধুমাত্র তওয়াফে এফাযা করবে। সাঈ করবে না। ক্বিরাণকারীর হজ্জ ও ওমরার জন্য একটি মাত্র তওয়াফ ও সাঈ যথেষ্ট হওয়ার দলীল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী। তিনি আয়েশা (রাঃ) কে বলেন, طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ "আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ তোমার হজ্জ ও ওমরার জন্য যথেষ্ট হবে।"[1] আয়েশা (রাঃ) ছিলেন ক্বিরাণ হজ্জকারীনী। অতএব নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করে দিলেন যে, ক্বেরাণকারীর তওয়াফ ও সাঈ হজ্জ ও ওমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ (৫২৯) জনৈক ব্যক্তি রাত বরোটা পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে মক্কা চলে গেছে, ফজরের পূর্বে আর মিনায় ফেরত আসেনি। তার বিধান কি ?

উত্তরঃ রাত বারোটা যদি মধ্য রাত্রি হয়, তবে তারপর মিনা থেকে বের হলে কোন অসুবিধা নেই। যদিও উত্তম হচ্ছে রাত ও দিনের পূর্ণ অংশ মিনাতেই অবস্থান করা। আর রাত বারোটা যদি মধ্য রাত্রি না হয় তবে বের হওয়া জায়েয হবে না। কেননা মিনায় অবস্থান করার শর্ত হচ্ছে রাতের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়া। যেমনটি ফিক্বাহবিদগণ (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

---

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ হজ্জ-ওমরা, অনুচ্ছেদঃ ক্বিরাণকারীর তওয়াফ। এ হাদীছটির মূল ছহীহ্ মুসলিমে রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৫৩০) ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করার পর কাজ থাকার কারণে কেউ যদি সূর্যাস্তের পর আবার মিনায় ফিরে আসে। এখন কি মিনায় রাত থাকা তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ না, মিনায় রাত থাকা তার উপর আবশ্যক হবে না। সে তাড়াহুড়াকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে হজ্জের যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করে ফেলেছে। কাজের জন্য মিনায় ফিরে আসা তাড়াহুড়ার পরিপন্থী নয়। কেননা তার মিনায় ফিরে আসার নিয়ত নির্দিষ্ট কাজের জন্য হজ্জের জন্য নয়।

১৩ ই জিলহজ্জ সকালে কঙ্কর মারা জায়েয আছে কি ?

প্রশ্নঃ (৫৩১) সউদী আরবের বাইরে অবস্থান করে এমন জনৈক হাজী হজ্জের কাজ সম্পাদন করেছে। জিলহজ্জের ১৩ তারিখে আছর তথা বিকাল চারটার সময় তার সফরের সময় নির্দিষ্ট। কিন্তু ১২ তারিখ কঙ্কর মারার পর সে মিনা থেকে বের হয়নি। ১৩ তারিখের রাত সেখানেই অবস্থান করেছে। এখন ১৩ তারিখ সকালে কঙ্কর মেরে মিনা থেকে বের হওয়া তার জন্য জায়েয হবে কি ? উল্লেখ্য যে, যোহরের পর কঙ্কর মেরে বের হলে নির্ঘাত তার সফর বাতিল হয়ে যাবে, ফলে সে বিরাট অসুবিধায় পড়বে। এর উত্তর যদি না জায়েয হয়, তবে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারার ব্যাপারে কি কোন মত পাওয়া যায় না ?

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয নয়। জরূরী অবস্থা হিসেবে কঙ্কর নিক্ষেপ করা রহিত হবে না। তবে তার সমাধান হচ্ছে এ অবস্থায় কঙ্কর না মেরেই সে চলে যাবে এবং তার ফিদিয়া প্রদান করবে। আর তা হচ্ছে মক্কা বা মিনায় একটি কুরবানী করবে অথবা কাউকে এর দায়িত্ব প্রদান করবে। এবং উক্ত কুরবানী সেখানকার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। এরপর বিদায়ী তওয়াফ করে মক্কা ত্যাগ করবে। হ্যাঁ, যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারার বৈধতার ব্যাপারে মত পাওয়া যায়, কিন্তু তা বিশুদ্ধ নয়। সঠিক কথা হচ্ছে, ঈদের পর আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে কোন অবস্থাতেই যোহরের সময়ের পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয নয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে ইবাদতের (হজ্জ-ওমরার) নিয়ম শিখে নাও।"[1] আর তিনি এই দিনগুলোতে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারেন নি। কেউ যদি বলে যে, যোহরের পর নবীজির কঙ্কর নিক্ষেপ তার সাধারণ একটি কর্ম। আর সাধারণ কর্ম দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

জবাবে আমরা বলব, একথা সত্য যে এটি তাঁর সাধারণ কর্ম। তিনি যোহরের পর

[1] বুখারী, অধ্যায়ঃ ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদঃ পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফতোয়া দেয়া। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুন্ডন করেছে।

কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। এরকম বাচনিক নির্দেশ প্রদান করেন নি যে, 'কঙ্কর নিক্ষেপ যোহরের পরেই হতে হবে'। তাছাড়া এ সময়ের পূর্বে নিক্ষেপের ব্যাপারে কোন নিষেধও করেন নি। আর তাঁর কর্ম ওয়াজিবের অর্থ বহণ করে না। নির্দেশ সূচক শব্দ ছাড়া কোন কাজ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব হয় না বা নিষেধ সূচক শব্দ ছাড়া পরিত্যাগ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু আমি বলব, নবীজির উক্ত কর্ম যে ওয়াজিব তার পক্ষে কারণ আছে। আর তা হচ্ছে, কঙ্কর মারার ব্যাপারে যোহরের সময় পর্যন্ত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অপেক্ষা করাটাই প্রমাণ করে যে এটা ওয়াজিব। কেননা যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারা যদি জায়েয হত, তবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটাই করতেন। কারণ উম্মতের জন্য এটাই সহজ। আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যখন দু'টি বিষয়ের মাঝে স্বাধীনতা দেয়া হত, তখন তিনি উভয়টির মধ্যে থেকে সহজটি গ্রহণ করতেন- যদি তাতে কোন পাপ না থাকত। সুতরাং এখানে যখন তিনি সহজ অবস্থাটি গ্রহণ করেন নি অর্থাৎ যোহরের সময় হওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন নি, তখন বুঝা যায় এতে পাপ আছে। অতএব যোহরের সময় হওয়ার পরই কঙ্কর মারা ওয়াজিব।

এ কাজটি ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার সাথে সাথে যোহরের নামায আদায় করার পূর্বেই কঙ্কর মেরেছেন। যেন তিনি অধির আগ্রহে সূর্য ঢলার অপেক্ষা করছিলেন। যাতে করে দ্রুত কঙ্কর মারতে পারেন। আর এ কারণেই যোহর নামায দেরী করে আদায় করেছেন। অথচ প্রথম সময়ে অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথেই নামায আদায় করা উত্তম। এ থেকেই বুঝা যায় যোহরের সময় হওয়ার পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয হবে না।

১২ তারিখে কঙ্কর না মেরে ও বিদায়ী তওয়াফ না করলে ...

প্রশ্নঃ (৫৩২) জনৈক ব্যক্তি ১২ তারিখে কঙ্কর না মেরেই মিনা ছেড়েছে এ ধারণায় যে, এটাই অনুমদিত তাড়াহুড়া। এবং বিদায়ী তওয়াফও করেনি। তার হজ্জের কি হবে ?

উত্তরঃ তার হজ্জ বিশুদ্ধ। কেননা সে হজ্জের কোন রুকন পরিত্যাগ করেনি। কিন্তু সে তিনটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করেছে- যদি ১২ তারিখের রাত মিনায় না কাটিয়ে থাকে।

প্রথম ওয়াজিবঃ ১২ তারিখের রাত মিনায় কাটানো।

দ্বিতীয় ওয়াজিবঃ ১২ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

তৃতীয় ওয়াজিবঃ বিদায়ী তওয়াফ।

তার উপর আবশ্যক হচ্ছে প্রতিটি ছেড়ে দেয়া ওয়াজিবের বিনিময়ে একটি করে দম দেয়া। অর্থাৎ মোট তিনটি কুরবানী করে তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া। কেননা বিদ্বানদের মতে কেউ যদি হজ্জের কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করে, তবে তার বিনিময়ে কুরবানী করে তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

এ উপলক্ষে আমি হাজী সাহেবানদের সতর্ক করতে চাই, প্রশ্নকারী যে রকম ভুল করেছে অধিকাংশ হাজী এরকমই বুঝে থাকে এবং অনুরূপ ভুল করে থাকে। আল্লাহ্‌র বাণীঃ "যে ব্যক্তি দু'দিন থেকে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চায়, তার কোন গুনাহ্ নেই।" তারা মনে করে এখানে দু'দিন বলতে ঈদের দিন ও ১১তম দিনকে বুঝানো হয়েছে। তাই তারা ১১ তারিখে কঙ্কর মেরেই মিনা ত্যাগ করে। কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়। এটা একটা মারাত্মক ভুল। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

"তোমরা নির্দিষ্ট কতিপয় দিনে আল্লাহর যিকির কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দু'দিন থাকার পর তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চায়, তার কোন গুনাহ্ নেই।" (সূরা বাক্বারাঃ ২০৩) এ আয়াতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বলতে আইয়্যামে তাশরীকের দিন সমূহ (তথা জিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩) কে বুঝানো হয়েছে। আর আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দিন হচ্ছে ১১ তারিখ। অতএব উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে থেকে প্রথম দু'দিনে তাড়াহুড়া করে চলে আসবে তার কোন গুনাহ্ নেই। আর উক্ত দু'দিনের দ্বিতীয় দিন হচ্ছে ১২তম দিন। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত এ মাসআলাটি ভালভাবে অনুধাবন করা এবং ভুল সংশোধন করে নেয়া।

রাতের বেলায় মিনায় স্থান না পেলে কি করবে ?

প্রশ্নঃ (৫৩৩) মিনায় স্থান না পাওয়ার কারণে কোন লোক যদি সেখানে শুধুমাত্র রাতের বেলায় আগমণ করে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করে। তারপর মক্কা চলে যায় এবং রাত ও দিনের অবশিষ্ট অংশ তথায় অবস্থান করে তবে কি হবে ?

উত্তরঃ তার এই কাজ যথেষ্ট হবে। কিন্তু এর বিপরীত করাই উত্তম। উচিত হচ্ছে, হাজী সাহেব রাত ও দিনের পূরা সময় মিনাতেই অতিবাহিত করবে। ভালভাবে অনুসন্ধান করার পরও যদি কোন মতেই মিনার অভ্যন্তরে স্থান করতে না পারে, তবে সর্বশেষ (খীমা বা) তাঁবুর সংলগ্ন স্থানে তাঁবু করে সেখানে অবস্থান করবে যদিও তা মিনার বাইরে পড়ে। বর্তমান যুগের কোন কোন বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন মানুষ যদি মিনায় অবস্থান করার স্থান না পায়, তবে মিনায় রাত কাটানো রহিত হয়ে যাবে। তখন তার জন্য জায়েয হয়ে যাবে মক্কা বা অন্য কোন স্থানে রাত কাটানো। তাদের কিয়াস হচ্ছে, কোন মানুষের ওযুর কোন অঙ্গ যদি কাটা থাকে তখন সেটা ধৌত করা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের এই মত যুক্তি সংগত নয়। কেননা ওযুর অঙ্গের বিষয়টি ঐ ব্যক্তির পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু মিনায় রাত কাটানোর বিষয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমস্ত লোকের একস্থানে সমবেত থাকা। সকলে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে প্রকাশ ঘটানো। সুতরাং ওয়াজিব হচ্ছে, মিনার শেষ তাঁবুর পাশে তাঁবু বানিয়ে থাকা, যাতে করে সে হাজীদের সাথেই রাত কাটাতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে, নামাযের জামাআতে যদি

মসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়, আর লোকেরা মসজিদের আশে-পাশে বাইরে নামাযে দাঁড়ায়, তবে আবশ্যক হচ্ছে কাতার মিলিত হওয়া। যাতে করে তারা একই জামাআতভুক্ত একথা প্রমাণ হয়। রাত কাটানোর বিষয়টি এর সাথে সামঞ্জস্যশীল, শরীরের কর্তিত অঙ্গের সাথে এর তুলনা করা উচিত নয়।

বিদায়ী তওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থান করার বিধান

প্রশ্নঃ (৫৩৪) জনৈক ব্যক্তি সকালে বিদায়ী তওয়াফ করে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আছরের পর সফর করার ইচ্ছা করে। তাকে কি কিছু করতে হবে ?

উত্তরঃ হজ্জ ও ওমরা উভয় ক্ষেত্রে তাকে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। কেননা নবী (ﷺ) বলেনঃ (لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بِالْبَيْت) "সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ না করে কেউ যেন বের না হয়।"[1] একথাটি নবীজি বিদায় হজ্জে বলেছেন। সুতরাং বিদায়ী তওয়াফের বিধান সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে। একথা বলা ঠিক হবে না যে, নবী তো বিদায় হজ্জের পূর্বে ওমরা করেছেন কিন্তু বিদায়ী তওয়াফ তো করেননি। কেননা বিদায়ী তওয়াফের আবশ্যকতার নির্দেশ তো বিদায় হজ্জে পাওয়া গেছে। আর তিনি এরশাদ করেছেন: (وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِـــكَ) "হজ্জের মধ্যে যেভাবে কাজ করে থাক ওমারাতেও সেভাবে করো।"[2] এ নির্দেশটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু তার মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছে আরাফা, মুযদালিফা ও মিনাতে অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে এ কাজগুলো হজ্জের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো ছাড়া বাকী কাজ উক্ত হাদীছের আওতাধীন থাকবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমরাকে ছোট হজ্জ রূপে আখ্যা দিয়েছেন।[3] যেমনটি আমর বিন হাযম কর্তৃক প্রসিদ্ধ দীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি মুরসাল[4]। কিন্তু উলামাগণ সাধারণভাবে হাদীছটি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর।" বিদায়ী তওয়াফ যদি হজ্জের পূর্ণতার অংশ হয়, তবে উহা ওমরারও পূর্ণতার অংশ হবে। ওমরাকারী মসজিদে হারামের তাহিয়্যাত হিসেবে তওয়াফের মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশ করেছে। সুতরাং কোন তাহিয়্যাত ছাড়া চলে যাওয়াও উচিত হবে না। তাই সে বিদায়ী তওয়াফ করবে।

অতএব এই ভিত্তিতে হজ্জের ন্যায় ওমরাতেও বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব।

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতীর জন্য উহা রহিত।

[2]. বুখারী, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ খালূক রং কাপড়ে লাগলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ও ওমরায় ইহরামকারীর জন্য যা বৈধ।

[3]. দারাকুতনী ২/২৮৫ হা/ (১২২)

[4]. যে হাদীছের সনদ হতে ছাহাবীর নাম বাদ পড়ে যায় তাকে মুরসাল হাদীছ বলা হয়।

তিরমিযীতে একটি হাদীছ পাওয়া যায়ঃ বলা হয়েছে, "কোন লোক যদি হজ্জ বা ওমরা করে, সে আল্লাহর ঘরের বিদায়ী তওয়াফ না করে যেন বের না হয়।" কিন্তু এই হাদীছটি যঈফ। কেননা এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। সে দুর্বল। এ হাদীছটি দুর্বল না হলে এই মাসআলার সুস্পষ্ট দলীল হিসেবে বিবেচিত হত এবং সকল মতভেদ বিদূরীত হত। কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করার কোন ভিত্তি নেই। তবে আমরা পূর্বে যে সমস্ত মূলনীতি, দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন করেছি তার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, ওমরায় বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব।

তাছাড়া এই তওয়াফ সতর্কতা ও যিম্মা মুক্তি স্বরূপও হয়ে যায়। কেননা ওমরাতে আপনি বিদায়ী তওয়াফ করলে তো কেউ আপনাকে বলবে না যে আপনি ভুল করছেন। কিন্তু তা না করলে তো যারা তা ওয়াজিব মনে করে তারা বলবে, আপনি ভুল করলেন। এই কারণে তওয়াফ করাটাই সঠিক হবে। আর তওয়াফ না করলে আশংকা রয়ে যাবে এবং বিদ্বানদের কারো মতে তা ভুল হবে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞানী)

প্রশ্নঃ (৫৩৫) ওমরাকারীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ করার বিধান কি ?

উত্তরঃ ওমরাকারী মক্কা আগমণ করার সময় যদি নিয়ত করে যে, তওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুন্ডন তথা ওমরার কার্যাদী সম্পন্ন করার সাথে সাথে ফেরত চলে যাবে, তবে তাকে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবেনা। কেননা তওয়াফে কুদূমই তার জন্য ওমরার তওয়াফ ও বিদায়ী তওয়াফ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু ওমরা সম্পন্ন করার পর যদি মক্কায় অবস্থান করে তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব। একথার দীলল নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপক নির্দেশঃ لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ) "সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ না করে কেউ যেন বের না হয়।"[1] এখানে أَحَدٌ বা 'কেউ' শব্দটি অস্পষ্ট। যে কেউ হলেই তার জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। অর্থাৎ-তওয়াফ না করে বের হবে না। সে হজ্জকারী হোক বা ওমরাকারী।

দ্বিতীয়তঃ ওমরা হজ্জের মতই। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমরাকে হজ্জ রূপে আখ্যা দিয়েছেন। আমর বিন হাযম কর্তৃক প্রসিদ্ধ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "ওমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ।"[2] হাদীছটি মুরসাল। কিন্তু উলামাগণ সাধারণভাবে হাদীছটি গ্রহণ করেছেন।

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতীর জন্য উহা রহিত।
[2]. দারাকুতনী২/২৮৫ হা/ (১২২)

তৃতীয়তঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত ওমরা হজ্জের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।[1] অর্থাৎ-হজ্জ করলে ওমরাও আদায় হয়ে গেল।
চতুর্থতঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ালা বিন উমাইয়াকে বলেন,

(وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ)

“হজ্জের মধ্যে যেভাবে কাজ করে থাক ওমারাতেও সেভাবে করো।”[2] যদি তুমি হজ্জে বিদায়ী তওয়াফ করে থাক, তবে ওমরাতেও তা কর। তবে বিদ্বানদের ঐকমত্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উক্ত নির্দেশের বাইরে থাকবেঃ আরাফা, মুযদালিফা ও মিনাতে অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ। এগুলো ওমরাতে শরীয়ত সম্মত নয়। তাছাড়া সতর্কতার জন্য এবং যিম্মা মুক্ত হওয়ার জন্য বিদায়ী তওয়াফ করে নেয়াই উচিত।

ইহরাম বাঁধার পর হজ্জ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে করণীয় কি ?

প্রশ্নঃ (৫৩৬) জনৈক ব্যক্তি মীক্বাত থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছে সে প্রশাসন (ডিউটি পুলিশ) কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেননা সে হজ্জের অনুমতি পত্র নেয়নি। এখন তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ এ অবস্থায় মক্কা প্রবেশ করতে না পারলে সে ‘মুহছার’ বা বাধাগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। তখন বাধাপ্রাপ্ত স্থানে কুরবানী যবেহ করে সে ইহরাম খুলে ফেলবে। যদি ইহা তার প্রথম ফরয হজ্জ হয়ে থাকে তবে পরবর্তী বছর তা আদায় করবে। আর ফরয না হয়ে থাকলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী পরবর্তী বছর তা আদায় করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদায়বিয়ার বছরে বাধাপ্রাপ্ত হলে পরবর্তী বছর তা কাযা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেননি। অতএব আল্লাহর কিতাবে ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতে বাধাপ্রাপ্ত হজ্জ বা ওমরা কাযা আদায় করার বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾

“যদি বাধাগ্রস্থ হও, তবে সহজসাধ্য কুরবানী করবে।” (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৬) এখানে কুরবানী করা ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখ করা হয়নি। আর পরবর্তী বছর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উমরা আদায়কে কাযা উমরা এজন্যই বলা হয়েছে যে, তিনি কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে পরবর্তী বছর ওমরা আদায় করবেন। এই কারণে নয় যে, ছুটে যাওয়া কাজের পূর্ণতার জন্য কাযা আদায় করেছিলেন। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন)

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জের মাস সমূহে ওমরা করা জায়েয।
[2] . বুখারী, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ খালূক রং কাপড়ে লাগলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ও ওমরায় ইহরামকারীর জন্য যা বৈধ।

প্রশ্নঃ (৫৩৭) হজ্জের ইচ্ছা করার পর যদি তাকে নিষেধ করে দেয়া হয়, তবে তার করণীয় কি ?

উত্তরঃ যদি সে ইহরাম না করে থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। কোন কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। কেননা কোন লোক ইহরামে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত ইচ্ছা করলে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে, ইচ্ছা করলে নিজ ঠিকানায় ফেরত আসতে পারে। কিন্তু হজ্জ ফরয হলে, যতদ্রুত সম্ভব আদায় করে নেয়া ভাল। আর ইহরামে প্রবেশ করার পর বাধাগ্রস্থ হলে যদি ইহরাম বাধার সময় শর্ত করে থাকে এই বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হাবেস্, ফা মাহেল্লী হায়ছু হাবাস্তানী", তবে বাধাপ্রাপ্ত স্থানে ইহরাম খুলে ফেলবে। কোন কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি শর্ত করার জন্য এরূপ দু'আ পাঠ না করে থাকে, তবে উক্ত বাধা অচিরেই বিদূরিত হওয়ার আশা থাকলে অপেক্ষা করবে এবং হজ্জ পূর্ণ করবে। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে যদি বাধা মুক্ত হয়, তবে আরাফাতে অবস্থান করে হজ্জ পূর্ণ করবে। কিন্তু আরাফাতে অবস্থানের পর বাধা মুক্ত হলে, হজ্জ ছুটে গেল। তখন ওমরা আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলবে। ফরয হজ্জ হয়ে থাকলে পরবর্তী বছর তা কাযা আদায় করবে। কিন্তু অচিরেই বাধা মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং শর্ত না করে থাকলে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং কুরবানী করে দিবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ-ওমরা পূর্ণ করবে। যদি বাধাগ্রস্থ হও, তবে সহজসাধ্য কুরবানী করবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৬)

প্রশ্নঃ (৫৩৮) হজ্জ করতে এসে পাপের কাজে লিপ্ত হলে কি হজ্জের ছওয়াব কমে যাবে?

উত্তরঃ সাধারণভাবে সবধরণের পাপকাজ হজ্জের ছরয়াব হ্রাস করে দেয়। কেননা আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

"যে ব্যক্তি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করবে, সে স্ত্রী সহবাস, গর্হিত কাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্তহে ত পারবে না।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৭)

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেছেন, হজ্জ অবস্থায় পাপ কাজ করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানদের নিকট প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে: "হারাম কাজটি যদি ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে তার কারণে ইবাদত বাতিল হবে না।" সাধারণ পাপ সমূহ হজ্জের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কেননা তা হজ্জের সময় যেমন হারাম অন্য সময়ও হারাম। এটাই বিশুদ্ধ মত। এ সমস্ত পাপকাজ হজ্জকে বাতিল করে দিবে না। কিন্তু তার ছওয়াব নষ্ট করে দিবে।

প্রশ্নঃ (৫৩৯) মিথ্যা পাসপোর্ট বানিয়ে হজ্জ করলে হজ্জ হবে কি ?

উত্তরঃ তার হজ্জ হয়ে যাবে। হজ্জ আদায় হবে। কেননা পাসপোর্ট নকল করা হজ্জের কর্ম সমূহের অন্তর্ভূক্ত নয়। এটা হজ্জের বাইরের কাজ। কিন্তু এ কাজের কারণে সে গুনাহগার হবে। তাকে তওবা করা উচিত। কেননা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বা প্রশাসনকে ধোঁকা দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ ও বড় গুনাহর কাজ। জেনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার ব্যবস্থা করে দিবেন, তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করবেন, তার সকল কাজ সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, সত্য কথা বলবে এবং সৎ পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তার কর্ম সংশোধন করে দিবেন এবং তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

সমাপ্ত